পতি পরম গুরু
প্রথম খন্ড
বিমল মিত্র
www.worldmets.com - Bengali ebooks -
All bengali books

বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

বিমল মিত্র
পতি
পরম
গুরু

অথঃ পূর্বাভাষ

এ এমন এক যুগের কথা বলছি যখন কলকাতার মানুষের মনের সামনে শুধুই হতাশা, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন এক যুগেরও কথাও বলছি যখন তার আশা-ভরসারও যেন আর অন্ত নেই। মানুষ একবার ভাবে এই অন্ধকার দূর হয়ে সামনেই বুঝি আসছে সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, আবার ভাবে তার বুঝি কোনও আশা নেই, অন্ধকারের নরকেই তার জীবনের সব সাধ-আহ্লাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন একজন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ-সন্তান চোখ বুজে-বুজে বৃহৎ প্যান-এশীয়-সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখে আর হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত সব রাজ্যে আকাশ-পথে ঘুরে ঘুরে মানুষকে আরো পরিশ্রমী হতে বলে, না খেয়ে খেটে খেটে সুন্দর সুখী ভারতবর্ষের স্বপ্নকে সার্থক করবার উপদেশ দেয়। আর এদিকে বাঙলার মসনদে তখন জম্পেশ করে বসেছে একজন ডাক্তার—যে কেবল দিল্লীর কাছ থেকে ধর্না দিয়ে টাকা আদায়ই করে না, একটার পর একটা মোটা মাইনের চাকরি দিয়ে প্রভাবশালী মতলববাজ লোকগুলোর মুখও বন্ধ করে দেয়। এ সত্যিই অবক্ষয়ের যুগ। অবক্ষয়ের যুগ হলেও বিদ্রোহের যুগও বটে। আর শুধু বিদ্রোহের যুগই নয়, অশ্রদ্ধারও যুগ। যা কিছু প্রতিষ্ঠিত, যা কিছু পরীক্ষিত, যা কিছু পর্যবসিত তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহ তখন ক্রমে ক্রমে অশ্রদ্ধার রূপ নিতে চলেছে। সুখ শান্তি বিশ্বাস সব কিছুর ওপরেই সকলের অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রদ্ধার অঙ্কুর আস্তে আস্তে কবে বিরাট মহীরুহে রূপান্তরিত হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করবে সেই আতঙ্কেই যেন সবাই থর থর করে কাঁপছে।

এ সেই ১৯৫৬ সালের শেষভাগের কলকাতা। সবে ১৯৫৭ সালের শুরু। সারা ভারতবর্ষের শহরে শহরে তখন ভোটের উন্মাদনা শুরু হয়েছে। দু'পক্ষের ভোটের লড়াইতে আর টাকার দান-খয়রাতে মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। একদল বলছে—ওরা পুঁজিপতির দালাল, ওদের ভোট দেবেন না। আর একদল বলছে—ওরা রাশিয়ার দালাল, ওদের ভোট দেবেন না।

ঠিক এমনি সময়, যখন সন্ধ্যে হবো-হবো, তখন একদিন উত্তর কলকাতার বিদ্যাধর বিশ্বাস বাই লেনের শেষ বাড়িটার সামনে একটা ছোট গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়িটার স্টিয়ারিং-এ বসে ছিল একটা মেয়ে। গাড়িটা দাঁড়াতেই মেয়েটা দরজা খুলে পাশের বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। যে-ছেলেটি পাশে বসেছিল সেও তার পেছন পেছন গিয়ে ঢুকলো বাড়ির ভেতরে।

রাস্তা তখন নির্জন।

ভারত-ইতিহাস-ভাগ্য-বিধাতার রথের রশিতে অনেকবারই টান পড়েছে। সেই ১৭৫৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছে সেসব। অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ। তারপর কেটেছে। ১৮৫৭ সাল। সিপাহী-বিদ্রোহের সন্ধিযুগ। আর তারপর এই ১৯৫৭। দু'শো বছরের ইতিহাসে মানুষ যত বিদ্রোহ করেছে তত তার পায়ের শিকল একটা-একটা করে খসেছে। কিন্তু এবার অন্যরকম।

সেদিন ক্লাইভ সাহেবও ভোট চেয়েছিল। বলেছিল—তোমরাই নবাব হও, আমরা ব্যবসা করতে এসেছি, ব্যবসাই করে যাবো বরাবর—

কিন্তু না, বাঙলার মানুষ ভোট দিয়েছিল ক্লাইভ সাহেবকে।

তারপরের পালা বাহাদুর শা'এর। সাম্রাজ্যবাদীরা জিজ্ঞেস করেছিল—কাকে ভোট দেবে তোমরা? বাহাদুর শা'কে না আমাদের?

ইণ্ডিয়ার মানুষ সেবারও ভোট দিয়েছিল ক্লাইভ সাহেবদের।

কিন্তু এবার বুঝি সব উল্টে গেল। এই ১৯৫৭ সালে। সাম্রাজ্যবাদীদের দিকের পাল্লা যেন আর তেমন আগেকার মত ঝুঁকছে না। যেন আগেকার মত কেউ বলছে না—এবার তোমাদেরই ভোট দেবো। এবার যেন মানুষ একটু সচেতন হয়েছে। আগে কংগ্রেস ছাপ দিয়ে দিলে লোকে ল্যাম্প্‌পোস্টকেই ভোট দিয়ে এসেছে। এবার আর তা নয়। এবার পাশাপাশি আর একটা দল গজিয়ে উঠেছে।

এবার কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছে—ওরা পুঁজিপতিদের দালাল, ওদের আর ভোট দিও না।

উল্টোদিক থেকে ওরাও রব তুলেছে—ওরা রাশিয়ার দালাল, ওদের ভোট দিও না। আজ মীরজাফর, বাহাদুর শা, লর্ড ক্লাইভ সবাই একসঙ্গে যেন আবার কবর থেকে উঠে এসে হাজির হয়েছে দেশের মানুষের সামনে। সবাই চিৎকার করে একসঙ্গে বলতে শুরু করেছে—আমাকে ভোট দাও, আমাকে ভোট দাও—আমিই হিন্দুস্থানের মসনদে বসবো—আমি তোমাদের ভালো করবো—

কিন্তু কাকে বিশ্বাস করবো? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মনে তখন একই প্রশ্ন জেগেছে—কাকে বিশ্বাস করবো? কাকে হিন্দুস্থানের মসনদে বসাবো? মীরজাফর আলি সাহেবকে, না বাহাদুর শা'কে, না জালিয়াৎ রবার্ট ক্লাইভকে? কাকে ভোট দেবো?

বিদ্যাধর বিশ্বাস বাই লেনের অন্ধকার ব্লাইণ্ড বাড়িগুলো এর জবাব দিতে পারলে না। প্রশ্নগুলো সকলের ঘরে-ঘরে সকলের মনে মনে মাথা কুটে মরতে লাগলো; তবু কেউ সাড়া-শব্দ দিলে না। তবু কেউ উত্তর দিতে পারলে না।

হঠাৎ একটা বাড়ির ভেতর থেকে দুম্-দুম্ করে তিনবার পিস্তলের শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাড়াটা চম্‌কে উঠে কান খাড়া করে রইল। এখানে এই অন্ধ গলির নিরিবিলির মধ্যে ও কীসের শব্দ? কে কাকে গুলি করলে?

—কে? কে গুলি করলে মশাই? কোন্ বাড়িতে?

এক বাড়ির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, মশাই, গুলির আওয়াজ কেন, শোনেন?

কেউ জানে না, কেন কোথায় গুলির শব্দ হলো! উত্তর দেবে কী করে?

১৯৫৭ সালেও কি আবাব পলাশীর যুদ্ধ শুরু হলো নাকি? না সেপাই-বিদ্রোহ?

কিন্তু না, ততক্ষণে কিছু ছোকরা মানুষ আর থাকতে পারলে না—তারা সবাই দল বেঁধে হুড়মুড় করে বাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়লো। সবাই জানতো বাড়িটার ভেতরে কেউ থাকে না। একজন ভদ্রলোক সবে বাড়িটা করেছিল ওখানে। এ-পাড়ার কারোর সঙ্গে তখনও তার ভালো করে পরিচয় হয়নি। বাড়িতে লোকটা একলাই থাকে। একটা গাড়ি আছে, সেইটে চালিয়ে রোজ কোন্ অফিসে যায়, আর কখন কত রাত্রে যে বাড়ি ফিরে আসে তা আর কেউ টের পায় না।

তবে লোকে বলে—কংগ্রেস ওয়ার্কার—

ওই পর্যন্ত। তার বেশি আর কেউ জানেও না, জানবার বিশেষ চেষ্টাও

করে না। তাছাড়া কলকাতা শহরের বুকের মধ্যে কেই বা কার খবর রাখে? কারই বা অত সময়? একটা ঠিকে-ঝি এসে শুধু সকাল বেলা রান্নাবান্না করে দিয়ে চলে যায়। আর কেউ নেই ভদ্রলোকের। বাইরে যাবার সময় শুধু ভদ্র-লোককে দেখা যায়। বেশ চমৎকার দোহারা চেহারা, ফরসা রং। বয়েস উনত্রিশ-ত্রিশের মধ্যে। সদর দরজায় তালা দিয়ে নিজের গাড়িটাতে গিয়ে ওঠে। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হুশ্‌ করে চলে যায়। গিয়ে গ্রে স্ট্রীটে পড়ে। তখন আর গাড়িটাকে দেখা যায় না।

এ প্রতিদিনকার নিয়ম। ছুটির দিনগুলোতেও যে ভদ্রলোক কোথায় বেরোয় তা কেউ বুঝতে পারতো না। হয়তো কংগ্রেসের কাজে। সম্প্রতি ভোট এগিয়ে আসছিল। ভদ্রলোকেরও যেন কাজ বেড়ে গিয়েছিল। নাওয়া-খাওয়ারও যেন আর সময় পেত না।

হঠাৎ চিৎকার উঠলো—খুন—খুন—খুন হয়েছে—

বাড়িটার ভেতর থেকে একদল ছেলে চিৎকার করে উঠলো—মশাই খুন হয়েছে. পুলিশ, পুলিশ—

কয়েকজন পাঁই-পাঁই করে হয়তো থানার দিকেই ছুটলো।

দোতলা বাড়ির জানলা থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলে—কে খুন হয়েছে ভাই? কে খুন হয়েছে?

—কংগ্রেস ওয়ার্কার।

—কে খুন করেছে? কারা?

—একটা মেয়ে।

—মেয়েছেলে? বলো কী হে? মেয়েছেলেটা কে?

কে আর কার কথার উত্তর দেবে? তখন সবার মাথাতেই আগুন ধরে গেছে, পাড়ার মধ্যে খুন! এ-পাড়ায় এতদিন আছি, এমন খুনোখুনি কাণ্ড তো কখনও ঘটেনি। কালে কালে এ সব কী হতে আরম্ভ করলো।

ততক্ষণে অনেকে রাস্তায় নেমে এসেছে। আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেনি।

—কী হলো মশাই? ধরা পড়েছে নাকি মেয়েছেলেটা?

—হ্যাঁ, ধরেছি। পুলিশকে খবর দিয়েছি। এখুনি আসছে তারা!

যারা হুঁশিয়ার মানুষ তারা সহজে খুনোখুনির ধারে-কাছে ঘেঁষে না। তারা বাড়ির ভেতর থেকেই খোঁজ-খবর নিতে লাগলো। এক সময় পুলিশের ভ্যান এল. তাও দেখলে। কিন্তু তবু সামনে গেল না। শেষকালে কোর্ট-কাছারির হ্যাঙ্গামে পড়লে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই দূরে থেকে খবর নেওয়াই ভালো।

একটা ছোকরা বাড়ি থেকে বেরিয়েই বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছিল—

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলো—ও ভাই. বাড়ির ভেতরে কী হচ্ছে? মেয়েটা ধরা পড়েছে নাকি?

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ, একটা মেয়ে ধরা পড়েছে, আর একটা ছেলেও ধরা পড়েছে—

—দুজনেই খুন করেছে নাকি?

ছেলেটা বললে—না. মেয়েটা বলছে সে খুন করেছে। ছেলেটা বলছে সে। পুলিশ দুজনকেই এ্যারেস্ট করেছে—

—মেয়েটা কে? কোথায় থাকে? কী করে?

—কমিউনিস্ট পার্টির মেয়ে—

—ওরে বাবারে বাবা! শেষকালে ভদ্দরলোকের পাড়ার মধ্যে কমিউনিস্টরা ঢুকে পড়লো।

ছেলেটা আর দাঁড়ালো না। যে-কাজে যাচ্ছিল সেই কাজেই চলে গেল। কিন্তু লোকের ভিড়ে বিদ্যাধর বিশ্বাস বাই লেন তখন একেবারে জনারণ্য হয়ে উঠেছে। কোথায় রইল পলাশীর যুদ্ধ, কোথায় রইল সেপাই-বিদ্রোহ, সেই ১৯৫৭ সালে যেন আবার এক মহা-বিপ্লব শুরু হয়ে গেল রাতারাতি। পুলিশ একজন মেয়ে আর একজন ছেলেকে হাতে হাতকড়া বেঁধে ভ্যানে তুলে নিয়ে থানার দিকে চললো।

কিন্তু এর জের শুধু এখানেই শেষ হলো না। পরের দিনই খবরের কাগজে ফলাও করে এই হত্যার বিবরণ ছাপা হলো। কয়েকমাস ধরে এর বিচারও চললো। তারপর বহুকাল পরে একদিন রায় বেরোল। ছেলেটি ছাড়া পেল আর মেয়েটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জেলখানায় চলে গেল।

বড় ছোট এই ঘটনাটুকু।

খবরের কাগজে এর চেয়েও ভীষণতর খবর আজকাল প্রায়ই বেরোয়। এখন এ-সব গা-সওয়া হয়ে গেছে আমাদের। প্রথম প্রথম আমরা ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠি। তারপর যত দিন চলে যেতে থাকে ততই আমরা অন্য কোনও নতুন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় পুরোন দুর্ঘটনাটাকে ভুলে যাই। ভুলতে ভুলতে একদিন আমাদের মন থেকে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শেষকালে যত আমাদের বয়েস বাড়ে একটার পর একটা আঘাত এসে আমাদের অসাড় করে দেয়। আমরা পাথর হয়ে যাই।

কিন্তু এবার আর তা হলো না।

এ ঘটনার পেছনের আসল ঘটনাটা যে চোদ্দ বছর পরে আবার শুনতে হবে তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

এ পরিচ্ছেদ তারই পূর্বাভাষ!

অথঃ কথারম্ভ

মানুষের জীবনে উত্থান-পতন যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি তার সুখ-দুঃখ। কিন্তু সুখকে আমরা যত সহজে স্বীকার করি, দুঃখকে স্বীকার করতে আমাদের তেমনি সঙ্কোচ হয় কেন? যেন সুখটা আমাদের ন্যায্য পাওনা, আর দুঃখটা একটা ব্যতিক্রম।

যদি তেমন করে কখনও জীবনকে দেখতে পারা যেত তো জীবনটা নিয়ে এত হেনস্তা হতে হতো না আমাদের। ভারতবর্ষের ঋষি-পণ্ডিতরা তাই সুখে বিগতস্পৃহ আর দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকতে পরামর্শ দিয়ে গেছেন সেই আদিযুগে। কিন্তু আমরা সে-কথা মেনে নিতে পারি কই?

অথচ এই বিরাট বাড়িটার ভেতরে যে-মানুষটার কথা লিখতে বসেছি, তার জীবনে সুখের লেশটুকু ছিল না বললে কি কিছু বেশি বলা হবে?

একপাল লোক বাড়িতে। চাকর-ঝি-দরোয়ান-ঠাকুর, কিছুরই তো কমতি ছিল না। অতগুলো মানুষ যাঁর তাঁবে, তাঁর যে কেন অত দুঃখ তা কে বলতে পারবে? আর কে-ই বা তা বুঝতে পারবে?

এককালে ওই বাড়িটার ভেতরেই অন্য রকম চেহারা ছিল। অন্য রকম ছিল বাড়িটার মেজাজ। রোজ সকাল বেলায় পশ্চিমের কোণে দুধ দোওয়া হতো। শিবশম্ভু চৌধুরী দুধ খেতে ভালোবাসতেন। তাঁর নিজের ছিল দুধ খাওয়ার শখ। মেয়েকেও দুধ খাওয়াতেন। দুধ খেলে হাড় মজবুত হয়, দেহের ত্বক ভালো থাকে, লাবণ্য বাড়ে।

বাবার সঙ্গে লাবণ্যময়ীও দুধ খেত।

শিবশম্ভুবাবু বলতেন—আমার মেয়ের নাম লাবণ্যময়ী, মেয়েকে দেখতেও লাবণ্যময়ী—

তা সেই ছোটবেলা থেকেই ভাল খেয়ে ভাল পরে ভালোভাবে থেকে লাবণ্যময়ী একজন মেয়ের মত মেয়ে হয়ে উঠেছিল। মেয়ের মা নেই, মাসি নেই, কাকা নেই, কাকী নেই। যারা আছে সংসারে তারা আপন কেউ নয়। বড়লোকের বাড়ি, থাকবার জায়গার অভাব নেই, তাই দূর-সম্পর্কের কিছু কিছু অনাত্মীয় এসে আস্তানা গেড়েছিল।

এ-গল্পের নায়ক তখনও এ-বাড়িতে আসেনি। হয়তো সে তখন জন্মায়ইনি। শিবশম্ভুবাবুর বাড়ির সরকার ভূপতি। ভূপতি ভাদুড়ী। বিপত্নীক মানুষ। তার হাতেই সম্পত্তির হিসেব-পত্তর আদায়-নিকেশ ফেলে দিয়ে শিবশম্ভুবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর ভূপতি ভাদুড়ীও লোকটা খারাপ ছিল না। কর্তামশাই-এর সাশ্রয় দেখতো। তারই বাপ-মা মরা ভাগ্নেটাকে একদিন ভূপতি এনে হাজির করলে।

ভাগ্নেটাও ভালো। প্রথম-প্রথম যখন এ বাড়ির হাল-চাল দেখতো তখন অবাক হয়ে যেত। এত বড় বাড়ি। এত লোকজন, এত টাকা, মালিক এঁরা। সদর থেকে দেউড়ি পর্যন্ত দেখে দেখে আর আশ মিটতো না তার।

—তুই কে রে? কী নাম তোর?

—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সান্যাল!

—বাড়ি কোথায়?

—সুরুলপুর!

—তুই কার লোক?

—আজ্ঞে, সরকার-বাবুর লোক। আমি তাঁর ভাগ্নে। তিনি আমার মামা হন।

এ-কথার পর আর কারো কিছু বলবার থাকতো না। সরকার-বাবুর ভাগ্নে। তার মানে কর্তাবাবুর ভাগ্নে। বাড়ির চাকর-বাকর ঝি থেকে শুরু করে মা-মণি পর্যন্ত সবাই সরকার-বাবুকে মান্য-গণ্য করতো।

—ভালো, ভালো। বেশ ছেলে! বেশ লক্ষ্মী ছেলে তুমি!

তারপর থেকেই চৌধুরীবাবুর বাড়ির লোকজনরা সুরেন্দ্রনাথ সান্যালকেও বেশ মান্য-গণ্য করতে লাগলো।

সুরেন বললে—হ্যাঁ গো, এটা কীসের খাঁচা গো?

—এখানে আগে কাকাতুয়া পাখী থাকতো মা-মণির!

—তা কাকাতুয়াটা কোথায় গেল?

—মরে গেছে।

—আর এটা কী?

—এটা হলো গোয়াল-ঘর, এখানে কর্তাবাবুর গরু থাকতো।

—কর্তাবাবু কে?

—শিবশম্ভু চৌধুরী। তিনি খুব দুধ খেতে ভালোবাসতেন!

—তিনি কোথায়?

—তিনি কবে মারা গিয়েছেন।

সে-সব কি আজকের কথা হে। আস্তে আস্তে সেই সব গল্পও শুনলো সুরেন। সে নাকি খুব জাঁক-জমক ছিল এ-বাড়ির, সেই কর্তাবাবুর আমলে। এ আর কী দেখছো এখন! তখন কর্তাবাবুর ঘোড়া ছিল, ঘোড়ার গাড়ি ছিল। ওই বাড়িটা দেখছো ওইটে ছিল ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল। তখন আমরা বছরে দু'জোড়া ধুতি পেতুম। এখন তো সে-সব কিছুই বাহার নেই। সমস্ত বাড়িটাই যেন তখন খাঁ খাঁ করতো। শুধু ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়িই নয়, সেই কাকাতুয়া পাখীটাও একদিন মরা গেল হঠাৎ।

লাবণ্য খুব কেঁদেছিল সেদিন। অমন লাল ঝুঁটিওয়ালা পাখীটা। সে মারা যাবার পর থেকেই সমস্ত বাড়িখানা লাবণ্যর চোখে যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

শিবশম্ভু চৌধুরী বলতেন—জন্মালেই মরতে হবে মা, আমিও একদিন মরে যাবো—কেউই সংসারে চিরকাল বাঁচতে আসেনি—

লাবণ্য জিদ ধরতো—না বাবা, তুমি মরতে পারবে না—তোমাকে আমি মরে যেতে দেব না—

—বা রে!

শিবশম্ভু চৌধুরী হো হো করে হাসতেন। মেয়ের আবদার শুনে হাসি পেত তাঁর।

বলতেন—তোমার বিয়ে হোক মা, তখন তুমিই আমার কথা আবার ভুলে যাবে। সংসারের নিয়মই যে এই মা, ও নিয়ে কান্নাকাটি করতে নেই—বিয়ে হওয়ার পর মেয়েরা বাপের কথা ভুলেই যায়, আর ভুলতে না পারলে তার জীবনে আর শান্তি আসে না—

লাবণ্য বলতো—তাহলে আমার বিয়ে দিও না বাবা—আমি বিয়ে করবো না।

সেই ছোট বয়েসের খেয়াল। ছোটবেলায় এ-সব কথা অনেকেই বলে।

ছোটবেলায় মেয়েরা বুঝতে পারে না, কাকে বলে বিয়ে, কাকে বলে সংসার, কাকে বলে স্বামী।

ওই বাদামীবও তখন ছিল কম বয়েস। বাদামী তার মা'র সঙ্গে ঝি হয়ে এসেছিল এ-সংসারে। লাবণ্য বাপের সঙ্গে সারাদিন খেলা করে একলা রাত্রে শুতে যেত নিজের ঘরে। ঘরের মধ্যে তখনও ওই বড় খাটখানা ছিল। মা যতদিন বেঁচে ছিল ওই খাটটাতে শুতো মেয়েকে পাশে নিয়ে। তারপর মা যখন মারা গেল তখন আর কেউ রইল না। তখন লাবণ্য একলা।

প্রথম প্রথম ভয় পেত মেয়ে। বড় ভীতু ছিল লাবণ্য।

মাঝরাত্রে মনে হতো যেন মা এসেছে ঘরে। দরজায় খিল বন্ধ। তবু যে মা কেমন করে ঘরে ঢুকতো তা বোঝা যেত না।

মা চুপি চুপি বলতো—আসবি? আমার কাছে আসবি?

হঠাৎ নিজের চিৎকারেই লাবণ্যর ঘুম ভেঙে যেত। পরে তখন সে আর একলা নিজের ঘরে শুতে পারতো না। দৌড়ে চলে যেত বাবার ঘরে।

—বাবা, বাবা, বাবা—

শিবশম্ভুবাবু অবাক হয়ে দরজা খুলে দিতেন। বলতেন—কী হলো মা, কী হলো?

—মা এসেছিল বাবা, মা।

—দূর পাগল! স্বপ্ন দেখেছিস! স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়? বিদ্যাসাগর মশাই বলেছেন স্বপ্ন মিথ্যে! আয়, আমার কাছে শুবি আয়—

বলে তিনি মেয়েকে নিজের বিছানায় শোয়াতেন। ভোলাতে চেষ্টা করতেন। সান্ত্বনা দিতেন। তখন লাবণ্য আস্তে আস্তে আবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়তো।

ভূপতি ভাদুড়ী মশাই হিসেবী মানুষ। চৌধুরী বংশের বহু উত্থান-পতন দেখেছে। দেখে দেখে পাকা-পোক্ত হয়ে উঠেছে। একদিন শিবশম্ভু চৌধুরীর আমলেই এ-বাড়িতে এসে উঠেছিল আর তখন থেকেই রয়ে গেছে। সংসার বলতে তার সব কিছুই এই চৌধুরী-বাড়ি ঘিরে। যখনকার গল্প লিখতে বসেছি তখন ভূপতি ভাদুড়ী বুড়ো মানুষ। বিষয়-সম্পত্তি যা-কিছু করেছে সব নিজের দেশে। সেখানে জমি-জায়গা-বাড়ি করেছিল একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। ভেবেছিল যদি কখনও চাকরি চলে যায় তখন বুড়ো বয়েসে সেখানে গিয়েই বাস করবে। নিজের ভগ্নিপতিকে থাকতে দিয়েছিল সেখানে। ভগ্নিপতির ওই একটা ছেলে ছিল। সুরেন। সুরেনকে ভালো করে কখনও দেখেওনি জীবনে। ছেলে হয়েছিল, সেটাই যথেষ্ট। আর কেউ না-দেখুক, সে অন্ততঃ দেখবে।

কিন্তু হঠাৎ সর্বনাশ হয়ে গেল। একদিন ভগ্নিপতি মারা গেল তিনদিনের জ্বরে। সেই সুদূর পাড়াগাঁয়ে কোথায় ডক্তার আর কোথায় বদ্যি। বোন আগেই মারা গিয়েছিল। সুতরাং ভাগ্নেটাকে নিজের কাছে না-নিয়ে এলে আর চললো না।

মামা জিজ্ঞেস করলে—ইস্কুলে পড়বি তো?

সুরেন বললে—পড়বো—

—লেখাপড়া কিছু শিখেছিস, না গো-মুখ্যু হয়ে আছিস?

সুরেন সে-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

মামা বললে—তাহলে তোর বাপ তোর জন্যে কিছুই করেনি?

যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। মামা একদিন টাউন-অ্যাকাডেমীতে গিয়ে ভাগ্নেকে ভর্তি করে দিলে। আর তারপর থেকেই এ-বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখতে লাগলো সুরেন।

চৌধুরী বাড়িটার কাছাকাছিই ইস্কুলটা। লেখাপড়া কেমন করছে তা দেখবার সময় নেই ভূপতি ভাদুড়ীর। ভূপতি ভাদুড়ীর অনেক কাজ। সকাল থেকে উঠেই সারা বাড়িটার তদারকের কাজ আছে। তারপর আছে কলকাতার সাত-খানা বাড়ির ভাড়াটেদের আর্জি শোনা। শিবশম্ভুবাবুর সম্পত্তি অনেক। পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা তো ছিলই, তার ওপর সেই সম্পত্তির মুনাফা নিয়ে আরো অনেক সম্পত্তি কিনেছিলেন। তার আয় থেকেই এই বিলাস-ব্যসন-ঐশ্বর্য-লোক-লৌকিকতা চলতো। একটি মাত্র মেয়ে ছিল। তারও বিয়ে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন ভালো বরে ভালো ঘরে।

তিনি দেখে গিয়েছিলেন তাঁর সব আশা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তাঁর অগাধ সম্পত্তিও তাঁকে শেষ জীবনে শান্তি দিতে পারেনি।

মারা যাওয়ার সময় ভূপতিকে ডেকে বলেছিলেন—মেয়েটাকে দেখো ভূপতি, আর তো কেউ নেই তার, তোমার ওপরেই তার ভার ছেড়ে দিয়ে চললাম—

বেশিক্ষণ আর কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না শিবশম্ভু চৌধুরীর। কিন্তু তখন থেকেই ভূপতি ভাদুড়ী লাবণ্যময়ীকে দেখে আসছে। লাবণ্যময়ীর সম্পত্তির তদারকি করে আসছে। তদারকি করতে করতে কখন যে এতগুলো বছর বেরিয়ে গেছে তাও টের পায়নি। যখন নিজের ভাগ্নেকে এ-বাড়িতে এনে তুললে তখন সেই ভূপতি ভাদুড়ীও বুড়ো হয়ে গেছে, লাবণ্যময়ীও বয়েসের হিসেবে যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসে গেছে।

—কর কর, প্রণাম কর মা-মণিকে।

তখন ছোট ছেলে সুরেন। সবে গ্রাম থেকে এসেছে। ভালো করে কলকাতার জলও পেটে পড়েনি। ঢিপ্ করে একটা প্রণাম সেরে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

—কী নাম তোমার?

আড়ষ্ট সুরে সুরেন বললে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—

—কী পড়ো?

ভাদুড়ী বললে—লেখাপড়া এতদিন কিছুই করেনি মা-মণি, এবার এখানে টাউন-অ্যাকাডেমীতে ভর্তি করে দিয়েছি—

—বেশ বেশ। বেশ মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। বুঝলে?

তখন অনেক বয়েস লাবণ্যময়ীর। কিন্তু সুরেনের মনে হলো যেন বড় রূপসী মা-মণি। এককালে হয়তো আরো রূপসী ছিল, কিন্তু সেই বুড়ো বয়সেও টক্ টক্ করছে গায়ের রং। পরনে একটা শাড়ি পরেছে। সকাল বেলাই বোধহয় স্নান সারা হয়ে গেছে। চুল ভিজে। ভিজে চুলগুলো পিঠের ওপর এলানো।

—এবার এসো।

আর তারপর আর একবার প্রণাম করে সুরেন সেদিন মামার সঙ্গে নেমে এসেছিল। কিন্তু নিচেয় এসেও অনেকক্ষণ মা-মণির কথা ভুলতে পারেনি সে। কেবল বারে বারে মনে পড়ছিল মা-মণির কথা। মা-মণির গত জীবনের কথা। মা-মণির এই বিরাট সম্পত্তির কথা, মা-মণির স্বামীর কথা। মা-মণির সমস্ত জীবনটাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

শিবশম্ভু চৌধুরী দুধ খেয়ে যেমন নিজের চেহারাটা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, মেয়েরও তাই। লাবণ্যকে যে দেখতো সে-ই বলতো—বড় সুন্দরী মেয়ে আপনার—

বাপ বলতো—দেখতে সুন্দরী হলে তো হবে না ঠাকুরমশাই, ভাগ্যটাও সুন্দর হওয়া চাই—

ঠাকুরমশাই স্পষ্টই বলেছিলেন—তা আপনার মেয়ের কপালে তো রাজ-রাজেশ্বরী যোগ আছে, আপনি অত ভাবছেন কেন?

শিবশম্ভু চৌধুরী বলতেন—না না, আপনি আর একবার জন্মপত্রিকাখানা দেখুন, ও তো জন্মেই মা'কে খেয়েছে—

বাড়ির কুল-পুরোহিত লাবণ্যর জন্মপত্রিকা নিয়ে আবার বিচার করতে বসতেন। বড় জটিল জন্মপত্রিকা। লগ্নে কেতু মঙ্গল বৃহস্পতি, সপ্তমে শনি-রাহু। এ মেয়ের বিবাহিত জীবন কেমন কাটবে তার বিচার সহজ নয়। তবু বার বার দেখতেন ঠাকুরমশাই। চন্দ্র নীচস্থ।

বলতেন—এবার একবার চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়—

শিবশম্ভু চৌধুরী বলতেন—তা করুন, যা ভালো হয় তাই-ই করুন, তার জন্যে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

এমনি করেই এক-এক করে বারো মাসে তের বার পুজো-হোমযজ্ঞ হতো, ব্রাহ্মণ ভোজন হতো। কুল-পুরোহিত মশাই-এরও তাতে কিছু প্রাপ্তি-যোগ হতো। শুধু কুল-পুরোহিত কেন, বাড়ির ঝি-চাকর-ঠাকুর-ম্যানেজার সবারই কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধে হতো।

কিন্তু মানুষের শুভ-অশুভর অপেক্ষা করে কারো জীবন বসে থাকে না। নিঃশব্দে সে তার নিজের পথেই এগিয়ে চলে। কখনও আশা কখনও আশংকা, কখনও বা উৎকণ্ঠা নিয়ে সে তার আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে যায়। লাবণ্য জন্মাবার সময় এ-বাড়ির অবস্থা উজ্জ্বলই ছিল। বয়েস যত বাড়তে লাগলো তার সে-অবস্থা খারাপ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন আরো ভালো হতে লাগলো।

একদিন একদল লোক এল বাড়িতে। বেশ রীতিমত অবস্থাপন্ন লোক। মাধব কুণ্ডু লেনের গলি দিয়ে ঢুকলো গাড়িটা। বেশ দামী গাড়ি।

ভূপতি ভাদুড়ী মশাই আগে থেকেই তৈরি ছিল। গলায় চাদর দিবে ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল...

—আসুন সিংহী মশাই, আসতে আজ্ঞা হোক—

ভারি খানদানী লোক ভোলানাথ সিংহ মশাই। কলকাতার আদি নিবাসী, আগে থেকেই সব শুনেছিলেন তিনি। শুনেছিলেন যে পাত্রীর মা বেঁচে নেই। তা না থাকুক। পাত্রীর ভাই নেই তাও শুনেছিলেন। তাও না থাকা ভালো। শিবশম্ভু চৌধুরীর প্রচুর সম্পত্তির খবরও রাখতেন। কলকাতা শহরের মধ্যে সাতখানা বিরাট-বিরাট বাড়ি। তার ওপর আছে কোম্পানীর শেয়ার, শুধু শেয়ার নয়, অনেক কোম্পানীর আবার ডাইরেক্টরও বটে। তা থেকেও ভালো আয় হয় শিবশম্ভু চৌধুরীর। ভোলানাথ সিংহ মশাই-এর নিজের ছেলেই একদিন তো সব পাবে। শিবশম্ভুবাবুর মৃত্যুর পর এই সমস্তই তাঁর হেফাজতে

আসবে, এ সবই তিনি জানতেন। তাই খুব খোলা মন নিয়েই এসেছিলেন চৌধুরী মশাই-এর বাড়িতে পাত্রী দেখতে।

লাবণ্যকে সেদিন বাদামী খুব ভালো করে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল বৈঠকখানা ঘরে।

ভোলানাথ সিংহ মশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমার নামটি কি মা?

লাবণ্য বলেছিল—লাবণ্যময়ী চৌধুরী।

শিবশম্ভু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন—প্রণাম করো প্রণাম করো, আগে গুরুজনদের প্রণাম করে তবে কথা বলতে হয়, তা জানো না?

—না না, থাক্ থাক্—বলে সিংহ মশাই পা টেনে নিয়েছিলেন।

চৌধুরী মশাই বলেছিলেন—না না, থাকবে কেন বেয়াই মশাই, ছোট বেলা থেকেই এসব শেখা উচিত। এখন না শিখলে আর শিখবে কবে?

ভোলানাথ সিংহ বলেছিলেন—মায়ের আর কতই বা বয়েস, বিয়ে হলে সব শিক্ষাই হয়ে যাবে। আপনাকেও শেখাতে হবে না, আমাকেও শেখাতে হবে না। সংসার এমনই জিনিস চৌধুরীমশাই, সেই সংসারই সমস্ত কিছু শিখিয়ে দেবে।

সেদিন অনেকবার করে পরীক্ষা হলো লাবণ্যময়ীর। সেই প্রথম। সে-সব আজ থেকে কত বছর আগের কথা। তখন লাবণ্যময়ীর আর কতই বা বয়েস। সত্যিই সে জানতো না যে গুরুজনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয় বসবার আগে।

কিন্তু তারপরে আর তেমন ভুল কখনও করেনি লাবণ্য। যে দেখতে এসেছে তাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তখন চেয়ারে গিয়ে বসেছে কেউ চুল খুলে পরীক্ষা করেছে. কেউ শাড়ি উঁচু করে পায়ের গোছ দেখেছে, প্রত্যেক বারই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল লাবণ্য, কিন্তু তবু বিয়ে হয়নি কারোর সঙ্গেই।

ভূপতি ভাদুড়ীই মাঝখান থেকে শুধু বকুনি খে ।

শিবশম্ভু চৌধুরী বলতেন—তোমারই দোষ ভূপতি, তুমি তো আগে থেকে বলবে—

ভূপতি চৌধুরীবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে থাকতো। তাঁর মুখের সামনে কথা বলবার সাহস ছিল না তার।

চৌধুরীবাবুর নিজের কথাগুলো বলা শেষ হয়ে গেলে তখন মাথা তুললো ভূপতি ভাদুড়ী।

বললে—আজ্ঞে আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আমি জানতুম না।

—তুমি জানতে না মানে? আমার এক মেয়ে, আমি ওই কালো ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেব ভেবেছ? কেন, কলকাতা শহরে কি ভাল পাত্র নেই? আমি এমন জামাই চাই, যার কোনও খুঁত নেই।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা সিংহী মশাই-এর ছেলেরও তো কোন খুঁত নেই।

—খুঁত নেই! তুমি বলছো কী? কালো ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব বলতে চাও?

—আজ্ঞে খুব তো কালো নয়, এই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ!

চৌধুরীমশাই বললেন—ওরই নাম কালো! আমার কী এমন দায় পড়েছে যে আমি ওই ছেলের হাতে আমার মেয়েকে তুলে দেব?

এমনি করেই ভোলানাথ সিংহ মশাই-এর ছেলে নাকচ হয়ে গেল।

ভোলানাথ সিংহ মশাই অনেক আশা করেছিলেন। কিন্তু ঘটক গিয়ে সব কথা জানালো। সিংহ মশাই জিজ্ঞেস করলেন—আমার ছেলে যদি কালো হয় তো চৌধুরী মশাই-এর মেয়েই কি একেবারে ডানা-কাটা পরী?

ঘটক বললে—ওই-ই বলে কে সিংঘীমশাই।

রেগে গেলেন ভোলানাথ সিংহ।

বললেন—বেশ, ঠিক আছে, এবার আমার ছেলের জন্যে আর একটা পাত্রী খোঁজ তো, আমি একবার চৌধুরী মশাইকে দেখিয়ে দিই সুন্দরী কাকে বলে। ওরা ভেবেছেন ওঁর মেয়ে ছাড়া কলকাতায় আর সুন্দরী পাত্রী নেই?

তা রাগারাগি করলে আর কী হবে! কিন্তু এমন পাত্রী আর এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেলে কোন্ মানুষের না রাগ হয়।

শিবশম্ভু চৌধুরী হুকুম দিলেন—অন্য পাত্র খোঁজ ভাদুড়ী, আমি এই অঘ্রাণেই মেয়ের বিয়ে দেব!

আবার একটা সম্বন্ধ এল। আবার সেটা বাতিল হলো। কলকাতা শহরের ইয়া-ইয়া নামজাদা সব ঘটক নাজেহাল হয়ে গেল শিবশম্ভু চৌধুরীর জামাই খুঁজতে খুঁজতে।

শেষে একদিন সন্ধান মিললো পাথুরিয়াঘাটাতে।

পাত্রটি ভালো। চোখ জুড়িয়ে গেল দেখে। শিবশম্ভু চৌধুরী বুঝলেন মেয়ে অনেক ভাগ্য করেছে তাই এমন পাত্রের সন্ধান মিললো।

বাড়িটা পুরোন। তা হোক, বনেদী বংশ। এককালে আরো অবস্থা ভালো ছিল। বাড়িতে এখনও ঘোড়ার গাড়ি আছে। শ্বেত পাথরে বাঁধানো উঠোন। সেই উঠোন পেরিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে ম্যানেজার ভূপতি ভাদুড়ী আর সিদ্ধেশ্বর ঘটক।

সিদ্ধেশ্বর ঘটক বললে—ওই হলো পাত্রের বাপের ছবি—

শিবশম্ভু চৌধুরী চেয়ে দেখলেন। বেশ দশাশই চেহারা। গায়ে একটা কাশ্মিরী শাল চড়ানো।

—কী করতেন তিনি?

ঘটক মশাই বললে—কিছু তো করবার দরকার হয়নি এঁদের। এস্টেট্ দেখেছেন আর বাবুয়ানি করেছেন।

এই একটি মাত্র ছেলে রেখে তিনি গেছেন। কাকা আছেন, কাকার ছেলে-মেয়েরা আছে, তারাই সব দেখাশোনা করছে।

—কত টাকাব সম্পত্তি হবে?

ঘটক মশাই বললে—শুনেছি তো চল্লিশ লাখ টাকার মতন।

শিবশম্ভু চৌধুরী হিসেব করলেন। তারপর বললেন—তাহলে বড় ভাইপোর নামে কুড়ি লাখ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ বেশ।

পাত্রের কাকা খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি দোতলা থেকে নেমে এলেন। পাত্রের

বাপের মতই চেহারা; তাঁরই বয়সী হবেন। এসে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন।

বললেন—আমার একটু দেরি হয়ে গেল আসতে। আপনি পায়ের ধুলো দিলেন, এ আমার সৌভাগ্য।

—সে কি বলছেন দত্ত মশাই, মেয়ের বাপ হয়েছি, এ তো আমারই দায়। আমাকেই তো আগে আসতে হবে।

শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর রুপোর থালায় জলযোগ এল। এ-সব পুরোন আমলের বাসন-পত্র। শিবশম্ভু চৌধুরী সবই লক্ষ্য করলেন। পাত্রও এল। সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যাবার মত চেহারা। বছর বাইশ বয়েস হবে। গায়ে একটা মলমলের পাঞ্জাবী, পরনে ফিনফিনে ধুতি। পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। চটি জোড়া একপাশে খুলে রেখে শিবশম্ভু চৌধুরীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

—থাক থাক বাবা। আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও।

পাত্রের কাকা বললেন—ওর চেয়ে আর বড় আশীর্বাদ নেই বেয়াই মশাই। একেবারে খাঁটি কথাটি বলেছেন।

শিবশম্ভু চৌধুরী বললেন—সম্পত্তি টাকা-কড়ি বাড়ি-গাড়ি কি থাকে দত্ত মশাই! আপনিও তো এতদিন ধরে অনেক কিছু দেখলেন, আমিও দেখলাম। ওই হুগলীর অবনী চাটুজ্জেদের কী-না ছিল। আমি দেখেছি অবনী চাটুজ্জের বাড়ি রোজ এক মণ চালের ভাত রান্না হতো, বাড়ির সামনে বিকেল বেলা গোলাপ-জল ছিটিয়ে ধুলো-মারা হতো। একবার চাটুজ্জে মশাই সুন্দর বনে শিকার করতে গিয়ে একটা কুমীর মেরে এনেছিলেন। হুগলীর এস-ডি-ও সেই কুমীর দেখতে এসেছিলেন। সেই ব বদে হুগলীর দশ-হাজার লোককে এলাহি খানা খাইয়েছিলেন লাখ-টাকা খরচ করে। কী? না চাটুজ্জে-মশাই কত বড় বীর তা তোমরা দেখে যাও এসে। লোকেও খুব পেট ভরে খেয়ে বাহবা দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় গেল সে-সব? যারা তাঁর বাড়িতে এসে খেয়ে গেল তারাই আবার একদিন অভিশাপ দিলে।

দত্ত-মশাই বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কেন অভিশাপ দিলে কেন।

শিবশম্ভু চৌধুরী বললেন—তা অভিশাপ দেবে না? অত ভালো কি ভালো? ভালোরও তো একটা সীমা আছে দত্তমশাই! অত ভালো লোকের চোখে সইবে কেন বলুন?

দত্ত মশাই বললেন—তা দুনিয়ার ভালো করাও দেখছি খারাপ।

শিবশম্ভু চৌধুরী বললেন—নিশ্চয়ই খারাপ, বেশী টাকা থাকাও যেমন খারাপ, সেই টাকা দেখিয়ে জাঁকজমক করাও আরো খারাপ। আসল কথাটি হলো মানুষের চরিত্র। চরিত্রটি খাঁটি রাখো, সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কেউ তোমার কিছুটি করতে পারবে না। আমি তো ওই একটি কথাই বুঝি—চরিত্র। চরিত্র যার পৃথিবী তার।

দত্ত মশাই বললেন—খুব খাঁটি কথা বলেছেন বেয়াই মশাই। আমার এই ভাইপোটির ওই একটি গুণ আছে। জামাই করুন, তখন দেখবেন। নিজের মুখে আর নিজের ভাইপোর গুণপনা করতে চাই না। সিধু ঘটক সব জানে—

সিধু ঘটক এতক্ষণ সব শুনছিল।

বললে—হ্যাঁ কর্তামশাই, পাত্রের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছি

বলেই তো আমি এমন সম্বন্ধ এনেছি—পাত্রটি সিগারেট পর্যন্ত খান না—

কাকা বললেন—শুধু সিগারেট বলছো কেন সিধু, সিগারেট পান বিড়ি চা কিছু নেশাই নেই আমার ভাইপোর—আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ও সন্নিসী না হয়ে যায়।—

শিবশম্ভুবাবুর এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো, পাত্রের দিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন—যাও বাবাজী, তুমি যাও, তুমি আর এখানে বসে বসে কী করবে।—

পাত্র খুব ভক্তিভরে প্রণাম করলো শিবশম্ভু চৌধুরীকে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বাইরে চলে গেল।

—এ কী বেয়াই মশাই, হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? একটু জলযোগ করুন।

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন শিবশম্ভু চৌধুরী। একমাত্র মেয়ে। এমন সুপাত্র যে পাবেন তা যেন কল্পনাও করতে পারেননি তিনি। বললেন—দত্ত মশাই, ঈশ্বরের কী ইচ্ছা তা ঈশ্বরই জানেন, আমার একটি মাত্র কন্যা, তা তো আপনি জানেন! তাই আপনার কাছে শুধু আমার একটি অনুরোধ—

—বলুন, কী অনুরোধ?

শিবশম্ভু চৌধুরী বলেন—আমার মা-মরা মেয়ে, তার ভবিষ্যতের ভাবনাই আমার সবচেয়ে বড় ভাবনা। আমার মেয়ে এর পর থেকে আপনার মেয়ে হবে। তার দোষ ত্রুটি সবকিছু ক্ষমা করে নেবেন। সংসারে সে আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না।

দত্ত মশাই বললেন—সে কি কথা বেয়াই মশাই, আমার ভাইপো আর আমার ছেলে কি আলাদা। দাদা বৌদি মারা যাবার পর থেকে তো আমার ভাইপো আমারই নিজের ছেলের মতন হয়ে গেছে। ওকে আমি সেই চোখেই দেখি—

শিবশম্ভু চৌধুরী কথাটা শুনে খুশী হলেন।

বললেন—তাহলে দেনা-পাওনার কী হবে।

দত্ত মশাই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—দেনা-পাওনা মানে?

—যৌতুক দানসমগ্রী আমাকে কী কী দিতে হবে?

দত্ত মশাই জিভ কাটলেন। জিভ কেটে দুটো হাত জোড় করে বললেন—আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না বেয়াই মশাই। ওর বাপ নেই বলে কি আমিও মারা গিয়েছি? আপনার যা খুশী তাই দিয়ে আপনার কন্যাকে সাজিয়ে দেবেন। আর বর-পণ প্রথা আমাদের বংশে নিষিদ্ধ। ওটা আর আপনি দয়া করে মুখে উচ্চারণ করবেন না—

কথাগুলো শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন শিবশম্ভু চৌধুরী। জলযোগ সেরে নমস্কার সেরে বিদায় নিলেন। আসবার সময় নিজের গাড়িতে উঠে সিদ্ধেশ্বর ঘটককে বললেন—তোমার কী চাই তাই আগে বলো সিধু—

সিদ্ধেশ্বর দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে নিচু হয়ে বললে—আপনি শুধু আমাকে আশীর্বাদ করুন কর্তামশাই, যেন টাকার লোভে স্বভাব কখনও নষ্ট না করি—

—আচ্ছা ঠিক আছে—

সেই সিদ্ধেশ্বর ঘটককেও শেষকালে শিবশম্ভু চৌধুরী তার নিজের দেশে জমিজমা-বাড়ি দিয়েছিলেন। একেবারে দলিল বানিয়ে সব বন্দোবস্ত পাকা করে দিয়ে গিয়েছিলেন, যেন পরে আর কোনও গণ্ডগোল না হয়। অথচ বন্দোবস্ত পাকা করে গেলেই যেন সব কিছু পাকা হয়! যেন নিয়তি বলে কিছু

নেই। যেন মানুষই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা, ভগবান ঈশ্বর গড্ বলে কেউ নেই। নইলে শিবশম্ভু চৌধুরীর অত পাকা বন্দোবস্ত কেন কেঁচে গেল? সব হিসেব বেহিসেব হয়ে গেল?

শিবশম্ভু চৌধুরী বাড়ি ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই জেনে গেল কর্তার মেয়ের পাত্র পছন্দ হয়ে গেছে। একটা ভাল দিন দেখে বিয়ে হবে লাবণ্যময়ীর।

ভূপতি ভাদুড়ী মশাই-এর চাল-চলন বদলে গেল। একা তারই ঘাড়ে সব কাজের ভার। সব কাজ তাকেই সামলাতে হবে।

পুরুত মশাই এলেন।

শিবশম্ভু চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন—কুষ্ঠি কেমন দেখলেন ঠাকুর মশাই? ভালো করে বিচার করে দেখেছেন তো?

পুরুত মশাই বললেন—চতুর্থ-দশম যোগ, একেবারে রাজযোটক মিল। এ আর দেখবার কী আছে। পাত্রীর সপ্তম পতি লগ্ন আঁকড়ে ধরে রয়েছে, এ জাতিকা স্বামীকে নিজের বশে রেখে দেবে।

—তার মানে?

শিবশম্ভু চৌধুরী কিছু বুঝতে পারলেন না।

পুরুতমশাই বললেন—তার মানে হলো পাত্র কন্যার কথায় উঠবে বসবে—

বড় খুশী হলেন শিবশম্ভু চৌধুরী। ওকেই তো বলে স্বামী-সৌভাগ্য। যার স্বামী স্ত্রীর কথায় উঠবে বসবে তাকেই বলে সৌভাগ্যবতী। নিজের গৃহিণীর কথা মনে পড়লো। নিজের জিদ নিয়েই বরাবর কাটিয়ে গেছেন তিনি, গৃহিণীর কথায় কখনও কান দেননি। লাবণ্যর মা বড় দুঃখ নিয়ে চলে গেছে। এই বিরাট বাড়ি, এই অগাধ সম্পত্তি, এইসব দিকেই তিনি নজর দিয়েছেন বেশী, তখন স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখবার সময় ছিল না তাঁর। কী হলো তাঁর এত সম্পত্তির বোঝা মাথায় নিয়ে? কার জন্যে তিনি এ-সব করলেন? কে দেখবে এসব? কার ওপর ভার দিয়ে যাবেন তিনি এই সমস্ত কিছুর? এ-সব কথা স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই তার মনে হতে আরম্ভ করেছে। আজ সেই স্ত্রী নেই। থাকলে বলতে পারতেন—ওগো, আমি ভুল করেছি, এবার আর ভুল করবো না। এখনও মাঝে মাঝে ভুল করে বলেন—ওগো তুমি ফিরে এসো—অমন ভুল আমি করবো না—

মেয়ে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যেত। জিজ্ঞেস করতো—তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো বাবা? তোমার ঘরে কে আছে? তখন হুঁশ হতো শিবশম্ভুবাবুর। বলতেন—কই, কখন কথা বললুম রে?

তেতলার ঘর থেকে নেমে শিবশম্ভুবাবু রোজ একবার গিয়ে নিচের বৈঠক-খানায় বসতেন। সেই সকাল থেকে এগারটা-বারটা পর্যন্ত তাঁর সেখানেই কাটতো। সেখানেই আসতো কনট্রাকটার, রাজমিস্ত্রী, উকীল, এ্যাটর্নী; আর সঙ্গে থাকতো ভূপতি ভাদুড়ী।

সেই সময়টা আর কাটতে চাইতো না লাবণ্যর।

তখন এত রেডিওর চল ছিল না। বাদামীকে নিয়ে তাস খেলতে বসতো সে। বাদামী আরো দু'জন ঝিকে ডেকে আনতো। তাস খেলে আর কতক্ষণ কাটে। তারপর নিচের থেকে খাবার ডাক পড়তেই স্নান করতে যেতে হতো। বাদামী বরাবরই স্নান করিয়ে দিত। একেবারে সেই ছোটবেলা থেকে। নিজের হাতে স্নান করার অভ্যাসটা আর হয়নি, মাথার চুলগুলো নিয়ে মুশকিল হতো বড়।

বাদামী বলতো—দিদিমণি, এমন চুল আমি কারো দেখিনি—

লাবণ্য বলতো—একদিন কাঁচি দিয়ে কচ্ কচ্ করে কেটে ফেলে দেব সব চুল—

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। যখন সধবা হবে তখন বুঝবে চুলের কদর, তোমার চুল দেখেই তোমার সোয়ামী তখন তোমায় ভালবাসবে, দেখো—

লাবণ্য বলতো—দূর, তুইও যেমন, আমার মুখ পড়ে রইল, রূপ-গুণ পড়ে রইল, শেষকালে চুলের বালাই নিয়েই মরবো আমি?

বাদামী নিজের হাত দিয়ে দিদিমণির মুখ চাপা দিয়ে দিত। বলতো—অলক্ষুণে কথা বলো না দিদিমণি—

তারপর খানিক পরে বলতো—দুলাবাবুকে খুব সোন্দর দেখতে, জানো তো তুমি—

লাবণ্য রেগে যেত। বলতো—তোকে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না, তুই নিজের কাজ কর—

—না দিদিমণি, সত্যি বলছি, শুনলুম কর্তামশাইকে ঠাকুর-মশাই কুষ্ঠি দেখে বলে গেছেন—

লাবণ্যর এতক্ষণে যেন একটু কৌতূহল হলো।

বললে—কী বলে গেছে রে? তুই শুনেছিস?

বাদামী বললে—বলে গেছে তোমার সোয়ামী তোমার হাত-ধরা হবে, তোমার কথায় উঠবে বসবে—

—ওমা, বাঁদরছানা নাকি যে উঠতে বললে উঠবে আর বসতে বললে বসবে?

—কী যে বলো তুমি দিদিমণি তার ঠিক নেই, সোয়ামী যদি বউ-এর বশ হয় তো মেয়েমানুষের আর কী চাই বলো?

—তুই কী করে শুনলি?

বাদামী বললে—কেষ্ট যে বৈঠকখানায় কর্তাবাবুকে তামাক দিতে গিয়েছিল, সেই বললে।

—আর কী বলেছে রে?

—আরো অনেক কথা বলেছে। কেষ্ট তো মুখ্যু মানুষ, সব শুনতে পায়নি, শুধু ওই কথাটা বুঝতে পেরেছে তা আমি বললুম সোয়ামী যে বশে থাকবে তা কি আর দিদিমণির কুষ্ঠি দেখে তবে বলতে হবে? ও তো আমিও বলতে পারি।

—তুই-ই যদি বুঝতে পারবি তো এ্যাদ্দিন বলিসনি কেন?

—ওমা, বলিনি তোমাকে? তাই তো সেবার যখন সম্বন্ধ এলো, তখন তো আমিই তোমাকে বলেছিলুম, পাত্তরের গায়ের রং কালো হলে চলবে নি। আমিই তো কর্তাবাবুকে গিয়ে বললুম। বললুম—দিদিমণির কালো বর পছন্দ্ হবে না কর্তাবাবু—

—ওমা, তুই কেন বলতে গেলি ও-কথা? বাবা কী ভাবলে বল্ তো—

—না গো দিদিমণি, না। সে ভয় তোমার নেই। মা-মণি থাকলে তো তিনিই বলতেন, আমাকে আর মুখ ফুটে বলতে হতো নি!

লাবণ্য বললে—তুই বড় মুখফোঁড় বাদামী। বাবা হয়তো ভাবলে আমিই তোকে দিয়ে বলিয়েছি—

বাদামী বললে—না, আমি বলেছি, দিদিমণি বলে দিয়েছে ফরসা বর ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

লাবণ্য বাদামীর পিঠে দুম্ করে এক কিল বসিয়ে দিলে—তুই কেন মিথ্যে কথা বলতে গেলি?

—তা ফরসা বর কে না চায় দিদিমণি!

—আমি ফরসা বর চাই তা তোকে কে বলেছে? আমি বলেছি?

বাদামী স্বীকার করলে—তা ফরসা বর তো সবাই চায় দিদিমণি! আমিও তো চাই যে আমার ফরসা জামাইবাবু হোক—

হঠাৎ বাইরে থেকে কলঘরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিতে লাগলো।

—কে? কে রে মুখপুড়ী? তরলা বুঝি? দেখেছ দিদিমণি, তরলার কাণ্ড!

লাবণ্য বললে—জিজ্ঞেস কর্ না কী বলছে?

বাইরে থেকে তরলা বললে—কর্তাবাবু ডাকছে দিদিমণিকে—

—দেখেছ দিদিমণি, মাগীর আক্কেলখানা কর্তাবাবু ডাকছে তো কী হয়েছে, বল্ দিদিমণি এখন চান করছে, চুকে গেল ল্যাঠা—তা নয়, এখানে এসে দরজায় ঘুঁষি মারছে—

শিবশম্ভু চৌধুরী নিজের ঘরের সামনের বারান্দায় এসে বসেছিলেন। মেয়েকে দেখে তার আপাদমস্তক ভালো করে চেয়ে দেখলেন।

—আমাকে তুমি ডাকছিলে বাবা?

শিবশম্ভু চৌধুরী বললেন—এই দেখ মা, এই ফোটোখানা দেখ, তোমাকে দেখাবার জন্যেই ডাকছিলাম। পাথুরেঘাটা থেকে ওঁরা এসেছিলেন, দিয়ে গেলেন।

—কী ফটো?

—যার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করছি। আমি ওদের বলেছিলুম মা, মেয়েকে আমার জামাই-এর ফোটো দেখাতে হবে।

—কিন্তু আপনি নিজেই তো দেখেছেন বাবা, আমাকে আবার দেখানো কেন?

শিবশম্ভু চৌধুরী বললেন—তা হোক মা, আমার চোখ আর তোমার চোখ তো এক নয়। আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আমার চোখের তেজ কমে গিয়েছে, আমি কী দেখতে কী দেখে এসেছি, তা কি আমি নিজেই জানি! তুমি নিজে ভালো করে দেখ, তার পরে আমি তাদের পাকা কথা দেব—

লাবণ্য কী করবে বুঝতে পারলে না। ফোটোখানা হাতে নিয়ে চুপ করে চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

শিবশম্ভু চৌধুরী বললেন—দেখ ফোটোখানা—লজ্জা কী?

লাবণ্য অন্য সময়ে বাবার কাছে কত সহজভাবে কথা বলতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেল।

—তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনিই এ-সব করতেন, আমাকে আর কিছু করতে হতো না। তা যখন নেই তখন তোমার নিজের মুখেই সব বলতে হবে যে মা—

লাবণ্য বড় মুশকিলে পড়লো হঠাৎ। কী জবাব সে দেবে! কী করে সে বাবার সামনে এই নিয়ে কথা বলবে। লাবণ্য হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

বললে—তুমি যা বলবে তাই-ই হবে বাবা—

হঠাৎ কী যেন হলো। যেন একটা কী কাজের কথা মনে পড়লো আর তিনি হল্-ঘর পেরিয়ে পাশের ঘরে উঠে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—আমি আসছি—

আর সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যও যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যে দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল। তাড়াতাড়ি জানালা-দরজা বন্ধ করে ছবিখানা দেখতে লাগলো একমনে। এমন চেহারা, এমন নাক-মুখ, এমন হাসি! দেখতে দেখতে দুটো চোখ জলে ভারি হয়ে এল লাবণ্যর। হঠাৎ যেন মা'কে মনে পড়লো। মায়ের কথাগুলো আবছা মনে পড়তে লাগলো। তখন আর কিছু দেখা যায় না চোখের সামনে। সব কিছু ঝাপসা।

—ও দিদিমণি, দিদিমণি—

বাইরে বাদামীর ডাকে ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে লাবণ্য। উঠে চোখমুখ মুছে দরজা খুলে দিয়েছে।

—ওমা, এত করে চুল-টুল আঁচড়ে দিলুম আর তুমি ভিজে চুল নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছো?

তারপর হঠাৎ নজরে পড়লো ছবিখানা

—ওমা, জামাই-এর ছবি বুঝি? লুকিয়ে দেখছিলে! তা বলতে হয় তো!

তারপর ফটোখানা একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো বাদামী। বললে—হ্যাঁ দিদিমণি, জামাই-এর মত জামাই বটে! রাজপুত্তুর গো, রাজ-পুত্তুর!

লাবণ্য তাড়াতাড়ি বাদামীর হাত থেকে ফটোখানা কেড়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর সোজা বাবার ঘরে গিয়ে ছবিখানা দিয়ে দিলে।

—কী মা, পছন্দ হয়েছে তো?

লাবণ্য কিছু উত্তর না দিয়ে নিচু হয়ে বাবার পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। শিবশম্ভু চৌধুরী মেয়ের মাথার ওপর হাতটা রেখে বললেন—তুমি সুখী হও মা, তোমাকে সুখী দেখে যেতে পারলে আমি মরে গিয়েও সুখ পাবো—

লাবণ্য আর দাঁড়ালো না সেখানে। ঘর থেকে বাইরে যেতে পেরে যেন বাঁচলো। আর তার সাতদিন পরেই বাড়িতে রসুনচৌকি বসলো, কাক-চিলের উৎপাতে সারা বাড়ি আস্তাকুঁড় হয়ে উঠলো।

কোথা থেকে দূর সম্পর্কের সব আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই এসে জুটলো। চাকর-ঝি-ঠাকুর-নায়েব-গোমস্তা সকলের নতুন কাপড় উঠলো পরনে। [illegible] কুণ্ডু লেনের বাড়িটার গায়ে আবার রাজমিস্ত্রীরা নতুন করে রং ফেরালো। [illegible] ইলেকট্রিক-বাতি জ্বলতে লাগলো। এক মাইল দূর থেকে লোকে লুচি ভাজার গন্ধ পেতে লাগলো আর তখন তো আর এখনকার মত ভেজিটেবল-ঘি নয়, একেবারে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি। শিবশম্ভু চৌধুরী সেই বেহারের দারভাঙ্গা থেকে খাঁটি ভয়ষা-ঘি আনিয়েছিলেন। বড়বাজার থেকে ময়দা, পোস্তা থেকে

আলু আর বৈঠকখানা বাজার থেকে কলাপতা তরিতরকারি। প্রায় দেড় হাজার লোক ছাতে ম্যারাপের তলায় বসে পাত পেড়ে খেয়েছিল। সেই বিয়েতে পোনা মাছের কালিয়া আর মুগের ডালের মুড়িঘণ্টটা অনেকদিন পর্যন্ত কেউ ভুলতে পারেনি। সবাই একবাক্যে বলেছিল—আহা, বড় উত্তম আয়োজন হয়েছিল—। আর খাওয়ার শেষে কলাপাতায় মোড়া মিঠে পানের খিলি আর বাইরে এসে টিন টিন সিগারেট। সে একটা দিন গেছে চৌধুরী বাড়িতে। বাড়ির কাক ইঁদুর বেড়ালটা পর্যন্ত এঁটো কাঁটা খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেললে। খাওয়া হলো যত, নষ্ট হলো তার অনেক বেশি। সত্যিই পাড়ার লোক আত্মীয়স্বজন বহু-দিন ধরে বলতো—আহা, বড় উত্তম আয়োজন হয়েছিল গো—

সকলের মুখেই ওই এক কথা—আহা, বড় উত্তম আয়োজন হয়েছিল—

কিন্তু হঠাৎ এমন এক দুর্ঘটনা ঘটলো যার বুঝি জোড়া নেই মানুষের ইতিহাসে। অত যে হাসি, অত যে রসুনচৌকি, অত যে আয়োজন, সব যেন এক নিমেষে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল।

শিবশম্ভু চৌধুরী একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন শেষের দিকে। আর ঘর থেকে বেরোতেন না শেষ ক'টা দিন। কারো সঙ্গে দেখাও করতেন না। কেউ এলে ভূপতি ভাদুড়ীই এগিয়ে যেত সামনে। বলতো—তাঁর অবস্থা এখন ভাল নয়, ডাক্তার কথা বলতে বারণ করেছে।

লোকে জিজ্ঞেস করতো—তা ডাক্তারবাবুরা কী বলছেন? সেরে উঠবেন তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—সেরে ওঠার কথা ভগবানই বলতে পারেন—

—কে দেখছেন?

—কে দেখছেন না তাই বলুন! কলকাতা শহরের কোনও ডাক্তার দেখতে আর বাকি নেই।

লোকে আর বেশি ঘাঁটাতো না। বিরাট চৌধুরী বাবুদের বাড়ির পেছন দিকের গোয়ালে পাঁচটা গাই গরু তখনও আধ মনটাক দুধ দিত। কিন্তু খাবার লোক নেই। তখন বাড়ির কর্তাবাবুর প্রাণ নিয়ে টানাটানি, কে আর দুধের খবর রাখতে যাচ্ছে। কর্তার সাধের একটা কাকাতুয়া ছিল, সে-ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। ক'দিন ধরে কিছুই খেলে না। বাটির ছোলা কাক-পক্ষীতে এসে খেয়ে গেল। কাকাতুয়াটা চুপ করে শুধু দেখতে লাগলো সেই দিকে চেয়ে। মুখে কিছু বললে না, ধারালো ঠোঁট দিয়ে একটা ঠোকরও মারলে না কাউকে। খাক, সব খেয়ে যাক্। শিবশম্ভু চৌধুরীর অসুখের খবর জানাজানি হবার পর থেকেই যেন সমস্ত বাড়িটাও অসাড় হয়ে পড়েছিল।

আর লাবণ্য? তখনও তার মাথার সিঁথিতে নতুন টাটকা সিঁদুরের দাগটা দগ্-দগ্ করে যেন জ্বলছে। বাদামীর সঙ্গে কথা বলাও সে বন্ধ করে দিয়েছে।

ভূপতি ভাদুড়ী কর্তাবাবুর কাছে যেতেই কর্তাবাবু একবার চাইলেন সরকারের দিকে।

বললেন—লাবণ্য কোথায়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মা ভেতরে, ডাকবো? ডেকে দেব?

শিবশম্ভু চৌধুরী বললেন—আমি চললাম ভূপতি, তোমাকেই সব দেখতে হবে এবার থেকে, তোমার হাতেই লাবণ্যর ভার দিয়ে গেলাম, তুমি ওকে দেখো—

প্রথম দিকে সবাই মনে করতো এ ছেলেটা আবার এ-বাড়িতে এল কেন?

কিন্তু যখন দেখলে ছেলেটা ভূপতি ভাদুড়ী মশাই-এর আপন ভাগ্নে, তখন একটু একটু সমীহ করে চলতো সবাই। বিরাট বাড়িটার একতলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে যেন আশ মিটতো না সুরেনের।

সেদিন যথারীতি ছেলেটা খেতে বসেছে রান্নাঘরের পাশের বারান্দায়। বারান্দাটা ঢাকা। ওই ঢাকা বারান্দাতেই বাড়ির গণ্যমান্য কর্মচারী খেতে বসতো। যেদিন কোর্টের উকিল-মুহুরীরা এসে খেতো সেদিনও ওইখানেই তাদের পাতা পেতে খেতে দেওয়া হতো।

খাওয়ার পর অনেক দিন মামা জিজ্ঞেস করতো—ভাত খেয়েছিস?

সুরেন বলতো—হ্যাঁ—

—কী দিয়ে খেলি?

সুরেন বলতো—ভাত-ডাল-তরকারি—

—মাছ দেয়নি?

—দিয়েছিল।

—কী মাছ?

—ট্যাংরা।

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—কেন, শুধু ট্যাংরা মাছ? পোনামাছ দেয়নি?

সুরেন বললে—না—

ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নের ডান হাতটা ধরে ফেললে। ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো রান্নাঘরের দিকে। তারপর একবারে সোজা ঠাকুরের কাছে গিয়ে ডাকলে—ঠাকুর, এদিকে এসো, তুমি একে মাছ দাওনি নাকি? পোনা মাছ?

ঠাকুর তো একেবারে হতভম্ব। তিরিশ বছর ধরে একটানা চাকরি করে আসছে সে এই চৌধুরী বাড়িতে।

বললে—আজ্ঞে, পোনা মাছ তো দিয়েছি ছোড়দাদাবাবুকে—

—দিয়েছ মানে? তাহলে এ কি মিছে কথা বলছে? আমার ভাগ্নে তাহলে মিথ্যেবাদী বলতে চাও?

ঠাকুর একটু থতমত খেয়ে গেল।

সুরেন সান্ন্যাল তখন এ-বাড়িতে নতুন এসেছে। কিছুই জানতো না। কী বললে ঠিক হবে আর কী বললে বেঠিক হবে তাও জানা ছিল না। তাই সেদিন ঠাকুরের চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিল যে সে নিশ্চয়ই মাছ চুরি করেছে। কত লোক খাচ্ছে কত লোক খাচ্ছে না, কে আর তার হিসেব রাখতে যাচ্ছে। কে আর জানতে পারছে কোন্ দিন কোন্ মাছ বাজার থেকে কেনা হয়েছে।

এক-একদিন তো অনেকে খেতোই না। কোনও কাজে সকাল-বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আবার ফিরে এল সন্ধ্যেবেলা। তার খাবারটা কী হলো, কে খেলে তার হিসেব রাখা সহজ নাকি? আবার উল্টোও হয়েছে অনেকবার। হঠাৎ হয়তো মা-মণির দূর সম্পর্কের কেউ এসে গেল বাড়িতে, তাকে খেতে বলা

হলো। বলা-নেই-কওয়া নেই, তখন ঠাকুরকে আবার উনুনে ভাত চড়িয়ে দিতে হয়।

—কী? উত্তর দিচ্ছিস না কেন, কথা বল?

ঠাকুর অম্‌তা আম্‌তা করে বলতে লাগলে—আজ্ঞে, সরকার-বাবু, আমি কি অত হিসেব করে রেখেছি?

—তা হিসেব যদি রাখতে না পারো তো কাজ করছো কেন শুনি? কাজ ছেড়ে দাও, আমি এমন লোক রাখবো যে হিসেব রাখতে পারবে!

তারপর একটু থেমে নিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী আবার বললে—আর তুমি হিসেব না রাখলে আমি মনিবের কাছে হিসেব দেব কেমন করে? হিসেবের গরমিল হলে তো মনিব আমাকে ছাড়বে না। মনিব তো গলায় গামছা দিয়ে আমাকে টানাটানি করবে! তখন? তখন আমি কী জবাবদিহি করবো, তাই বল?

এ-সব কথার উত্তরে ঠাকুর কিছুই বললে না। চুপ করে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী সাবধান করে দিয়ে বললে—খবরদার বলছি, এর পর যদি কোনও দিন আর এমন বেহিসেব হয় তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন—এই তোকে বলে রাখলুম, মনে থাকে যেন!

ঘটনাটা অত বড় বাড়ির অন্যান্য ঘটনার মধ্যে এমন কিছুই নয়। অতি সামান্য। কিন্তু সেদিন থেকেই হঠাৎ ঠাকুর যেন সদয় হয়ে উঠলো ছেলেটার ওপর। দেখতে পেলেই ঠাকুর বলতো, কিগো ছোটদাদাবাবু, খাবে না? খিদে পায়নি?

আর খেতে বসিয়েও কত আদর অপ্যায়ন! আর একটা ভাজা-মাছ দেব? লজ্জা কোর না, তুমি সরকার-বাবুর ভাগ্নে, চেয়ে নিয়ে খাবে, এ তো তোমাদেরই নিজের বাড়ি—

আর বাহাদুর সিং! লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে। মাথার চুল, মুখের দাড়ি, সব পেকে শনের নুড়ি হয়ে গেছে, সেই-ই বা কত খাতির করতো। গেট দিয়ে যাবার সময় ওই অতটুকু ছেলেকেও বেশ খাতির করে সেলাম করতো। প্রথম-প্রথম বড় ভয় করতো সুরেনের। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন বড় হলো তখন ভয় কমে গেল। তার বদলে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠলো দুজনের মধ্যে। গোঁফের আর দাড়ির ফাঁকে একটা প্রসন্ন হাসির আভাস ফুটে উঠতো বাহাদুর সিং-এর চোখে। বোধহয় সেও জানতে পেরেছিল যে ছেলেটা সরকার-বাবুর আপন ভাগ্নে। যে সরকারবাবু তাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

আসল মালিককে যখন কেউ দেখতে পেত না, তখন সরকার-বাবুকে মালিক ভাবা ছাড়া আর উপায় কী? একবার কারো নামে গিয়ে অভিযোগ পেশ করে এলেই হলো। আসল মালিক দেখতেও আসছে না সে অভিযোগ সত্যি কি মিথ্যে, নকল মালিকের কথাতেই চাকরিটা খতম হয়ে যেতে পারে।

একটা দেশের উত্থান-পতনের কথা ইতিহাসের বইতে লেখা থাকে। একটা মানুষের সুখ-দুঃখের কথাও জীবনীতে লেখা থাকে। কিন্তু মাধব কুণ্ডু লেনের মধ্যেকার একটা বাড়ির ইতিহাস কে লিখতে যাবে বলুন? [illegible] দায় পড়েছে? বিরাট পৃথিবীর মানুষের ভিড়ের মধ্যে কে জানতে চাইবে শিবশম্ভু চৌধুরী মানুষটি কে ছিলেন, কী ছিলেন? আর তার চেয়েও নগণ্য একটি হিন্দু গৃহস্থ মেয়ের জীবনী জানবার জন্যে কারই বা এত মাথা-ব্যথা হবে?

কিন্তু বাইরের লোকের চোখে নগণ্য হলেও শিবশম্ভু চৌধুরীর নিজের কাছে তো সে-মেয়ে নগণ্য নয়। তাঁর নিজের ঔরসজাত মেয়ে। মেয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন্ বাপ না-ভেবে থাকতে পারে?

রাতারাতি বিয়ের আয়োজন হতে লাগলো। হাতে বেশি সময় নেই আর। সিধু ঘটক একবার বরের বাড়ি যায়, আর একবার কনের বাড়ি আসে।

এসে বলে—সরকার-বাবু, আর একখানা নমস্কারীর হুকুম হয়েছে—

ভূপতি ভাদুড়ী অবাক হয়ে যায়। বলে—কেন? এই যে সেদিন বললে একশো পঁচাত্তরখানা নমস্কারী দিলেই চলবে? আমি ওসব ব্যাপারে আর থাকবো না। তুমি কর্তামশাইকে গিয়ে বলো। তিনি মালিক, যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তোমার জন্যে আমি বকুনি খেতে পারবো না—

সিধু বললে—কিন্তু, আমি কী করে বলি সরকার-বাবু, আমার কি মুখ আছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা কা'র জন্যে আর একখানা নমস্কারীর দরকার?

—আজ্ঞে, দূর-সম্পর্কের এক মামী-শাশুড়ী আছে, তার জন্যে একখানা থান দরকার—

কথাটা শেষ পর্যন্ত উঠলো শিবশম্ভু চৌধুরীর কানে। কর্তা বললেন—এই কথা! তা এ-কথা বলতে এত সঙ্কোচ করবার কী আছে সিধু, তুমি দত্ত মশাইকে গিয়ে বলে দিও নমস্কারী একখানা নয়, যদি আরো একশোখানা দরকার হয় তো তাও যেন তিনি মুখ ফুটে বলেন। সে কী কথা, সামান্য নমস্কারীর ক'খানা কাপড় তাও আমি দিতে পারবো না?

তারপর ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে বললেন—যাও ভূপতি, তুমি একবার নিজে গিয়ে বেয়াই মশাই-এর সঙ্গে দেখা করো গিয়ে। গিয়ে বলো গে যে, আপনার আর ক'খানা শাড়ি-থান দরকার সব লিখে দিন, চৌধুরী-মশাই সব-গুলো দিয়ে দেবেন। তার জন্যে কিছু কিন্তু যেন না করেন। যাও, তুমি এখনি চলে যাও—

ততদিনে কোথা থেকে সব আত্মীয়-স্বজনে ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। এত যে তাদের আত্মীয়-বান্ধব তা লাবণ্য নিজেও কোনওদিন জানতো না।

—এ'কে প্রণাম করো মা, ইনি তোমার মাসিমা হন—

বাবার কথায় লাবণ্য একবার মহিলাটির মুখের দিকে তাকায়। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট চেহারার মেয়েমানুষ। বিধবা। একটা সাদা থান পরনে। ফরসা নাক-মুখ, বড় বড় চোখ। মাসিমা মানে লাবণ্যর মায়ের বোন। ফুল-মাসিমা তাড়াতাড়ি পা-জোড়া সরিয়ে নিয়ে লাবণ্যর চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলে।

বললে—থাক্ থাক্ মা, বেঁচে থাকো, এয়োস্ত্রী হয়ে সিঁথির সিঁদুর নিয়ে মনের সুখে স্বামীর সংসার করো মা—

লাবণ্য তখনও ফুল-মাসিমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। তার নিজের মা'কেও এই রকম দেখতে ছিল নাকি?

—তুমি আমার মা'কে দেখেছো ফুল-মাসিমা? মা'কে দেখতে কেমন ছিল বলো না?

ফুল-মাসিমা লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরলো। বললে—ওরে, আমি তোর আপন মাসিমা নই রে, আমি তোর মায়ের মাসতুতো বোন। তবু তোর মা'কে আমি একবার মাত্তোর দেখেছি। আহা, কী রূপই ছিল তাঁর। রূপ নয় তো যেন আগুনের হল্‌কা—

লাবণ্যর বিয়ের পর সব আত্মীয়-স্বজন যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল। কিন্তু ফুল-মাসিমা যায়নি। যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শিবশম্ভু চৌধুরীর তখন খুব অসুখ। সেই অসুস্থ মানুষকে ছেড়ে তিনি চলে যানই বা কেমন করে।

ফুল-মাসিমা বলেছিল—এ তো বড় জ্বালা হলো দেখছি রে, আমি কোথায় এসেছিলাম তোর বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে, এখন তোকে এই অবস্থায় ফেলে যাই কী করে?

বাদামী বললে—আপনি থেকে যান্ না মাসিমা, কর্তামশাই-এর এই অসুখ, এ-সময়ে আপনি চলে গেলে একলা এত বড় বাড়িতে দিদিমণি থাকবে কী করে?

ফুল-মাসিমা বললে—আমি তো ঝাড়া হাত-পা, আমার থাকতে আর কী? কিন্তু ওই যে আমার গলার কাঁটা...

গলার কাঁটা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। একটা ছোট মা-বাপ-মরা নাতনী। সে তখন ঘরের কোণে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ফুল-মাসিমা বিয়ে-বাড়িতে এসেছিল সেই মা-বাপ-মরা নাতনীটাকে নিয়ে। ভেবেছিল বাড়িতে তো পেট ভরে ভালো করে খেতে পায় না, বোন-ঝির বিয়েতে গিয়ে ভালো-মন্দ খেয়ে আসুক!

তা সেই গলার কাঁটার দিকে চেয়ে বাদামী বললে—ওর খাওয়া-দাওয়াটা ভালো করে দেখছেন তো ফুল-মাসিমা—আমি তো কাজের ঠেলায় চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না—

ফুল-মাসিমা বললে—সে ওকে বলতে হবে না বাছা, ও তেমন মেয়ে নয়—

হঠাৎ তরলা দৌড়তে দৌড়তে এল, বললে—দিদিমণি, কর্তাবাবু কেমন করছে—

—সে কী রে?

তারপর সেদিন সেই চৌধুরী বাড়ির অন্দর মহলে এক মুহূর্তে এক সোরগোল পড়ে গেল। প্রথমে এল পাড়ার ডাক্তার, তারপরে এল বড় ডাক্তার, তারপর এক সাহেব ডাক্তার, বরফ এল, ওষুধ এল, ইনজেকসান এল। যেন প্রকাণ্ড এক ভূমিকম্প ঘটে গেল বাড়িটার ভেতরে। আর সেই দিনই মাধব কুণ্ডু লেনের শিবশম্ভু চৌধুরী ইহলোক ত্যাগ করলেন।

সুরেন সান্যাল ঠিক সেই ঘটনার বহু বছর পরে ওই বাড়িতে এসে উঠেছিল নিজের মামা ভূপতি ভাদুড়ী মশাই-এর কাছে। কলকাতার নতুন বাড়িতে এসে পৌঁছালে গ্রামের ছেলের যে-দুর্দশা হয় প্রথম-প্রথম সুরেনেরও তাই হয়েছিল। এ যেন এক অন্য জগৎ।

বাড়ির জমাদারদের থাকবার জায়গা ছিল খিড়কীর দিকে। জমাদারদেরই একটা ছেলের সঙ্গে বল খেলতে খেলতে হঠাৎ বলটা লাফিয়ে একেবারে তেতলায় জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

ভয়ে আঁতকে উঠেছে অর্জুন। অর্জুন ছেলেটা জমাদারের ছেলে হলে হবে কি, বাবুদের ভয়-ভক্তি করতো।

—সর্বনাশ! কী করে?

সুরেন বললে—তুই যা না, ওপরে উঠে গিয়ে নিয়ে আয় না বলটা!

অর্জুন বললে—আমায় বকবে মা-মণি, তুমি যাও।

—আমাকেও যদি বকে?

—তোমাকে বকবে কেন? তুমি তো বাবুদের লোক। সরকার-বাবুর ভাগ্নে।

সুরেন বললে—আমি তো মাত্তোর একদিন মা-মণির কাছে গিয়েছিলুম, আমাকে যদি চিনতে না পারে? আমাকে যদি ভিতরে ঢুকতে না দেয়?

অর্জুন আর দাঁড়ালো না সেখানে, ভয়ে ভয়ে নিজেদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেদিনকার মত খেলা বন্ধ হয়ে গেল সুরেনের। কিন্তু মনটা খচ খচ করতে লাগলো।

মামা সবে বলটা কিনে দিয়েছে।

সোজা গিয়ে দফতরে দেখলে। সেখানে তখন মামা নেই। রান্নাবাড়িতে যে-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আস্তে আস্তে সোজা অন্দর বাড়ির সদর গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওই রাস্তা দিয়ে একদিন মামার সঙ্গে ভেতরে গিয়েছিল। ভেতরে গিয়ে মা-মণিকে প্রণাম করে এসেছিল।

কিন্তু অত ভাবলে আর চলে না। সুরেন সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি। উঠলে পায়ের তেমন কোন শব্দ হয় না। সিঁড়ির মোড়ে কাকাতুয়া পাখীটির ফাঁকা খাঁচা তখনো পড়ে রয়েছে। ওপরে উঠতে উঠতে সুরেনের বুকটা দুর দুর করতে লাগল। যদি কেউ দেখে ফেলে তো কী বলবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কেন সে ওপরে যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, তখন কি উত্তর দেবে?

প্রথম দিন ওপরে উঠেছিল মামার সঙ্গে, তার কতদিন পরে আবার উঠছে ওপরে। রাস্তা ভুল হবার নয়। কাঠের সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে একেবারে তেতলা গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু দু'পাশে কত আসবাব, কত ছবি, কত বাহার। এত গল্প শুনেছে এই মা-মণির, সব যেন আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। পুরোন চাকর-বাকর সবাই সে-গল্প জানে। সেই একদিন বিয়ে হয়েছিল শিবশম্ভু চৌধুরীর মেয়ে লাবণ্যলতার। সে-সব কত কাল আগের ঘটনা। বিয়ে হলো বটে, খুব জাঁক-জমক, খুব ঘটা করেই বিয়ে হলো, কিন্তু সেই একদিনের জন্যই শ্বশুর-বাড়ি গেল লাবণ্যলতা। আর তার পর?

হঠাৎ সামনে ভূত দেখলে যেমন হয়, যেন ঠিক তেমনি মনে হলো।

—কে? তুমি কে?

সুরেন ভয় পেয়ে আবার নিচের দিকে চলে আসছিল। কিন্তু মুখখানার দিকে চেয়ে কেমন যেন থমকে দাঁড়ালো। শোনা গল্পের সেই লাবণ্যলতার সঙ্গে যেন অবিকল মিলে গেল।

যেন দুধ-ঘি খেয়ে খেয়ে লাবণ্যলতার স্বাস্থ্যটা খুব তেল-গোল হয়েছে। কিন্তু বয়েস এত কমে গেল কি করে? এই তো সেদিন দেখা গেল খুব বুড়ো হয়ে গেছে মা-মণি, গালের মাংস ঝুলে পড়ছে।

সুরেনের মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

—কে? তুমি কে?

তার মনে হলো সে যেন এক গোলকধাঁধার মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। চারদিকে নহবত বাজছে, শাঁখের শব্দ হচ্ছে কোথা থেকে। উলু দাও গো তোমরা, উলু দাও। বর এসে গেছে, বর এসে গেছে।

হুড়মুড় করে মেয়েদের দল ঝুঁকে পড়েছে বারান্দায়। কই বর কোথায়! ওমা, কী চমৎকার বর ভাই।

—কেমন সুন্দর দেখতে! জামাইবাবু, বড় সুন্দর বর হয়েছে আপনার। বর দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। আহা, যেমন আপনার রূপসী মেয়ে তেমনি আপনার রাজপুত্তুর জামাই হয়েছে। আশীর্বাদ করি সুখে থাকো মা, জন্ম-জন্ম সোয়ামীর ঘর করো, জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে স্বামী-সোহাগিনী হও।

হঠাৎ মেয়েটা কাছে এসে পেছন থেকে জাপটে ধরেছে।

—বাদামী, অ-বাদামী, ধর ধর একে, পালাচ্ছে—

সুরেন বুঝতে পারলে না কী করবে। হতবাক্ হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। এ তো মা-মণি নয়; এ তো অন্য মেয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে ওদিক থেকে বাদামীও এসে গেছে। মা-মণিও এসে গেছে। ধরেছিস?

মেয়েটা বললে—এ চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকছিল, যেই দেখে ফেলেছি, অমনি পালিয়ে যাচ্ছিল—

মা-মণি কাণ্ড দেখে অবাক। বললে—এ কীরে, এ কে? কাকে ধরেছিস?

কিন্তু সুরেন তার নিজের পরিচয় দিতেই মা-মণি তার হাত ধরে পাশের দিকে টানলে। বললে—ওরে, ছাড় ছাড় পাগলী-মেয়ে, ছাড়, এ যে আমার সরকারের ভাগ্নে—

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—তুমিই তো একদিন আমাকে প্রণাম করে গিয়েছিলে? তা আজ ওপরে এসেছিলে কী করতে?

সুরেন তখনও হতবুদ্ধি হয়ে আছে। মুখে তার কোনও কথা বেরুচ্ছে না। চোখের সামনে থেকে সেই নহবত, সেই শাঁখ, উলুর শব্দ, সেই আতর সেই গোলাপ-জলের গন্ধ সব কিছু এক নিমেষে মুছে গেল। অর্জুন কী কুক্ষণে যে রবারের বলটা অন্দর-বাড়ির ভেতরে ফেলে দিয়েছিল, নইলে আর এমন দুরবস্থায় পড়তে হতো না।

সুরেন বললে—আমার বলটা পড়ে গিয়েছিল অন্দর-বাড়িতে, তাই খুঁজতে এসেছিলাম—

—বল্? কী বল্?

সুরেন বললে—রবারের বল—আমি ফেলিনি, অর্জুন ফেলে দিয়েছিল—

—অর্জুন? অর্জুন কে?

—জমাদারদের ছেলে আছে। তার নাম অর্জুন।

মা-মণি রেগে উঠলো। বললে—ওদের ছোঁও নাকি তুমি?

সুরেন কিছু উত্তর দিতে পারলে না ভয়ে।

—তোমার মামা জানে যে তুমি ওদের সংগে খেলা করো?

সুরেন বললে—না।

তারপর মা-মণি বুঝি কাকে ডাকলে। বললে, ওরে বাদামী, একবার সরকার-বাবুকে খবর দে তো। বলবি আমি একবার ডাকছি, যেন আমার কাছে একবার আসে—

খবরটা পেতেই ভূপতি ভাদুড়ী সব কাজ ফেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। এসে সব শুনে সুরেনের দিকে চাইলে। বললে—তুই বল খেলিস নাকি ওই মেথরদের ছেলের সংগে? তা তো আমি জানতুম না! চল্, এখুনি চান করবি চল্—চল্—

সুরেন সান্ন্যালের মুখে তখন কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

শুধু বললে—আমি আর করবো না মামা—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গর্জন করে উঠলো—আবার কথা বলে, চল্ শিগ্গির। আর যদি কখনও ওদের সঙ্গে খেলতে দেখি তোকে তো হাড় আলাদা মাস আলাদা করে ফেলবো, চল্ তুই।

এতক্ষণে মা-মণি কথা বললে—ওকে অত করে বকছো কেন সরকার-বাবু, ও ছোট ছেলে, না-জেনে ভুল করে ফেলেছে, তার জন্যে অমন করে বকবে?

এতক্ষণ যে-মেয়েটা সুরেনকে ধরে ফেলেছিল সে এগিয়ে এসে বললে - কী দুষ্টু ছেলেটা জানো মা-মণি, আমি ধরেছি বলে আমাকে আবার নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে—

—কই, দেখি?

মা-মণি দেখলে। একদিন বহুকাল আগে দিদিমার সঙ্গে এই মেয়েটাই এসেছিল মা-মণির বিয়েতে। তখন শিবশম্ভু চৌধুরী বেঁচে ছিলেন। তারপর কর্তামশাই ম্যরা গেছেন, দিদিমাও মারা গেছে এ-বাড়িতে। সেই ফুল-মাসিমার মৃত্যুর পর আর কেউ ফিরিয়ে নিতে আসেনি সুখদাকে। তখন থেকেই সুখদা রয়ে গিয়েছে এখানে।

মা-মণি আবার বললে—কই, কোথায় আঁচড়ে দিয়েছে দেখি?

সুখদা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—এই, এই যে—

কিন্তু কোথাও দেখা গেল না আঁচড়ানোর দাগ। মা-মণি সুখদার হাতটা অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও কোনও দাগ দেখতে পেলে না।

তারপর সুরেনের হাতখানা ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললে—দেখি, তোর নখ আছে কি না দেখি—

কিন্তু না, সুরেনের হাতের আঙুলে সত্যিই সেদিন কোনও নখ বড় ছিল না। দু'হাতের দশটা আঙুলই ভালো করে পরীক্ষা করলে মা-মণি। না, সব নখ ভালো করে কাটা। তবে কি মিথ্যে কথা বলছে সুখদা?

মা-মণি কী বুঝলে কে জানে, তাড়াতাড়ি বললে—ঠিক আছে, তুমি যাও, আর কখনও জমাদারদের ছুঁও না, জানো না ওদের ছুঁতে নেই—

মামার সঙ্গেই সেদিন সুরেন নিচেয় চলে এসেছিল। কিন্তু শাস্তি সেখানেই শেষ হয়নি তার। শাস্তি শুরু হয়েছিল তার পরে। মামা তখনই জমাদারকে ডেকে পাঠালে দফতরে। বহুদিনের জমাদার দুখমোচন। দুখমোচনের পূর্বপুরুষও ওই চৌধুরী-বাড়িতে কাজ করে গেছে। তারই ছেলে অর্জুন। দুখমোচনের পর অর্জুনও আবার একদিন ওই বাড়িতে কাজ করবে।

দুখমোচনকে দেখেই ভূপতি ভাদুড়ী গর্জে উঠলো—হারামজাদা, আমি তোকে বার বার বলেছি না যে আমার ভাগ্নের সঙ্গে তোর ছেলেকে মিশতে দিবিনে। আবার সে মিশেছে?

দুখমোচন ম্যানেজারবাবুর সামনে হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—মাফ করুন হুজুর, আর কসুর হবে না।

—কসুর হবে না মানে? আমি এবার তোর মাইনে কেটে তবে ছাড়বো। এ-মাসের মাইনে থেকে তোর একটাকা কাটা গেল।

হাত-জোড় করে মিনতি করতে লাগলো দুখমোচন। ছেলে-বউ নিয়ে সে থাকে। অনেক খরচ তার। বউ-এর অসুখ হয়েছে তাই ছেলেকে ঠিক ন

সামলাতে পারে না। অনেক কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো সে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি কারো কথা শুনছিনে, মা-মণি নিজে আমাকে ডেকে বকুনি দিয়ে দিয়েছে। তোর জন্যে আমি কেন কথা শুনতে যাবো শুনি? তোর ছেলের বেকুবির জন্যে আমি গালাগালি খাবো?

তা সত্যিই সেবার মাইনে কাটা গেল দুখমোচনের। সরকার-বাবুর ভাগ্নের জন্যে অর্জুনেরও নাজেহাল হলো বেশ। সেও মার খেলো দুখমোচনের কাছে। সমস্ত চাকর-বাকর, বাড়িময় সব লোক জানতে পারলো যে দুখমোচনের ছেলে সরকার-বাবুর ভাগ্নের জন্যে মার খেয়েছে।

কিন্তু আসলে যা'র জন্যে অত কাণ্ড সেই মেয়েটা কিন্তু কিছু বললে না। চুপ করে রইল। কেন যে সে সুরেনকে অমন করে হেনস্থা করেছিল কে জানে। নিজের ঘরে একমনে বই পড়তে-পড়তে সেই কথাই ভাবছিল।

সকাল থেকে তখন মামা কড়া নজর রাখছে। মামা বলে দিয়েছে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে পড়তে। পড়তে পড়তে অনেকদিন রাত হয়ে যায়। সারা বাড়িতে একটা সঙ্গী নেই। সকাল বেলা লেখা-পড়া করার পর ইস্কুল। ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই আবার হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসা।

এতদিন পরে সে-সব দিনের কথাগুলো ভাবলে মনে হয় কোথায় গেল সেই দিনগুলো। তখন যত কষ্টই হোক, আজ মনে হয় সেই দিনগুলোই যেন ছিল ভাল। ভোর না হতেই ফুল বেল-পাতা আসতো মা-মণির পুজোর জন্যে। উঠোনের একতলার চৌবাচ্চার সামনে ভিড় জমে যেত চাকর-বাকরের। রাত্রের এঁটো বাসনের ডাঁই মাজা হোত একপাশে। ঝগড়া বেধে যেত তাদের মধ্যে। চেঁচামেচি যখন সপ্তমে উঠতো তখন ভূপতি ভাদুড়ী এসে চিৎকার করে থামাতো। বলতো—থাম্‌ থাম্‌ তোরা থাম। থাম বলছি—

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনে জল পড়তো। তখন আবার যে-যার কাজে মন দিত।

কিন্তু সবচেয়ে মজা লাগতো বুড়োবাবুকে দেখে। বুড়োবাবু ছিল নিরীহ গো-বেচারা মানুষ। কারো সাতে-পাঁচে থাকতো না। উঠোনের একেবারে পুব কোণে একটা একেনে অন্ধকার ঘর ছিল। তারই ভেতরে দিন-রাত পড়ে থাকতো।

সুরেন যখন প্রথম এসেছিল এ-বাড়িতে তখন দেখেনি বুড়োবাবুকে। কারো মুখে বুড়োবাবুর নামও শোনেনি।

যেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ভূপতি ভাদুড়ীর মাছ দেওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, সেইদিনই প্রথম দেখেছিল যে বুড়োবাবু বলেও একজন লোক আছে বাড়িতে।

সেদিন মামা চলে যেতেই বুড়োবাবু পেছন থেকে ডেকেছিল।

—ও বাবা শোন, শোন এদিকে!

সুরেন পেছন ফিরে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বয়েস তখন বুড়োবাবুর অনেক। খালি গা, খালি পা। একটা গামছা শুধু পরনে।

সুরেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—আমাকে ডাকছেন?

বুড়োবাবু জিজ্ঞেস করেছিল—ওখানে কী হয়েছিল বাবা? অত ঝগড়া হচ্ছিল কীসের? সরকার-বাবু ঠাকুরকে অত বকছিল কেন?

সুরেন বলেছিল—ওই ঠাকুর আমাকে পোনা মাছ দেয়নি বলে মামা বকছিল ঠাকুরকে—

—ও, তাই বলো, সরকার-বাবু তোমার মামা? তুমি সরকার-বাবুর ভাগ্নে?

তারপর একটু থেমে বললে—ঠিক হয়েছে বকেছে। জানো, তোমাকেও মাছ দেয়নি তো? আমাকেও ও মাছ দেয় না। সেদিন ডাল-ভাত আর ডাঁটা-চচ্চড়ি দিয়েছিল খেতে। তা আমি কি ডাঁটা চিবোতে পারি? আমার কি দাঁত আছে?

বলে আবার বললে—আমার দাঁত দেখবে, এই দ্যাখ—

সুরেন দেখলো বুড়োবাবু হাঁ-করে তার মুখের ভেতরটা দেখাচ্ছে। সারা মাড়িতে ওপর-নিচেয় গোটা পাঁচ ছয় দাঁত।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আপনি কী করে খান? চিবোন কী করে?

বুড়োবাবু বললে—চিবোই না তো! চিবোতে পারিই না তো চিবোব কী করে! গিলি। শুধু গিলি। ডাল দিয়ে ভাত মেখে দলা পাকিয়ে শুধু মুখের মধ্যে পুরে দিই।

সুরেন বললে—তা মাছ দিলেই বা আপনি কী করে খেতেন?

বুড়োবাবু বললে—কেন, মাছগুলো হাত দিয়ে চটকে পিষে নিয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে নিতাম, তারপর মুখে পুরে দিতাম তাতে ভাতের স্বাদ বাড়তো। দাঁত নেই বলে কি জিভও নেই? জিভ তো ভালো-মন্দ খেতে চায়। দাঁতই গেছে, জিভ তো যায়নি ভাই—

এ কথার উত্তরে সুরেন আর কি ই বা বলবে।

বুড়োবাবু বললে—বেশ করেছে বকেছে সরকার-বাবু। তা সরকার-বাবু তো তোমার মামা হয়, একটা কাজ করতে পারবে বাবা? এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, খুব সহজ কাজ। কাজটা করলে আমার ভারি উপকার হয়, দেখছো তো আমি বুড়ো মানুষ, আর কটা দিনই বা বাঁচবো—

সুরেন বললে—তা কী করতে হবে বলুনই না—

—তোমার মামাকে বলে একটা গামছা কিনে দিতে পারবে বাবা আমাকে?

সুরেন অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—গামছা?

হ্যাঁ ভাই, একটা গামছা শুধু, আর কিছু নয়। সামান্য একখানা গামছা হলেই আমার সব দুঃখ ঘোচে—

সুরেন আরো অবাক হয়ে গেল। একটা সামান্য গামছার জন্যে লোকটার এত আরজি।

বুড়োবাবু বললে—এই দেখ না, এই একটা মোটে গামছা, চান করে উঠে এই ভিজে গামছাই পরতে হয়। এই ভিজে গামছা পরেই গায়ে গায়ে শুকিয়ে নিই—বুড়ো মানুষ তো, কোন্‌দিন অসুখ করে যাবে, তখন নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবো, তাই বলছি—

সুরেন বললে—তা আপনি মামাকে বললেই পারেন—

বুড়োবাবু বললে—বলেছি ভাই, বলেছি, একশো বার নয়, হাজার বার বলেছি, কিন্তু আমার কথা কে শোনে বলো না! আমার কথা তো কেউ শোনে না এ-বাড়িতে আমাকে কেউ মানুষ মনে করে না।

সুরেন বললে—তা মামাকে না বলে বাড়ির ভেতরে মা-মণিকেও তো বলতে পারেন, তিনিই তো বাড়ির মালিক!

—ওরে বাবা—

বলে বুড়োবাবু যেন ভয়ে শিউরে উঠলো, বললে—ওরে বাবা, তোমাদের মা-মণিকে বললেই হয়েছে। তাহলে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

সুরেন বললে—কেন, তাড়িয়ে দিতে যাবেন শুধু শুধু?

—ও ভাই, তুমি চেন না তাকে। তিনি আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন, দেখতে পারেন না কেন?

—সে ভাই অনেক কথা। তুমি বুঝবে না সে-সব। মেয়েমানুষের মেজাজের কথা কেউ কি বলতে পারে? আর তেমন দামী জিনিসও তো চাইনি আমি। একটা গামছার দাম আর কতোই বা। আনা আষ্টেক হলেই একটা বাঁধিপোতা গামছা হয়ে যায়—

সুরেন বললে—তা আট আনা পয়সা দিয়ে নিজেই তো গামছা কিনে নিতে পারেন—

বুড়োবাবু বললে—কোথায় পাবো পয়সা? আমার হাতে একটা পয়সাও দেয় না কেউ। আমি তো বলেছিলুম সেকথা। তা রেগে মারতে এল তোমার মামা—

অদ্ভুত লোক ছিল ওই বুড়োবাবু! সারাদিন ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে একখানা তক্তপোষের ওপর শুয়ে থাকতো। আর ক্ষিধে পেলে রান্নাঘরের সামনে আসতো।

এসে বলতো—ও ঠাকুর, বলি ভাত নেমেছে উনুন থেকে? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে যে আমার—

তা সেদিন সুরেন কথাটা পেড়েছিল মামার কাছে।

কথাটা শুনেই মামা রেগে গেল। বললে—কেন, বুড়ো তোকে বলছিল নাকি গামছার কথা?

সুরেন বললে—না, বুড়োবাবু লোকটা ভাল মামা, বলেনি কিছু, শুধু দুঃখ করছিল।

—তা এত লোক থাকতে তোর কাছে দুঃখ করছিল কেন? তুই কি এ-বাড়ির ম্যানেজার, না মালিক, যে তোর কাছে নালিশ করতে আসে?

সুরেন বললে—বলছি তো নালিশ করেনি, শুধু দুঃখ করছিল—

মামা বললে—ওই একই কথা, যার নাম দুঃখু করা, তার নামই নালিশ করা—আমি আজই দেখিয়ে দিচ্ছি মজা। এই সেদিন চোতমাসে একটা গামছা দিলাম আর এরই মধ্যে আবার গামছা? গামছা কি বুড়ো চিবিয়ে খায় নাকি? এবার যদি আর তোকে গামছার কথা বলে তো বলে দিবি এখানে না পোষায় যেখানে ইচ্ছে চলে যাক, আমি থাকতে দিয়েছি দয়া করে তাই অত তেল—

সুরেন সেদিন মামার কথা শুনে আরো অবাক হয়ে গিয়েছিল। বেশি তো কিছু চায়নি বুড়োবাবু। মাত্র আট আনা দামের একখানা বাঁধিপোতার গামছা, তার জন্যেও সেদিন অত কথা শুনতে হলো বুড়োবাবুকে। অথচ এমন কী অপরাধ করেছিল বুড়োবাবু একখানা গামছা চেয়ে? বাড়িতে কত লোকের কুকুর-বেড়ালও তো থাকে। কাকাতুয়া পাখীও তো একটা ছিল শিবশম্ভু চৌধুরীর। সে পাখীর জন্যেও তো কত খরচ হতো সংসারের। কাকাতুয়া পোষা কম খরচ? তার খোরাকই কি একটা গামছার চেয়ে কম কিছু?

আর আশ্চর্য! যে বুড়োবাবু একদিন হা-পিত্যেস করেও সামান্য একখানা

গামছাও পায়নি, সেই বুড়োবাবুরই বা শেষ পর্যন্ত কী হলো? কোথায় রইল সেই মাধব কুণ্ডু লেনের ভূপতি ভাদুড়ী, আর কোথায় রইল সেই বুড়োবাবু? সেই বুড়োবাবুই কি না শেষকালে...

কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

একদিন এমনি পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেছে। ক'দিন পরেই এগজামিন। রাত জেগে পড়তে হয়। সমস্ত বাড়িটা তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বড় রাস্তার ট্রাম-বাসের শব্দও আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়লো। বাহাদুর সিং ঘড়-ঘড় শব্দ করে সদরের লোহার গেটটা বন্ধ করে দিলে। তারপর রান্নাবাড়ির ঢাকা-বারান্দার জোরালো আলোটাও নিভে গেল। তখনও একমনে পড়ে চলেছে সুরেন। ম্যাট্রিক পাশের পড়া। ভয়ও ছিল মনে।

হঠাৎ বাইরে যেন দরজায় টোকা মারলো কে।

চমকে গিয়েছিল সুরেন। বললে—কে? কারো সাড়া-শব্দ নেই। সুরেনের কী রকম যেন একটা সন্দেহ হলো। আবার বললে—কে?

তবু সাড়া-শব্দ নেই কারো। সুরেনের মনে হলো হয়তো হাওয়া। হাওয়া লেগে দরজায় শব্দ হয়েছে। কিন্তু খানিক পরে আবার সেই রকম মৃদু টোকা পড়লো।

এবার তক্তপোষ থেকে উঠে সুরেন দরজা খুলে দিতেই অবাক হয়ে গেল। কে একজন মেয়েমানুষ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চিনতে পারা গেল না অন্ধকারে।

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—কে তুমি? কে?

মূর্তিটা নিচু গলায় বললে—আমি তরলা—

এতদিন পরে এই বয়েসে কল্পনা করাও যাবে না যে, মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির উঠোনের ঘরে অন্দর-মহলের ঝি এসে একজন সেই-বয়েসের ছেলেকে এত রাত্রে ডাকলে মনের কী অবস্থা হয়। বুকটা তখন থর-থর করে কাঁপছে তার। কাঁপছে রোমাঞ্চে নয়, ভয়ে। এত ভয়ই বা তার কীসের ছিল। সে তো ও-বাড়ির ম্যানেজার ভূপতি ভাদুড়ীর ভাগ্নে। ঝি-চাকর-ঠাকুর, এমন কি বুড়োবাবু পর্যন্ত সবাই তো সেই মামারই কাছে জোড়হস্ত। সুতরাং কাকে তার ভয়?

কিন্তু সংসারে এক-একজন মানুষ বুঝি এই ভয় নিয়েই জন্মায়। প্রতি মুহূর্তে ধর্ম হারাবার ভয়, কলঙ্ক লাগবার ভয়, অপবিত্র হওয়ার ভয় নিয়েই সারাদিন বিব্রত থাকে। আসলে বোধহয় ভয়ও নয়, আসলে ওটা এক ধরনের 'আত্ম-সচেতনতা'। যে যত আত্মসচেতন সে তত আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। সেইজন্যেই বোধহয় সেদিন অত রাত্রে তরলাকে দেখে অত ভয় পেয়েছিল সুরেন।

তরলা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেনের কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে বললে—চলুন আপনাকে সুখদাদি অন্দরে ডাকছে—

—সুখদাদি? সুখদাদি কে?

—কেন, সুখদা-দিদিমণিকে আপনি চেনেন না? যার নামে আপনি মা-মণির কাছে আরজি পেশ করেছিলেন?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি আবার কখন কার কাছে আরজি পেশ করলুম!

রেগে গেল বুঝি তরলা। অত রাত্রে তাকেও বোধহয় ঘুম ভাঙিয়ে কেউ হুকুম করেছে ভাগ্নেবাবুকে ডেকে দিতে। তরলা বললে—অত শত বলতে পারিনে বাপু, আপনাকে ডাকতে বলেছে, আমি ডাকছি, আপনি না-যান

না-যাবেন, আমি চললুম—

সুরেন বললে—না, তুমি দাঁড়াও আমি যাচ্ছি, গায়ে জামাটা দিয়ে আসি—

তারপর সেই রাত্রে তরলার পেছন-পেছন সুরেন গিয়ে ঢুকলো ও-বাড়ির অন্দর-মহলে। সদরে ভেতর থেকে তালা-চাবি পড়ে যেত। সেদিনও হয়তো তালা-চাবি পড়েছিল। তাই তরলা ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তালা খুলে ঢুকলো।

বললে—আসুন, আমি তালা বন্ধ করে দেব—

সুরেন ঢুকতেই আবার তালা-চাবি বন্ধ করে দিলে তরলা। তারপর সিঁড়ি। সুরেনকে নিয়ে চলতে চলতে তরলা সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছুল। তার পাশেই বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে বাঁ হাতি একটা বসবার ঘর। তরলা সেখানে ঢুকেই বললে—সুখদাদি, এই যে এসেছে—

—কই, দেখি—

তরলা পেছন ফিরে বললে—আসুন তো ভাগ্নেবাবু; ভেতরে আসুন—

সুরেন ঢুকলো। ভয়ে ভয়েই ঢুকলো। ঘরখানা বড়। এই ঘরটাতেই বোধ-হয় আগের দিনে কর্তামশাই বসতেন। সেই শিবশম্ভু চৌধুরী। তাঁরই আমলের ঘর। কতকাল আগে কর্তামশাই মারা গেছেন, কিন্তু তখনও ঘরখানা তেমান সাজান আছে।

তখনও সোজা দৃষ্টি দিয়ে সুখদা দিদিমণির দিকে চাইতে পারছিল না সুরেন।

হঠাৎ গলা শোনা গেল সুখদাদিদির, বললে—কাল তুমি মা-মণিকে কী বলেছিলে শুনি?

সুরেন বুঝতে পারলে না। তার স্মৃতিশক্তির ভাঁড়ার যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল প্রশ্নটা শুনে। কবে কাল আর কে মা-মণি তাও যেন সব গোলমাল হয়ে গেল এক মুহূর্তে। বললে—কোন্ মা-মণি?

সুখদা বললে—আহা হা ন্যাকা ছেলে, যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না। মা-মণিকে তুমি বলোনি যে আমি তোমাকে খিমচে দিয়েছি নখ দিয়ে।

সুরেন চুপ করে রইল। এতক্ষণে যেন তার মনে পড়েছে। তারপর বললে—আমি কিছু বলিনি, হয়তো আমার মামা বলেছে—

—তা মামা কী করে জানলে! তুমি নিশ্চয় বলেছ। তুমি নিজে না বললে তোমার মামা জানবে কী করে।

সুরেন বললে—আমি নিজে মামাকে তো কিছু বলিনি, মামা নিজেই দেখতে পেয়েছে—

—কিন্তু, আমি কোথায় খিমচে দিয়েছি দেখি? দেখি? দেখাও আমাকে—

তরলা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সুখদা বললে—তরলা, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তুই ঘুমোগে যা—আমি দেখছি একে কেমন করে জব্দ করা যায়—

তরলা চলে যেতেই সুখদা বললে—দেখি, দেখাও কোথায় কোন্ জায়গায় তোমাকে খিমচে দিয়েছি—

সুরেন হাতটা বাড়িয়ে দিলে সামনের দিকে। ডান হাতটা।

—কই কোথায় খিমচে দিয়েছি?

—এই এখানে।

সুখদা সুরেনের হাতটা নিয়ে আরো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। তারপর আবার বললে—কই, কোথায় খিমচোনোর দাগ?

সুরেন বললে—কালকে আমি টিন্‌চার আইডিন্‌ দিয়ে দিয়েছি—তাই দাগ নেই।

—আবার মিথ্যে কথা?

আশ্চর্য, কবেকার সেই সমস্ত কথা! অথচ অনেকদিন পরে এই সুখদাই আবার একদিন সুরেনের হাত ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল। বলেছিল—তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যা ভাই,—তুই আমাকে বাঁচা—

সে অনেকদিন পরের কথা, তখন জীবনে অনেক ক্ষয় অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক দেখে অনেক শুনে অনেক ভুগে, সুরেন তখন অন্য মানুষই হয়ে গেছে বলতে গেলে। আর সুখদা'র বর?

কিন্তু সে-সব কথা পরে। সে-কথা বলবার সুযোগ পরে অনেক পাবো। তখন সুখদার কথাও বলবো, সুখদার বরের কথাও বলবো। এখন লাবণ্যলতার কথা দিয়ে এ গল্প আরম্ভ করেছিলাম, তাই লাবণ্যলতার কথা দিয়েই গল্প এগিয়ে নিয়ে যাই। এখন সুখদা'র কথা বললে এ উপন্যাসও আমার অন্য উপন্যাসের মত দীর্ঘ হয়ে যাবে।

মনে আছে সেদিন মাঝরাত্রে সুখদার সঙ্গে সেই ভাবে দেখা হওয়ার জন্যে সুরেন ঠিক তৈরিও ছিল না। তৈরি থাকলে হয়তো তেমনি করেই সে-কথার উত্তর দিত। কিন্তু সুখদার সে-কথার উত্তর সে কেমন করে দেবে?

তবু সুখদা আবার জিজ্ঞেস করলে—বলো, চুপ করে রয়েছ কেন? উত্তর দাও—

সুরেন বললে—আমি তো বলছি, আমি মা-মণিকে তোমার নামে কিছু বলিনি—

—তা তুমি না বললে মা-মণি জানতে পারলো কী করে শুনি?

সুরেন বললে—মা-মণি কী করে জানলো, তা কী করে জানবো? হয়তো মামা বলেছে—

—আবার ওই এক কথা? তুমি না বললে কি করে তোমার মামা জেনেছে? খবরদার বলছি, আর যদি কখন শুনি যে আমার নামে মা-মণির কাছে লাগিয়েছ তো এ-বাড়িতে থাকা তোমার ঘুচিয়ে দেব, তা বলে রাখছি।

সুরেনের দু'চোখে জল ভরে এল, খানিক পরে বললে—আমাকে এত কথা বলছো কেন তুমি? আমার মামাকে বলতে পারো না? আমার মামাই তো আমাকে এ-বাড়িতে এনেছে—

—এ-বাড়িতে তোমার খুব সুখ, না? এই মা-মণির সমস্ত সম্পত্তি তুমি হাত করবার মতলব করেছ, না? তবে এ-ও বলে রাখছি এ-সম্পত্তির এক ফোঁটাও তুমি পাবে না, যতই মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো আর যতই আমার নামে মা-মণির কাছে চুক্‌লি খাও, আমি তোমাকে এ-সম্পত্তির এক ফোঁটাও নিতে দেব না। ভেবেছ মা-মণির ছেলেমেয়ে নেই—তুমি সব গ্রাস করবে, না? আমি তোমাদের সব মতলব বুঝেছি—

সুরেন কথাগুলো শুনে আরো হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে কার সম্পত্তি নেবার মতলব করেছে? এতক্ষণে সোজা সুখদার দিকে চেয়ে দেখলো সুরেন। এর আগে পর্যন্ত সুখদাকে মনে হচ্ছিল মেয়েটা খুব সুন্দরী আর মিষ্টি, কিন্তু হঠাৎ বড় খারাপ লাগলো দেখতে। দেখল বুক আর গলার কাছে একটা তিল রয়েছে। মনে হলো ওটা তিল নয়, যেন একটা দাগ, ফরসা গলাটা যেন দাগী হয়ে গেছে ওই তিলটার জন্যে।

—ফের যদি আর কোনও দিন মা-মণির কাছে দেখি তো তোমাকে দেখে নেব।

সুরেন বললে—তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি না। আমি কোন্ সম্পত্তি হাত করবার চেষ্টা করছি?

সুখদা ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—থামো, ন্যাকা সেজো না আমার কাছে, আমি সব বুঝতে পারি।

সুরেন বললে—সত্যি বলছি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না তোমার কথা—

—আর বুঝতে হবেও না। তলে তলে বুড়োবাবুর সঙ্গে এত ভাব কেন, সব আমি জানি, বুড়োবাবু তোমার কাছে গামছা চেয়েছে না?

কথাটা বেশি দূর হয়তো এগোত, কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়লো। মাঝরাত্রে কথা-বার্তাগুলো বোধহয় বেশ জোরেই হচ্ছিল। বাইরে থেকে মা-মণির গলার আওয়াজ এল—বাদামী, ও বাদামী...

এক নিমেষে যেন বোবা হয়ে গেল সুখদা, সঙ্গে সঙ্গে তার ফরসা মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এতক্ষণ বসেছিল সে, এবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর আড়ষ্ট হয়ে চারদিকে একবার চেয়ে দেখে নিলে। সুরেন বুঝি কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, সুখদা হঠাৎ হাত দিয়ে তার মুখটা চাপা দিয়ে বললে—চুপ্—

তারপর আবার আওয়াজ এল মা-মণির গলার—বাদামী, কই রে—কোথায় ও-ঘরে আলো জেলেছে কে—

সুখদা যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে, হঠাৎ তাড়াতাড়ি সুরেনকে ঠেলতে লাগলো। বললে—যাও, যাও শিগগির এখান থেকে চলে যাও—

সুরেন সেই অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারলে না, কিন্তু সুখদা তাকে তখনও ঠেলছে। বলছে, যাও যাও শিগগির সামনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নিচেয় চলে যাও—

আর কোনও উপায় নেই তখন। তাকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে সিঁড়ির মুখে নিয়ে এল। তারপর বলে—যাও—যাও—

সুরেন টিপি-টিপি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো, অন্ধকার সিঁড়ি। একটু অসাবধান হলেই একেবারে গড়িয়ে একতলায় পড়ে যাবে। অথচ দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। মা-মণি দেখতে পাবে। মা-মণি যদি দেখতে পায় তাহলে জিজ্ঞেস করবে—এত রাত্রিতে বাড়ির ভেতর কেন সে? তখন কী উত্তর দেবে সুরেন? তার পরে যদি মামাকে ডাকে। ডেকে জিজ্ঞেস করে—তোমার ভাগ্নে এত রাত্রিতে বাড়ির মধ্যে অন্দর-মহলে কী করতে এসেছিল? আর তারপর যদি খোঁজ পড়ে কে সদরের তালা-চাবি খুলে দিয়েছিল?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে হঠাৎ নজরে পড়লো সদর-দরজার তালা-বন্ধ। এখন কী হবে? সারা রাত কি এখানে এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে সে? সেখানে দাঁড়িয়েই সে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে। একেবারে তেতলায় তখনও মানুষের পায়ের শব্দ হচ্ছে, হয়তো মা-মণি নিজের ঘর থেকে বাইরে এসে বাদামীকে ডাকছে। সুখদা বোধহয় ততক্ষণ পালিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার মধ্যে লুকিয়েছে, দু'চারটে আলো জ্বলে উঠলো তেতলায়। তরলা আবার উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বাদামী।

—কী রে তরলা, কার যেন গলা শুনছিলাম, আলো জেলেছিল কে? তুই?

তরলা খুব চালাক ঝি। বললে—হ্যাঁ মা-মণি, আমি সাজা-ঘরে গিয়েছিলুম—

—তা বলবি তো আমাকে! আমি ভাবছি চোর এল বুঝি! সদর দরজায় তালা বন্ধ করেছিস তো?

তরলা টপ করে বললে—হ্যা মা-মণি, আমি নিজে সদরের তালা-চাবি বন্ধ করে তবে শুতে গেছি—

মা-মণি যেন নিশ্চিন্ত হলো, বললে—দেখিস মা, চারদিক দেখে শুনে শুবি। যা চোর-ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত হয়েছে পাড়ায়, ভূপতি-ম্যানেজার তো তাই বলছিল—

বাদামীও পাশেই ছিল। সে বললে—আপনি কিছু ভাববেন না মা-মণি, আমি আছি, তরলা আছে—ভেতরে কে আসতে যাবে? কার এত বুকের পাটা হবে? তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে কী করে?

মা-মণি তবু বোধহয় এদিক-ওদিক দেখলে একবার, তারপর আবার নিজের ঘরে শুতে চলে গেল।

ওপরের কথাবার্তাগুলো নিচেয় দাঁড়িয়ে সবই শুনতে পেলে সুরেন। অন্ধকারের আড়াল থেকেই দেখতে পেলে একে একে তেতলার সব আলো-গুলোই নিভে গেল। আবার অন্ধকারে ঢেকে গেল সমস্ত আবহাওয়াটা।

সুরেন তখন নিরুপায় হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে ওখানে? সারা রাত? রাত কতটা বাকি আছে আর? এই সিঁড়ির ওপর ঠাণ্ডা মেঝেতেই যদি সে ঘুমিয়ে পড়ে? আর যদি ভোর হবার আগেই জেগে না ওঠে? যদি বাড়ির অন্য চাকর-বাকর দেখতে পায়? তখন যে সবাই জেনে যাবে। তখন বাড়ির ঠাকুর, বাহাদুর সিং, অর্জুন, বুড়োবাবু, মামা সবাই যে তাকে ছিঃ ছিঃ করবে। তখন যদি সুরেন বলে যে তরলা তাকে বাড়ির ভেতরে রাত্রে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, কে তা বিশ্বাস করবে?

কিন্তু হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যেই কার যেন পায়ের শব্দ হলো। মনে হলো কে যেন তেতলা থেকে অভ্যস্ত পায়ে নিচেয় নেমে আসছে। আওয়াজটা আস্তে আস্তে অনেক কাছে এল। একেবারে কাছাকাছি। তারপরে এত কাছে যে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরা যায়। অন্ধকারটাও সেখানটায় যেন খুব গাঢ় হয়ে উঠলো।

সুরেন সেই দিকে চেয়েই নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে?

কোনও উত্তর নেই। ছায়াটা তাকে পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে দরজার দিকে চলে গেল। সুরেন হতভম্বের মত জিজ্ঞেস করলে—কে গো? কে তুমি?

ছায়াটা তবু কথা বললে না, একেবারে তার সামনে গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। তারপর একেবারে বলা-নেই-কওয়া-নেই তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

—কে তুমি? কে গো? তরলা? সুখদা?

কিন্তু সুরেনের মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। ছায়াটা একেবারে নিজের মুখ বাড়িয়ে সুরেনের মুখের কাছে মুখ এনে তার সমস্ত মুখটা চাপা দিয়ে দিলে, আর তারপর সেই মুখের ওপরেই ছায়াটার নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো জোরে জোরে। বড় গরম নিঃশ্বাস।

সুরেন মুখটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করতে গেল—কে? কে তুমি? সুখদা? না তরলা? কে তুমি? কিন্তু তখন বোধহয় আর তার কথা

বলবার ক্ষমতাই নেই। সুরেনও ছায়াটাকে জোর করে চেপে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছায়াটা নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। আর সঙ্গে সঙ্গে সদরের তালাটা খুলে দিয়ে তাকে বাইরে ঠেলে দিলে। আর এক মুহূর্তের মধ্যে আবার দরজাটা তালা-চাবি বন্ধ করে দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে।

সুরেন একলা বাইরের সেই নিঃসীম অন্ধকার উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভালো করে সমস্ত অবস্থাটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে। তার মনে হলো যেন এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীতে একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল। তার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। তারপর ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে তাড়াতাড়ি নিজেকে আড়াল করবার জন্যে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে কথা দিয়ে এ-কাহিনী আরম্ভ হয়েছিল সে-সব আরো অনেকদিন আগের ঘটনা। এ-বাড়িতে ওরা কেউ ছিল না, ওই ঠাকুর-চাকর-বামুন সবাই নতুন। ওই বুড়োবাবুও তখন ছিল না এখানে। ওরা সবাই নতুন এসেছে। ওই সুখদাও বলতে গেলে তখন ছিল না, আসলে তখন ও-মেয়ের বয়েসই ছিল মাত্র তিন-বছর। ওই সুখদাই সেই ফুল-মাসিমার গলার কাঁটা। গলাটা আগেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু কাঁটাটা তখন লাবণ্যলতার গলায় গিয়ে আটকে গেছে।

মা-মণি এক-একবার সরকার-বাবুকে ডেকে বলতো—কই ভূপতি, সুখদার জন্যে যে সেই পাত্র খুঁজতে বলেছিলুম তার কিছু করেছো?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—চেষ্টা তো করছি মা-মণি, ঘটককেও খবর নিতে বলেছি—

—একটু শিগগির শিগগির করো ভূপতি, মেয়েটার বয়েস যে বেড়ে চলেছে -

ভূপতি ভাদুড়ীও জানতো যে মেয়েটার বয়স বাড়ছে। সেই কবে একদিন ফুল-মাসিমা এসে মেয়েটাকে এ-বাড়ির মা-মণির করুণার ওপর নির্ভর করে এখানে ফেলে রেখে নিশ্চিন্তে চলে গিয়েছে, তাও জানা ছিল। ভূপতি ভাদুড়ীর কিছুই অজানা ছিল না। কিন্তু আবার কি একটা বিপর্যয় ঘটবে যেমন ঘটেছিল লাবণ্যলতার বেলায়? সে-কথাও তো ভূপতি ভাদুড়ীর মনে আছে। সে কতকাল আগের কথা। পাথুরিয়াঘাটার সেই দত্তবাড়ির ছেলে বিয়ে করতে এসেছিল এই মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরী বাড়িতে। পাত্রের কাকা এসেছিল। খুড়তুতো ভাইরা এসেছিল। আর এসেছিল বর। চতুর্দোলায় চড়ে পাথুরেঘাটা থেকে বর এসেছিল একদল বরযাত্রীর সঙ্গে। সেদিন বর দেখে ধন্য-ধন্য রব পড়ে গিয়েছিল পাড়ায়। আহা, বর নয় তো যেন রাজপুত্তুর। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে ছুটতে ছুটতে লোক এসেছিল শুধু চৌধুরী-বাড়ির বরকে একবার চাক্ষুষ দেখতে '

ফুল-মাসিমা তখন বেঁচে। ফুল-মাসিমা বলেছিল—আহা, জামাই করেছেন বটে জামাইবাবু, জামাই দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

আসরের ভেতর থেকে যারা দেখছিল তারাও একদৃষ্টে চেয়ে রইল বরের দিকে। বর সিল্কের চাদর গায়ে দিয়েছে একটা। গরদের পাঞ্জাবীতে হীরে-বসানো বোতাম। সমস্ত কপালটায় শ্বেত আর লাল চন্দনের অলকা-তিলকা।

সভা আলো করে বসে আছে।

সিদ্ধেশ্বর ঘটক কন্যাপক্ষের আত্মীয়স্বজনদের সামনে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। বললে—কি রকম বর এনে দিয়েছি দেখছেন চৌধুরী-মশাই, লাখে একটা কেন, কোটিতে একটা মিলবে না।

ওদিকে তখন ভেতরে শাঁখ বাজছে। লুচি ভাজার কড়া গন্ধ আসছে নাকে। তার সঙ্গে আছে আতর গোলাপজলের ফোয়ারা আর বেলফুলের গোড়ে মালার তীব্র সুবাস। আর সকলের ওপর গেটের ওপর নহবত বাজাচ্ছে সেকালের নামজাদা নহবতিয়া বেনারসের আম্‌জাদ আলির সাগরেদ রহমত আলি খাঁ।

আর ভেতরে অন্দর-মহলের তেতলায় তখন মেয়েরা লাবণ্যলতাকে বেনারসী পরিয়ে মুখে পাউডার ঘষে কপালে চন্দন দিয়ে সাজাচ্ছে।

সেজ-কাকিমা দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এসে ঢুকলো—ওরে লাবি, তোর কী চমৎকার বর হয়েছে রে, বড় ভাশুর বেছে বেছে জামাই করেছে বটে—

কথাটা শুনে লাবণ্যলতার গাল দুটো আরো রাঙা হয়ে উঠলো।

সেদিনকার লাবণ্যলতার সঙ্গে এখনকার লাবণ্যলতার যেন কোনও তফাতই নেই। মুখে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বিয়ের কনে সেজে লাবণ্য ঘরের ভেতরে বসে সব শুনছিল।

ফুল-মাসিমা বললে—ওরে যা যা, বর দেখে আয়, বর দেখে আয়, কেমন সোনার কার্তিক বর হয়েছে, দেখে আয়—

কথাগুলো খুব ভাল লাগছিল লাবণ্যর। সারা দিন উপোস করেছে। সেই ভোর রাত্রে, যখন রাত তিনটে তখন ফুল-মাসিমা ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা থেকে ডেকে তুলে দই আর সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর গায়ে-হলুদ হয়েছে। হলুদ নিয়ে কাড়াকাড়ি-মাখামাখি চালিয়েছে বাড়ির মেয়েরা। কোথা থেকে সব অচেনা আত্মীয়স্বজনরা এসে বাড়িতে ভিড় করেছিল। সে-ক'দিন কিন্তু খুব ভালো লেগেছিল লাবণ্যর। সারাদিন বাড়ির মধ্যে হাসি-খেলা লেগেই আছে। বরাবর সমস্ত বাড়িটাতে একলা-একলা থেকে-থেকে হঠাৎ সে-ক'দিন যেন বড় আনন্দে কেটেছিল। বাড়িতে লোকজন থাকাই যেন ভালো।

ফুল-মাসিমা হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল—দেখিস্ লো মেয়ে, বরের গুমোর ভাঙতে পারবি তো?

কথাটা বুঝতে পারেনি লাবণ্য। শুধু কথাটার মানে বোঝবার জন্যে ফুল-মাসিমার মুখের দিকে চেয়েছিল।

—হাঁ করে চেয়ে দেখছিস কী লা?

লাবণ্য হাসতে হাসতে বোকার মত জিজ্ঞেস করলে—কীসের গুমোর ফুল-মাসিমা?

ফুল-মাসিমা বললে—ওলো বুঝবি লো বুঝবি। ফুল-শয্যের রাতে বুঝবি কাকে বলে গুমোর।

তারপর অন্য মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আর ও-সব কথা বেশি দূর এগোয়নি। ততক্ষণে ছাদনাতলায় বরকে নিয়ে আসা হয়েছে। চারদিকে কলাগাছ বসিয়ে

আলপনা-আঁকা পিঁড়ের ওপর বরকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে চারদিকে।

সবাই মিলে লাবণ্যকে নিয়ে একটা পিঁড়ির ওপর তুললো। সাত পাক ঘুরতে হবে। বরকে সাত পাক না ঘুরলে সারা জীবন স্বামীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে কেমন করে? পুরুষ মানুষের কেবল বাইরের দিকে নজর। সে ঘরে বউ রেখে বাইরে ঘুরতে পারলেই খুশী। সেই তাকেই বশ করতে হবে। বশ করে সংসারে বাঁধতে হবে তাকে। তবেই তো তুমি বউ, তবেই তো তুমি সহধর্মিণী।

—ও লো, উলু দে, উলু দে—

ওদিক থেকে উলু দিতে লাগলো মেয়েরা। শুধু উলু নয়, শাঁখও বাজতে লাগলো। রাঙা চেলি পরে পিঁড়ির ওপর বসে সাত পাক ঘুরতে হলো লাবণ্যকে।

—ওলো চোখ খুলিসনি, চোখ খুলিসনি। চোখ ঢাক। শুভদৃষ্টির আগে বরকে দেখতে নেই—

কে যেন বলে উঠলো—লাবি আর লোভ সামলাতে পারছে না মাসিমা—

নাপিতটা দাঁড়িয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি বর-কনের মাথায় চাদর ঢাকা দিয়ে দিলে। আর তার পরেই ছড়া আওড়াতে লাগলো—

কড়ি দিয়ে কিনলাম।
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম।
হাতে দিলাম মাকু
ভ্যা করো তো বাপু!

হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগলো বাড়ির মেয়েরা। একজন বললে—ওমা, বর যে ভ্যা করছে না ভাই। ও বর, ভ্যা করো না—

লাবণ্যর সেদিন খুব রাগ হয়েছিল। সবাই মিলে তার বরকে অত হেনস্থা করছে কেন? শুভদৃষ্টির সময়েই লাবণ্যলতা লোকের মুখে শোনা খবরের সঙ্গে বরকে মিলিয়ে দেখেছিল। সত্যিই, কেউ এক চুল বাড়িয়ে বলেনি। রাধানাথ তো রাধানাথই বটে। রাধানাথের মতই স্বামীর চেহারাটা। পাথুরেঘাটার দত্ত বাড়ির ছেলে শ্রীমান রাধানাথ দত্ত।

সেই শুভদৃষ্টির সময়েই প্রথম দেখেছিল লাবণ্য। আর তারপর দেখেছিল বাসর ঘরে। বাসর-ঘরে সবাই মিলে লাবণ্যকে জোর করে ধরে রাধানাথের কোলে বসিয়ে দিয়েছিল। সবাই বলেছিল—দেখ দেখ যেন হর-গৌরী। হর-গৌরীর যুগল-মিলন হয়েছে।

সুরেন এইসব শোনা-গল্পের সঙ্গে মা-মণির চেহারাটা কতবার মিলিয়ে দেখেছে। তারপর কতবার মা-মণির ঘরে গেছে। এক-একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছে—আচ্ছা, তোমার সে-সব কথা মনে পড়ে মা-মণি?

কিন্তু লজ্জায় সংকোচে সব কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি। শুধু মুখখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখেছে আর ভেবেছে ছোটবয়সে এই মা-মণিকে দেখতে কেমন ছিল। এই মা-মণির সঙ্গেই একদিন পাথুরেঘাটার রাধানাথ দত্তর বিয়ে হয়েছিল।

সেদিন হঠাৎ সেই মা-মণিই আবার ডেকে পাঠালে।

ততদিনে বেশ গড়ো-গড়ো হয়ে গেছে মা-মণির কাছে যাওয়া। আর আশ্চর্য, যে সুখদা তাকে সেদিন অমন করে বে-ইজ্জৎ করতে চেয়েছিল সেই

সুখদাও তখন অন্যরকম হয়ে গেছে। একেবারে বদলে গেছে। আর মামা? ভূপতি ভাদুড়ী মা-মণিকে কী বলে এসেছে কে জানে, মামাও যেন মনে মনে খুশী হয়েছিল তার ওপর।

প্রথম দিন একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল মা-মণির ডাক শুনে; আবার তাকে বকবে নাকি? তাবাব সুখদা মা-মণির কাছে তার নামে লাগিয়েছে নাকি?

মনে আছে, সেই সেদিন সেই মাঝরাত্রে যখন অন্দর-মহল থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন ঘটনাটা কেউ দেখে ফেলেছে কিনা চারদিকে চেয়ে দেখেছিল। তারপর আস্তে আস্তে আবার তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। লেখা-পড়া করতে আর ভালো লাগেনি তখন। বিছানাতে শুয়ে শুয়েও কেবল মনে মনে অন্ধকারে কল্পনা করতে ভালো লাগছিল দুটো নরম হাতের ছোঁওয়া। দুটো নরম হাত দিয়ে তার মুখখানা চেপে ধরেছিল, তারপর সেই দুটো হাত দিয়ে মুখখানা নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কী-রকম একটা ভালো গন্ধ নাকে এসেছিল। গন্ধটা চুলের না শাড়ির তা বুঝতে পারেনি সে। কিন্তু ভারি মিষ্টি লেগেছিল গন্ধটা। মনে হয়েছিল তখনও যেন সেটা মুখে লেগে রয়েছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সুরেন বার বার গন্ধটা শুঁকতে চেষ্টা করলে। বেন খুব ভালো লাগতে লাগলো। কে যে অমন করলো, কে যে তাকে বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দিলে তা কোনও দিন জানা গেল না।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেও সুরেন সেই সব কথাগুলোই ভাবতে লাগলো, সেই আগের রাত্রের কথাগুলো। কে? কে সেই মেয়েটা? তরলা, না সুখদা? বার বার নানা ছুতোয় সুরেন উঠোনের ভেতরে বাড়িটার চার-পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বাইরে থেকে কাউকে দেখা যায় না। সারা বাড়িটার জানালা-দরজার ফাঁক দিয়েও কারোর মুখ নজরে পড়লো না। আশ্চর্য, কাল রাত্রে অত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ কই, কেউ তো কিছু বলছে না।

বাহাদুর সিং দরজায় পাহারা দিচ্ছিল বন্দুক নিয়ে।

সুরেন বললে—কী বাহাদুর সিং? পাহারা দিচ্ছ?

বাহাদুর সিং সুরেনকে ভাগ্না-বাবু বলে ডাকতো। বাহাদুর সিং বললে—হ্যা ভাগ্না-বাবু—

—বেশ ভালো করে পাহারা দিও বাহাদুর সিং। বাড়ির মধ্যে কেউ যেন না ঢোকে

বাহাদুর সিং বললে—কে ঢুকবে ভাগ্নাবাবু? ঢুকলে আমার বন্দুক দিয়ে তাকে গোলি করে মারবো—

বোঝা গেল সেও কিছু টের পায়নি। তারপরে গেল রান্না-বাড়ির দিকে। ঠাকুর তখন এক মনে রান্না নিয়ে ব্যস্ত।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কী ঠাকুর, রান্না করছো? খুব ভালো করে রান্না করো।

ঠাকুর তো অবাক! বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ উপদেশ দিতে এল কেন ভাগ্নেবাবু। যেমন রান্না করছিল তেমনি রান্না করতে লাগলো।

সুরেন বললে—জানো তো ঠাকুর, সামনে আমার এগ্‌জামিন আসছে, এগ্‌জামিনের দিনে যেন ভাত দিতে দেরি না হয়, বুঝলে? দেরি হলে আমি

ভাত না খেয়েই এগ্‌জামিন দিতে চলে যাবো কিন্তু।

ঠাকুর কিছু বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞেস করলে—এখন ভাত খাবেন নাকি ভাগ্নেবাবু?

বললে—না, না, এখন কি ভাত খাবার সময়? এখন তো সবে সকাল হয়েছে। আমি তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। ওদিকে জমাদারদের ঘর। দুখমোচন তখন বাড়ির কলতলা নর্দমা সাফ করছে। সুরেনকে দেখেই হাত তুলে একটা সেলাম করলে।

সুরেন বললে—কী দুখমোচন, মন দিয়ে কাজ করছো তো?

—হ্যাঁ ভাগ্নাবাবু, মন দিয়ে কাজ করবো না তো কি ফাঁকি দেব?

—হ্যাঁ, তাই বলছি, খুব মন দিয়ে কাজ করবে। নইলে মামা আবার রেগে যাবে। রেগে গেলে মামার জ্ঞান থাকে না তা জানো তো?

কিন্তু কোনও দিক থেকেই টের পাওয়া গেল না ব্যাপারটা কেউ জেনেছে কি না। সোজা আবার নিজের ঘরের দিকেই চলে আসছিল। অনেক পড়া বাকি আছে অথচ সামনে পরীক্ষা।

—অ খোকা, খোকা!

সুরেন পেছন ফিরে দাঁড়ালো। দেখলে বুড়োবাবু পেছন থেকে ডাকছে। সুরেন কাছে গেল। বুড়োবাবু বললে—এসো এসো, ভেতরে এসো বাবা—

সুরেন দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বুড়োবাবু বললে—ওখানে দাঁড়ালে কেন? ভেতরে এসো, এই ঘরের ভেতরে—

সেই-ই প্রথম সুরেন বুড়োবাবুর ঘরে ঢুকলো। চারিদিকে ঝুল, একটা ভাঙা তক্তপোষ। তার ওপরে একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা। ঘরময় নোংরা। পরনে একটা গামছা।

—কী দেখছো?

সুরেন বললে—কিছু দেখছি না! তোমার ঘরের ভেতরে খুব ময়লা-ঝুল, তাই দেখছি—

—ময়লা? তা হবে! আমি তো ও-সব চোখে দেখতে পাইনে। আমার চোখে ময়লাও যা পরিষ্কারও তাই, আমার কাছে সবই ঝাপসা।

সুরেন বললে—কী বলছিলে? আমাকে ডাকছিলে কেন?

বুড়োবাবু বললে—ডাকছিলাম আর কেন! এই চুপচাপ একলা ঘরে বসে-ছিলাম তাই ডাকছিলাম। একলা বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। একলা বসে থাকি বলে কেবল ক্ষিদে পায়। কেবল ক্ষিদে। এত ক্ষিদে যে কোত্থেকে আসে কে জানে। যেন মা-বাপ নেই ক্ষিদের, তা তুমি ঠাকুরকে কী বলছিলে?

সুরেন বললে—ঠাকুরকে বলছিলাম ভাল করে মন দিয়ে রান্না করতে।

বুড়োবাবু বললে—মন দিয়ে রাঁধে না ছাই রাঁধে। সেদিন ডালের মধ্যে গুচ্ছের নুন দিয়ে ফেলেছিল, আমি একেবারে খেতে পারিনি. একটু বললুম—ঠাকুর, এত নুন দিয়েছ কেন? তা শুনে আমাকে মারতে এল। জানো, আমাকে মারতে এল তেড়ে! আমি বলি ভালো রে ভালো—। আর কিছু বেশি বললুম না. চুপ করে রইলাম—

—তা খেলে কী দিয়ে?

—ওই নুন পোড়া দিয়েই খেয়ে নিলাম।

সুরেন বললে—তা তুমি মাইনে পাও তো?

—মাইনে? কীসের মাইনে? বুড়োবাবু কিছু বুঝতে পারলে না কথাটার মানে।

সুরেন বললে—তা তুমিও তো এ-বাড়ির চাকর। সব চাকরই তো মাইনে পায়, তুমি মাইনে পাও না কেন? তোমাকে বুঝি বুড়ো হয়ে গেছ বলে মাইনে দেয় না?

বুড়োবাবু বললে—দূর, তুমি কিছু বোঝো না, একেবারে আনাড়ি। আমার কি চোখ আছে যে কাজ করবো? খেতে বসে আমি ভাতই দেখতে পাই না—ওই ঠাকুরটাকে তুমি তোমার মামাকে বলে তাড়িয়ে দাও বাবা। তাহলে আমার বড় উপকার হয়, আমি একটু পেট ভরে খেতে পাই—

আজ মনে হয় সেই বুড়োবাবু, কত অপমান তাকে সেদিন সহ্য করতে হয়েছে, একটু পেট ভরে ভাত খেতে পাওয়ার জন্যে কত হেনস্থা হয়েছে। সেই বুড়োবাবুরই একদিন আবার শেষ পর্যন্ত কী পরিবর্তন হলো। মানুষের জীবনের কথা কি কিছু ঠিক করে বলা যায়? ওই বাহাদুর সিংই আবার একদিন বুড়োবাবুকে দেখে বন্দুক ঠুকে সেলাম করতো। ওই ঠাকুরই আবার একদিন বুড়োবাবুর হুকুমে বরখাস্ত হয়ে গেল। ওই ঠাকুরই সেদিন বুড়োবাবুর পা জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—আমার দোষ হয়ে গেছে হুজুর, আমাকে ক্ষমা করুন—

কিন্তু না, সেদিন ওই বুড়োবাবুই বলেছিল—না, তোকে আর এ-বাড়িতে রাখবো না—যা তুই—

বুড়োবাবু তার কথা কিন্তু আর কিছুতেই শোনেনি। যারা যারা তাকে কষ্ট দিয়েছিল তাদের সকলকে একসঙ্গে বরখাস্ত করে দিয়েছিল।

সুরেন যখন ঘর থেকে চলে আসছে তখন বুড়োবাবু বললে—হ্যাঁ ভাই, একটা কথা, তুমি তো বাড়ির ভেতরে যাও? বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

সুরেন বললে—দুদিন গিয়েছিলাম ভেতরে—

বুড়োবাবু জিজ্ঞেস করলে—তা ভেতরে গিয়েছিলে তো বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

সুরেন বললে—গিন্নী? গিন্নী কে?

—ওই গো, যাকে সবাই মা-মণি বলে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল—

—তা বাবা, এবার যদি দেখা হয় তো আমার কথাটা একটু বলবে গিন্নীকে?

—আপনার কী কথা?

বুড়োবাবু বললে—এই ধরো আমার সেই গামছার কথা?

সুরেন বললে—সে তো আমি আমার মামাকে বলেছি—

—না, না, মামাকে বললে কিছু হবে না। তোমার মামা আমার ওপর ভীষণ ক্ষ্যাপা! তোমার মামাকে বললে চলবে না! একেবারে খোদ মা-মণিকে বলতে হবে, খোদ গিন্নীকে—

—তা সে তো তুমি নিজেই বলতে পারো।

বুড়োবাবু বললে—ওরে বাবা, তাহলেই হয়েছে, আমাকে ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় করবে। একেবারে এই বাড়িছাড়া করে দেবে।

কথাগুলো শুনে সেদিন বুড়োবাবুর ওপর খুব দুঃখ হয়েছিল সুরেনের। কিন্তু কিছু করবার উপায়ও ছিল না তখন। পকেটে টাকা থাকলে সুরেন নিজেই একটা নতুন গামছা কিনে দিতে পারতো। তাই একটা স্তোক-বাক্য শুনিয়েই চলে এসেছিল। বুড়োবাবু আসবার সময় বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিল—তা হলে ভুলো না বাবা, মা-মণিকে কথাটা বলতে ভুলো না, জানো?

সেখান থেকে ফিরে এসে সুরেন আবার নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আর কাউকেই কিছু বলেনি। কিন্তু সারাদিনটা কেবল মনটা ছট্‌ফট্ করেছিল। শুধু মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল—

—সে কে? সুখদা? না তরলা? সে কে?

মানুষের জীবনের অনেক অলি-গলি সুড়ঙ্গ আছে। শুধু সোজা রাস্তা দিয়ে মানুষের জীবন চলে না। ওই সব অলি-গলি সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে মানুষ ক্রমে ক্রমে মহাজীবনের দিকে এগিয়ে চলে। তার প্রতি পদে রহস্য, প্রতি পদক্ষেপে রোমাঞ্চ। কখনও অন্ধকারের আতিশয্যে তার হতাশা আসে, কখনও ক্লান্তি। আবার কখনও আশার হাতছানিতে জীবন তর-তর করে সামনে চলে; তারপর যখন জীবন তার শেষ-পরিচ্ছেদে এসে পৌঁছোয় তখন পেছন ফিরে ফেলে আসা পথটার দিকে চেয়ে দেখে। চেয়ে দেখতে তার ভাল লাগে। তখন দুঃখটাও মিষ্টি লাগে, ভয়টাকেও মধুর বলে মনে হয়।

ঠিক এমন সময় আবার একদিন ডাক এল ভেতর-বাড়ি থেকে।

কী করবে বুঝতে পারলে না সুরেন। ডাকতে এসেছিল মা-মণির হাতের চাকর ধনঞ্জয়। সুরেন বললে—তুমি যাও ধনঞ্জয়, আমি একবার মামাকে বলে যাচ্ছি—

ধনঞ্জয় বললে—সরকার-বাবুকে আবার কী জিজ্ঞেস করবেন ভাগ্নেবাবু, সরকার-বাবু তো এখনি মা-মণির কাছ থেকে দেখা করে এলেন—

তবু একবার দেখা করে যাওয়াটা ভালো। কিন্তু মামার কাছে গিয়ে কথা বলতে ভয় করতে লাগলো। যদি আবার সেইদিনের কথা ওঠে। কেন সে রাত্রে গিয়েছিল, গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করেছিল, সব কথা যদি সুখদা ফাঁস করে দিয়ে থাকে?

কিন্তু মামার দপ্তরে যেতেই দেখলে দু'চারজন লোক বসে আছে মামার সামনে। ভূপতি ভাদুড়ীর সামনেই যে-লোকটা বসে আছে, সে লোকটা মনে হলো ঘটক।

ভূপতি ভাদুড়ী তখনও দেখতে পায়নি ভাগ্নেকে। ঘটককে লক্ষ্য করে বলছে—মেয়ে তোমার দেখতে হবে না ঘটক মশাই। মেয়ের স্বভাব-চরিত্র যাকে বলে একেবারে খাঁটি সোনা, মানে খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি—

—পাত্রীর নামটা কী বললেন? আমাকে তো আবার গিয়ে বলতে হবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—পাত্রীর নাম হলো সুখদা। সুখদা বালা দাসী।

—কিন্তু পাত্রীর পিতা-মাতা?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমাকে তো আগেই বলেছি পাত্রীর পিতা-মাতা কেউ নেউ। এখানে মা-মণির কাছেই মানুষ। নিজের মেয়ের মত করেই মানুষ করেছেন মা-মণি। সেই একেবারে ছোটবেলা থেকে পাত্রী এখানেই আছে: আমি সেই তখন থেকেই দেখে আসছি ঘটক-মশাই। স্বভাব চরিত্রে কোনও খুঁত পাবে না কেউ। মানে যাকে বলে ক্যারেকটার। ক্যারেকটারটি খাঁটি সে ব্যাপারে

আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি—

ঘটক-মশাই বললে—পাওনা-থোওনা কেমন হবে ম্যানেজারবাবু?

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—পাওনা-থোওনার কথা যদি জিজ্ঞেস করো তো জিজ্ঞেস করো গিয়ে সিধু ঘটককে। সিধু ঘটকের নাম শুনেছ! সিদ্ধেশ্বর ঘটক যার নাম।

ঘটক-মশাই বললে—খুব শুনেছি—

—শুনবেই তো। সে-জানে। সে এই মা-মণির বিয়ে দিয়েছিল। দেশে তাকে কাঁবিঘে লাখেরাজ জমি দিয়েছিল কর্তাবাবু, তা তাকেই জিজ্ঞেস করে এসো। সে হয়তো এখনও বেঁচে আছে। বুড়ো মানুষ বলে তাকে আর আমি খবর দিইনি—

তারপর আর একটু থেমে আবার বললে—তবে পাত্রী সম্বন্ধে আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি ঘটক-মশাই যে, যারা সুখদাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে তারা আসল খাঁটি সোনা পাবে, গিলটি-সোনা নয়, একেবারে যাকে বলে পাকা সোনা—

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরেন অনেকক্ষণ কথাগুলো অবাক হয়ে শুনতে লাগলো। তবে কি সুখদার বিয়ের কথা হচ্ছে? সুখদার বিয়ে হয়ে সে কি চলে যাবে শ্বশুর-বাড়িতে?

—কী রে, তুই? তুই কী করতে?

হঠাৎ বোধহয় এতক্ষণে ভূপতি ভাদুড়ীর নজর পড়লো সুরেনের দিকে! বললে—কিছু কাজ আছে আমার কাছে?

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। কেমন করে কথাটা পাড়বে তা-ও বুঝতে পারলে না।

শুধু বললে,—হ্যাঁ, একটা কথা ছিল—

—কী কথা?

সুরেন আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—ধনঞ্জয় আমাকে ডাকতে এসেছিল—বলছিল মা-মণি আমাকে ওপরে ডেকেছে—

ভূপতি ভাদুড়ীর মুখের চেহারাটা হঠাৎ যেন অবিশ্বাস্য রকম প্রসন্ন হয়ে উঠলো। এটা আশা করেনি সুরেন। ভেবেছিল মামা রাগ করবে। যেমন বুড়োবাবুর গামছা চাওয়ার কথা বলতে রেগে খুন হয়ে গিয়েছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী হেসে বললে—তাই নাকি? তোকে ডেকেছেন মা-মণি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম। যাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী কথাটা শুনে যেন কী-রকম সঙ্কুচিত হয়ে রইল। এমনিতে যে-মানুষরা বুদ্ধিমান তারা বাইরে ভালোমানুষ। বাইরে তাদের দেখে কিছু বোঝবার উপায় থাকে না। বুদ্ধিমান মানুষদের বাইরের চেহারাটা আসল নয়।

হঠাৎ ঘটক-মশাই-এর দিকে চেয়ে মামা বললে—ঘটক-মশাই তুমি একটু বোসো, আমি আসছি—

বলে ঘরের বাইরে নিয়ে এল সুরেনকে। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—দেখছিস ঘটক-মশাই বসে রয়েছে, তার সামনে ও-সব কথা বলতে আছে? একটা আক্কেল-বিবেচনা নেই তোর?

তারপর কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ধনঞ্জয় তোকে বলেছে মা-মণি ডাকছে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

—তা শুনে তুই কী বললি?

সুরেন বললে—আমি বলেছি তোমাকে জিজ্ঞেস করে তবে যাবো—

—তা, ধনঞ্জয় সে-কথা শুনে কী বললে?

সুরেন বললে—ধনঞ্জয় বললে তুমি নাকি সব জানো—

ভূপতি ভাদুড়ী কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হয়তো ভাবতে লাগলো কিছু।

সুরেন বললে—তুমি কী বলছো? যাবো? গেলে তুমি আবার বকবে না তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—দূর বোকা, বকবো কেন? আমি তো জানি সব। তুই যা। গিয়ে মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি, বুঝলি? কথাটা মনে থাকবে তো? মা-মণির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি। যদি মা-মণি আপত্তি করে বামুন হয়ে কায়েতের মেয়ের পায়ের ধুলো নিলে, তা তুই শুনবি নে। জোর করে পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকাবি, জানলি?

সুরেন বললে—কিন্তু কী জন্যে আমাকে ডেকেছে মামা? আমি তো কিছু করিনি।

ভূপতি ভাদুড়ী চুপি চুপি ধমকে উঠলো। বললে—যা বলছি তাই কর। আমি তো আছি. আমি তোকে খারাপ মতলোব দেব বলতে চাস্? আমি তোর মামা না? শুধু মা-মণির কাছে গিয়ে পায়ের ধুলো নিতে যেন ভুল করিসনে—যা—

এর পরে আর দাঁড়ানো চলে না। সুরেন চলে যেতেই ভূপতি ভাদুড়ী আবার ঘরের ভেতরে ফিরে এল। ঘটক-মশাই বললে—ও কে সরকার-বাবু? আপনার ভাগ্নে? আপনাকে মামা বলছিল?

নিজের কাজ করতে করতে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ।

—আপনার ভাগ্নে বুঝি আপনার কাছেই থাকে?

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—তোমার ওই বড় দোষ ঘটক-মশাই। তোমার যত বাজে কথা। তুমি ঘটকালির কাজ করছো করো. ওই জন্যই তো তোমার কারবার মোটে চলে না—

ঘটক-মশাই বললে—আজ্ঞে তা নয়, ভাবছিলাম আপনার ভাগ্নেরও তো বিয়ে দেবেন?

ভূপতি ভাদুড়ী কাজের মানুষ, অকাজের কথা শুনলেই তার বড় রাগ হয়। বললে—তোমার কিস্যু হবে না ঘটক-মশাই, এই বেস্পতিবারের বারবেলা তোমাকে আমি বলে দিলাম, তোমার কিস্যু হবে না। তোমাকে কাজ দেওয়াই আমার ঝকমারি হয়েছে। সুখদার জন্যে তোমায় আর পাত্তোর খুঁজতে হবে না, তুমি যাও, আমি আমার সিধু ঘটককেই খবর পাঠাচ্ছি—

ঘটক-মশাই বললে—কেন, গরীবের ওপর কেন রাগ করছেন সরকার-বাবু—আমি কী করেছি?

—তা রাগ করবো না? তুমি আমার ভাগ্নের বিয়ের কথা কোন্ মুখে বললে শুনি? ওর বিয়ের বয়েস হয়েছে? আমি ওর এখন বিয়ে দেব? বিয়ে দিলে বউকে ও খাওয়াবে কী?

—আজ্ঞে, আজ না হোক, একদিন তো হবেই এখন থেকে মনে মনে ছকে রাখছিলাম আর কি। আপনি চটলে আমার পেশা চলবে কেমন করে

সরকার-বাবু ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। আমার এখন কাজ আছে, তুমি এখন যাও—

ঘটক-মশাই বললে—কিছু টাকা-কড়ি দিন সরকার-বাবু, ক'দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছি—

—টাকা ?

ভূপতি যেন সাপ দেখে চমকে উঠেছে হঠাৎ। বললে—কীসের টাকা?

—এই যে আমি এতদিন পাত্র খুঁজে বেড়ালাম, আমার খরচপাতি কিছু নেই ?

ভূপতি ভাদুড়ী আবার রেগে গেল। বললে—দেখ ঘটক মশাই, তুমি জানো আমাদের পাত্রী ভাল, পাত্রও আমাদের ভাল পাওয়া চাই—

ঘটক-মশাই বললে—আমি যে-কটা পাত্তোর এনেছি, সব ক'টাই তো আপনারা নাকচ করে দিয়েছেন সরকারবাবু—

—তা পাত্র পছন্দ না হলে নাকচ করবো না? আর পাত্র কি আমি নাকচ করেছি হে, সবাইকে তো নাকচ করেছে মা-মণি। আমার মনিব! আমি কী করবো ?

বাইরে দাঁড়িয়ে সুরেন কথাগুলো কিছুক্ষণ শুনতে লাগলো—খানিকটা যেন অবাক লাগলো তার; যে-মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, সে কেন তাকে রাত্রে বাজে ছুতো করে ভেতর-বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল! কী লাভ তার তাতে!

আস্তে আস্তে সুরেন অন্দর-বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। এইখানেই ক'দিন আগে মাঝরাত্রে সে আটকে পড়েছিল। আবার এখানেই কে তাকে ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দিয়েছিল। কাঠের সিঁড়ি। এক-পা এক-পা করে উঠে তেতলায় উঠতেই মা-মণির গলার আওয়াজ কাণে এল—কইরে বাদামী, ধনঞ্জয়কে বলেছিলি ভাগ্নেবাবুকে ডাকতে—

এর পর আর দেরি করা চলে না। সুরেন তাড়াতাড়ি উঠে তেতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—এই যে মা-মণি, আমি এসেছি—

মা-মণি সুরেনকে দেখেই বললে—এসে গেছ? ভাল হয়েছে, তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম—

তার পরেই ডাকাডাকি শুরু করে দিলে—ওরে ও বাদামী, ও তরলা, কোথায় গেলি সব, ওরে ও...

বারান্দার ভেতরে ধূপ-ধুনোর গন্ধ বেরোচ্ছিল। সুরেন কিছুই বুঝতে পারছিল না—কেন, কীসের জন্যে মা-মণির এত ব্যস্ততা!

মা-মণি বললে—তুমি একটু দাঁড়াও বাবা, বাদামী আসুক, তোমার বসবার জায়গা করে দেবে—

বলে আবার ডাকতে লাগলো মা-মণি—বলি কানের মাথা খেয়েছিস নাকি গা ও তরলা, কোথায় গেলি তোরা—সুখদা, অ সুখদা—মুখপুড়ি কোথায় গেল ?

ততক্ষণে তরলা এসে গেছে।

মা-মণি বললে—কানে কথা যায় না তোদের? আমি তোদের ডেকে ডেকে গলা ভাঙিয়ে ফেলছি। ছেলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? হাঁ করে দাঁড়িয়ে

দেখছিস কী? ছেলেকে কল-ঘরে নিয়ে যা। একটা গামছা দে, সাবান দে, তেল দে—আর বড় ঘরে কার্পেটের আসনটা পেতে দে—

সুরেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। ততক্ষণে মা-মণির ডাক পেয়ে বুড়ি-ঝি বাদামীও থপ্ থপ্ করে এসে হাজির হয়েছে। বহুকালের ঝি। মা-মণির বিয়ের সময় ওই বাদামীই নতুন-কনের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ি গিয়েছিল।

মা-মণি বাদামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কোথায়? সুখদা কোথায়? বলি তার কি এখনও সাজ-গোজ শেষ হলো না? করছে কী সে?

বাদামী বললে—সে তো চুল আঁচড়াচ্ছে—

—বলি অত সাজ-গোজ কার জন্যে? ভাতার এসেছে না কী? তাড়াতাড়ি আসতে বল গিয়ে। বল সুরেন এসে গেছে—

কিছুই বুঝতে পারছিল না সুরেন। এ-সব কীসের আয়োজন হচ্ছে তাকে নিয়ে!

কেন তাকে ডাকা হয়েছে? আর সুখদাই বা তার কাছে আসার জন্যে অত সাজ-গোজ করছে কেন? মা-মণি সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—যাও বাবা, ওই তরলার সঙ্গে কল-ঘরে যাও। তা হ্যাঁ রে, নতুন কাপড়টা দিলিনে?

—ওমা, একেবারে ভুলে গেছি—বলে তরলা আবার দৌড়লো ভেতরের দিকে।

সুরেন মা-মণির দিকে চেয়ে বললে—এ সব কী মা-মণি?

মা-মণি বললে—ওই সুখদার ব্রত-পারণ হলো কি না আজ থেকে, তাই...

—কীসের ব্রত?

মা-মণি বললে—হিতসাধিনী-ব্রত। সুখদাকে হিতসাধিনী-ব্রত করতে বলেছি আমি আজ থেকে, তা তুমি তো বামুনের ছেলে, ব্রত করবার পর বামুনকে রোজ মিষ্টি আর দক্ষিণে দিতে হয়। তাই তোমাকে ডাকা—

এতক্ষণে জিনিসটা সোজা হয়ে গেল সুরেনের কাছে। তরলা দৌড়তে দৌড়তে একটা ধুতি নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, বেশ পাট-করা নতুন কোরা ধুতি।

মা-মণি বললে—যাও বাবা, ওই ধুতিটা নিয়ে কল-ঘরে যাও। কলতলায় ঢুকে সাবান তেল দিয়ে চান করবে। তবে ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে নতুন ধুতিটা পরবে। তারপর আমি তোমার জন্যে জল-খাবারের ব্যবস্থা করে রাখছি—

প্রথমে একটু দ্বিধা হলো সুরেনের মনে। বাড়ির কল-ঘরে সে ঢোকে, নিজের ময়লা ধুতি-জামা রোজ নিজেই সে কাচে। সেইটেই তার বরাবরের অভ্যেস। কিন্তু এই তেতলায় মা-মণির কলঘরে যদি সে জামা-কাপড় ছেড়ে রাখে তো কে তা কাচবে?

তরলাই সুরেনকে কল-ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কল-ঘরের ভেতরে ঢুকে সুরেন দেখলে বেশ সাজানো কল্-ঘরটা। সাবান-গামছা-তোয়ালে গন্ধ তেল সবই র‍্যাক-এ সাজানো রয়েছে থরে থরে। একটু আগেই কেউ বুঝি স্নান করেছে সেখানে। টাটকা সাবানের গন্ধে ভুর ভুর করছে সারা ঘরখানা। ভিজে একখানা শাড়িও মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে বোধহয় সুখদারই শাড়ি। সুখদা একটু আগে হয়তো এই ঘর থেকে স্নান করে বেরিয়েছে।

তরলা বললে—কাপড়-জামা আর তোমায় কাচতে হবে না, এমনি ফেলে রেখে এসো, আমি কেচে দেব এখন—

সুরেন তবু হাঁ করে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিল।

তরলা বললে—দাঁড়িয়ে আছো কেন? দরজা বন্ধ করে দাও—

সুরেন নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যেই বোধহয় দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে ছিট্‌কিনি বন্ধ করে দিলে। কিন্তু দরজা বন্ধ করে দিয়েই হঠাৎ মামার কথাটা মনে পড়লো। মামা যে বলে দিয়েছিল মা-মণিকে দেখতে পেলেই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে। তা তো করা হয়নি।

আবার সেই অবস্থাতেই ছিটকিনিটা খুলে ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ালো সুরেন। তরলা শব্দ শুনে পেছন ফিরে দেখলে। বললে—ওমা, কী হলো? চান করলে না?

সুরেন তাকালে—মা-মণি? মা-মণি কোথায়?

একটা ঘর থেকে মা-মণি বেরিয়ে এল। বললে—কী রে? চান করলিনে?

সুরেন তাড়াতাড়ি সোজা সামনে গিয়ে মা-মণির পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

—করিস কী, করিস কী? তুই যে বামুনের ছেলে রে? কী জ্বালা। বলে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো মা-মণি।

সুরেন বললে—আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম মা-মণি, আমার মামা আমাকে এ-বাসায় আসবার আগে বার বার করে বলে দিয়েছিল তোমায় প্রণাম করতে—আমার মনে ছিল না—

মা-মণি তাড়াতাড়ি সুরেনকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলে। আদর করে বললে—দূর বোকা, তুই যে বামুন, আর আমি যে কায়েতের মেয়ে। তোর পেন্নাম নিলে আমার যে পাপ হয়।

সুরেন মা-মণির বুকের ভেতরে তেমনি করেই মুখখানা লুকিয়ে রাখলো। বড় ভালো লাগলো তার। এমন আদর করে কেউ তো তাকে চুমু খায়নি আগে। সবাই কেবল তার খুঁতই ধরেছে, সবাই কেবল ওকে বকেই এসেছে। সবাই তাকে কেবল অবহেলাই করে এসেছে এতদিন। সেদিন রাত্রে সেই যে কে-একজন তার মুখে গরম-মুখ রেখে আদর করেছিল, সেও কিন্তু এমন মিষ্টি নয়।

মা-মণি আগের মতই ঠিক তেমনি করে আর একবার হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললে—যাও বাবা তাড়াতাড়ি চান্‌টা করে এসো। সুখদা আবার তোমার জন্যে সকাল থেকে উপোস করে বসে আছে। তোমাকে খাইয়ে তবে আবার সে জল খাবে—

সুরেন তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার কল-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর যেন নিজেকে অন্য লোকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করবার জন্যেই কল-ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলে।

মানুষের জীবনের মত বিচিত্র জিনিস আর কীই বা আছে এ-সংসারে! কোথায় কোন অজ পাড়াগাঁয়ে ছিল সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল। কে যে তার অমন বিশ্রী নাম রেখেছিল কে জানে। আর কোনও নাম পেলে না রাখবার? ইস্কুলে অনেক নাম শুনেছে সুরেন, কিন্তু এমন সাদামাঠা নাম

কখনও শোনেনি। নামটা শুনলেই যেন ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। নামটার সঙ্গেই যেন পাড়াগাঁয়ের গন্ধ লুকিয়ে আছে। হয়তো ওই নামটার জন্যেই সে এই শহরে এসে এতদিন কারো কাছে স্নেহ পায়নি, সহানুভূতি পায়নি। সুখদা যে তার সঙ্গে ওই রকম খারাপ ব্যবহার করেছে, তাও বোধহয় ওই নামটার জন্যেই।

তবু যে মা-মণি তাকে এত আদর করলে এটা সৌভাগ্য ছাড়া আর কী? তার নিজের সৌভাগ্য আর মা-মণির মহত্ত্ব। মা-মণি মানুষটা ভাল বলেই তাকে এত আদর করলে। তার বামুন হওয়াটার মধ্যে তো তার নিজের কোনও কৃতিত্ব নেই। বামুন হয়ে সে জন্মেছে, সেটা ঘটনা। অথচ বামুন না হলে তো এমন করে তাকে কেউ খাওয়ার জন্যে ডাকতো না, এমন নতুন কাপড়ও দিত না। কিন্তু সত্যি-সত্যি তাকে ঠিক কীসের জন্যে যে খাতির করছে তা চান করতে করতে সুরেন অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো। খুব ঠাণ্ডা জল। সাবানটাও বেশ গন্ধওয়ালা। সাবানটা তখনও ভিজে জব-জব করছে। এই সাবানটা দিয়ে একটু আগে সুখদা চান করে গেছে। এই সাবানটাই সে সারা গায়ে মেখেছে।

ভিজে কাপড়টা একপাশে রেখে সুরেন নতুন কাপড়টা পরে নিলে। নতুন কাপড়টারও একটা কোরা কোরা গন্ধ আছে। সে-গন্ধটাও বেশ ভালো। কলের তৈরি কাপড়ে মাড় লাগানো থাকে। সেই মাড় শুকিয়ে গেলেই বোধহয় এই রকম গন্ধ বেরোয়।

—কই রে, তোর চান করা হলো?

বাইরে থেকে মা-মণি আবার তাড়া দিলে।

সুরেন বললে—এই এখ্খুনি হচ্ছে মা-মণি—

সত্যিই, হয়তো স্নান করতে অনেকক্ষণ সময় নিয়েছিল সুরেন। সাবানটা গায়ে ঘষতে ঘষতে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

আর দেরি করা চলে না। সুরেন তাড়াতাড়ি গামছা দিয়ে মাথাটা মুছে নিয়ে চিরুনী দিয়ে চুলটা আঁচড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

তারপর বারান্দা দিয়ে মা-মণির ঘরের দিকে যেতে যেতে বড় হলঘর-খানার দিকে নজর পড়তেই দেখলে, মা-মণি মেঝের ওপর বসে আছে। সামনে একটা কার্পেটের আসন পাতা। তার সামনে রুপোর রেকাবি। সেই রেকাবির ওপর সন্দেশ-রসগোল্লা মিহিদানা। নানা রকম মিষ্টি সাজানো। তার পাশে রুপোর একটা গেলাস।

সুরেনকে দেখতে পেয়েই মা-মণি ডাকলে—আয় রে আয়, এদিকে আয়—

তারপর হঠাৎ পাশের ঘরের দিকে চেয়ে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলো—কোথায় গেলি রে সুখদা, কোথায় গেলি? সুরেন এসে গেছে।—ও সুখদা মুখপুড়ি, কোথায় গেলি তুই—ও মুখপুড়ি—

সুরেন গিয়ে কার্পেটের আসনটার ওপর বাবু হয়ে বসলো।

সেই-ই প্রথম মা-মণি আর সুখদাকে কাছাকাছি থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা। সেদিনকার সেই নতুন দেখা কলকাতার মতই সেই ঘনিষ্ঠতা দিনে-দিনে কত

বেড়েছে। ... কুণ্ডু লেনের গলিটা থেকে যে-জীবন শুরু হয়েছিল, কত অলি-গলি পেরিয়ে একদিন সে-জীবন আরো কত নতুন হয়ে উঠলো। আরো কত বিস্ময়কর। সেদিনকার সেই সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের সঙ্গে আজকের সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের কত বিরোধ বাধলো, কত মিলন হলো, কত মন কষা-কষি, কত আপোস, তার হিসেব কে রেখেছে?

এখনও চোখ বুজলে চোখের সামনেই ভেসে ওঠে সুখদার সেই কথা-গুলো। সুখদা বলতো—কেন তুমি এমন করে আমাকে ঠকালে সুরেনদা? কেন তুমি আমার জীবনটা এমন করে নষ্ট করলে?

সুখদার জীবনটা শেষকালের দিকে কান্নাতেই শেষ হয়েছিল। অথচ কে যে তার সেই কান্নার জন্যে দায়ী, তাও সে বুঝতে পারতো না। অভিযোগটা যে সে করতো তা তার সুরেনদার বিরুদ্ধেও নয়, কিংবা তার স্বামীর বিরুদ্ধেও নয়। সে ভাবতো হয়তো তার কপালই তার জন্যে দায়ী। কিন্তু সুখদা তো জানতো না যে মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যে মানুষের কখনও অভাব হয় না। মানুষই একদিন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আইন তৈরি করে, আবার সেই আইনই আবার একদিন পাথর হয়ে মানুষকে পিষে থেঁতলে গুঁড়িয়ে ফেলে।

—ও মুখপুড়ি, মুখপুড়ি—

সুরেন সেই কার্পেটের আসনের ওপর তখন বাবু হয়ে বসেছিল। সামনে একটা পিলসুজের ওপর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। মিষ্টিগুলো রেকাবীর ওপর থরে থরে সাজানো। ধূপ জ্বলছে। ধূপের ধোঁয়া হেলে সাপের মত এঁকে-বেঁকে সুরেনের দিকে এগিয়ে আসছিল।

মা-মণিও একটা গরদের শাড়ি পরেছে। সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—ধনঞ্জয়কে দিয়ে তোমার জামা-কাপড়-গেঞ্জি আমি কাচিয়ে পাঠিয়ে দেব, তুমি কিছু ভেবো না।

সুরেন বললে—আচ্ছা—

—আর দেখ; এক মাস ধরে রোজ সুখদার ব্রতটা চলবে, তোমাকে যেন ডেকে পাঠাতে না হয়, তুমি রোজ এই সময়ে আসবে। রোজ-রোজ নতুন কাপড় পরবার দরকার নেই। তবে বাসি কাপড়ে তো চলবে না। সক্কাল-বেলা চান সেরে এখানে চলে আসবে। সকাল বেলা পুজো-টুজো কিছু করো?

সুরেন বুঝতে না পেরে বললে—পুজো?

—হ্যাঁ পুজো। তুমি তো জাতে বামুন। পুজো-টুজো কিছু করো না?

সুরেন বললে—করি, গায়ত্রী জপ করি—

মা-মণি বললে—ঠিক আছে, গায়ত্রী জপ করে একেবারে সোজা ওপরে চলে আসবে—

তারপর হঠাৎ বুঝি মনে পড়লো মা-মণির। মা-মণি পাশের ঘরের দিকে চিৎকার করে ডাকলে—ও সুখদা, সুখদা, কী রে, এখনও তোর সাজা হলো না?

কথা শেষ হবার আগেই সুখদা এসে হাজির। সেদিনকার সে সুখদাকে যেন আর চিনতে পারবার উপায় নেই। সেজে-গুজে একেবারে চেহারাটা বদলিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি। খানিকক্ষণ সুরেন হাঁ করে চেয়ে রইল সুখদার মুখের দিকে।

সুখদা সামনে আসতেই মা-মণি বললে—দ্যাখ দিকিনি, ছেলে কতক্ষণ বসে

আছে, আর তোর সাজতে-গুজতে বেলা পুইয়ে গেল! আয়, এই ধান দুব্বো দে ছেলের হাতে—

সামনেই একটা রুপোর রেকাবীতে ধান দুব্বো ছিল। সেটা তুলে নিয়ে সুখদা সুরেনের হাতে দিলে।

মা-মণি বললে—নাও, ওই ধান দুব্বো নিয়ে সুখদাকে আশীর্বাদ করো বাবা, ধান-দুব্বো তুলে নাও—

সুরেন আরো আড়ষ্ট হয়ে গেল। মা-মণির দিকে চেয়ে বললে—আমি আশীর্বাদ করবো?

—হ্যাঁ, তুমি ওকে আশীর্বাদ করবে, বলবে যেন ওর ভালো-ঘরে ভালো-বরে বিয়ে হয়, যেন সোয়ামী-সোহাগিনী হয় ও—

তবু সঙ্কোচ হতে লাগলো সুরেনের। বললে—বা রে, আমি কী করে আশীর্বাদ করবো?

সুখদার দিকে চেয়ে দেখলে সুরেন, মনে হলো সে যেন মুখ টিপে-টিপে হাসছে।

মা-মণি সুখদার হাসি দেখতে পেয়েই বললে—হাসিস্‌নি লো, হাসিস্‌নি, তোর হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়, অত হাসি কীসের শুনি? হাসি কীসের আছে এতে? বামুনের ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে তোকে আশীর্বাদ করতে এসেছে, আর তোর যত ন্যাক্‌রা।—দাও বাবা, ধান দুব্বো নিয়ে ওর মাথায় দাও। বলো—তোমার ভালো শ্বশুর-শাশুড়ি হোক,—বলো—

সুরেন এক চিম্‌টি ধান দুব্বো নিয়ে সুখদার মাথায় রাখলো, সুখদাও তার ভিজে চুলসুদ্ধ মাথাটা সুরেনের সামনে নিচু করে দিলে।

মা-মণি বললে—বলো, তিনবার ওই কথাগুলো বলে আশীর্বাদ করো। তিনবার করতে হয়।

তিনবারই সুরেন ওই কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করলে। হাতটা সুখদার মাথায় ঠেকাবার সময় সুরেনের মনে হলো সুখদা যেন কাঁপছে। কিন্তু কাঁপছে কেন? কীসের জন্যে কাঁপছে? ভয়ে কাঁপছে না আনন্দে কাঁপছে? কিন্তু ভয়ই বা কীসের? আর আনন্দও যদি হয় তো কীসের আনন্দ? কিন্তু সুরেন তখন নিজেই কাঁপছে। হয়তো ওটা তার মনের ভুল। হয়তো সুখদা কাঁপছে না, আশীর্বাদ করতে গিয়ে সে নিজেই কাঁপছে। আশ্চর্য! যে-মেয়েটা কদিন আগে এই মা-মণির সামনেই তাকে নাজেহাল করেছে, সেই মেয়েটাই তার সামনে তার চুলসুদ্ধ মাথাটা নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভর হয়ে বসে আছে।

—নে এবার মিষ্টির রেকাবীটা ছেলের হাতে তুলে দে।

সুখদা এবার মিষ্টির রেকাবীটা নিয়ে সুরেনের হাতে তুলে দিলে। সুরেন হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নিলে। মা মণি যেমন যেমন নির্দেশ দিচ্ছিল তেমনি তেমনিই কাজ হচ্ছিল।

মা-মণি বললে—নে, এবার ছেলেকে প্রণাম কর্‌—

সুখদা দুই হাত জোড় করে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। মা-মণি ধমক দিয়ে উঠলো—ও কি পেন্নাম করার ছিরি লো, গলায় আঁচল দিয়ে পায়ে হাত ঠেকিয়ে পেন্নাম কর্‌—

অগত্যা সুখদাকে তাই-ই করতে হলো। প্রণাম করতে করতে হাসি চেপে রাখতে পারলে না।

ধমক দিয়ে উঠলো মা-মণি—অত হাসি কীসের লা ধাড়ি মেয়ে? অত

হাসি কীসের? হাসতে লজ্জা করে না? বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, এখনও বিয়ে হচ্ছে না, তার আবার হাসি! হাসির কী আছে এতে? ভাল মানুষ পেয়ে ওকে তুই ঠাট্টা করছিস? জানিস ও বামুনের ছেলে? বামুনকে ঠাট্টা করলে পাপ হয় তা জানিসনে?

সুরেন বললে—না মা-মণি, তুমি ওকে বোকা বলো না। ওর কাছ থেকে পেন্নাম নিতে আমারই হাসি পাচ্ছে—

—ওমা—মা-মণি অবাক হয়ে গেল। বললে—থাম, বামুনের বংশে জন্ম হওয়া কি সোজা কথা নাকি? আর জন্মে অনেক পুণ্য করলে তবে বামুনের ঘরে জন্ম হয়। ওর অনেক পুণ্যির ফল যে বাড়িতে বসে তোর মত বামুনের ছেলেকে নিজের হাতে মিষ্টি খাওয়াতে পারলো। হিতসাধিনী ব্রত কি সোজা নাকি? পান থেকে চুন খসলে আর ফল ফলবে না—

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, বললে—পান কই রে, পান? ছেলেকে পান দিলিনে?

সুখদা উঠে গেল পান আনতে। উঠে গেল তো উঠেই গেল। পান আর আসে না।

সুরেন বললে—তুমি ব্যস্ত হোয়ো না মা-মণি, আমি পান খাইনে—

মা-মণি বললে—ওমা, সে কি কথা। তুই পান খাস আর না খাস, পান দেওয়া যে নিয়ম—

বলে মা-মণি ডাকতে লাগলো—ওরে, ও সুখদা, পান আনতে এত দেরি কীসের? ও তরলা—তরলা! কোথায় গেলি সব? পান কি হলো?

ততক্ষণে সব মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেছে সুরেনের। কত রকমের সন্দেশ কত ক্ষীরের খাবার, জিলিপী, রাজভোগ। অত খাবার কি তাড়াতাড়ি মা-মণির চোখের সামনে বসে বসে খাওয়া যায়? তবু যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তত তাড়াতাড়ি সেগুলো মুখে পুরে দিলে।

সুরেন বললে—সবগুলোই খেয়ে ফেললুম আমি, মা-মণি—

মা-মণি বললে—লক্ষ্মী ছেলে! ব্রতর মিষ্টি ফেলতে নেই। কালকে সকালে আবার আসবে বুঝলে? এক মাস ধরেই ব্রত করতে হয় কি না—

হঠাৎ সুরেন জিজ্ঞেস করে ফেললে—আচ্ছা, এই ব্রতের ফল ফলে?

—ওমা, ফলবে না? এই যে হিতসাধনী-ব্রত করাচ্ছি সুখদাকে দিয়ে, যদি ঠিক নিয়ম করে করতে পারে তো ভালো বরে ওর বিয়ে হবে।

সুরেন আর থাকতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—আপনি ব্রত করেছিলেন?

মা-মণি এ-প্রশ্নের জন্যে বোধহয় তৈরি ছিল না। বললে—আমি?

বলতে গিয়েও বোধহয় উত্তরটা মুখে আটকে গেল খানিকক্ষণের জন্যে! [illegible] মা-মণি নিজে এ-ব্রত করেনি।

—আমার কথা ছেড়ে দে! আমার কি মা ছিল যে আমাকে দিয়ে ব্রত করাবে। বাড়িতে তো ছিল শুধু বাবা আর ছিল ওই বাদামী। ওই যে আমার ঝি বাদামী। এখন বুড়ী থুত্থুড়ী হয়ে গেছে। আগে ওই-ই তো আমার কাছে থাকতো বরাবর। আমাকে চান করিয়ে দিত চুল বেঁধে দিত। আমি নিজেই বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আর ও তো বুড়ি হবেই। এখন কিচ্ছু কাজ-কর্ম করতে পারে না। আমার যেমন ছিল বাদামী, তেমনি এখন তরলা সুখদার কাজ-কর্ম করে দেয়—

ততক্ষণে পান সেজে নিয়ে এল তরলা।

—তোদের কি কোনও খেয়ালই থাকে না। মিষ্টির পর পান দিতে হয়, তাও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

তারপর সুরেনের দিকে পানটা বাড়িয়ে দিয়ে মা-মণি বললে—নাও, পান খাও—

সুরেন পানটা মুখে পুরে দিয়ে উঠলো।

মা-মণি বললে—কালকেও সকালে এমনি সময়ে আবার আসবে, জানলে? ভুলে যেও না যেন। যেন আবার তোমাকে ডেকে পাঠাতে না হয়।

সুরেন বললে—আচ্ছা—

বলে সিঁড়ির দিকে আসছিল।

মা-মণি বললে—তোমার ভিজে জামা-কাপড় কেচে শুকিয়ে ধনঞ্জয় তোমার কাছে দিয়ে আসবে, তুমি কিছু ভেবো না—

সুরেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আস্তে আস্তে নিচের উঠোনে চলে এল। এ যেন এক নূতন অভিজ্ঞতা। পরনে নতুন কোরা কাপড়। গা খালি, শুধু গলায় একটা সুতোর পৈতে ঝুলছে, সুরেনের মনে হলো ওই পৈতেটার জন্যেই হয়তো তার এই আজকের এত খাতির। তার নিজের জন্যে কোনও খাতির কেউ করবে না। কিন্তু যদি সে বামুনের ছেলে না হতো? যদি মা-মণিদের মত কায়স্থ হতো, তাহলে মা-মণি হয়তো এমন করে সামনে বসিয়ে মিষ্টিও খাওয়াতো না। ভাগ্যিস সে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিল। ছোট বেলা থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার মূল্য যেন এতদিন পরে এই-ই প্রথম সে হাতে হাতে পেয়ে গেল। সত্যিই, এই ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাবার জন্যে কাকে সে ধন্যবাদ দেবে? কার কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানাবে? সে কি ভগবান? কে সে ভগবান? কোথায় থাকে সেই ভগবান? কেমন দেখতে তাকে? বহুদিন আগে দেশে থাকতে একবার সুরেনের মনে হয়েছিল, ভগবানকে খুঁজে বার করবে। তখন ছোট সে। খুব ছোট। ইচ্ছে হয়েছিল কাউকে না বলে একদিন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে হিমালয়ে চলে যাবে। হিমালয়ের গুহার ভেতরে অনেক সাধু থাকে। সাধুরা গুহার ভেতরে বসে বসে ভগবানকে ধ্যান করে। ধ্যান করতে করতে একদিন ভগবানের দয়া হয়। তখন ভগবান নিজে সশরীরে এসে ভক্তকে দেখা দেয়।

কথাটা অনেক দিন নিজের মনেই গোপন রেখেছিল সে। কিন্তু একদিন বলে ফেলেছিল নিতাইকৃষ্ণ সরকারকে। সরকার-বাড়ির ছেলে, সুরেনের খুব ভাব ছিল নিতাই-এর সঙ্গে। এক সঙ্গে দু'জনে গঞ্জের ইস্কুলে পড়তে যেত। নিতাই হেসে উঠেছিল কথাটা শুনে। বলেছিল—দূর, ভগবান-টগবান কিছু নেই—

নিতাই-এর কথায় খুব রাগ হয়েছিল সুরেনের। বলেছিল—তাহলে আমার বাবা মিথ্যে কথা বলেছে বলতে চাস্? প্রহ্লাদের কথা মিথ্যে? ধ্রুবর কথা মিথ্যে?

নিতাই বলেছিল—দূর তুই একটা ছেলেমানুষ। ভগবান যদি থাকবে তাহলে আমার মা ক্যানসার হয়ে মারা গেল কেন? মা তো রোজ ভগবানকে ডাকতো, রোজ পুজো করতো, বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো হতো, সত্যনারায়ণ পুজো হতো—মা তো কোনও দোষ করেনি—

কথাটা ভাববার মত। নিতাই-এর যুক্তি কাটাবার মত কোনও যুক্তি আর সেদিন খুঁজে পায়নি সুরেন। তার পরেও অনেকবার ভেবেছিল সুরেন।

ভেবে ভেবে কোনও কূল পায়নি আর, শেষকালে ভাবা ছেড়ে দিয়েছিল সে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবা কাছাকাছি বাড়ি থেকে ফিরছিল, আর একটা গাছতলায় এসে হঠাৎ বসে পড়লো। খবরটা এনেছিল মোছলমান পাড়ার গোলাম মোল্লা। গোলাম মোল্লা গরুর গাড়ি চালিয়ে গঞ্জ থেকে আসছিল। হঠাৎ দেখে গাব-গাছতলায় কে যেন পড়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে চেহারাটা ভালো করে দেখতেই নজরে পড়লো। সান্ন্যাল মশাই না?

আর তার পরের কথা গাঁয়ের সবাই জানে।

শিরোমণি কবিরাজ দেখে বললেন—সন্ন্যাস রোগ—

ইউনিয়ন বোর্ডের নতুন এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারও এসেছিলেন। তিনি দেখে বলেছিলেন—ষ্ট্রোক্। সেদিন যুগীপাড়ার শ্মশানে বসে কিন্তু আবার সেই ভগবানের কথাই মনে পড়েছিলো কেবল। সত্যিই কি ভগবান আছে? যদি ভগবান বলে কেউ থাকে তো বাবা কেন অমন করে মরে গেল! বাবা কী পাপ করেছিল?

শেষকালে মামা খবর পেয়ে সুরেনকে গ্রাম থেকে নিয়ে চলেছিল এই কলকাতায়, এই চৌধুরী বাড়ীতে। তবে কি ভগবান শুধু দুঃখ দেয় না, আনন্দও দেয়। এই যে আজ মা-মণি তাকে খাতির-যত্ন করলে, এও তো ভগবানেরই আশীর্বাদ। নইলে গ্রামের সামান্য একটা গরীবের ছেলে হয়ে কেমন করে সে এত বড়লোকের বাড়িতে ঢোকবার অধিকার পেল! তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে সুরেন প্রথমে তক্তপোষটার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলো না। আবার উঠলো। তারপর খানিকক্ষণ অঙ্কের বইখানা নিয়ে অঙ্ক কষতে বসলো। কিন্তু একটা অঙ্কও মিললো না। তারপর বইটা বন্ধ করে একটা জামা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তার বাস-ট্রাম-গাড়ি-রিক্সা সব যেন আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুরেন ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে লাগলো নিজের মনে।

একটা জায়গায় গিয়ে দেয়ালের রেলিঙ-এ চোখ পড়তেই যেন আবার বাস্তব-জগতে ফিরে এসেছে। পর পর সার দিয়ে রঙিন সব ছবি টাঙানো। প্রথমে নজরে পড়লো শিবের ছবিটার দিকে। মাথার জটা, জটা থেকে গঙ্গা নেমে আসছে স্বর্গ থেকে। দুটো বড় বড় কেউটে সাপ মাথার দু'দিকে ফণা তুলে রয়েছে। তার পাশেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের ছবি। ঘোঁড়ার ওপর মিলিটারী পোশাকে বসে আছেন নেতাজী। ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো সুরেন। দুই হাত জোড় করে ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে নমস্কার করেই চলে যাচ্ছিল। শিব যেমন, নেতাজীও তো তেমনি। দু'জনেই মানুষ নয়, সাক্ষাৎ দেবতা।

কিন্তু হঠাৎ তার পাশের ছবিটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলো। বেশ রঙ-চঙা ছবি। একটা পুরুষ একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। নজরে পড়তেই তার সমস্ত মুখ-চোখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। ছিঃ ছিঃ, কোনও লজ্জা নেই কারো। রাস্তার ওপরেই ওটা টাঙিয়ে রেখেছে। রাস্তায় কত ভদ্রলোক কত ভদ্র মেয়েরা যাচ্ছে। যদি কারো নজরে পড়ে যায় তো কী ভাববে? তাড়াতাড়ি চোখটা নামিয়েই সুরেন আবার হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলো! ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও করে না কারো। একেবারে রাস্তার

ওপর সকলের চোখের সামনেই টাঙিয়ে রেখেছে! হয়তো কেউ দেখে ফেলেছে সুরেনকে। ভদ্রলোকের ছেলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়ার ছবি দেখছে—এটা দেখে অনেকেই হয়তো তার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছে। রাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্ছিল ট্রামে-বাসে পায়ে হেঁটে। আর তা ছাড়া যদি তার চেনা লোক কেউ দেখে ফেলে থাকে! এই সময়েই তো সবাই অফিসে যায়। অফিসে যাবারই সময় এটা।

কথাটা ভাবতে গিয়ে আবার সুরেনের কানটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। হন্ হন্ করে সোজা চলতে লাগলো সুরেন। কেন যে সে রাস্তায় বেরিয়েছিল! এতক্ষণ নিজের ঘরে বসে বসে অঙ্ক কষলে কাজ হতো।

শ্যামবাজারের মোড় থেকে সোজা এসে মাধব কুণ্ডু লেনের মুখে আসতেই থমকে দাঁড়ালো একবার।

কী মনে হলো যেন। সেই ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলোর কথা মনে পড়লো। বড় রং-চং করা ছবি।

ওদের মধ্যে নেতাজীর ছবিটাই সব চেয়ে ভাল। শিবটা যেন একটু রোগা-রোগা। কিন্তু সেই ছবিটা? সেই চুমু খাওয়ার ছবিটা! ছবিটার সবটুকু ভাবতে ভাল লাগলো সুরেনের।

বেশ ছবিটা! এক-কথায় যে লোকটা ছবিটা এঁকেছে, তার আঁকার হাত ভালো। মেয়েটার মুখটা অনেকটা সুখদার মত, বিশেষ করে চোখটা যেন অবিকল সুখদার চোখের মত। চোখের চাউনিতে দুষ্টুমি লেগে আছে।

মাধব কুণ্ডু লেনের ভেতরে ঢুকতে গিয়েও আর ঢোকা হলো না। সুরেন আশেপাশে চারদিকে ভালো করে দেখে নিলে। কেউ দেখেনি তো তাকে? না, খাবারের দোকানে তখন খদ্দের এসেছে। ও-পাশের দর্জির দোকানে তখন ঝাঁপ খোলেনি। পাড়ার দু'একজন লোক তখন বাজার করে ফিরছে। হাতে বাজারের থলি।

আর যারা হেঁটে চলেছে তারা আপিসে যাচ্ছে। ট্রাম-রাস্তায় গিয়ে বাস ধরবে।

সুরেন আবার পায়ে পায়ে উল্টোদিকে চলতে লাগলো। মাধব কুণ্ডু লেন এর মুখেই বিরাট একটা সিনেমা-হাউস। সেই ফুট দিয়েই ভিড় বাঁচিয়ে আবার সেই শ্যামবাজারের মোড়। একবার ভয় হলো সুরেনের। যদি সেই চুমু খাওয়ার ছবিটা বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকে? যদি কেউ কিনে নিয়ে গিয়ে থাকে? ভালো ছবি তো পড়ে থাকবে না?

কিন্তু না, আছে। তখনও ঠিক তেমনি সেই ভাবেই টাঙানো আছে। দোকানদার একপাশে চুপ করে ফুটপাতের ওপর বসে বসে বিড়ি টানছে। সুরেনের দিকে দেখছেই না, সুরেন একমনে ছবিটা দেখতে লাগলো। বেটা ছেলেটার মুখখানা মেয়েটা দুইহাতে ধরে পুরুষটাকে চুমু খাচ্ছে, মুখটা যেন আনন্দে ভরে গেছে। যেন কোনও দিকে খেয়াল নেই মেয়েটার। একমনে চুমু খেয়েই চলেছে।

সুরেন চোখটা ফিরিয়ে নিলে লজ্জায়। ভাবলে ওদিকে আর দেখবে না। ও-সব দেখা খারাপ। চোখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে দেখতে লাগলো। কিন্তু আবার চোখটা ঠিক ছবির দিকেই গিয়ে আটকে গেল।

দোকানদার এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে সুরেনকে।

বললে—কী? কী দেখছেন? ক্যালেণ্ডার কিনবেন?

—সুরো, ও সুরো—

ভূপতি ভাদুড়ী কাজ-কর্ম করতে করতেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সুরোটা ভেতরে অন্দর-মহলে গিয়েছিল, এখনও এল না কেন?

একবার চাকরটাকে ডাকলে—এই কে আছিস রে? কে যায় ওখান দিয়ে?

দুখমোচন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী সরকার-বাবু?—

এই, দ্যাখ তো ভাগ্নেবাবু ঘরে আছে কিনা। একবার ডেকে দে তো, বলবি সরকার-বাবু একবার ডেকেছে—

দুখমোচন ফিরে এসে বললে—ভাগ্নেবাবু ঘরে নেই সরকার-বাবু—

তারপর আরো অনেকক্ষণ পরে একবার খেয়াল হলো। সুরেনের ঘরে নিজেই চলে গেল। সুরেন নেই। সামনে দিয়ে দুখমোচনের ছেলেটা যাচ্ছিল। তাকেই ডাকলে—এই ছোঁড়া, আমার ভাগ্নেকে দেখেছিল?

ছেলেটা বললে—ভাগ্নেবাবু তো বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে গেলো—

তাই নাকি! রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। এত বেলায় আবার রাস্তায় বেরোল কী করতে? ঘরের ভেতরে নজর পড়লো—বইগুলো টেবিলের ওপর ছড়ানো, বিছানাটা এলোমেলো। বিছানার ওপর একটা চিঠির মতন কী যেন পড়ে আছে: ভূপতি ভাদুড়ী কাগজখানা নিয়ে পড়তে লাগলো। নাম ধাম নেই কারো। শুধু মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—'কাল যদি আর আসো তো তোমাকে মারবো'—

কেমন অদ্ভুত লাগলো কথাগুলো, কাকে মারবে? কেন মারবে? সুরেনকে মারবে? সুরেন কী করেছে? হঠাৎ সেই সময়ে সুরেন ঘরে ঢুকছে। ঢুকে মামাকে দেখে অবাক। মামা তার ঘরে কী করতে এসেছে?

ভূপতি ভাদুড়ী তাকে দেখেই বলে উঠলো—কোথায় গিয়েছিলি তুই? এ্যাঁ, গিয়েছিলি কোথায়? আমি তোকে খুঁজছি তখন থেকে!

তারপর হঠাৎ হাতের চিঠিটা দেখিয়ে বললে—এটা কার হাতের লেখা? কে লিখেছে? তোকে মারবে লিখেছে? কে এ?

বলে ভূপতি ভাদুড়ী চিঠিখানা ভাগ্নের দিকে এগিয়ে দিলে।

প্রথমে সুরেন নিজেও বুঝতে পারেনি। মোটা মোটা হাতের লেখা। লেখা রয়েছে 'কাল যদি আবার আসো তো তোমাকে মারবো'। ওপরেও কারোর নাম লেখা নেই, নিচেও কারো নাম সই নেই।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে—কার চিঠি রে এটা? কে লিখেছে? তোকে লিখেছে?

সুরেন বললে—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না মামা—

—বুঝতে পারছিসনে মানে? তোর ঘরে এ-চিঠি এল কী করে?

সুরেন বললে—আমি কি করে জানবো কবে এসেছে! আমি তো এই প্রথম দেখছি—

—তা তোর বিছানার ওপর চিঠিটা ছিল, আর তুই-ই দেখতে পেলিনে? আমি তখন থেকে ভাবছি সুরো মা-মণির কাছে গেল এখনও এল না কেন? তা ওপর থেকে এসে আমাকে তো খবর দিবি! কোথায় গিয়েছিলি এখন?

সুরেন বললে—এই একটু রাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিলুম।

—রাস্তায়? এই এত বেলায় রাস্তায় কী করতে গিয়েছিলি? এখন বেড়াবার সময়? হাঁ করে বুঝি রাস্তায় লোক দেখছিলি? বল্, কী দেখছিলি? বল্!

সুরেন বললে—না, লোক দেখিনি—

—তাহলে কী দেখছিলি? কলকাতার রাস্তায় দেখবার কী আছে শুনি? হাতী আছে না ঘোড়া আছে? কী আছে এখানে?

তারপর যেন আস্তে আস্তে সুর বদলে গেল। রুক্ষ চেহারাটা হঠাৎ রূপান্তরিত হয়ে মিষ্টি হয়ে উঠলো। চিঠিটা সুরেনের হাত থেকে নিয়ে গোলা পাকিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। তারপর তক্তপোষটার ওপর আয়েশ করে বসলো।

বললে—এবার বল্ ওপরে কী হলো! এই নতুন ধুতিটা মা-মণি দিলে বুঝি? দেখি, ধুতিটা দেখি, কাছে আয়—

সুরেন মামার কাছে সরে এল। ভূপতি ভাদুড়ী কাপড়ের খুঁটটি নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বললে—না, দামী ধুতি দিয়েছে রে! তা কম করে দশ টাকা দাম হবে ধুতিটার।

তারপর ধুতিটা ছেড়ে দিয়ে বললে—তা' ধুতির কথা থাক, কী বললে মা-মণি?

সুরেন বললে—বলবে আবার কী, এই ধুতিটা দিলে, আর একথালা মিষ্টি খেতে দিলে।

—আর? আর কী বললে?

—বললে রোজ একমাস ধরে সকালে গিয়ে এই রকম মিষ্টি খেতে হবে। সুখদার হিতসাধিনী ব্রত আছে কিনা। ব্রত যতদিন চলে বামুনকে প্রণাম করে মিষ্টি খেতে দিতে হয়, তাই আমাকে ডেকেছিল। আমিও বামুন কি না।

তারপর একটু থেমে সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ও মেয়েটা কে মামা? ওই সুখদা?

—তা জেনে তোর দরকার কী? কেন, কিছু বলছিল?

সুরেন বললে—না, ওর বিয়ে হচ্ছে না কিনা, তাই মা-মণি ওকে ব্রত করতে বলেছে। হিতসাধিনী ব্রত করলে ভাল বিয়ে হয় নাকি!

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—ওর বিয়ে হোক আর না হোক তাতে তোর অত মাথা-ব্যথা কেন? তুই কেন অত মাথা ঘামাচ্ছিস?

সুরেন বললে—কই আমি তো মাথা ঘামাচ্ছি না।

—মাথা ঘামাচ্ছিস না মানে? আমি জিজ্ঞেস করছি মা-মণির কথা, আর তুই কেবল ওই সুখদার কথা বলছিস। ও তো বিয়ে হয়ে গেলেই শ্বশুর-বাড়ি চলে যাবে। ও তোকে খাওয়াবে না পরাবে? ওই যে অত মিষ্টি খেলি, এই যে নতুন ধুতি পেলি, একি ভেবেছিস ওই ছুঁড়িটা দিয়েছে? ও তো সব মা-মণির দেওয়া। কোথাকার কোন্ একটা মেয়ে এ-বাড়িতে এসে আরাম করে খাচ্ছে দাচ্ছে থাকছে, ওর কপাল ভাল যে এ-বাড়িতে এসে মানুষ হয়েছে। নইলে পাড়াগাঁয়ে থাকলে এই আরাম পেতো? পড়তো কোন্ পাড়াগাঁয়ে ভূতের হাতে, তখন আরাম ঘুচে যেত—

সুরেন আস্তে আস্তে বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে বললে—মেয়েটা খুব বদ-মাইস বুঝি?

—বদমাইস মানে? হাড় বদমাইস! আদর দিয়ে দিয়ে মা-মণি ওর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে একেবারে। আমাকে জ্বালিয়ে খায় একেবারে!

—তোমাকেও জ্বালিয়ে খায়?

ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নের দিকে আপাদমস্তক ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। বললে—কেন, তোকে কিছু বলেছে নাকি?

সুরেন বললে—না, আমাকে আর কী বলবে! আমি তো ওর সঙ্গে কোনও কথা বলিনি। ওর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক!

মামা বললে—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে বেশি কথা বলবিনে। মিষ্টি খেতে দিলে মিষ্টি খাবি। বাস্, ওই পর্যন্ত। বড় শয়তান মেয়েটা! আমাকে কেবল এ-বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কি? তোমাকে তাড়াতে চায়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তাড়াতে চাইবে না? এই সম্পত্তি যে সব একলা হাত করতে চাইছে। আমি এখানে থাকতে তো সেটা পারছে না। দেখতে ছোট হলে কি হবে, পেটে পেটে যে ক্ষুদে মেয়েটার অনেক শয়তানি বুদ্ধি।

সুরেনের চোখের সামনে যেন একটা নতুন জগতের সিংহদ্বার খুলে গেল। এতক্ষণে যেন সমস্ত স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। এই জন্যেই তাকে সুখদা এত হেনস্থা করতে শুরু করেছে গোড়া থেকে। এই জন্যেই সেদিন মাঝ-রাত্রে তাকে ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অমন করে অপমান করেছে। আর চুমু খাওয়া? সেদিন কে জোর করে চুমু খেয়ে ঠেলে বার করে দিয়েছিল? সুখদা না তরলা? অন্ধকারে কিছু স্পষ্ট ঠাহর হয়নি, কিন্তু একবার সুখদাকে সন্দেহ হয়েছে, আবার একবার তরলাকে।

মামা বললে—কী ভাবছিস?

সুরেন সামলে নিলে নিজেকে। বললে—একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে-ছিলাম—

—এই দ্যাখ আমি বকে বকে মরছি, আর তুই অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কথা ভাবছিস? এই রকম করলেই হয়েছে আর কী! আমি তোকে এখানে এনেছি কী করতে শুনি? তোকে এই সব দেখতে হবে না? এই এত বড় এস্টেটের ম্যানেজারি করা সোজা কথা ভেবেছিস নাকি? তোকে সব শিখে নিতে হবে না? আমি আর ক'দিন রে?

হঠাৎ সুরেনের যেন দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। তবে কি এই জন্যেই মামা তাকে এনেছে? এই জন্যেই এত শেখাচ্ছে পড়াচ্ছে? এই সম্পত্তির ভার নিয়ে ঠিকভাবে চালাতে হবে? খানিক পরেই ধনঞ্জয় এসে খবর দিলে যে মা-মণি মামাকে ডাকছে। মা-মণির নাম শুনেই মামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। বললে—এখন যাই, তোকে যা বললুম তাই করবি—।

বলে আর দাঁড়ালো না। সোজা হন্ হন্ করে অন্দরের সিঁড়ির দিকে দৌড়লো। মামা চলে যেতেই সুরেন উঠোনের দিকে গিয়ে সেই গোলা পাকানো কাগজটা তুলে নিয়ে আবার ভেতরে এল। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে, আর একটু পরেই দুখমোচন ঝাঁট দিয়ে কাগজটা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিত। মামা কাগজটাকে টিপে-পিষে দুমড়ে ফেলে দিয়েছিল। সুরেন তক্তপোষের ওপর বসে আবার কাগজটা পাট করে সোজা করতে লাগলো। লেখাটা নষ্ট হয়নি। মাঝে মাঝে শক্ত ভাঁজ পড়েছে এই পর্যন্ত। লেখা রয়েছে 'কাল যদি আবার আসো তো মারবো।' বার বার লাইনটা পড়তে লাগলে

সুরেন। মারবে কেন? কী করেছে সে? কেন সে মারবে? আর লিখেছেই বা কে? তার নিজের নাম লেখেনি কেন? আর লিখেছে কাকে! কে এখানে তার ঘরের মধ্যে চিঠিটা রেখে গেল?

ভাবতে ভাবতে সুরেন সেই তক্তপোষের ওপরেই শুয়ে পড়লো। কীসের রাগ সুখদার তার ওপর? কেন তাকে মারবে? সে তো কিছু অন্যায় করেনি। মা-মণি যদি তাকে ডেকে পাঠিয়ে থাকে তো সে কী করবে?

কিন্তু বেশিক্ষণ শোওয়া হলো না তার। উঠে পড়লো। সকাল বেলাই তো স্নান-টান সব সারা হয়ে গেছে. শুধু খেয়ে নিলেই নিশ্চিন্ত। সারা দিনের মত নিশ্চিন্ত।

আস্তে আস্তে সোজা রান্নাবাড়ির দিকে গেল। ভেতর থেকে বেশ গন্ধ বেরোচ্ছে রান্নার। ঠাকুর তখন মাছ চাড়িয়েছে কড়ায়। সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ঠাকুর, ভাত দেবে!

ঠাকুর বললে—তা বসে যান্, ভাত বেড়ে দিচ্ছি, মাছটা ততক্ষণে হয়ে যাবে—

সুরেন একটা কাঠের পিঁড়ি টেনে নিয়ে ঘেরা বারান্দার এক কোণে বসে পড়লো। জগা একটা কাঁসার থালা আর এক গ্লাস জল সামনে রেখে দিয়ে গেল। তখনও ভাত আসেনি, কিন্তু হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই ক্যালেন্ডারের ছবিটা। শিবের ছবিটার পাশেই সেই নেতাজীর ছবি আব তার পাশেই...

—আর ভাত নেবেন ভাগ্নেবাবু?

সুরেন নজর দিয়ে দেখলে থালা ভর্তি ভাত দিয়েছে ঠাকুর। বেগুন ভাজা দিয়েছে। আর একটা বাটিতে ডাল। সুরেন ডাল দিয়ে গরম ভাতটা মাখতে লাগলো। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আবার সুকিয়া স্ট্রীটে যেতে হবে।

টাউন এ্যাকাডেমীতে যখন মামা ভর্তি করে দিয়েছিল তখন কাউকেই চিনতো না সুরেন। একেবারে দেশ থেকে প্রথম সেই কলকাতায় আসা। মাধব কুন্ডু লেন থেকে ডান দিকের ফুটপাথ ধবে সোজা সুকিয়া স্ট্রীটেব মোড়ে এসে সে রাস্তা পার হতো। প্রথম দিন কারো সঙ্গে ভাব হয়নি। কলকাতার ছেলেরা সহজে কারো সঙ্গে আগ্ বাড়িয়ে আলাপ পরিচয় করতে চায় না. সুরেনেরও তখন অত সাহস হয়নি। আলাপ হলো নেতাজীর জন্ম-দিনের উৎসবে। চাঁদা চাইতে এসেছিল সুব্রত রায়।

সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—কত চাঁদা দিতে হবে?

সুব্রত বলেছিল—এক টাকা, এক টাকার কমে হবে না। সকলের কাছ থেকে এক টাকা করে নিচ্ছি—

সুরেনের হাতে তখন টাকা তো দূরের কথা, একটা আধলাও দিত না মামা। মামা বলতো—টাকা? টাকা কী হবে? বাড়ি থেকে তো পেট ভবে ভাত গিলে যাস্ আবার টাকা নিয়ে কী করবি তুই? চিনেবাদাম ঘুগনি খাবি নাকি। ও-সব খেতে হবে না।

সুরেন বলেছিল—না. কিছু খাবো না। নেতাজী-পুজোর চাঁদা—

—কিসের পুজো?

মামা ঠিক বুঝতে পারেনি কথাটা। বললে—কী পুজো বললি?

সুরেন স্পষ্ট করে বললে—নেতাজী-পুজো।

মামা অবাক হয়ে বললে—সে কী রে, লক্ষ্মী-পুজো, সরস্বতী-পুজো.

কালী-পুজো শুনেছি, নেতাজী-পুজো আবার কী?

সুরেন বুঝিয়ে বললে—ক্লাসের ছেলেরা নেতাজী সুভাষ বোসের মূর্তি তৈরী করে তার পুজো করবে, তার জন্যে আমার কাছ থেকে চাঁদা চেয়েছে। সবাই দিচ্ছে—

মামা রেগে গেল কথাটা শুনে। বললে—সবাই দিলেই বা, তা বলে মাথা-মুণ্ডু নেই, যা-তা পুজো করলেই হলো—

পৈতের সময় সুরেনের কয়েকটা টাকা জমেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই টাকা থেকেই একটা টাকা দিয়েছিল সুব্রতকে। আর তারপর থেকেই খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। বড় খেয়ালী ছেলে ছিল সুব্রত। হঠাৎ তার মাথায় এক-একটা অদ্ভুত আইডিয়া আসে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ নেতাজী পুজো। আবার একবার খেয়াল হলো সাইকেল চড়ে বোম্বাই যাবে। মামা তো শুনে হতবাক্। এই মারে তো সেই মারে, বলে—সাইকেল চড়ে বোম্বাই যাবি? বোম্বাই কত দূর জানিস?

সেবার বোম্বাই যাওয়া হয়নি সাইকেল চড়ে, কিন্তু সুব্রত চলে গিয়েছিল। একমাস পরে ফিরে এসেছিল। ফিরে আসবার সময় ট্রেনে চড়ে এসেছিল। এসে অনেক গল্প করেছিল। কত সিনেমার স্টারদের সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই সব বললে। সকলের কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিয়েছে, তাও দেখালে।

সেদিন সুরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর কাণ্ড-কারখানা দেখে।

সুব্রত বলতো—মিস্ সুলোচনার নাম শুনেছিস? মিস্ নার্গিস? সব্বাই বলেছে আমাকে সিনেমায় নামিয়ে দেবে:

অবাক বিস্ময়ে ক্লাশের ছেলেরা সবাই সুব্রতর দিকে চেয়ে থাকতো।

সুব্রত বলতো—আর একটু বড় হতে দে আমাকে, আর চার বছর পরে নার্গিস আমাকে আবার যেতে বলেছে—বি এ-টা পাশ করেই আমি চলে যাবো বোম্বেতে—

—কিন্তু তোর বাবা-মা? বাবা-মা বোম্বাই যেতে দেবে?

সুব্রত বলতো—আরে, আমার নিজের দিদিই তো থিয়েটার করে।

সবাই অবাক হয়ে যেত সুব্রতর কথায়। বলতো—কোথায় থিয়েটার করে?

সুব্রত বলতো—কলেজে। কলেজে 'বিসর্জন' নাটকে অপর্ণা সেজেছিল—

ঠাকুর একটা মাছ দিয়েছিল। পোনা মাছের দাগা। সুরেন তাড়াতাড়ি গরম ঝোলটা ভাতের ওপর ঢেলে নিলে। সেই যে একদিন মামা ঠাকুরকে বকে দিয়েছিল, তার পর থেকে আর কখনও ভাগ্নেবাবুকে ঠকায়নি।

খেয়ে নিয়েই সুরেন উঠলো। উঠোনের এককোণে কলতলা। বাইরের লোক সবাই ওই কলতলাতেই চান করে। কলঘরটা খালি পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়ের খুঁটে জল মুছে নিলে। তারপর নিজের ঘরে এসে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো অঙ্কর বইটা নিয়ে।

বাহাদুর সিং দেখতে পেয়েই সেলাম ঠুকলে।

সুরেন বললে—দেখ বাহাদুর, যদি মামা আমাকে খোঁজে তো বলে দিও আমি সুব্রতদের বাড়ি গেছি, বুঝলে!

বাহাদুর সিং মাথা নাড়িয়ে বললে—জী—

বাহাদুর সিং লোকটা ভালো। মামাকে বলে ওর মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। অত জোয়ান মানুষ দেখায়। কিন্তু বয়েস হয়েছে। ও কর্তামশাইকে দেখেছে, মা-মণির বিয়ে দেখেছে, বিয়ের পর নতুন বউ-এর সঙ্গে গয়নার

বাক্স কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে। সে-সময়কার অনেক গল্প করে বুড়োটা। তারপর শিবশম্ভু চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহের সঙ্গে নিমতলা শ্মশানেও গিয়েছে। বলতে গেলে অশৌচও পালন করেছে বাহাদুর সিং। শিবশম্ভু চৌধুরীর ছেলে ছিল না, কিন্তু বাহাদুর সিং ছিল। শেষ সময়ে বাহাদুর সিং সেই ছেলের কাজ করেছে। এ-সব কথা বাহাদুর সিং-এর মুখেই শুনেছে সুরেন।

শুধু বাহাদুর সিং নয়। ওই বুড়োবাবুও মাইনে পায় না। শুধু খেতে পায়; তারও মাইনের ব্যবস্থা একটা করতে হবে। মামাকে বললে কিছু হবে না। বুড়োবাবুর মাইনের কথাটা মা-মণিকে বলতে হবে! বুড়ো হয়ে গেছে বলে কি মাইনেও পাবে না নাকি? তা মাইনেটা না দাও তো অন্ততঃ হাত-খরচা কিছু টাকা দাও।

—কী? ক্যালেণ্ডার কিনবেন নাকি?

সেই লোকটা তখনও বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। চলতে চলতে সুরেন কখন যে মোড়ের ক্যালেণ্ডারের দোকানে এসে পড়েছিল তার খেয়াল ছিল না। আশ্চর্য, সেই ক্যালেণ্ডারটা আর নেই। হয়তো কেউ কিনে নিয়ে গিয়েছে। সেই শিবের ছবিটা আছে, ঘোড়ায় চড়া নেতাজীর ছবিটাও আছে, কিন্তু সেখানা নেই। আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করতে লাগলো। একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করে সেই ছবিখানা কোথায় গেল। কিন্তু কী ভাববে হয়তো লোকটা। তাড়াতাড়ি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে সুরেন আবার চলতে লাগলো সুকিয়া স্ট্রীটের দিকে।

আসলে আজ থেকে যদি পেছন ফিরে সমস্ত বিগত জীবনটা দেখা যেত তো এই সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের স্পষ্ট ধারণা হতো যে কিছুই থেমে নেই—যেমন ওই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটা, যেমন ওই বুড়োবাবু, যেমন ওই সুখদা। আর যেমন ওই মা-মণি।

সেই দেবেশ। দেবেশও পড়তো তাদের ক্লাশে। সুব্রত আর দেবেশ। দুজনেই যেন উল্টো দিকে চলেছে।

দেবেশ বলতো—তুই অত সুব্রতদের বাড়ি কেন যাস, আমি তা বুঝতে পারি না ভেবেছিস?

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সুরেন চেয়ে থাকতো দেবেশের দিকে। দেবেশ ছিল গরীব ঘরের ছেলে। ময়লা জামা-কাপড় পরা। হাত-খরচের পয়সা বেশি থাকতো না তার কাছে। বই কেনবারও পয়সা থাকতো না। তবু লেখাপড়া করে যেত বরাবর। ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতো।

দেবেশ বলতো—তুই তো আমাদের দলে, তবে কেন সুব্রতদের বাড়ি যাস্?

সুব্রতর সঙ্গে তার মেলামেশাটা পছন্দ করতো না দেবেশরা। কিন্তু তবু সুব্রতর সঙ্গে না মিশেও থাকতে পারতো না সুরেন। সুকিয়া স্ট্রীটের লাল একটা বাড়ির পাশেই সুব্রতদের বাড়ি। বড়লোকের বাড়ি হলে যেমন হয়, সুব্রতদের বাড়িটিও ছিল তেমনি। প্রথম দিন সুব্রতই সুরেনকে তার

সাইকেলের পেছনে বসিয়ে তাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। সামনে একটা বাগান, বাগানটির চারপাশে লম্বা উঁচু পাঁচিল। গেট দিয়ে ঢুকে ভেতরে গাড়ি-বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে সামনেই মস্ত হল্-ঘর। হল্-ঘরের ভেতরে সোফা-কৌচ পাতা, মেঝেতে গালচে, আর দেওয়ালের গায়ে সার-সার অনেকগুলো ছবি। একটা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের, একটা মহাত্মা গান্ধীর, আর একটা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, জহরলাল নেহরু, আরও সব অনেকের ছবি।

একটা দেয়ালে সুব্রতর বাবা আর মহাত্মা গান্ধী এক সঙ্গে বসে গল্প করছে। আব একটাতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু হেসে কথা বলছে সুব্রতর বাবার সঙ্গে। কলকাতায় ' মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু অনেকবাব এসেছে সুব্রতদেব বা[illegible]

সুব্রত বলতো—মহা[illegible] ী আমাকে খুব ভালবাসতো, জানিস?

সুব্রতকে দেখে হিংসে হতো সুরেনের। কত বড়লোক তারা। কত বড় বড় লোক তাদের বাড়ি এসেছে। কত লোককে দেখেছে সুব্রত!

সব ছবিগুলো দেখতে দেখতে সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ রে, সুভাষ বোসের ছবি নেই কেন রে তোদেব বাড়িতে? সুভাষ বোস বুঝি তোদের বাড়িতে কখনও আসেনি?

সুব্রত বলতো—দূর, সুভাষ বোসেব ছবি কেন থাকবে? সুভাষ বোস তো শেষকালে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। বাবা বলেছে সুভাষ বোস দেশের শত্রু—

সুরেন কথাটা শুনে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল সুব্রতর মুখের দিকে। ব[illegible]সে—তা হলে তুই যে নেতাজী-পুজো করলি সেবারে? সেই যে এক টাকা করে চাঁদা দিয়েছিল সবাই।

সুব্রত বললে—সেই জন্যেই তো আর নেতাজী-পুজো করি না। বাবা আমাকে খুব বকেছিল বলেই তো নেতাজী-পুজো ছেড়ে দিলুম—

তা নেতাজী দেশেব শত্রুই হোক আর যাই-ই হোক, সুব্রতদের বাড়িটা কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল, সুরেনের। সেই প্রথম দিন থেকেই ভালো লেগে গিয়েছিল। মাধব কুণ্ডু লেনের মা-মণির বাড়িটার মত অগোছালো নয়। চারিদিকে বেশ সাজানো গোছানো। বাগানে খুব সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে ফুলগাছের কেয়ারি।

হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ হতেই সুরেন বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। একটা [illegible]ড়ি এসে থামলো গাড়ি-বারান্দাব তলায়। গাড়িটা থেকে একটা মেম সাহেব নামলো। নেমে পাশেব সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—মেম সাহেবটা কে রে?

সুব্রত বললে—ও আমাব দিদিকে পিয়ানো শেখাতে এসেছে—

এ-সব একেবারের গোড়ার দিকের কথা। তখন প্রথম-প্রথম দেশ থেকে এসেছে সুরেন। মাধব কুণ্ডু লেনেব বাড়িটার বাইরেও তখন মনটা উড়ু-উড়ু করে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় স্কুলে যাবার পথে যা দেখে তাই-ই ভালো লাগে দেখতে।

সেই সময়েই সুব্রতর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সুব্রতদের সাইকেল ছিল, মোটর গাড়ি ছিল। আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো তার সঙ্গে। সুব্রতর বাবাকে দেখলে। আগাগোড়া খদ্দর পরা বিরাট উকিল। উকিল ঠিক নয়, এ্যাডভোকেট। কংগ্রেসের জাঁদরেল লীডার। সুব্রতর দিদিকেও দেখলে; যে-দিদি মেম-সাহেবের কাছে পিয়ানো শিখতো।

একদিন দেবেশ একলা পেয়ে সুরেনকে ধরলে।

দেবেশ বললে—তুই সুব্রতর বাড়িতে অত যাস কেন তা আমি জানি না ভেবেছিস?

হঠাৎ কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল সুরেন। জিজ্ঞেস করেছিল - কেন যাই? কী বুঝেছিস তুই? কী জানিস?

দেবেশ বলেছিল—ওরা বড়লোক বলে—

সুরেন বলেছিল—তা ওরা বড়লোক তো আমার কী?

—আরে, বড় লোকের সঙ্গে মিশলেও তো সুখ? কি বলছিস তুই? কত কী খেতে পাস, কত কী দেখতে পাস?

সুরেন বললে—দূর! আমি কি নিজে ইচ্ছে করে ওদের বাড়ি গিয়েছি? সুব্রতই তো আমাকে সাইকেলে চড়িয়ে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছি—

দেবেশ বললে—তা আমাকেও তো নিয়ে গিয়েছিল সুব্রত, কিন্তু আমি কি তারপরে আর গিয়েছি?

—কেন? যাস না কেন?

—কেন যাবো? ওরা তো বড়লোকিপনা দেখাবার জন্যে আমাদের নিয়ে যায়। আমরা ও-রকম ঢের ঢের বড়লোক দেখেছি, কলকাতায় ওদের মত ঢের ঢের বড়লোক আছে। ওরা বড়লোক তো আমাদের কী? ওরা কি আমাদের কিছু দেবে?

তখন থেকেই বড়লোক আর গরীব লোকের তফাতটা সুরেনের মাথায় ঢুকেছিল। অথচ তার আগে কে বড়লোক আর কে গরীব লোক তা নিয়ে কখনও সুরেনরা মাথা ঘামায়নি। বড় জোর ভগবান আছে কি নেই তা নিয়ে তারা মাথা ঘামিয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল হলে জীবনে যে উন্নতি হয় তা নিয়েও কত কথা হয়েছে নিতাই-এর সঙ্গে। নিতাই সরকার। কিন্তু সেদিনই প্রথম সুরেন জানতে পেরেছিল যে সংসারে এটাও একটা সমস্যা। এই গরীব-বড়লোকের সমস্যা।

সুব্রত শুনে বলতো—দূর, তুই ওসব কথায় কান দিস্‌নি। আমরা বড়লোক বলেই ওরা হিংসে করে। কিন্তু ওরা তো জানে না আমার বাবা সাত বছর জেল খেটেছে—

প্রথমে সুরেন কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু জেল তো মহাত্মা গান্ধীও খেটেছিল। দেশবন্ধুও জেল খেটেছিল। জেলে না গেলে কি কংগ্রেসের লীডার হওয়া যায়! তখনকার দিনে তো লীডাররা সবাই জেল খেটেছিল! সুব্রতর বাবা পুণ্যশ্লোক রায় তাই জেল খাটবার পর থেকেই নামজাদা হয়ে উঠেছিল। ওকালতিতে পসার বেড়েছিল। মক্কেলের ভিড়ে সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তবু তারই ফাঁকে-ফাঁকে দেশসেবা চলতো। পার্কে পার্কে মীটিং-এ লেকচার দিত।

এম-এল-এ'ও হয়েছিল। তারপরে একেবারে মিনিস্টার। আর ছিল সঙ্গে

ম্যুলেও টাউন অ্যাকাডেমির সেক্রেটারি।

এ-সব অনেক দিনের ঘটনা। সেই সুব্রতই সাইকেল চড়ে বোম্বাই গিয়েছিল। সেই সুব্রত বোম্বাই গিয়ে ফিল্‌ম-স্টারদের সঙ্গে দেখা করেছে, আবার সেই সুব্রতই পরে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল।

কিন্তু তখন, সেই ছোটবেলার, সুরেন সুব্রতর সঙ্গেই দিনরাত মিশতো। তখন মনে করতো তারা দু'জনেই এক—একই সমাজের।

বাড়িটার সামনে গিয়ে গেটের দারোয়ানকে দেখতে পেলে না, পাশের কুঠরির ভেতরে সে বোধহয় রান্না করছে। পুণ্যশ্লোকবাবুর তখন বাড়িতে থাকবার কথা নয়। সুরেন একেবারে বাগানের রাস্তা পেরিয়ে সোজা গাড়ি-বারান্দার নিচে চলে গেল। ডান দিকে মিনিস্টার পুণ্যশ্লোকবাবুর বৈঠকখানা ঘর।

মধ্যখানে সাজানো একটা হল্‌। বাঁ পাশে সিঁড়িটার গা-ঘেষে সুব্রতর পড়ার ঘর। সেখানে বসেই অন্যদিন সুব্রত পড়া-শোনা করে।

সুরেন সেখানে যেতেই দেখলে ঘরটা খালি; সুব্রত নেই।

খানিকক্ষণ সেখানেই সুরেন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। আশেপাশে কোনও চাকরবাকরও নেই যে তাকে সুব্রতর কথা জিজ্ঞেস করে। হঠাৎ ওপর থেকে সেই মেমসাহেবটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, আর তার পেছনে সুব্রতর দিদি।

তাদের দেখে সুব্রত একটু একপাশে সরে দাঁড়ালো।

মেমসাহেবটা চলে যেতেই সুব্রতর দিদি সুরেনের কাছে এগিয়ে এসে বললে—সুব্রতকে খুঁজছো? কিন্তু সে তো বাড়িতে নেই—

সুরেন মুখে কিছু বলতে পারছে না। সুব্রতর দিদির চেহারাটার দিকে চেয়ে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। শুধু জিজ্ঞেস করলে—কখন আসবে সে?

সুব্রতর দিদি বললে—সে নিউ-এম্পায়ারে গেছে, ম্যাটিনী শো'তে। ছ'টার সময় ফিরবে।

বলে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে পেছনে ফিরে বললে—তুমি ঘরে বসবে? আমি রঘুয়াকে বলছি ঘরের চাবি খুলে দিতে—

বলে মিষ্টি গলায় ডাকতে লাগলো—রঘুয়া—রঘুয়া—

রঘুয়াকে ডাকতে ডাকতে সুব্রতর বোন ওপরে উঠে যেতে লাগলো। আর খানিকক্ষণ পরেই রঘুয়া এসে ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সুরেনকে বসতে বলে চলে গেল।

সেদিন সুব্রতর ঘরে সুরেন আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ একলা কাটিয়ে দিয়েছিল। কোথাকার কে সুব্রতর বোন। কী দরকার ছিল তার তাকে বসতে বলার? আর শুধু তো বসতে বলা নয়, খানিক পরে আবার রঘুয়াকে দিয়ে চা পাঠিয়েও দিয়েছিল। চা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সুরেন!

রঘুয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল—চা? কেন?

রঘুয়া বলেছিল—দিদিমণি চা দিতে বললে—

সুরেন বাড়িতে তখনও চা-খাওয়া ধরেনি। রোজ চা-খাওয়ার অভ্যেসও নেই তার। তবু চা দিয়ে গেল যখন তখন না-খাওয়াটা খারাপ। গরম চায়ে

বার কয়েক চুমুক দিতেই পাঁচ মিনিটে খাওয়া শেষ হয়ে গেল। খালি কাপটা মেঝের ওপর এককোণে রেখে দিয়ে সুরেন আবার চেয়ারটাতে এসে বসলো। দুপুর বেলায় ঘরের চারিদিকের জানালা বন্ধ। বেশ অন্ধকার হয়ে আছে ঘরের ভেতরটা। সুব্রতর বইগুলো সব আলমারির ভেতরে তোলা থাকতো। চারজন মাষ্টার তার। সব রকম সাবজেক্টেই তাকে তারা পাকা করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে থাকতো। আর সেই জন্যেই সুরেন এসে অঙ্ক, ইংরিজী বাঙলা বুঝে নিত সুব্রতর কাছে।

সুব্রত বলতো—জানিস, বড় হয়ে আমি বিলেত যাবো—

সুব্রতর কোনওদিন কোনও মতিস্থির ছিল না। ছোটবেলায় সিনেমা-স্টার হতে চাইতো। একটু বড় হয়ে চাইতো মিনিস্টার হতে। আরো যখন বয়েস হলো তখন চাইতো ফরেন এ্যামবাসাডর হতে। চিরকাল তার বড় হবার দিকে ঝোঁক। আরো বড়, আরো আরো বড়। একেবারে আকাশে গিয়ে সে তার মাথা ঠেকাবে।

হঠাৎ রঘুয়া ঘরে ঢুকলো একটা ডিস নিয়ে। ডিসের ওপর চারটে বিস্কুট। বিস্কুট দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সুরেন। বললে—আবার বিস্কুট দিচ্ছ কেন?

রঘুয়া বললে—দিদিমণি দিতে বললে।

সুরেন বললে—কিন্তু আমার তো চা খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আর বিস্কুট খাবো না।

রঘুয়া বললে—বিস্কুট খেয়ে নিন দাদাবাবু, নইলে দিদিমণি আমাকে বকবে।

সুরেন বললে—কেন? বকবে কেন তোমাকে?

রঘুয়া বললে—চায়ের সঙ্গে তখন বিস্কুট দিইনি বলে আমাকে খুব বকেছে, এখন এ না-খেলে আবো বকবে।

সুরেন বললে—কিন্তু আমি তো বিস্কুট চাইনি—

রঘুয়া বললে—না চাইলে কী হবে। দিদিমণিব যে হুকুম।

সুরেন বললে—কিন্তু আমি তো একটু আগেই বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে এসেছি। এখন চাও খেতাম না, তুমি দিলে বলে তাই খেলাম। এখন আর আমার ক্ষিদে নেই, তুমি যাও, ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

হঠাৎ ওপর থেকে সুব্রতর বোনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—রঘুয়া—

রঘুয়ার মুখ চোখ কী রকম ভয়ে নীল হয়ে এল। রঘুয়া বুঝতে পাবলে না সে কী করবে! বিস্কুটগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না রেখে যাবে!

বললে—ওই, দিদিমণি আবার ডাকছে!

কিন্তু সুরেনই বা কী করবে! তার মনে হলো যদি সে বিস্কুটগুলো না খায় তো রঘুয়া হয়তো দিদিমণির কাছে বকুনি খাবে। কিংবা হয়তো এই অপরাধের জন্যে তার চাকরিটাও চলে যেতে পারে। সামান্য চারখানা বিস্কুট খেলে যদি একজনের চাকরি থাকে তো কেন সে খাচ্ছে না। বিস্কুটগুলো খেলেই তো সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

বললে—দাও, দাও আমি খেয়ে নিচ্ছি—

কিন্তু ততক্ষণে সুব্রতর দিদি সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। এসে একেবারে সোজা ঘরে ঢুকেছে।

—কী রে, তোকে এত ডাকছি তুই শুনতে পাচ্ছিস না?

সুরেন রঘুয়ার হাত থেকে বিস্কুটগুলো নিয়ে নিয়েছে। বললে, ওকে তুমি বোক না। আমিই ওকে আট্‌কে রেখেছিলাম—

সুব্রতর বোন যেন প্রথমটায় হতবাক্‌ হয়ে গেল। সুরেনের কথা শুনে। তারপর বললে—কিন্তু আমি ডাকছি তখন থেকে, তবু ও সাড়া দিচ্ছে না কেন?

রঘুয়া একটা কৈফিয়ত দিতে গেল। বললে—আমি তো বিস্কুটটা দিয়েই যাচ্ছিলাম—

সুব্রতর বোন চিৎকার করে উঠলো—তা আমি তোকে একসঙ্গে চা আর বিস্কুট দিতে বললাম। তা দিসনি কেন, বল—শুধু চা দিলি কেন?

রঘুয়ার মুখে কোনও কথা নেই। ভয়ে তখন সে থর-থর করে কাঁপছে।

সুরেন বললে—তা না দিক, আমি তো চা খাই না!

দিদিমণি বললে—চা তুমি খাও আর না খাও, ওর দেখবার দরকার কী! আমি ওকে চা আর বিস্কুট নিয়ে তোমাকে দিতে বলেছি, তা ও ভুলে গেল কেন দিতে?

সুরেন বললে—যাক্‌ গে, ওকে তুমি বোক না দিদি, ওর কিছু দোষ নেই, ও ভুল করে ফেলেছে—

দিদি কিন্তু তাতেও দমলো না। বললে—কেন ভুল করবে? ও মাইনে নেয় না? এই রঘুয়া। আয় এদিকে আয়! তোকে আজকেই আমি ডিসচার্জ করে দেব—আয়—

রঘুয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—আর এমন হবে না দিদিমণি, আর অমন ভুল করবো না—

দিদি হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে রঘুয়ার কান ধরে ফেললে। তার পরে কানটা ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কানে বোধহয় তেল ছিল বলে হাত থেকে কানটা ফসকে গেল। আরো রেগে গেল দিদি।

বললে—আবার বদ্‌মায়েসী? আমার সঙ্গে আবার বদ্‌মায়েসী! আয় বলছি। শিগ্‌গির আয়—না এলে যোগীন্দর সিংকে ডাকবো বলে দিচ্ছি—

ততক্ষণে সুরেন আর থাকতে পারলে না। সে দিদির কাছে এগিয়ে গেল। আসলে তো রঘুয়ার দোষ নয়। দোষ তো সুরেনেরই। সুরেন যদি বিস্কুট-গুলো নিয়ে রঘুয়াকে ছেড়ে দিত তা হলে আর এত গণ্ডগোল হতো না। দিদির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—দেখ দিদি, ওকে তুমি মারছো, কিন্তু আমারই নিজের কষ্ট হচ্ছে, তুমি কেন আমাকে চা পাঠালে, কেন আমাকে বিস্কুট পাঠাতে গেলে? আমি গ্রামের ছেলে, আমরা কি ও-সব খাই?

—তুমি থামো তো!

বলে সুব্রতর বোন সুরেনকে ধম্‌কে উঠলো।

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি না হয় চা খাও না, কিন্তু আমি যা হুকুম করবো, তা ও শোনে না কেন? আমি তো আগেই ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছি ও কি এই প্রথম গাফিলতি করেছে? ওকে আমি আজ ডিসচার্জ করে দেবই—আয় তুই, আয়—

সামান্য একটা ঘটনায় কী হয়ে গেল, আর মাঝখান থেকে সুরেনের বড় লজ্জা করতে লাগলো। ওদিকে চেঁচামেচি শুনে বাড়ির অন্য চাকর-বাকরও এসে পড়েছে সামনে। যোগীন্দর সিং গেট ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ওপাশে বাগানের এক-কোণে খিড়কীর দিক থেকে কয়েকজন উঁকি মারছে।

—এই তোরা কী দেখছিস্ রে? তোরা কী দেখছিস্ ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তারপর যোগীন্দর সিং-এর দিকে চেয়ে বললে—যোগীন্দর সিং, একে গেটের বাইরে বার করে দাও তো, ইসকো নিকাল দেও—আমি ওকে ডিস্চার্জ করে দিলুম আজ থেকে—নিকাল দেও ইস্কো—

রঘুয়া তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে। ক'দিন আগেই সে হয়তো দেশ থেকে এসেছিল, কলকাতা শহরে নোক্রির খোঁজে। কলকাতার বড়লোকদের বাড়িতে একটা চাকরি পেয়ে গেলে চিরকালের মত তার ভাবনা চুকে যেত। তারপর আস্তে আস্তে তার নিজের ভাই-বোন আত্মীয়স্বজনদেরও কলকাতায় নিয়ে আসতো। কিন্তু তা আর হলো না। সুরেনকে উপলক্ষ্য করেই, হঠাৎ একটা নিরীহ গরীব মানুষের চাকরি চলে গেল ভেবে তার বড় দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু সে-ই বা কী করতে পারে? কে তার কথা শুনবে? সেই দুপুর বেলা, সমস্ত কলকাতা যখন ঝাঁ ঝাঁ করছে, সমস্ত কলকাতার লোক যখন যার-যার নিজের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত তখন সকলের চোখের আড়ালে একটা লোক তার একমাত্র আশ্রয় ছেড়ে আবার হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠবে। কেউ জানবে না কোন অপরাধে তার চাকরি গেল। কে তার চাকরি খেলে।

যোগীন্দর সিং হুকুমের চাকর। সে তখন রঘুয়ার ঘাড় ধরে তাকে গেটের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে গেট দিয়ে ঢুকলো সুব্রত, সুব্রতকে দেখে ধড়ে যেন প্রাণ এল সুরেনের। সুব্রত স্কুটার চালিয়ে ভেতরে ঢুকে ভিড় দেখে অবাক। আরো অবাক ভিড়ের এক কোণে সুরেনকে দেখে।

—কী রে, তুই? এখানে কী হয়েছে?—রঘুয়া কী করেছে যোগীন্দর সিং? ওকে ধরেছিস কেন?

সুব্রতর দিদি এগিয়ে গেল। বললে—আমি ওকে ডিস্চার্জ করে দিলাম। কিচ্ছু কাজ পারে না।

সুব্রত বললে—কিন্তু এই তো সবে নতুন এলো, এরই মধ্যে তাড়িয়ে দিলি তুই?

সুব্রতর দিদি বললে—না, ওর দ্বারা কাজ হবে না, ওকে দিয়ে আমি কাজ চালাতে পারবো না—

সুব্রত তত্‌ক্ষণে রঘুয়াকে যোগীন্দর সিং-এর কবল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—মন দিয়ে কাজ করিস না কেন? কী করেছিলি তুই?

দিদি বললে—ছেড়ে দিচ্ছিস কেন ওকে? ওকে আমি কিছুতেই রাখবো না।

সুব্রত বললে—তুই না রাখিস, আমি রাখবো। এবার থেকে আমার কাজ করবে ও—আয়, আয়, তোর জানাশোনা কেউ আছে কলকাতায়?

রঘুয়া বললে—হুজুর, আমি নয়া আদমী—

সুব্রত বললে—তাহলে তুই থাক, এবার থেকে তুই আমার কাজ করবি—

সুব্রতর দিদি এতক্ষণ সব দেখছিল। এবার সামনে এগিয়ে এল। বললে—আমি ওকে তাড়িয়ে দিলুম আর তুই ওকে তবু রাখবি?

সুব্রত বললে—বেশ করবো রাখবো, তোর কী?

হঠাৎ রেগে গেল সুব্রতর দিদি। বললে—না, কিছুতেই রাখতে পারবি না তুই ওকে আমি বলছি তুই ওকে রাখতে পারবি না।

—হ্যাঁ রাখবো, কী করবি তুই কর না।

সুব্রতর কথা শুনেই দিদি হঠাৎ রাগের মাথায় সুব্রতর গালে এক চড় মারলে। মারতেই যেন প্রলয়-কাণ্ড ঘটে গেল! চারদিকে চাকর-বাকর দারোয়ান-ঠাকুর-ঝি সকলের সামনেই তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল ভাইবোনে।

সুরেন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সব দেখছিল শুনছিল। এতদিন এ-বাড়িতে এসেছে. এতদিন সুব্রতর সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু এমন ঘটনা কোনও দিন ঘটেনি। সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। একেবারে সোজা গিয়ে সুব্রতর হাত দুটো ধরে ফেললে।

বললে—সুব্রত থাম,—থাম—

সুব্রতকে কিন্তু তখন থামানো দায়। সুব্রতর দিদিও আর থামতে চায় না। সে ভাই-এর চেয়ে বয়সে বড়। সকলের সামনে তাকে অপমান করেছে তার ছোট ভাই। এটা অসহ্য। হঠাৎ একটা ঘুঁষি এসে সুরেনের নাকের ওপর পড়তেই কেমন যেন সব ঠাণ্ডা হয়ে এল। কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো কাছাকাছি থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সুরেনের মনে হলো তার মাথাটা যেন ঘুরছে। সে সেখানেই পড়ে গেল।

সুব্রত রেগে গেল দিদির ওপর। চেঁচিয়ে বলে উঠলো—কেন তুই সুরেনকে মারলি? ও তোর কী করেছে?

কিন্তু সুব্রতর দিদির মুখে তখন আর কোনও কথা নেই। সে আর সেখানে দাঁড়ালো না। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

সুরেন অনেক কষ্টে তখন নিজেই উঠে দাঁড়ালো।

সুব্রত বললে—কী রে, খুব লেগেছে তোর?

সুরেনের তখন লজ্জা করছিল। চারদিকে লোকজন সবাই দেখছে তাকে। সকলের চোখের সামনেই সুব্রত তাকে ধরে নিয়ে তার নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে—চল্, ঘরে গিয়ে বসবি চল্—

তারপর একটা সোফার ওপর বসিয়ে বললে—দেখি, কী রকম লেগেছে! দিদিটা ভীষণ বদমাইস হয়েছে আজকাল। বাবাকে বলে দিতে হবে। একটু চা খাবি?

সুরেন আস্তে আস্তে বললে—তুই সিনেমায় গিয়েছিলি?

সুব্রত বললে—না রে, সিনেমায় তো গিয়েছিলুম, কিন্তু টিকিট পেলুম না বলে ফিরে এলুম।

তারপর বাইরে চেয়ে ডাকলে—এই রঘুয়া—রঘুয়া—

রঘুয়া এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোটবাবুর ডাক পেয়েই ভেতরে ঢুকলো। সুব্রত তার দিকে চেয়ে বললে—এই, ওপরের ফ্রিজ থেকে একটু বরফ আনতে পারবি?

রঘুয়া কিছুই বুঝতে পারলে না। বোবার মত হাঁ করে চেয়ে রইল সুব্রতর দিকে। সুব্রত বিরক্ত হয়ে বললে—তুই একটা আস্ত হাঁদা, সাধে কি দিদি তোর চাকরি খতম করে দিয়েছিল? ফ্রিজ্ চিনিস না? ফ্রিজ্ রে ফ্রিজ্? যাতে জল ঠাণ্ডা হয়।

তারপর কোনও উপায় না পেয়ে সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—ওর দ্বারা হবে না, আমাকে নিজেই যেতে হবে! রঘুয়া নতুন এসেছে তো, তাই এখনও কিছু কাজ শেখেনি। আমি তোর জন্যে একটু বরফ নিয়ে আসছি। তোর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, নাকটা ফুলে উঠেছে—

সুরেন বললে—কেন আমার জন্যে আবার কষ্ট করবি। তোর দিদি হয়তো আবার রাগ করবে—

সুব্রত রেগে গেল। বললে—কেন, রাগ করবে কেন?

সুরেন বললে—না, আসলে আমার জন্যেই তো সব ব্যাপারটা ঘটলো। আমাকে বিস্কুট দিতে ভুল না করলে তো রঘুয়ার চাকার যেত না, তার চেয়ে আমি বাড়ি চলে যাই—সেই ভালো—

সুব্রত বললে—না রে, সে-জন্যে রঘুয়াকে তাড়ায়নি! আসলে কী হয়েছে জানিস? আসলে রঘুয়াটাকে আমিই একদিন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে বাড়িতে চাকরি দিয়েছিলুম। ওকে দেখতে ভালো নয় সেই জন্যেই দিদির যত রাগ ওর ওপর। গোড়া থেকেই ওকে তাড়াবার চেষ্টা করছিল দিদি—রঘুয়াটার চেহারা ভাল নয় সে কি রঘুয়ার অপরাধ? তুই-ই বল্—

সুরেন অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—তোর দিদি খারাপ চেহারা দেখতে পারে না?

সুব্রত বললে—না, যাদের দেখতে খারাপ তাদের দিদি দুচক্ষে দেখতে পারে না।

সুরেনের কেমন ভয় করতে লাগলো। তারও তো চেহারা খারাপ। হয়তো সুব্রতর দিদি সেই জন্যেই তাকেও দেখতে পারে না। এতদিন সুব্রতদের বাড়িতে আসছে, এতদিনের মধ্যে একদিনও সে সুরেনের সঙ্গে কথা বলেনি, সুরেনের দিকে ফিরে চেয়েও দেখেনি। তার জন্যে হয়তো তার এই খারাপ চেহারাটাই দায়ী। কিন্তু তাই-ই যদি হবে তাহলে তাকে বসতে বলে চা পাঠিয়ে দেবারই বা কী দরকার ছিল? চা-ই যদি পাঠিয়ে দিয়েছিল তো বিস্কুট না দেওয়াতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল?

সুব্রত হঠাৎ লক্ষ্য করলে ভালো করে।

বললে—তোর নাকটা খুব ফুলে গেছে রে! ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ছে আবার—তোর মামা যদি জিজ্ঞেস করে তো কী বলবি?

সুরেন বললে—মামার জন্যে ভাবছি না।

—তাহলে? তাহলে কার জন্যে ভাবছিস? তোদের বাড়িতে আবার আর কে আছে তোর?

সুরেন বললে—আছে ভাই অনেক লোক। যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়িতে একটা মেয়ে আছে। সে রোজ ব্রত করে—

—ব্রত? কীসের ব্রত? ব্রত করে কেন?

সুরেন বললে—হিতসাধিনী ব্রত। যাতে ভালো বরের সঙ্গে বিয়ে হয় সেই জন্যে ব্রতটা করে। আমাকে কালকে সকাল বেলাও আবার তার কাছে গিয়ে তাকে আশীর্বাদ করতে হবে। আমি বামুন কিনা, তাই আমাকেই আশীর্বাদ করতে হয়। এমনি একমাস যেতে হবে—

হঠাৎ বাইরে গেট খোলার শব্দ হলো। সুব্রত সেদিকে চেয়ে দেখলে। বললে—ওই বাবা এসে গেছে—

সুরেনও দেখলে সুব্রতর বাবার গাড়িটা ঢুকছে বাগানের রাস্তায়! সেই খদ্দর পরা চেহারা। মাথায় গান্ধী টুপি। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি। বিরাট গাড়িটা এঁকেবেঁকে ভেতরে ঢুকে ঠিক বৈঠকখানার সামনে এসে থামলো।

সুব্রত বললে—তুই বোস, আমি তোর জন্যে বরফ এনেই বাবাকে সব বলছি। দিদিটা বড় আনরুলি হয়ে গেছে—

বলে সুব্রত বাইরে বেরিয়ে গেল।

পুণ্যশ্লোক রায় সুকিয়া স্ট্রীটের আদি বাসিন্দা। শোনা যায় এককালে তাঁর ঠাকুমা মুড়ি ভেজে পেট চালিয়েছে। তখন কলকাতার এমন রমরমা অবস্থা ছিল না। দিনের বেলাও ওই পুব দিকের বস্তির কাছটাতে শেয়াল ডাকতো। কিন্তু অবস্থা ফিরলো পুণ্যশ্লোক রায়ের বাবার আমল থেকেই। অবস্থা ফেরার একমাত্র কারণ ওই ওকালতি ব্যবসা। তিনি ওকালতি ব্যবসার গূঢ় রহস্যটা এমন ভাবে রপ্ত করে নিয়েছিলেন যে টাকা-পয়সা আধুলি-সিকি যেন আকাশ ফুঁড়ে আসতে লাগলো। আর টাকার মতন জিনিস যখন একবার আকাশ ফুঁড়ে আসতে শুরু করে তখন কারো সাধ্য নেই যে আকাশের সেই ফুটো ছিপি এঁটে বন্ধ করে। আর অত দূরে হাত পৌঁছুবেই বা কার?

তিনি প্রচুর দানধ্যানও করেছিলেন। তখন কংগ্রেসের গোড়ার দিক। শেষ বয়েসে পাড়ার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। জেল-টেল খেটেছিলেন। বিলিতি-কাপড়ও পুড়িয়েছিলেন, চরকায় সুতো কেটে সেই সুতো দিয়ে ধুতি তৈরি করিয়ে নিয়ে পরেছিলেন।

তারপর এল ছেলের আমল। ছেলে পুণ্যশ্লোক বড় হয়ে বাপের পেশাতেই হাত পাকাতে লাগলেন। বাপের সুবাদে কংগ্রেসের কর্তাদের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তারপর প্রথমে পাড়ার সার্বজনীন দুর্গাপুজোর প্রেসিডেন্ট, পাড়ায় সংস্কৃতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী। এই রকম করে করে ধাপে ধাপে যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাড়তে লাগলো তেমনি ওকালতিতেও পসার বেড়ে যেতে লাগলো হু-হু করে।

কিন্তু গ্রামের ছেলের কাছে সুব্রতদের আদি ইতিহাস অবান্তর। কেমন করে কারা বড়লোক হলো, সৎপথে থেকে না অসৎপথে থেকে পয়সা হলো তা জানবার আগ্রহ কারই বা থাকে। লোকে শুধু দেখে বাড়ি, গাড়ি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান। কেমন করে কোথা থেকে কী ভাবে তা হলো তা জানবার দরকার কী?

সেদিন সুব্রতদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সুরেনের সেই কথাই কেবল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কী চমৎকার ওদের বাড়িটা, কী চমৎকার ওর বাবা, কী চমৎকার ওর দিদিটা।

সুব্রত বাবার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলেছিল। পুণ্যশ্লোকবাবু শুনে বললেন—ডাকো তো দেখি কী-রকম মেরেছে। তোমার বন্ধুকে ডাকো তো একবার—

সুব্রত এসে বললে—চল্ তোকে বাবা একবার ডাকছে—

—আমাকে? কেন?

—তুই চল্ না। বাবাকে দেখাবো দিদির কাণ্ডটা—

সুরেন বললে—কিন্তু, আমার যে ভয় করছে—

—ভয় কীসের রে? চল্, চল্, দেখবি বাবা খুব ভালো লোক। কত লোক বাবার কাছে দেখা করতে আসে, বাবা কত লোকের উপকার করে! বাবাকে তুই চিনিস না। কত বছর জেল খেটেছে বাবা তা জানিস?

পুণ্যশ্লোকবাবুকে সুরেন আগে অনেক বার দেখেছে। টাউন

এ্যাকাডেমির সেক্রেটারি ছিল আগে পুণ্যশ্লোকবাবু। যেবার প্রথম এম-এল-এ হলেন সেবার সমস্ত স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল সেক্রেটারির সম্মানে। তারপর যেবার মিনিষ্টার হলেন সেবার আর একবার ছুটি হলো। সমস্ত ইস্কুলের ছেলেদের লুচি-মাংস খাওয়ানো হলো।

ইস্কুলের সেই সতেরো শো ছেলে সার বেঁধে খেতে বসে গেল ইস্কুলের লম্বা বারান্দায়। কত পাঁঠা কাটা হলো, কত ময়দা মাখা হলো। বড় বড় লোহার কড়ায় লুচি ভাজা হতে লাগলো। সবাই খুব খুশী।

কিন্তু বেঁকে বসল দেবেশরা।

দেবেশ বললে—আমাদের ঘুষ দিচ্ছে সেক্রেটারি—আমরা খাবো না—

সুরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল দেবেশদের কথা শুনে! ঘুষ বলছিস কেন? লোকে বড় হলে সবাইকে তো খাওয়ায়।

দেবেশ বললে—আমরা কি বাড়িতে খেতে পাই না যে, আমাদের খাওয়াচ্ছে সেক্রেটারি?

সুরেন বললে—সেক্রেটারি তো নিজের পয়সা খরচ করে খাওয়াচ্ছে। ইস্কুলের পয়সা তো নষ্ট করছে না।

কিন্তু দেবেশরা সে কথায় কান দিলে না। তারা বলতে লাগলো অন্য কথা। সে-সব কথা কল্পনাও করা যায় না। সেক্রেটারি নাকি কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল ইস্কুলের টাকায়। ইস্কুলের সামনে যে বাগান হয়েছে তার জন্যে কত খরচ হয়েছে জানিস? পনেরো হাজার টাকা! আসলে খরচ হয়েছে পাঁচশো টাকা, বাকিটা সমস্ত সুব্রতর বাবার পকেটে গিয়ে ঢুকেছে। সুব্রতদের ওই বাড়িটা তৈরি হয়েছে কাদের টাকায়? ইস্কুলের টাকায়। ইস্কুল তো একরকম লাভের ব্যবসা রে! ইস্কুলের ব্যবসার মত ব্যবসা নেই। সব চেয়ে লাভের ব্যবসা হলো মঠের ব্যবসা, তারপরেই হলো ইস্কুল। কিন্তু সব লোক ভাবে, সেক্রেটারি বুঝি ইস্কুল করে দেশের সেবা করছে।

আশ্চর্য আজ ভাবলে অবাক হতে হয় সেই ছোটবেলাতেই দেবেশ অত কথা কী করে শিখেছিল! কোথায়, কার কাছে শিখেছিল?

বাড়িতে যেতে যেতে রাস্তায় সেই কথাই কেবল ভাবছিল সুরেন। সমস্ত জিনিসটাই যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে বুকের ওপর গিয়ে বিঁধছিল। সুব্রতর কাছে অঙ্ক বুঝে নিতেই গিয়েছিল সে। কিন্তু কী দুর্বিপাকে সমস্ত কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

পুণ্যশ্লোকবাবুর সামনে গিয়ে সুরেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। একে বড়লোক তায় ইস্কুলের সেক্রেটারি, তার ওপর মিনিস্টার। পুণ্যশ্লোকবাবু একলা ছিলেন না। ঘরে আরো অনেক লোক তাঁকে ঘিরে বসে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা সুব্রতর কাছে আগেই হয়তো শুনেছিলেন তিনি। সুব্রত পরিচয় করিয়ে দিলে—এই দেখ বাবা, এই-ই সুরেন—

অনেক কাজের মানুষ সুব্রতর বাবা। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁর সময় নেই।

একবার দেখে নিয়েই বললেন—কে মেরেছে? পমিলি?

সুব্রত বললে—হ্যাঁ, দিদি—

—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পমিলিকে বকে দেবো, এখন তোমরা যাও। আমি একটু কাজে ব্যস্ত আছি—

কিন্তু সুব্রত নাছোড়বান্দা। বললে—না বাবা, তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা

করতেই হবে। দিদি কেন আমার বন্ধুকে মারবে? দিদি কেন রঘুয়াকে তাড়াবে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা তুমি তো রঘুয়াকে রেখে দিয়েছ। সে থাক। তাকে তাড়াবার রাইট তো পর্মিলির নেই।

—কিন্তু এই সুরেন? এ আমার বন্ধু, একে কেন মারবে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ওকে তো মারবে বলে মারেনি। তোমার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে ওর নাকে লেগে গিয়েছে।

তারপর সুরেনের দিকে ফিরে বললেন—তোমার পুরো নাম কী?

সুরেন বললে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল।

—কোথায় থাকো?

সুরেন বললে—মাধব কুণ্ডু লেনে, চৌধুরীদের বাড়িতে—

—চৌধুরীদের বাড়িতে? শিবশম্ভু চৌধুরী তো অনেকদিন মারা গেছেন। এখন কে-কে আছে তাঁর?

সুরেন বললে—এখন শিবশম্ভু চৌধুরী মশাই-এর একমাত্র মেয়ে আছে। তিনিই মালিক। তাঁর আর কেউ নেই।

—তোমার সঙ্গে চৌধুরীদের কী সম্পর্ক!

সুরেন বললে—আমার মামা ভূপতি ভাদুড়ী ওই বাড়ির এস্টেট-ম্যানেজার। আমার মা-বাবা কেউ নেই, তাই মামার কাছে থেকেই লেখা-পড়া করি।

সুরেনের কথাগুলো শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছু বললেন না। তারপর হঠাৎ বললেন—ভালো করে লেখা-পড়া করবে, জানলে? লেখা-পাড়াটাই আসল। বাজে বদ ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবে না। আজকালকার ছেলেরা বড়দের মানতে চায় না। বড়দের সামনেই সিগারেট-বিড়ি খায়। ও-সব কখনো করবে না—

সুব্রত বাধা দিয়ে হঠাৎ বললে—ও বিড়ি-সিগারেট খায় না বাবা। ও চা-ও খায় না—

—তুমি থামো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি, ও উত্তর দেবে; তুমি ইন্‌টার-ফিয়ার কোর না।

তারপর সুরেনের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন—একদিন তোমরাই তো দেশের নাগরিক হবে, একদিন এই দেশ-চালানোর ভার তোমাদেরই হাতে তুলে নিতে হবে। এখন থেকেই তো তার শিক্ষা চলবে। এখন থেকেই বড়কে সম্মান করতে শিখবে, বড়র হুকুম মানতে শিখবে, তবে তো নিজে একদিন বড় হবে। কেউ বড় হয়ে জন্মায় না। এটা ডেমোক্রেসির যুগ। এ-যুগে কেউ বড় নয়, কেউ ছোটও নয়। যার যার নিজের-নিজের গুণে বড় হতে হয়। তবেই অন্য লোকেরা তোমাকে বড় বলে মানবে। বুঝলে?

তারপর আবার একটু থেমে কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। কী-সব কথা বলতে লাগলেন কার সঙ্গে। সুরেনের মনে হলো খুব যেন জরুরী কথা সব হচ্ছে। মিনিস্টার মানুষ। বাজে কথা বলবার তো সময় নেই তাঁর। তারপর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। সুরেন অস্বস্তি বোধ করছিল। নাকটায় ব্যথাও হচ্ছিল খুব। একটু-রক্ত পড়ছিল তখনও।

পুণ্যশ্লোকবাবুর কথায় যেন তার চমক ভাঙলো। পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—বাড়িতে গিয়ে ওষুধ লাগাবে, বুঝলে? এখনও নাক দিয়ে তোমার রক্ত পড়ছে দেখছি—

এরপর আর বেশি কথা হয়নি। যখন সুব্রতদের বাড়ি থেকে চলে আসছে, যোগীন্দর সিং গেট-এ দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেন সেদিকে না চেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ রঘুয়া দৌড়তে দৌড়তে বাইরে এসে তাকে পেছন থেকে ডাকলে—সুরেনবাবু, সুরেনবাবু—

সুরেন পেছন ফিরে রঘুয়াকে দেখে অবাক। রঘুয়া তখন কাছে এসে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—আপনাকে একবার দিদিমণি ডাকছে—

দিদিমণি! আরো অবাক হয়ে গেল সুরেন। বললে—কোন দিদিমণি?

—আজ্ঞে পর্মিলি দিদিমণি!

একবার ভাবলো সুরেন, তাকে আবার ডাকছে কেন? আবার কী বলবে? আর যদি ডেকেই থাকে তো রঘুয়াকে দিয়ে ডাকছে কেন? এই একটু আগেই যে রঘুয়াকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল পর্মিলি দিদিমণি! এরই মধ্যে কি তবে আবার সব মিটমাট হয়ে গিয়েছে? আশ্চর্য, রঘুয়ার মুখে-চোখে তো সে-অপমানের চিহ্নটুকুও নেই। লেখাপড়া জানে না, তার ওপর গরীব লোক, এরা সহজেই ভুলে যায়।

রঘুয়া বললে—চলুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন—

সুরেন বললে—তোমার দাদাবাবু কোথায়? সুব্রত দাদাবাবু? দাদাবাবু জানে যে দিদিমণি আমাকে ডেকেছে?

রঘুয়া বললে—দাদাবাবু তো বাবুর ঘরে রয়েছে।

সুরেন তবু দ্বিধা করতে লাগলো। বললে—কী জন্যে দিদিমণি ডেকেছে, তুমি জানো?

রঘুয়া বললে—না—

সুরেন বললে—বলোগে যাও, আমি এখন যেতে পারবো না, আমার সময় নেই। বলে সুরেন হন্ হন্ করে ট্রাম-রাস্তার দিকে এগোতে লাগলো।

রাত্রে আর মামার সঙ্গে দেখা হয়নি। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটার মধ্যে ঢুকে সুরেন সোজা নিজের ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল। দরজা-জানলা বন্ধ করে ছোট কাঠের ফ্রেমের আরশিটার মধ্যে নিজের মুখখানাকে দেখেছিল অনেকক্ষণ। তার পর যখন সন্ধ্যে হয়েছিল তখন আর কোথাও বেরোয়নি।

সেই সময়েই বাড়ির ভেতরটা বড় নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। সারাদিনের খাটুনির পর ভূপতি ভাদুড়ী তখন হিসেবের খাতাখানা নিয়ে আবার বসে। তারপর হিসেব-নিকেশ মিলিয়ে গা-হাত-পা মুছে আহ্নিক করতে বসে। তারপর যখন রান্নাবাড়ি থেকে খবর আসে যে খাবার তৈরি তখন খেতে যায়। গরম-গরম লুচি বেশ আরাম করে খেতে খেতে ভূপতি ভাদুড়ী খুশী হয়ে প্রশ্ন করলে—ভাগ্নেবাবু আজ খেয়েছে ঠাকুর?

ঠাকুর বলে—আজ্ঞে না—ডাকবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বলে—না না, ডাকতে হবে না। সামনে পরীক্ষা আছে কিনা, তাই মন দিয়ে লেখা-পড়া করছে আর কি!

তারপর যখন আরো একটু বেশি রাত হলো, ভূপতি ভাদুড়ীর ঘরের আলো নিভলো, তখন সুরেন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাবাড়ির

দিকে গেল। গিয়েই দেখলে সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু বুড়োবাবু ঝুঁকে বসে খাচ্ছে।

সুরেনকে দেখতে পেয়েই বুড়োবাবুর মুখে যেন আশার আলো দেখা গেল। বললে—এই যে ভাগ্নেবাবু, এই দেখ, কী দিয়ে খাচ্ছি দেখ—

ভাগ্নেবাবুকে দেখে ঠাকুর ভাত বেড়ে দিয়েছিল। হঠাৎ বললে—সরকার-বাবু এই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল এখুনি—

সুরেন বললে—কেন, আমার কথা জিজ্ঞেস করছিল কেন? আমি তো বাহাদুর সিংকে বলে গিয়েছিলুম কোথায় যাচ্ছি—

বুড়োবাবু বললে—আর ভাত নেই ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—এই তো ভাত দিলুম আপনাকে? আর কত ভাত খাবেন, এবার উঠুন—

বুড়োবাবু কাতর গলায় বলতে লাগলো—দে বাবা, আর দুটো ভাত দে, পেট ভরেনি মোটে। ওই ক'টি ভাত খেয়ে কি বুড়ো মানুষের পেট ভরে রে?

সুরেন বললে—দাও না ঠাকুর, বুড়োমানুষ ভাত খেতে চাইছে, আর দুটি ভাত দাও না।

ঠাকুর বললে—শুধু ভাত দিলে তো হবে না, ভাত দিলেই আবার ডাল চাইবে, ডাল দিলেই আবার দুটো ভাত চাইবে। আজ কি আমি বুড়োবাবুকে নতুন দেখছি? শেষকালে পেটের ভারে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না, তখন দু'জনে মিলে ধরে তুলে ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

বুড়োবাবু সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—দেখলে তো বাবা কেমন করে ওরা আমাকে! কেউ মানতে চায় না। শেষকালে কোন্‌দিন দেখবে ঘরের ভেতরে না খেতে পেয়ে চিত্তির হয়ে আছি। তখন কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তোমাদেরই মড়া পোড়াতে হবে।

সুরেন বললে—আমি আপনার কথা মা-মণিকে বলবো বুড়োবাবু। কাল সকালেই তো আমার সঙ্গে মা-মণির দেখা হবে!

—তাই নাকি? তুমি বলবে?

বুড়োবাবু যেন বিগলিত হয়ে গেল সুরেনের কথা শুনে। বললে—আর একটা গামছার কথা তোমার মা-মণিকে বলে দিও বাবা। একখানা গামছাতে আর আমি চালাতে পারছি না। সেই গেল বোশেখ মাসে এইখানা দিয়েছিল, এখনও এটা টেনে টেনে চালাচ্ছি, তা জানো?

সুরেন বললে—না, আমি আপনার মাইনের কথা বলবো। সবাই মাইনে পায়, তা আপনিই বা পাবেন না কেন?

বুড়োবাবু বললে—মাইনে না দিক, মাসোহারাও তো দিতে পারে—কী বলো?

সুরেন বললে—যা' হোক একটা কিছু দেওয়া ওদের উচিত—

বুড়োবাবু বললে—তা তুমি একটু বলে দিও বাবা—এমন ভাবে বলবে যাতে কেউ জানতে না পারে—

আর দেরি না করে সুরেন উঠে পড়লো। তারপর কলতলায় গিয়ে হাতটা ধুয়ে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। সারা দিন পরিশ্রম গেছে। সারাদিন পড়াও হয়নি, বিশ্রামও হয়নি। কোথা দিয়ে যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিনগুলো। কী করে যে পাশ করবে কে জানে। অথচ পাশ না করলে মামা বকবে—এতগুলো টাকা মাসে মাসে নষ্ট হচ্ছে তোর জন্যে, আ তুই

কেবল আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছিস?

বিছানায় শুয়েও ভয় ভয় করছিল। হঠাৎ যদি মামা আসে। যদি এসে জিজ্ঞেস করে, কী রে, এত সকাল-সকাল আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লি যে? কেমন যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল সুরেনের। তবু প্রাণপণে চোখ বুজে থেকে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো সে। সুব্রতর দিদিটা কেনই বা আবার তাকে ডাকছিল, কে জানে। দেবেশ যে তাকে সুব্রতদের বাড়িতে যেতে বারণ করেছিল সে হয়তো তার ভালোর জন্যেই। অথচ সুব্রতর ঠিক বেছে বেছে কি আজই সিনেমায় যেতে হয়? অন্ধকারে সদরের গেটটা বন্ধ হবার শব্দ হলো। ঠিক এই সময়েই রোজ বাহাদুর সিং দরজাটা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করার সময় লোহার চাকার কেমন একটা ঘড় ঘড় শব্দ হয়। তারপর আর একটু পরে ঝাঁটা দিয়ে রান্নাঘর ধোয়ার খর খর শব্দ হবে। তারপর দুখমোচনের ঘরের দিকে কাদের নাক-ডাকার শব্দও কানে আসবে। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনের ওপর গড়া-গড়া শুয়ে পড়ে। তারপর ভোর হওয়ার আগেই আবার জেগে ওঠে। তখন উঠোন ধোওয়ার পালা।

হঠাৎ দরজায় যেন টোকা পড়লো একবার।

কান খাড়া করে উঠলো সুরেন।

আবার একবার টোকা।

—কে?

সুরেন তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতেই দেখে, ঘোমটা দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে তরলা।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—তরলা না?

তরলা বললে—হ্যাঁ, আমাকে দিদিমণি পাঠিয়ে দিয়েছে—

—কোন দিদিমণি?

তরলা বললে—সুখদা দিদিমণি। তোমাকে কাল সকাল-বেলা আর ওপরে যেতে হবে না।

সুরেন বললে—কিন্তু মা-মণি যে রোজ সকালে যেতে বলে দিয়েছে। বলেছে একমাস ধরে সুখদার ব্রত চলবে।

তরলা বললে—না, একমাস ধরে ব্রত চলবে না।

বলে তরলা চলেই যাচ্ছিল। সুরেন বললে—মা-মণি এখন জেগে আছে?

তরলা পেছনে ফিরেই বললে—মা-মণির অসুখ হয়েছে, দেখা হবে না— বলে অন্ধকারের মধ্যে তরলা সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। একবার ভাবলে তরলাকে ডাকবে। ডেকে জিজ্ঞেস করবে মা-মণির কী অসুখ, কখন থেকে অসুখ। ভাবলো আরো জিজ্ঞেস করবে এখন কেমন আছে।

যদি মা-মণির অসুখ হয়েই থাকে তো সংসার কে দেখবে। মা-মণিই তো সংসারের মালিক। আর সুখদা? সুখদা যে তাকে যেতে বারণ করেছে, সে-কথা কি মা-মণি জানে? মা-মণিকে জানিয়ে বারণ করেছে?

সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই অনেক প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল মাথার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। কোনও উপায়ই নেই আর কাউকে জিজ্ঞেস করবার। তরলা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্ধকারের ওপারে। শুধু অন্দর-মহলের [illegible] সদর গেটটা বন্ধ করবার একটা কর্কশ আওয়াজ কানে আসতেই [illegible] যেন সম্বিৎ ফিরে এল। সুরেন [illegible] নিজের ঘরের ভেতরে [illegible]।

এসে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিলে।

সকাল বেলাই মা-মণি ডাকলেন—বাদামী—

বাদামী এল। মা-মণি বললেন—হ্যাঁ রে, আজ ভাগ্নেবাবু এসেছিল? তরলাকে একবার ডাক তো—

খানিক পরে তরলাও এল। তরলা এসেই জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছেন মা-মণি?

মা-মণি সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, ভাগ্নেবাবু এসেছিল?

তরলা বললে—হ্যাঁ মা-মণি।

—সুখদা ভাগ্নেবাবুকে ফল-মিষ্টি দিয়েছিল?

তরলা বললে—হ্যাঁ মা-মণি, দিয়েছে—

—কোনও অসুবিধে হয়নি তো? আমি শুয়ে পড়ে রইলুম। অনুষ্ঠান সব ঠিক-ঠিক করেছিলি তো তোরা?

তরলা বললে—হ্যাঁ মা-মণি, আপনি কিছু ভাববেন না! কোনও গোলমাল হয়নি। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম আমি—

মা-মণি যেন কী ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটু ভেবে বললেন—তা সুরেন আমার কথা জিজ্ঞেস করলে না? সে জানে যে আমার অসুখ?

তরলা বললে—হ্যাঁ মা-মণি, আমি আপনার অসুখের কথা বলেছি ভাগ্নেবাবুকে—

মা-মণি বললেন—তা কই, আমার সঙ্গে তো একবার দেখা করে গেল না!

তরলা কিছু উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

মা-মণি বললেন—তুই যা, তুই এখন যা এখান থেকে—

মা-মণি একটু পরে আবার ডাকলেন—ওরে তরলা, সুখদাকে একবার ডেকে দে তো—সুখদা কী করছে?

তরলা বললে—সুখদা দিদিমণি এখন খাচ্ছে—

মা-মণি বললেন—খাওয়া হলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিবি—যা—

তরলা চলে গেল। মা-মণি বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলেন। মনে হলো সমস্ত সংসারটা যেন তাঁর অসুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। এতদিনের সংসার, এত যত্নের সংসার এত সাধের সংসার যেন তার অসুখের সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে শুরু করেছে। কবে একদিন শিবশম্ভু চৌধুরীর আমলে একটা মেয়ে হয়ে এই সংসারে জন্ম নিয়েছিল লাবণ্যময়ী, সেদিন কে জানতো যে এখানে এই বাড়িতেই তার সারাটা জীবন কেটে যাবে।

গায়ে হলুদের সময় যে-শাড়িটা লাবণ্যময়ী পরেছিল, মনে আছে, সেই শাড়িটার পাড়ের ওপর লেখা ছিল 'পতি পরম গুরু'। ন'মাইমা গায়ের ওপর হলুদ লাগিয়ে দিয়ে বলেছিল— লাবির বরের এই রকম হলুদ রং হোক— তাহলে লালে হলুদে মিলবে ভালো। বড় জ্যাঠাইমা বলেছিল—হলুদ রং হবে কেন গা, রঙ হবে দুধ-বরণ। দুধ-বরণ বর আর সোনার-বরণ কনে তবে তো

মানাবে ভালো। ন'মাইমা বলেছিল—না বড়দি, দুধ-বরণ বর হওয়া ভাল নয়, দুধ-বরণ বর হলে পেতনীর নজর লাগে। বড় জ্যাঠাইমা বলেছিল—পেতনীর নজর লাগতে দিলেই হলো ওমনি, আমাদের লাবি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে না পেতনীকে! কী রে লাবি, পেতনীকে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে পারবি না?

বামুনের মেয়েকেই প্রথম গায়ের হলুদটা লাগাতে হয়। ন'মাইমার পাশের বাড়ির বামুন-বৌদি এসেছিল গায়ে হলুদ দিতে। বলেছিল—যদি হয় ফরসা বর, তবে মেয়ের শূন্য ঘর। কে একজন বললে—তা লাবির যা রূপ দিদি, লাবিকে ফেলে ওর বর আর অন্য দিকে নজর ফেরাতেই পারবে না—

—অমন অলক্ষুনে কথা বোল না বৌদি। দাদা অনেক কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লাবির জন্যে বর আনছে, ঠাকুর মশাই বলেছে একেবারে রাজযোটক মিল।

সত্যিই সে ছবিগুলো যেন চোখের ওপর ভাসে সব সময়। ওই বাদামীর সব মনে আছে। বাদামীটাই ছিল তখন একেবারে বলতে গেলে আপনজন। মা তো ছিল না, শিবশম্ভু চৌধুরীর স্ত্রী ছিল না বলে তিনি বলতেন—মা, যখন মনে যা হবে আমাকে বোল—কোনও কথা বলতে লজ্জা কোর না—

লাবণ্য বলেছিল—আমি আর কী বলবো বাবা! আমি চলে গেলে তোমাকে কে দেখবে, আমি কেবল তাই-ই ভাবছি—

বাবা বলেছিলেন—আজ থেকে আমার কথা আর ভেবো না মা তুমি—আমি ভালো পাত্রের হাতে তোমাকে তুলে দিয়েছি, এখন থেকে তোমার সব দায়িত্ব রাধানাথের—

লাবণ্যর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বাবা মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—তোমাকে আমি গোত্রান্তর করে দিয়েছি মা, এখন তো তোমার ওপর আমার আর কোনও অধিকার নেই। তুমি এখন পাথুরেঘাটার দত্তবাড়ির বউ—

লাবণ্যময়ীর মাথায় ঘোমটা দেওয়া তখনও ভালো করে অভ্যেস হয়নি। বাবার কথার উত্তরে কোনও কথা বলেনি সে। শুধু বাবার পায়ের দিকে চেয়ে একটা অজানা সুখে থর-থর করে কাঁপছিল। অথচ কীসের যে সুখ তাও সে বুঝতে পারেনি। আসলে সুখ না বলে তাকে রোমাঞ্চ বলাই ভালো। বাসর ঘরে বরের পাশে বসে মা-মণির বুকের ভেতরটা যেন কেমন করেছিল। সেটা যে কী তা সে সেদিন নিজেও বুঝতে পারেনি।

দূর সম্পর্কের শালীরা সব বাসর ঘর জুড়ে ফূর্তি করছিল।

কে একজন বলেছিল—কই, একটা গান গান্—

রাধানাথ দত্ত বড়লোকের ছেলে। সোনার কার্তিকের মত চেহারা। সেও লজ্জায় জড়সড় হয়ে এক পাশে বসেছিল। শালীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখন।

বললে—গান আমি জানি না—

একজন শালী বলেছিল—তবে যে জ্যাঠামশাই বলছিলেন আপনি গান জানেন—

রাধানাথ বলেছিল—সত্যিই বিশ্বাস করুন, আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি গান জানিনে-

লাবণ্যর মনে হচ্ছিল যদি সে গান গাইতে পারতো তো ভালো হতো। আজকে এই উৎসবকে চিরকালের মত স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে একটা গান সে গাইতো। কিন্তু তারও তো তখন গা কাঁপছে, গলা কাঁপছে, বুক কাঁপছে।

বরের মুখখানা দেখবার জন্যে বার বার লোভ হচ্ছে। বাদামীর কাছে অনেক কথা সে শুনেছে। বরের একখানা ফোটোও সে দেখেছে। কিন্তু শুধু একবার মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল সেই ছবির সঙ্গে আসল মানুষটার চেহারার মিলটা কতখানি। আড়চোখে শুধু নজরে পড়ছিল একখানা হাত। হাতটা ফর্সা। অল্প-অল্প লোম সে হাতের ওপর। বেশ শক্ত মজবুত চেহারার মানুষটা, সেটা হাতটা দেখলেই বোঝা যায়। হাতের পাঁচটা আঙুলে কয়েকটা আঙটি। হীরে, পান্না, কত রকম পাথরের আঙটি।

হঠাৎ চারদিকে হাসির শব্দ উঠতেই লাবণ্য যেন চমকে উঠলো। মনে হলো কী যেন একটা হাসির কথা বলেছে একজন, আর সবাই হেসে উঠেছে সেই কথা শুনে। বাসর-ঘর জীবনে একবারই আসে। একবারের জন্যেই বাসর ঘরে সকলের সঙ্গে হাসিতে গানে রাত কাটিয়ে দিতে হয়। তবু আশ্চর্য সেই বাসর-ঘরের ভেতর থেকেও কেন যে ভয় করছিল মা-মণির কে জানে! কীসের ভয় কাকে ভয় কে তা বলতে পারে? বাবার মুখখানাই কেবল মনে পড়ছিল বার বার। সে চলে গেলে বাবা এ-বাড়িতে একলা থাকবে কী করে। আর লাবণ্যই বা বাবাকে ছেড়ে কেমন করে সেখানে গিয়ে থাকবে?

বাদামীই অভয় দিয়েছিল সেদিন। বাদামীই বাসর-ঘরের আশেপাশে পাহারা দিচ্ছিল সারাক্ষণ। আস্তে আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন। শিবশম্ভু চৌধুরীর বাড়ির তেতলার বড় ঘরখানাতে বাসর-ঘর সাজানো হয়েছিল। সেই বাদামী আজ চোখে ভাল দেখতে পায় না। সেই বাদামীই আজ হয়ত ভুলে গেছে সে-সব কথা।

মাসিমা বলেছিল—অ বাদামী, তুই একটু চোখ মেলে বসে থাকিস বাছা, আমি ঘুমোতে গেলুম—

বাদামী বলেছিল—আপনি যান, আমি আছি এখেনে—

সেই বাদামী আজ ভাল চোখে দেখতে পায় না। সেই বাদামীই আজ গতর নিয়ে অস্থির। একটু না ঘুমোলে মাথা ধরে। খাওয়ার গোলমাল হলে হাঁসফাঁস করে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গো, কেমন আছ বাদামী?

উত্তরে বাদামী বলে—যতক্ষণ গতর ততক্ষণ ভাত-কাপড়—

তা কথাটা মিথ্যে নয়। বাদামীর এখন গতর নেই, তাই কথায়-কথায় খোঁটা খেতে হয় মা-মণির কাছে। অথচ বাসর-ঘরের ভেতরে যখন লাবণ্যর খুব ভয় করেছিল তখন ওই বাদামীই বাসর-ঘরের দরজার বাইরে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল।

আর শেষকালে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন জেগে ছিল শুধু লাবণ্য আর রাধানাথ। পাথুরেঘাটার দত্তবাড়ির ছেলে রাধানাথ দত্ত!

সত্যি, রাধনাথ শুধু নামেই রাধানাথ নয়, রূপেও রাধানাথ। যেমন লাবণ্য তেমনি রাধানাথ। এমনিতে বাসর-ঘরে বর-কনের কথা বলা নিয়ম নেই। তবু কথা বলেছিল রাধানাথ। অনেকদিন আগেকার কথা। তবু সমস্ত মনে আছে মা-মণির। এই রকম এক-একটা অসুখ হলেই সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে মা-মণির।

রাধানাথ প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?

খুব চুপি-চুপিই কথাগুলো বলেছিল রাধানাথ। পাছে কেউ শুনতে পায়। তা শুনতে পায়ওনি কেউ।

—কই, কিছু বলছো না যে?

এর উত্তরে কী যে বলতে হয় তাও তখন জানতো না লাবণ্যময়ী। অনেকবার প্রশ্ন করার পর লাবণ্য বলেছিল—আমাকে পছন্দ হয়েছে?

রাধানাথ উত্তর দিয়েছিল—খুব—

আশ্চর্য, কখন কেমন করে কোন দিকে যে মানুষের জীবনের মোড় ঘোরে তা বোধহয় তার সৃষ্টিকর্তাও বলতে পারে না। নইলে সেই বাসর-ঘরের পরের দিনের পরের দিন ফুলশয্যার রাত্রে অমন বিপর্যয় কেনই বা ঘটবে?

—মা-মণি!

হঠাৎ কার গলার আওয়াজ পেয়ে সমস্ত স্বপ্ন যেন চুরমার হয়ে গেল।

মা-মণি বললে—কে রে?

তরলা সামনে এসে দাঁড়াল।

—কি রে তরলা? কী বলছিস?

তরলা বললে—মা-মণি, বুড়োবাবু এসেছে, একবার দেখা করতে চাইছে আপনার সঙ্গে—

—বুড়োবাবু? কেন? আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কেন? বল্‌গে, আমার সঙ্গে দেখা হবে না এখন, আমার শরীর খারাপ—

তরলা বললে—বলেছিলুম আপনার শরীর খারাপ, তবু শুনছে না—

মা-মণি বললেন—যদি না শোনে তো বাহাদুর সিংকে খবর দিয়ে বাইরে বের করে দিতে বলে দে—

তরলা বললে—একটিবার দেখা করুন না মা-মণি, বলছে আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে—

—তবু আমার কথা শুনছিস্ না? বলছি যে আমি এখন দেখা করবো না। আমার শরীর খারাপ—

এতক্ষণে তরলা আর দাঁড়ালো না। সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় এল। তারপর বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির দরজার সামনে এসে দেখলে বুড়োবাবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

তরলাকে দেখেই বুড়োবাবু বললে—কী গো তরলা, হুকুম দিয়েছে মা-মণি?

তরলা বললে—না, মা-মণি বললেন এখন দেখা হবে না—

বুড়োবাবুর মুখটা যেন শুকিয়ে গেল কথাগুলো শুনে।

বললে—তা তুমি আমার কথাগুলো ভালো করে বুঝিয়ে বলেছিলে?

তরলা বললে—হ্যাঁ গো বুড়োবাবু, বলেছি, কিন্তু মা-মণি না শুনলে আমি কী করবো বলো তো? শেষকালে আমাকে যদি জবাব দিয়ে দেয়! আমি তো হুকুমের ঝি বই আর কিছু নই—

বুড়োবাবু খপ্ করে তরলার হাত দুটো ধরে ফেললে।

বললে—তোমার পায়ে পড়ি তরলা, তুমি একটু মা-মণিকে বুঝিয়ে বলো গিয়ে আর একবার। আর একখানা গামছা না দিলে আমার আর চলছে না—এখানা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। বাইরের লোকের কাছে এটা পরে আর বেরোতে পারি নে—

তরলা বললে—ছি ছি, করো কী, করো কী, আমার হাত ছেড়ে দাও—

বুড়োবাবু বললে—তাহলে কথা দাও, আর একবার মা-মণিকে গিয়ে বলবে?

তরলা বললে—মা-মণি তোমার সঙ্গে দেখা করবে না বুড়োবাবু, তোমার ওপর রেগে আছে—তুমি বরং সরকার-বাবুকে গিয়ে বলো।

—ওরে বাবা, সরকার-বাবুকে বললে সরকার-বাবু আমাকে মেরে খুন করবে!

তরলা বললে—তাহলে ভাগ্নেবাবুকে গিয়ে বলো না!

বুড়োবাবু বললে—ভাগ্নেবাবুকেই তো মা-মণিকে বলতে বলেছিলাম। তা, ভাগ্নেবাবু যে বললে মা-মণির খুব অসুখ। ভাগ্নেবাবুর তো আজকে ওপরে আসার কথা ছিল—

তরলা বললে—তা ভাগ্নেবাবু আজ ওপরে আসেনি কেন?

বুড়োবাবু বললে—আমারই কপাল। ভাগ্নেবাবু বললে আজকে নাকি ওপরে আসার কথা ছিল, কিন্তু আসতে নাকি বারণ করে দিয়েছে।

—কে আসতে বারণ করে দিয়েছে? আমি? আমার নাম করেছে ভাগ্নেবাবু?

বুড়োবাবু ভয় পেয়ে গেল। বললে—না মা, তোমার নাম করবে কেন? ভাগ্নেবাবু তেমন মানুষ নয়। সরকার-বাবুটা মানুষ ভাল নয়, কিন্তু ভাগ্নেবাবু লোক ভাল। বলেছে, মা-মণিকে বলে আমার মাইনের বন্দোবস্ত করে দেবে! তা হ্যাঁ মা, একবার না-হয় আমাকেই মা-মণির কাছে যেতে দাও। আমি মা-মণির সামনে না-হয় নিজের দুঃখুটাই বলি গিয়ে—

তরলা বললে—তুমি এখন যাও বাপু, আমার অনেক কাজ—শেষে তুমি ওপরে উঠে এসেছ দেখতে পেলে আমাকেই মা-মণি দুষবে—

বুড়োবাবু বললে—তা হলে এক কাজ করো না, তোমাদের গামছা-টামছা কিছু পড়ে নেই? দাও না আমাকে, সত্যি বলছি, একখানা গামছাতে আমার কুলোয় না—

তরলা আর পারলে না। বললে—তুমি যাও দিকিনি এখান থেকে! তোমার সঙ্গে আর বাজে কথা বলতে পারি না—তুমি যাও—বলে বুড়োবাবুকে ঠেলে বাইরে বার করে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ভূপতি ভাদুড়ীর গলা শোনা গেল—কে রে ওখানে? কে? বুড়োবাবু?

বুড়োবাবু সরকার-বাবুর গলার আওয়াজ পেয়েই ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

—কি? তুমি যে একেবারে বলা-নেই-কওয়া-নেই, ওপরে উঠে এসেছ? বলি ভয়-ডর কিছু নেই তোমার? কে তোমাকে ওপরে উঠতে দিয়েছে শুনি? কার হুকুমে ওপরে উঠেছ?

বুড়োবাবু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বললে—আমি আর করবো না সরকার-বাবু। আমি নিচেয় চলে যাচ্ছি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা বললে চলবে না, বলো ওপরে উঠেছিলে কোন সাহসে? আমি তোমাকে বলে দিয়েছি না যে, কোনওদিন ওপরে উঠতে পারবে না।

বুড়োবাবু হঠাৎ বলে ফেললে—শুনলাম মা-মণির খুব অসুখ, তাই—

ভূপতি ভাদুড়ী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো—মা-মণির অসুখ তো তোমার কী? মা-মণির অসুখের জন্যে তোমার কেন এত মাথা-ব্যথা? তুমি কে? তোমাকে ঘর দেওয়া হয়েছে, তুমি সেখানে থাকবে, আর খাবার সময় ভাত খেতে পাবে। ওপরে ওঠবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

বুড়োবাবু আর কথা না বলে নিচেয় নেমে আসছিল। ভূপতি ভাদুড়ী

বললে—খবরদার বলছি, আর যদি কখনও ওপরে ওঠো তো তোমার বে-আদবি আমি ভেঙে দেব, এই বলে রাখছি—

বুড়োবাবু সে-কথার প্রতিবাদ না করে নেমেই আসছিল, কিন্তু ওদিকে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। ওপর থেকে হঠাৎ মা-মণির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—কে? কার সঙ্গে কথা বলছো ভূপতি?

ভূপতি ভাদুড়ী ওপরের দিকে চেয়ে দেখলে মা-মণি অসুস্থ শরীর নিয়ে নিচের দিকে চেয়ে আছে।

—এই দেখুন মা-মণি, আমি পই-পই করে বলে দিয়েছি বুড়োবাবুকে যেন ওপরে আপনার কাছে না আসে, কিন্তু কিছুতেই কথা শোনে না। আবার উঠে চলে এসেছে—

মা-মণি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন—তা জিজ্ঞেস করো তো ভূপতি, কী জন্যে এসেছিল।

জিজ্ঞেস আর করতে হলো না। বুড়োবাবু নিজেই ভেউ-ভেউ করে নিজের দুঃখের কথা বলতে চেষ্টা করলে। বললে—আমি একখানা গামছা চাইতে এসেছিলাম...

কথার মাঝখানেই ধমকে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী—থামো তুমি। আমি তোমাকে বলেছি না গামছা পাবে না—

ম-মণি বললে—কেন, কবে শেষ গামছা দেওয়া হয়েছিল ওঁকে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এই তো পুজোর সময় গামছা দিয়েছি, আমার হিসেবের খাতায় লেখা আছে, এত ঘন-ঘন গামছা ছিঁড়লে কাঁহাতক পারবো আমরা? আমরা তো এখেনে দান-ছত্তোর খুলে বসিনি—

মা-মণি বললে—আর ধুতি? ধুতি দেওয়া হয়নি?

ভূপতি ভাদুড়ী টপ্ করে বলে উঠলো—হ্যাঁ হ্যাঁ, ধুতিও দেওয়া হয়েছে বুড়োবাবুকে। আমার খাতায় লেখা আছে সব, পুজোর সময় গামছা দিলুম আর ধুতি দিলুম না, তাই কখনও হয়? হিসেবের খাতায় আমার সব লেখা আছে মা-মণি। আনবো হিসেবের খাতা? আপনাকে দেখাবো?

বুড়োবাবু বলে উঠলো—কই, ধুতি তো আমি পাইনি? কখন ধুতি পেলুম?

—মিছে কথা বোল না বুড়োবাবু, মিছে কথা বললে তোমার জিভ খসে যাবে। এই মিছে কথা বলে বলেই তোমার আজ এত দুর্দশা! মিছে কথা বললে পাপ হয় তা জানো না?

বুড়োবাবু তখন যেন তোতলা হয়ে গেছে। বললে—ধুতি পেলে তো আমি টের পেতুম সরকার-বাবু, ধুতি তো...

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ন্যাকামী রাখো তোমার। দেখলে তো মা-মণি, আবার কত ন্যাকামী জানে বুড়োবাবু! বলে কিনা ধুতি পায়নি।

মা-মণি বললে—যে আখখুটে মানুষ, হয়তো ধুতি ছিঁড়ে ফেলেছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাই হবে মা-মণি। বুড়োমানুষ, ছিঁড়ে ফেলেছে, এখন ভুলে গেছে। আমি হাতীবাগানের বাজার থেকে নিজে গিয়ে চাকর-বাকরদের ধুতি শাড়ি কিনে এনেছি, আর আমি ভুলে যাবো? তুমি যাও, যাও নিচেয় যাও। যা বলবার আমাকে গিয়ে বলবে, ওপরে এসে মা-মণিকে বিরক্ত করো কেন? জানো না মা-মণির অসুখ?

বলতে গেলে ভূপতি ভাদুড়ী একরকম জোর করেই বুড়োবাবুকে নিচেয়

পাঠিয়ে দিচ্ছিল। ওপরে মা-মণির দিকে চেয়ে বললে—আপনি চলে যান মা-মণি, আমি একে নিচেয় দিয়ে আসি, বুড়োমানুষ, চোখে দেখতে পায় না, পড়ে গেলে রক্তকাণ্ড হয়ে যাবে শেষকালে—

কিন্তু তার আগেই নিচের দিক থেকে সুরেন সোজা ওপরে সিঁড়ির মাঝখানে উঠে এসেছে।

সেখানে দাঁড়িয়েই সুরেন বললে—কিন্তু মা-মণি, আমি জানি বুড়োবাবুর ওই একখানা গামছা ছাড়া আর কিছু নেই—

সিঁড়ির ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত যারা-যারা দাঁড়িয়ে ছিল সবাই চমকে উঠেছে ভাগ্নেবাবুর কথায়।

ভূপতি ভাদুড়ীই প্রথমে কথা বললে—তুই আবার এখানে এলি কী করতে? তোর পড়াশুনো নেই? তোর সামনে না এগ্‌জামিন?

বুড়োবাবুর যেন একটু আশা হলো। সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—তুমি একটু বলো না বাবা, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। এরা...

কিন্তু সকলের কথাকে থামিয়ে দিলেন মা-মণিই। বললেন—সুরেন, তুই আয় এদিকে। আমার কাছে আয়, শোন—

সুরেন কিন্তু গেল না মা-মণির কাছে। সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে বললে—কিন্তু কেন তুমি বুড়োবাবুকে একটা ধুতি দেবে না মা-মণি? দেখছো না একটা গামছা পরে আছে। একখানা গামছাতে মানুষের চলে? বুড়োমানুষ হয়ে গেছে, এখন একটা গেঞ্জিও নেই যে গায়ে দেয়, তোমার একটু মায়াও হয় না?

—তুই থাম তো, বড় সর্দার হয়ে গেছিস!

বলে ভূপতি ভাদুড়ী নিজের ভাগ্নেকে সামলাতে গেল। কিন্তু মা-মণি ডাকলে। বললে—তুই আয় এদিকে, আমার কাছে আয়—শোন্, শুনে যা—

তারপর ভূপতির দিকে চেয়ে বললে—ভূপতি তুমি একটা গামছা কিনে দিও ওকে—আর একজোড়া ধুতি—

ভূপতি ভাদুড়ী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে-কথায় মা-মণি কান দিলে না। সুরেন ওপরে যেতেই তাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

নিচেয় এসে ভূপতি ভাদুড়ী যাচ্ছেতাই করে বলতে লাগলো বুড়োবাবুকে। বললে—এত বড় শয়তান, আমার নামে চুক্‌লি খেতে গেছ তুমি মা-মণির কাছে? তুমি ভেবেছ আমার নামে চুক্‌লি খেয়ে তুমি পার পাবে? দেব না তোমাকে গামছা, দেব না তোমাকে ধুতি, দেখি কী করতে পারো তুমি—যাও—

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে কোথাও যেন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় বলে কিছু ছিল না বুড়োবাবুর। সরকার-বাবুর বকুনি খেয়ে মাথা নিচু করে আবার তার নিজের কোটরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু বাইরে নিজের দফ্‌তরে এসে ভূপতি ভাদুড়ী গজরাতে লাগলো। যত সব বেআক্কেলে ছেলে হয়েছে—নিজের ভালো নিজে না বুঝলে আমি কী করতে পারি। আমি আর ক'দিন রে বাপু? তোর বাপ-মা কেউ নেই। তোর ভালোর জন্যেই তোকে এখেনে এনে তুলেছিলুম। তুই-ই যদি অবুঝের মত কাজ করিস তো আমার কী? আমার বয়ে গেছে। আমার আর ক'দিন!

হঠাৎ বাইরে ধনঞ্জয়কে দেখা গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী ডাকলে—এই ধনঞ্জয়, শোন্, শুনে যা ইদিকে—

ধনঞ্জয় কোনও কাজে যাচ্ছিল। এসে বললে—কী ম্যানেজারবাবু?

ভূপতি ভাদুড়ী জিজ্ঞেস করলে—কী রে, ওপরে এখন কী হচ্ছে রে? আমার ভাগ্নে কোথায়? সেই সুরেন? কী করছে সে?

ধনঞ্জয় বললে—ভাগ্নেবাবু তো মা-মণির ঘরে রয়েছে দেখলুম—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে তো জানি! তা কী করছে সেখানে বসে বসে? মা-মণির তো অসুখ —কী কথা বলছে?

ধনঞ্জয় বললে—তা জানি না। দেখলুম মা-মণি বিছানার ওপর শুয়ে আছে, আর ভাগ্নেবাবু পাশে বসে বসে গল্প করছে—

জীবনে এমন ঘটনা বোধহয় কচিৎ-কখনো ঘটে। চোখের সামনে যাকে দেখি, চোখের আড়ালে গেলে তাকে কেমন দেখতে লাগে তার নমুনা সব সময় পাওয়া যায় না। তাই সেদিন চোখের আড়াল থেকে দেখা মা-মণিকে চোখের সামনে থেকে দেখে বড় অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই মানুষটিকেই সবাই এতদিন ভুল করে ভয় করে এসেছে। সুরেনও এতদিন মা-মণিকে ভয় করেই এসেছিল, কিন্তু সেদিনই প্রথম যেন প্রথম ভালোবাসতে পারলো।

বেশ বড় একখানা ঘর। ঘরের মধ্যেখানে একখানা সেগুন-কাঠের বোম্বাই খাট। খাটের মাথার দিকে কাঠের ওপর ফুল-লতা-পাতার নকশা খোদাই করা। খাটের ওপর পুরু গদীর ওপর বিছানা পাতা।

মা-মণি একটুখানি পরিশ্রম করেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। নিজের ঘরে গিয়েই বিছানার ওপর শুয়ে পড়লো। পরনে ধপধপে সাদা থান ধুতি, গায়ে একটা সাদা সেমিজ। সমস্ত চেহারাটার মধ্যেই যেন পবিত্র শোকের চিহ্ন মাখানো।

এ-ঘরে সুরেন আগে কখনও আসেনি। এটাই মা-মণির শোবার ঘর। দেয়ালে দুটো বড়-বড় অয়েল-পেন্টিং। একটা শিবশম্ভু চৌধুরীর আর একটা মা-মণির মায়ের।

মা-মণি বললে—তুই বিছানার ওপর উঠে বোস, আরাম করে বোস—

সুরেন আড়ষ্ট হয়ে চেয়ারের ওপরই বসে ছিল। বললে—না থাক্, আমি তো বেশ আরাম করেই বসে আছি—

মা-মণি বললে—ওই তোর বড় দোষ, কথা শুনিস নে কেন?

এরপর আর বলতে হলো না। সুরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে খাটের একপাশে বসলো।

মা-মণি বললে—এই বালিশটাতে হেলান দে, হেলান্ দিয়ে বোস্—

সুরেন বললে—তোমার অসুখ, কথা বলতে হয়তো তোমার কষ্ট হচ্ছে—

—দূর, কথা বলতে কখনও কষ্ট হয়? কথা বলবার লোকই নেই আমার। সারাদিন চুপ করে থেকে থেকে কোন্‌দিন বোবা হয়ে যাবো, তাই কেবল ভয় করে আমার। তাইতো তোকে ডেকে নিয়ে—

সুরেন যে-কথাটা বলি-বলি করেও এতদিন বলতে পারেনি, সেই কথাটাই হঠাৎ আজ বলে ফেললে। বললে—কিন্তু মা-মণি, বুড়োবাবুকে তোমার কিছু মাইনে দেওয়া উচিত—

—মাইনে?

মাইনের কথা শুনেই মা-মণি কেমন হয়ে গেল। বললে—মাইনে? কেন, বুড়োবাবু তোকে মাইনের কথা বলেছে নাকি?

—না বলেনি, কিন্তু মাইনে না-দাও, একটা মাসোহারাও তো দিতে পারো? এ-বাড়িতে সবাই-ই তো মাইনে পায়, আর বুড়োবাবু বুড়ো হয়ে গেছে বলে কি মাসোহারাও পাবে না বলতে চাও? দাড়ি কামাতেও তো পয়সা লাগে.

চান করতেও তো সাবান কিনতে হয়। সে-পয়সা কোত্থেকে আসে বুড়োমানুষের?

মা-মণি কিছুক্ষণ শুনলো চুপ করে। তারপর হঠাৎ বললে—এ-সব কথা তোকে কে বলেছে? বুড়োবাবু নিজে?

সুরেন বললে—না, কিন্তু আমি তো দেখতে পাই সব, আমারও তো চোখ আছে!

মা-মণি বললে—তা এ-সব কথা আমাকে না বলে তোর মামাকে বলিসনে কেন? ও-সব কি আমি দেখি? ও তো তোর মামাই দেখে।

সুরেন বললে—মামাকে বলতে গিয়েছিলুম, কিন্তু মামা খেঁকিয়ে উঠলো। মামা বুড়োবাবুকে মোটে দেখতে পারে না। আসলে আমি দেখছি বুড়ো-বাবুকে কেউই দেখতে পারে না এ-বাড়িতে। বাড়ির ঠাকুর-চাকর-ঝি থেকে আরম্ভ করে বুড়োবাবুকে কেউ দেখতে পারে না দু'চক্ষে! এমন কি তুমিও দেখতে পারো না—

—কী করে জানলি আমি দেখতে পারি না বুড়োবাবুকে?

সুরেন বললে—আমি জানি!

মা-মণি বললে—তুই জানিস বুড়োবাবু এ-বাড়ির কে?

সুরেন বললে—কে আবার, চাকর! কিন্তু চাকর বলে কি বুড়োবাবু মানুষ নয়? চাকর বলে কি তার একটা ইজ্জত নেই? এ বাড়ির অন্য চাকররা তো কাপড় পায়, ধুতি পায়, গামছা পায়, গেঞ্জি পায়, আর বুড়োবাবু বুড়ো-মানুষ বলে কি তার শীত করে না, খিদে পায় না? চাকররাও তো বুড়ো হয়ে গেলে একটা মাসোহারা পাওয়া উচিত—

মা-মণি হঠাৎ বলে উঠলো—না, বুড়োবাবু চাকর নয়, কে বললে তোকে যে বুড়োবাবু চাকর?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—চাকর নয় তো তবে কী?

মা-মণি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে জানালার বাইরের দিকে চোখ ফেরালো। বললে—সে-কথা থাক্, আজকে সকালে সুখদার মিষ্টি খেয়েছিলি? সুখদাকে আশীর্বাদ করেছিলি? আমার সারা গায়ে এমন ব্যথা হয়েছিল কাল থেকে যে উঠতেই পারলুম না...

সুরেন এ-কথার উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারলে না। কেমন করে বলবে যে তরলা তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছিল! কেমন করে বলবে যে সুখদা তাকে চিঠি লিখে ভয় দেখিয়েছিল!

হঠাৎ মা-মণি বলে উঠলো—হ্যাঁ রে, তোর নাকে কী হয়েছে? ফুলেছে দেখছি?

বলে বিছানায় উঠে বসে সুরেনের মুখের কাছাকাছি মুখটা আনবার চেষ্টা করতেই পেছন থেকে ধনঞ্জয় এসে ডাকলে—মা-মণি, ভাগ্নেবাবুকে ডাকছে—

—কে রে? কে ডাকছে?

সুরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাকে আবার কে ডাকছে? মামা?

ধনঞ্জয় বললে—না, বাইরের কে একজন ছেলে—

মা-মণিও অবাক হয়ে গেল। বললে—তোকে আবার কে ডাকতে এসেছে এখানে? তোর বন্ধু? তোর বন্ধু কেউ আছে নাকি?

সুরেন বললো—আমার তো কোনও বন্ধু নেই—

মা-মণি বললে—তাহলে তুই যা, আবার আসিস্ কিন্তু—

সুরেন বললে—কখন আসবো বলে দাও—

মা-মণি বললে—যখন তোর খুশী। কখন আসবি তুই তা আবার বলে দিতে হবে নাকি? কাল সকালে তো তোকে আসতেই হবে। আসবি না?

সুরেন বললে—কাল সকালে আসবো?

—নিশ্চয় আসবি। তোকে তো রোজ বলেই রেখে দিয়েছি। যদ্দিন সুখদার ব্রত চলবে, ততদিন আসবি—

সুরেন উঠলো। বললে—আমি আসি তাহলে মা-মণি—

উঠে সিঁড়ির দিকে আসতে গিয়ে হঠাৎ যেন মনে হলো আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কে যেন তার সব কথাগুলো শুনছিল। সুরেনকে দেখতে পেয়েই আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সুরেন সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। যদি তাকে দেখা যায়! কিন্তু আর দেখা গেল না কাউকে। সমস্ত বারান্দাটা নিঃঝুম. আগের দিন যেখানে যে-ঘরে গিয়ে সুখদাকে আশীর্বাদ করেছিল সে-ঘরটার দিকেও উঁকি মেরে চেয়ে দেখলে। সেখানেও কাউকে দেখা গেল না। একবার মনে হলো ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢোকে, ঢুকে গিয়ে দেখে সেখানে কেউ আছে কি না। যদি সুখদা থাকে তো নিশ্চয় এতক্ষণ সে সব শুনেছে।

আস্তে আস্তে নিচেয় নামবার সময় একবার মনে হলো মা-মণিকে সব বলে দিলেই ভালো হতো। বলে দিলেই হতো যে তরলা তাকে আজ সকালে আসতে বারণ করে দিয়ে এসেছিল। আসলে মা-মণি বুঝতে পারতো যে সুখদা চায় না সে আসুক। আসলে সুখদা সুরেনকে দেখতে পারে না এটা মা-মণিকে জানানো ভালো। তাহলে সুখদাকেও মা-মণি বকবে, তরলাকেও বকবে। দুজনেই বকুনি খাক। ওরা ভেবেছে সুরেন বোকা-সোকা ছেলে, মা-মণিকে সব কথা বলবার সাহস নেই। সুরেনের মনে হলো ভয় করে কেন সে এতদিন এ-বাড়িতে থেকেছে। অথচ এ-বাড়ির মালিক যখন তাকে ভালবাসে তখন কেন সে ভয় করে? কীসের ভয় তার?

তাড়াতাড়ি আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। সোজা গিয়ে আবার মা-মণির ঘরে ঢুকলো। মা-মণি তখনও বিছানার ওপর শুয়ে আছে। বাদামী পায়ের তলায় বসে বসে পা টিপে দিচ্ছে।

সুরেনকে দেখে মা-মণি অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—কী রে? কে এসেছিল? তোর বন্ধু?

সুরেন বললে—তা জানি না, এখনও আমি নিচেয় যাইনি—

মা-মণি বললে—সে কী রে? নিচেয় না গিয়ে আবার ওপরে এলি কী করতে?

সুরেন বললে—তোমাকে একটা কথা বলতে এলুম—

—কী কথা?

সুরেন বললে—আচ্ছা মা-মণি, আমি যদি রোজ সকালে না আসি তো কিছু খারাপ হবে? তুমি কিছু মনে করবে?

মা-মণি অবাক হয়ে গেল। বললে—তার মানে?

সুরেন বললে—মানে, তুমি তো আমাকে এক মাস ধরে আসতে বলেছ সুখদার ব্রত তো একমাস ধরে চলবে! ধরো আমি যদি একদিন না আসি তো তাতে কি খুব ক্ষতি হবে?

মা-মণি বললে—তুই ও-কথা বলছিস কেন? তোকে কি কেউ কিছু বলেছে?

সুরেন বললে—ধরো, কেউ যদি কিছু বলে? এখনও বলেনি, কিন্তু যদি কখনও কিছু বলে?

মা-মণি বললে—সে যখন বলবে তখন বলবে, এখন ও নিয়ে ভাবছিস কেন? আর তা ছাড়া তোকে কেউ বলবেই বা কেন? সুখদা তো কিছু বলবে না। তার ভালোর জন্যই তো ব্রত করাচ্ছি। বললে এক আমিই বলতে পারি। তা আমিই বা আসতে বারণ করতে যাবো কেন? আমি তো পাগল নই—

সুরেন বললে—না, সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করতে এলাম আর কি!

মা-মণি বললে—ও-সব কথা তোকে ভাবতে হবে না, তুই যা। তোর বন্ধু কে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করগে যা। পাগল ছেলে কোথাকার—

সুরেন আর দাঁড়ালো না সেখানে। ঘর থেকে বেরিয়ে আবার সিঁড়ির কাছে এসে নিচেয় নামতে লাগলো।

নিজের ঘরে আসতেই সুরেন দেখলে দেবেশ দাঁড়িয়ে আছে। দেবেশ! তার বাড়িতে তো কখনও আসে না সে।

বললে—কী রে, তুই?

দেবেশ বললে—দেখি, নাকটা দেখি তোর? ওঃ, খুব ফুলে গেছে তো?

সুরেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলো দেবেশের দিকে। তার নাকের কথাটা দেবেশের কানে পৌঁছোলো কী করে!

দেবেশ বললে—আমি তখনই বলেছিলুম তোকে যে ওদের বাড়িতে যাসনি। আমি জানতুম একদিন এমনি হবে। তখন তো শুনলি না।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—তোকে কে বললে?

দেবেশ বললে—আরে, খবর ঠিক আমার কানে আসে। আমি সকলের সব খবরই রাখি।

তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। বললে—এরাও তো খুব বড়লোক দেখছি। তোর কে হয় এরা?

সুরেন বললে—কেউ হয় না, আমার মামা এদের এস্টেট-ম্যানেজার, কলকাতা শহরে সাতখানা বড়-বড় বাড়ি আছে এদের। তার ভাড়া থেকেই এদের চলে।

—কে আছে বাড়িতে?

সুরেন বললে—কেউ নেই। আসল কর্তা তো মারা গেছেন। তাঁর এক মেয়ে কেবল আছে।

—মেয়ে? কত বয়স?

সুরেন বললে—অনেক বয়েস, প্রায় বুড়ি—

দেবেশটার বরাবরই খুব খুঁতখুঁতে মন। সব জিনিস খুব খুঁটিয়ে দেখা স্বভাব। বললে—বিধবা বুঝি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

—ছেলেমেয়ে?

সুরেন বললে—ছেলেমেয়ে কেউ নেই।

তবু এতেও দেবেশ থামলো না। বললে—ছেলেমেয়ে নেই? তাহলে এই সম্পত্তি, এই সব সম্পত্তি কে পাবে?

অত কথা সুরেন জন্মেও ভাবেনি। এতসব তার মাথাতেও ওঠেনি কখনও। বললেন—ওসব কথা জানি না।

দেবেশকে এই জন্যেই কোনও দিন ভালো লাগতো না সুরেনের। কোনও দিন কোনও জিনিসের ভাল দিকটা দেখতে পারতো না দেবেশ, তাই একটু ভয় পেত দেবেশকে।

আজ এতদিন পরে যখন ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সব ভাল সব মন্দ যাচাই হয়ে গিয়েছে তখন সেদিনকার দেবেশের সেই চেহারাটা ভাবতে আজ আর খারাপ লাগছে না। আজ জলের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে দেবেশের ওপর হয়তো সেদিন অবিচারই করেছিল সুরেন। যে-দেবেশ পুণ্যেশ্লোকবাবুর ভোটে জেতার পর স্কুলে মাংস পোলাউ খেতে আপত্তি করেছিল, যে-দেবেশ সব জিনিসের ভাল-খারাপ দুটো দিক বিচার করে দেখতো, আসলে সেই দেবেশ ছিল যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তিবাদী মানুষগুলোকে তাই সব সময়েই বোধহয় আমরা ভুল বুঝে থাকি।

দেবেশ বলতো—জানিস, এরাই একদিন আমাদের দেশটাকে রসাতলে পাঠাবে—

দেশ বলতে কাদের বোঝায়, কারা সেই দেশটাকে রসাতলে পাঠাবে, এ-কথাগুলো তখন বুঝতো না সুরেন। তখন শুধু বুঝতো সব কিছু জিনিসকে অনুভব করা। সব জিনিসকে অনুভূতি দিয়ে ভোগ করার মধ্যেও যে একটা আনন্দ আছে সে-কথাটা সুরেন সেই ছোটবেলাতেই ভালো করে বুঝে নিয়েছিল। তখন মনে হতো এই কলকাতা, কলকাতার এই মানুষগুলো, এই মা-মণি, এই সুব্রত, এই পুণ্যশ্লোকবাবু, এই অর্জুন, ধনঞ্জয়, দুঃখ-মোচন, এমন কি এই বুড়োবাবুকে পর্যন্ত তার নিজের অনুভূতি দিয়ে ভোগ করতো। এই কলকাতার, এই কলকাতার সংসারটার সব কিছু ভালো মন্দ সৌন্দর্য নোংরামি তার যেন তখন ভালো লাগতো। এমন কি তার সঙ্গে সুখদার ব্যবহারের পীড়াদায়ক দিকটাও মনে একটা কৌতূহল জাগাতো। আর কৌতূহল মানেই তো রোমাঞ্চ। কলকাতায় স্কুলে যাবার পথে সামান্য ফুটপাথের ছোট একটা দোকান থেকে শুরু করে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের স্টলটুকু পর্যন্ত তার মনে রোমাঞ্চের শিহরণ জাগাতো! ঠিক সেই অনুভূতির ভোগের মধ্যে দেবেশ ছিল যেন একটা মূর্তিমান বাস্তব। দেবেশের কিছুই ভালো লাগতো না। তার ভালো লাগতো না সুব্রতদের বড়লোক হওয়া, ভাল লাগতো না এই গা-ঘেঁষাঘেঁষি মানুষের ভিড়। সুরেনের মনে হতো যে সংসারে কিছু ভালো না লাগবার জন্যেই যেন জন্ম হয়েছে দেবেশের।

দেবেশ বলতো—সবাই চোর হলে ভালো লাগবে কি করে, বল্?

সুরেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—সবাই চোর? সবাই কী চুরি করছে?

তখনকার সেই ছোট দেবেশের ছোট মুখে যেন কথাগুলোকে খুব বড় কথা শোনাতো। সে বলতো—আমাদের কেউ ভালবাসে না, জানিস? আমরা যে এখানে জন্মেছি এতেই যেন মহা অপরাধ হয়ে গেছে আমাদের—জানিস, আসলে আমরাই এই শহরের ডাস্ট্‌বিন্—

আরো অবাক হয়ে যেত সুরেন। বলতো—তার মানে?

দেবেশ বলতো—দেখছিস না, সব জায়গায় কেবল কিউ। তার মানেই তো তাই। মানুষরাই তো মানুষদের ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে। সবাই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা বাড়তি। আমরা এ শহরের বোঝা। কোনও বড়লোকদের ছেলেদের কখনও রেশনের দোকানে কিউ দিয়ে দাঁড়াতে দেখেছিস?

সুরেন বলতো—আমিও তো রেশনের দোকানে যাই না—আমাদের বাড়ির ধনঞ্জয় গিয়ে কিউতে দাঁড়ায়—

—তাহলে তুইও বড়লোক। তোরাই আমাদের শত্রু।

এসব কথা আগে অনেকবার দেবেশ বলেছে সুরেনকে। এই খোলাখুলি স্পষ্ট কথা বলতো বলেই সুরেন পারতপক্ষে দেবেশকে এড়িয়ে চলতো। শুধু সুরেন নয়, অন্য অনেক ছেলেরাও এড়িয়ে চলতো। কিন্তু সেই দেবেশকেই হঠাৎ তাদের বাড়ির ভেতর দেখে সুরেন বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ততক্ষণে বাড়িটার আপাদমস্তক দেখা হয়ে গেছে দেবেশের।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ কী করতে তুই এসেছিস্ বললি না তো?

দেবেশের যেন টনক নড়লো।

বললে—ভেতরে কোথায় গিয়েছিলি? ওপরে কার সংগে কথা বলছিলি!

সুরেন বললে—মা-মণির সংগে—এ-বাড়ির যিনি মালিক—

—খুব তো জমিয়ে নিয়েছিস দেখছি, কিন্তু শুনলুম সুব্রতদের বাড়িতে তুই কাল খুব মার খেয়েছিস? পর্মিলি নাকি তোকে খুব মেরেছে?

সুরেন বললে—তোকে কে বললে?

বললে—আমাকে সব খবর রাখতে হয়, আমি তখনই বলেছিলাম তুই পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ওদের সংগে অত মাখামাখি করিসনি। বেশ করেছে তোকে মেরেছে। তাতেও যদি তোর শিক্ষা হয়! আমার কথা তো শুনলি না। আমি তোকে এখনও বলছি ওরা তোকে রাজা করে দেবে না। এখনও তোকে বলছি ভালোয়-ভালোয় আমাদের দলে চলে আয়—

—তোদের দলে? তোদের দলে মানে?

দেবেশ বললে—সেই কথা বলতেই তো তোর কাছে এসেছি। আমরা একটা নতুন দল গড়ছি। দল না হলে কিছুছু হবে না। শুধু মুখের কথা কেউ শোনে না। জোর-জবরদস্তি না করলে এক-কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায় কথাগুলো—

—কিন্তু তোরও তো একজামিন! একজামিনের পড়া পড়ছিস না?

দেবেশ বললে—পড়াশোনা করলে কিছু হবে না। দেখবি আমরা যত ভাল করেই পাশ করি না কেন, আমরা চাকরি পাবো না। চাকরি পাবে ওই সুব্রতরা। ওরা ফেল করলেও ওদের জন্যে সব পোস্ট রিজার্ভড—

সুরেন বললে—কিন্তু আমার কথা আলাদা ভাই, আমি পাশ না-করতে পারলে আমার মামা মেরে আমার পিঠ ভেঙে দেবে—

—কিন্তু পাশ করে তারপর কী করবি, সেটা ভাবছিস না? আই-এ পড়বি? আই-এ পাশ করে বি-এ পড়বি? বি-এ পাশ করার পর?

তার পরের কথা দেবেশ ভাবলেও সুরেন ভাবেনি। সে তো অনেক পরের কথা।

সুরেন বললে—কিন্তু আমাকে যে পর্মিলি মেরেছে সে-কথা তুই কী করে জানলি?

দেবেশ বললে—তুই আমাদের পার্টি-অফিসে আয়, সেখানে তোকে সব বলবো।

—পার্টি-অফিস মানে? তোদের আবার অফিস আছে নাকি?

—নিশ্চয়, অফিস না হলে কাজ হবে কী করে? সারা ইণ্ডিয়ায় আমাদের পার্টি আছে। সর্বহারা বঞ্চিত আর লাঞ্ছিতদের পার্টি—তোকেও আমাদের পার্টির মেম্বার করে নেব। শুধু চার আনা করে চাঁদা দিতে হবে, দিতে পারবি না তুই?

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—ভাগ্নেবাবু—ভাগ্নেবাবু—

বুড়োবাবুর গলা। গলাটা শুনেই চিনতে পেরেছে সুরেন। তাড়াতাড়ি দরজার বাইরে এসে দেখলে বুড়োবাবু সেই গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছে। সুরেন বললে—আসুন বুড়োবাবু, ভেতরে আসুন—

বুড়োবাবুর চোখ দু'টো তখনও ছল ছল করছে। কাছে এসে বললে—হ্যাঁ ভাগ্নেবাবু, মা-মণি তোমাকে কী বললে গো শেষ পর্যন্ত?

সুরেন বললে—আপনি ভেতরে আসুন—বাইরে কেউ দেখতে পাবে—

বলে বুড়োবাবুর হাত ধরে ঘরের ভেতরে আনিয়ে বসালো। বললে—বসুন আপনি—

কিন্তু বুড়োবাবুর তখন বসবার মেজাজ নেই। ঘরের ভেতরে ঢুকে বাইরের লোক দেখে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—এ কে রে?

সুরেন বললে—ইনি আমাদের বাড়ির বুড়োবাবু! বুড়ো হয়ে গেছে বলে এখন আর কাজ করতে পারে না, তাই মাইনেও পায় না। তার ওপর একটা গামছা বহুদিন থেকে চাইছে তাও কেউ দেয় না একে—

তারপর বুড়োবাবুর দিকে চেয়ে বললে—আপনি আজ নিজে মা-মণির কাছে কেন গেলেন বুড়োবাবু? আমি তো বলেছিলুম আমি নিজে মা-মণির কাছে গিয়ে আপনার গামছার কথা বলবো।

বুড়োবাবু বললে—অনেক দিন থেকেই তো চাইছি, তাই আজ ভাবলাম নিজেই যাই। নিজে না বললে তো কিছু পাওয়া যায় না।

—আপনি ভুল করেছেন। আপনি নিজে না গেলে আমি ঠিক আপনার গামছা আদায় করে দিতুম। আপনি নিজে কেন গেলেন?

বুড়োবাবু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কিন্তু মা-মণি তোমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে কী বললে?

সুরেনের যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। বললে—আচ্ছা, একটা কথা, আপনি এ-বাড়ির কে বলুন তো? আপনি এ-বাড়িতে এক কালে কাজ করেছেন তো?

বুড়োবাবু বললে—কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

সুরেন বললে—মা-মণি বলছিল, তুমি নাকি এ-বাড়ির চাকর নও—

বুড়োবাবু বললে—তোমার মা-মণি সেই কথা বলেছে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

বুড়োবাবুর চোখ দুটো আরো যেন ঝাপসা হয়ে এল। বললে—না ভাগ্নেবাবু, তুমি জানো না গো, আমি এ-বাড়ির কেউ নই, আমি এ-বাড়ির চাকর-ঝির চেয়েও অধম, আমি মানুষই নই, আমি একেবারে অমানুষ গো ভাগ্নেবাবু, একেবারে অমানুষ—

বলতে বলতে বুড়োবাবু একেবারে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে।

সেদিনই প্রথম দেবেশ তাদের বাড়িতে এল আর সেদিনই সব জানতে পারলে। জানতে পারলে যে এ-বাড়িতেও গরীব লোকের ওপর অত্যাচার হয়। বুড়োবাবুর কথা শুনে সে তখন মানুষটার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছিল।

সুরেন বললে—আপনি যান বুড়োবাবু, আপনার নিজের ঘরে যান, যা করবার আমি করবো. আপনি যাতে একটা মাসোহারা পান, মা-মণিকে বলে আমি তার ব্যবস্থা করবো—

বুড়োবাবু চলে গেল আস্তে আস্তে। তার দিকে চেয়ে দেখে দেবেশ বললে—ব্যাপারটা কী রে? এ কে?

সুরেন বললে—কী জানি। তুই তো শুনলি সমস্ত—

দেবেশ বললে—শুনলুম তো, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলুম না। এ-বাড়িতে বুঝি অনেক লোক খাটে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ. অনেক। আমিও তো ওদের মত একজন। আমার মামা এখানকার এস্টেট ম্যানেজার, তাই আমার এখানে কোনও খরচ লাগে না। একজন ঠাকুব আছে সে সকলের ভাত রাঁধে। একজন চাকর আছে সে দোকান থেকে র‍্যাশন কিনে নিয়ে আসে—

—তাহলে তোকে কোনও কাজই করতে হয় না বাড়িতে!

সুরেন বললে—না—

—ঠিক আছে, তোকে দিয়েই আমার কাজ হবে। তোদের মত ছেলেরা আমাদের পার্টিতে দরকার। আমাদের কাজের পক্ষে তোদের মত ছেলেদেরই দরকার—কবে যাবি বল্?

সুরেন বললে—তুই কি ওই কথা বলতেই এসেছিলি আমার কাছে?

দেবেশ বললে—না. এসেছিলুম কালকে সুব্রতদের বাড়িতে কী হয়েছিল তাই জানতে। ওদের বাড়িতে তুই আর যাস্‌নি ভাই. ওরা ওই রকম। ওরা আলাদা জাত। বাইরে তো মিনিস্টার, কিন্তু আসলে ওই আমাদের ইস্কুল মেরে সব টাকা হয়েছে. ওকালতিতে কিচ্ছুই হয়নি—

সুরেন বললে—তুই ঠিক জানিস?

—আমার কথায় বিশ্বাস না-হয় তো আমাদের পূর্ণবাবুকে তুই জিজ্ঞেস করিস।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—পূর্ণবাবু তো বাংলা পড়ায়. এ্যাসিস্‌টেন্ট হেডমাস্টার।

দেবেশ বললে—পূর্ণবাবু তো আমাদের পার্টির লোক। সেই জন্যই তো পূর্ণবাবুকে হেডমাস্টার করলে না পুণ্যশ্লোকবাবু। পুণ্যশ্লোকবাবু ইস্কুলের সেক্রেটারির পোস্ট ছেড়ে দিয়েছে—তবু চালায় তো সবই পেছন থেকে।

সুরেন চুপ করে রইলো। একবার ভাবল এ-সব কথা তার শোনাও পাপ। সে কেন গুরুজনদের নিন্দে শুনবে? তার কাজ লেখা-পড়া করা। লেখা-পড়া নিয়েই তার থাকা উচিত। আর কোনও দিকে মন দেওয়া উচিত নয়। কোথায় কে কী চুরি করছে, তা নিয়ে তার কীসের ভাবনা। সামনেই তার পরীক্ষা। পরীক্ষা পাশ করার পর আবার কলেজে ঢোকবার কথা বলতে হবে মামাকে। তখন পড়তেও টাকা লাগবে। এখন বারো টাকা মাইনে, তখন লাগবে আরো বেশি।

—তুই বই-টই পড়ছিস না? তোর সব তৈরি হয়ে গেছে?

দেবেশ বললে—আমি তোদের মতন ভালো-ছেলে হতে চাই না। ভালো-ছেলে হয়ে আজকাল কোনও লাভও নেই—

বার বার সুরেনের চিরকালের ধ্যান-ধারণার উল্টো কথা সব বলে দেবেশ। অনেকক্ষণ ধরে রইলো দেবেশ। একবারও লেখা-পড়ার কথা উচ্চারণ করলে না। অথচ ক্লাশের অন্য ছেলেদের সঙ্গে দেখা হলে লেখা-পড়া ছাড়া অন্য কোনও কথাই হয় না। হিস্ট্রি, ইংরিজী, কত রকমের কত কোশ্চেন পড়তে পারে তারই আলোচনা হয়। 'এসে' কী পড়বে তাই নিয়েই তো ছেলেদের ভাবনার শেষ নেই. কিন্তু দেবেশ সে-কথার ধার দিয়েও গেল না। বার বার কেবল তাদের পার্টি অফিসে যেতে বলতে লাগলো।

যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললে—জানিস, তোকে চুপি চুপি একটা কথা বলে যাই, তোর নাম আমি করেছি পূর্ণবাবুর কাছে। বলেছি তোকে আমি আমাদের পার্টির মেম্বর করে নেব।

সুরেনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বললে—কিন্তু মামাকে আমি একবার জিজ্ঞেস করবো ভাই, মামাকে জিজ্ঞেস না করে আমি কিছুই কাজ করি না।

দেবেশ বললে—না খবরদার, তোর মামাকে বলিসনি। তোর মামারা সেকেলে লোক, ওরা গান্ধী বলতে অজ্ঞান। গান্ধীরাই তো আমাদের দেশের সর্বনাশ করেছে রে—

—কী বলছিস্ তুই? গান্ধীর লাইফ যে আমাদের টেক্সট্-বইতে আছে, পড়তে হয় আমাদের—

দেবেশ হাসতে লাগলো। বললে—দূর, ও-সব তো কংগ্রেসের লোকেরা ঢুকিয়েছে। যখন কংগ্রেসকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের পার্টির লোক মিনস্টার হবে তখন গান্ধীর লাইফ আর পড়ানো হবে না।

বলতে-বলতে উঠোনের দিকে এগোতে লাগলো দু'জনে। মাথার ওপর সূর্যটা উঠে এসেছে। রোদে ভরে গেছে সমস্ত উঠোনটা। রাস্তার দিকে দেবেশকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছিল সুরেন, হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ী দেখতে পেয়েছে।

—কী রে, সুরো? কোথায় যাচ্ছিস?

সুরেন বললে—তুই যা ভাই, আর একদিন আসিস, মামা ডাকছে যাই—

ভূপতি ভাদুড়ীর দফতরে তখন দু-চারজন মক্কেল বসে ছিল। সুরেন কাছে যেতেই মামা তাদের উঠিয়ে দিলে। বললে—এখন যাও হে তোমরা সব ও-বেলা এসো—যাও—বেলা হয়ে গেছে—

সবাই চলে যেতেই মামা বললে—কী রে? এতক্ষণ কী করছিলি? ও কে? আমি ভাবলাম তুই ওপরে মা-মণির সঙ্গে কথা বলছিস্?

সুরেন বললে—আমার ওই বন্ধু এসেছিল, ও ডেকে পাঠালো—

—কে ও?

সুরেন বললে—আমার বন্ধু, এক ক্লাশে পড়ি—

মামা যেন শুনে নিশ্চিন্ত হলো। লেখাপড়ার কথা বলতে এসেছিল হয়তো। বললে—তা মা-মণি তোকে কী জিজ্ঞেস করছিল? বুড়োবাবুকে গামছা দিইনি বলে কিছু বলছিল তোকে?

সুরেন বললে—না—

—তাহলে? তাহলে এতক্ষণ ধরে কী কথা হচ্ছিল? আমি তোকে পই-পই করে বলে দিয়েছি না যে. বাড়ির চাকর-ঝি'র ব্যাপারে তুই মাথা ঘামাবি না! তুই কি তোর নিজের ভাল-মন্দও বুঝতে পারিস না? আমি আর ক'দিন আছি

রে বাবা। আমার তো বয়েস হয়ে গেছে। আমি তো আর দু'দিন পরেই পটোল তুলবো। তখন তো তোকেই সাত লক্ষ টাকার আয়ের সম্পত্তি দেখা-শোনা করতে হবে। আর আজ আছে সাত লক্ষ টাকা, কাল তো এই সম্পত্তি আবার সতেরো লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে। তা তোর কি মাথায় এতটুকু বুদ্ধি থাকতে নেই?

সুরেন তবু বুঝতে পারলে না অন্যায়টা সে কী করেছে।

বললে—কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি মা-মণিকে!

—বলিনি মানে?

ভূপতি ভাদুড়ী এবার রেগে-মেগে গলাটা চড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার-মানুষ, ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সামলে নিয়েছে। চাপা গলায় বললে—বুড়োবাবু গামছা পেল-না-পেল তাতে তোর কী? তাতে তোর কিছু লোকসান যাচ্ছে? তুই যে সেই তেমনি করলি—'ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপুজোয় ঢাক'। বুড়োবাবুর গামছার জন্যে তোর মাথা-ব্যথা আর ওদিকে যে মা-মণির পেছন-দরজা দিয়ে হাতী গলে যাচ্ছে তা তো দেখতে পেলিনে তুই?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—খবরদার বলছি, ওপরে যাচ্ছো, মা-মণির সঙ্গে কথা বলছো, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমি কাকে গামছা দিচ্ছি কি দিচ্ছি না তার হিসেব-নিকেশ করতে হবে না তোমায়, এই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে শেষবারের মত।

সুরেন বললে—কিন্তু বুড়ো মানুষ, একটা গামছায় কি চলে?

মামা বললে—চলে কি না-চলে সে আমি বুঝবো। তোর কী? তোর নিজের ভাবনা কে ভাবে, শুনি?

—কিন্তু সবাই মাইনে পায় আর বুড়োবাবুই বা মাইনে পাবে না কেন? অন্ততঃ মাসোহারা তো দিতে পারে। সেই কথাটা শুধু আমি মা-মণিকে বুঝিয়ে বলেছিলাম!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন মাসোহারা পাবে বুড়োবাবু? কোন্ দুঃখে পাবে? চৌধুরী-এস্টেটের কোন্ সাশ্রয়টা করে শুনি ও? কেবল গাণ্ডে-পিণ্ডে পেট-পুজো ছাড়া আর কোন্ কম্ম জানে ও?

সুরেন বললে—কিন্তু মা-মণি বলছিল বুড়োবাবু নাকি এ-বাড়ির চাকর নয়।—চাকর নয় তো কে, তুমি জানো?

কথাটা শুনে ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নেটার দিকে খানিকক্ষণ হতবাকের মত চেয়ে রইলো। তারপর বললে—এ-সব কথা তোর মাথায় কে ঢোকায়, কে? কে তোকে এ-সব মতলব দিচ্ছে?

এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না সুরেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভূপতি ভাদুড়ী ধমক দিয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—বল্, এ-সব কে তোর মাথায় ঢোকায়?

সুরেন বললে—বুড়োবাবু নিজেই তো আমাকে বলে—

—বুড়োবাবু নিজেই বলে? দাঁড়া, আমি আজই ওকে বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছি—আজই তাড়িয়ে দিচ্ছি—

বলে ক্যাশ-বাক্সে চাবি বন্ধ করে কাপড়টা সামলে নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। সুরেন বাধা দিয়ে বললে—না মামা, কিছু বোল না বুড়োবাবুকে: আমারই দোষ হয়েছে, আমি আর কখনও ওর গামছার কথা বলবো না—আমি কথা দিচ্ছি—

কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ীর রাগ না চণ্ডালের রাগ! বাধা দিলে আরো ক্ষেপে ওঠে। বললে—খবরদার বলছি, রাস্তা ছাড়, আমি ওকে বিদেয় করবোই আজ, আমি বাড়ি থেকে ওকে বিদেয় করে দেবোই—

বলে সুরেনকে ঠেলে ঘর থেকে বাইরে বেরোল। তারপর উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর পেরিয়ে একেবারে সোজা বুড়োবাবুর ঘরের দিকে ছুটে গেল। আর চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—বুড়োবাবু—বুড়োবাবু—

পাশের ঝুপড়ি থেকে দুখমোচন বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে আছে অর্জুন। ওদিকে রান্না করছিল ঠাকুর। সে-ও হাতে খুন্তি নিয়ে ব্যাপার দেখতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

সুরেনও পেছন-পেছন গিয়ে দাঁড়ালো। ভূপতি ভাদুড়ী তখন একেবারে সোজা ঢুকে পড়েছে বুড়োবাবুর ঘরের ভেতরে। ঘরের দরজা খোলাই পড়ে ছিল। ভূপতি ভাদুড়ি ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। কোথায় গেল বুড়ো? গেল কোথায়? একটা ভাঙা তক্তপোষ পড়ে রয়েছে ঘরের একপাশে। ঘরখানা ছোট, চারদিকে ধুলো-ময়লা! কিন্তু গেল কোথায় বুড়ো?

—ঠাকুর, কোথায় গেল বুড়োবাবু? দেখেছ তুমি?

দুখমোচন বললে—হুজুর, বুড়োবাবু পাইখানায় গেছে—

—পায়খানায়! ভূপতি ভাদুড়ী খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে—ঠিক আছে, আগে বুড়ো বেরোক, তারপর দেখে নেব--

বলে আবার তেমনি ভাবে সেই রাস্তা দিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে ভূপতি ভাদুড়ী নিজের দফতরে ফিরে এল।

যদি জিজ্ঞেস করেন এতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে আমি কী পেয়েছি, তাহলে আমি উত্তর দেব পাইনিই বা কী। অর্থ সম্মান স্বাস্থ্য কিংবা প্রতিষ্ঠা পাওয়াটাই কি সংসারে বড় কথা? এত যে দেখেছি এত যে শুনেছি, দেখে শুনে এত যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, এত জ্ঞান হয়েছে, এর দামই কি কম? এই যে মা-মণির চেহারাটা চোখ বুজলে চোখের সামনে এখনও দেখতে পাই, যে মা-মণির বিয়ের সময় এত জাঁকজমক হয়েছিল আর সাত দিন ধরে মাধব কুণ্ডু লেনের আশেপাশে কাক-চিলের অত্যাচার থামেনি, সেই মা-মণিই বা শেষকালে অমন নিঃস্ব নিঃসহায় হয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল কেন? ওই সুখদার বিয়ের জন্যে মা-মণির কি কম দুর্ভাবনা ছিল। হিতসাধিনী ব্রত তো সেই জন্যেই করিয়েছিল সুখদাকে দিয়ে। নিজে স্বামী-সুখ পায়নি বলে যে ব্যথাবোধ ছিল মনের মধ্যে সেটাই বুঝি পূরণ করে নিতে চেয়েছিল সুখদাকে ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। কিন্তু মা-মণি তো তার শেষ দিন পর্যন্ত জানতেই পারলো না যে সুখদার ব্রত ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। জানতেই পারলো না যে ব্রাহ্মণকে নৈবেদ্য দেবার নাম করে যে-মিষ্টি বাজার থেকে আনা হয়েছিল তা অনেকদিন সুরেনের কাছ পর্যন্ত পৌঁছোয়ইনি। অথচ কত দামী মিষ্টি। হাতীবাগানের অধর মাঝির দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে মিষ্টি তৈরি করানো। সে-যুগের আট আনা দামের বড় রাজভোগ চারটে, চার রকমের দামী বাহারি সন্দেশ। আর তার সঙ্গে থাকতো ফল। বড় বড় মর্তমান কলা, আঙুর, পেস্তা,

বাদাম, এই সব। খেতে গিয়ে অনেক সময় সুরেনের পেট ভরে যেত। পেটে আর ঢুকতো না কিছুতেই। মা-মণি কিন্তু ছাড়তো না কিছুতেই। বলতো—না না, ফেলতে নেই, খেয়ে নে। না খেলে সুখদার অমঙ্গল হবে—হায় রে কপাল! যেন সুখদার মঙ্গল-অমঙ্গল মা-মণির হাতে!

আর পমিলি? সুব্রতর বোন?

প্রমীলা কেন যে কেমন করে পমিলি হয়ে গিয়েছিল তার ইতিহাসই বা কেমন করে জানতে পারতো যদি না সুব্রত তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যেত! সে যেন এক বিচিত্র জগৎ। এই সংসারটাই বড় বিচিত্র হয়ে ঠেকছিল সুরেনের চোখে। জীবনের যে জংশন-ষ্টেশনে এসে এখন সে পৌঁচেছে সেখানে দাঁড়িয়ে সেদিনকার সেই পুরোন পথগুলো পরিক্রমা করলে আবার যেন সেই প্রথম দিনকার যাত্রাপথের শুরুতেই ফিরে যেতে হয়। আসলে কিন্তু পেছন ফিরে দেখতে সকলেরই ভালো লাগে।

পরদিনের কথাটা ঠিক মনে আছে। ঠিক পরদিন ভোর বেলা। ঘুম থেকে উঠেই সুরেনের মনে পড়েছিল সুখদার ব্রতর কথা। মনে পড়েছিল মা-মণির কথা। কাল তো মা-মণির জ্বর ছিল, আজও কি জ্বর আছে? আজও কি মা-মণি নিজের ঘরে নিজের বিছানার ওপর শুয়ে থাকবে? সুখদার ব্রতর মিষ্টি খেতে, সুখদাকে আশীর্বাদ করতে সুরেন গেল-কি-গেল না তার খবর নেবে না?

কিন্তু সুরেন যা ভেবেছে তাই। ভেবেছিল, যদি তরলা ডাকতে আসে তো যেন যেতে বেশি দেরি না হয়।

কিন্তু তরলা সেদিন এল না। এল ধনঞ্জয়।

এসেই বললে—চলুন ভাগ্নেবাবু, মা-মণি ডাকছে—

বুকখানা আনন্দে ভরে উঠলো। মা-মণি ডেকেছে বলে আনন্দ নয়। আনন্দ হয়েছিল সুখদার অহঙ্কার ভাঙতে পেরেছে বলে। অথচ সুরেনের কাছে অহঙ্কারের তো কোনও মানেই হয় না। তোমার তো একদিন বিয়ে হয়েই যাবে। আজ হোক কাল হোক, বিয়ে তোমার একদিন হবেই। তখন তো আমিই এ-বাড়িতে থাকবো। মা-মণির সমস্ত স্নেহ-ভালবাসাটা আমি একলাই তখন ভোগ করবো। সুতরাং আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করছো তুমি?

—হ্যাঁ রে, মা-মণি আজ কেমন আছে?

ধনঞ্জয় বললে— জ্বর ছেড়ে গেছে, আজ ভাত খাবে মা-মণি, ডাক্তার ভাত খেতে বলেছে—

—আর দিদিমণি? দিদিমণি কোথায়? কী করছে?

ধনঞ্জয় বললে—দিদিমণি চান-টান করে তৈরি। আপনি গেলেই ব্রত শুরু হবে—

—কিন্তু দিদিমণি কি আমাকে ডাকতে বলেছে?

ধনঞ্জয় বললে—দিদিমণি বলবে কেন?

—মা-মণিই তো সকাল থেকে দিদিমণিকে তাগাদা দিচ্ছে—

সুরেন বললে—তুমি যাও আমি চানটা করে নিয়েই এখুনি যাচ্ছি—

কলঘর খালি ছিল না। একটু দেরি হয়ে গেল স্নান করতে। একগাদা লোক বাড়িতে, অথচ উঠোনে একটা মাত্র কলঘর। তাতে সবাই চান করলে খালি থাকবেই বা কী করে। আর একটা কলঘর থাকলে এত মুশকিল হয় না। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে সেই নতুন কাপড়খানা পরে নিলে সুরেন। তারপর গেঞ্জির ওপর সার্টটাও চড়িয়ে নিলে। তারপর অন্দরের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

সামনে একজামিন। অনেক ভাবনা সুরেনের মাথার ভেতরে। শুধু যে একজামিন তাই-ই নয়, তার ওপর আছে নিজের মনটা নিয়ে টানাটানি—যে-মন সকলকে কাছে টানতে চায়, সকলকে ভালোবাসতে চায়, অথচ সকলের কাছ থেকে কেবল আঘাত খেয়ে সে-মন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তার মনে হয় তার নিজের মনটা এত নরম বলেই হয়তো তার এত দুর্গতি। কই, দেবেশের মত নিষ্ঠুর তো সে হতে পারে না। কিংবা সুব্রতর মত সহজ। অথবা সুখদার মত জটিল! এক-একটা মানুষ বোধহয় এক-এক রকম মন নিয়ে জন্মায়। এক-একবার নিজের সৃষ্টিকর্তাকে ডেকে সুরেনের বলতে ইচ্ছে করে—হে ভগবান, কেন আমাকে এমন করে তৈরি করলে তুমি? একটু অন্য রকম করে সৃষ্টি করলে তোমার কী এমন লোকসান হতো? আমি তো তোমার কাছে অন্য কিছুই চাই না। শুধু চাই সবাই ভালো হোক। কিন্তু তোমার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে হয়তো তা একটা ব্যতিক্রম! আমাকে তুমি সহজও করলে না, জটিলও করলে না, নিষ্ঠুর নির্মমও করলে না। শুধু করলে ব্যতিক্রম। এতখানি ব্যতিক্রম হয়ে আমি যে নিজের বা পরের কারো কোনও কাজেই লাগতে পারলুম না। কেন এমন করলে?

বলতে গেলে এই-ই হলো এ উপন্যাসের শুরু। সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের জীবনের এই উপন্যাস। যার সূত্রপাত হলো সুকিয়া স্ট্রীটের টিউন অ্যাকাডেমী থেকে। আর যার পরিণতি হলো এই মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরীদের বাড়িটার পট-পরিবর্তনে। আর শুধু তো এই বাড়িটার পট-পরিবর্তন নয়, সঙ্গে সঙ্গে যে ইতিহাসেরও পট-পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল তার চোখের সামনে দিয়ে। একটার পর একটা ঘটনা চোখের সামনে দিয়ে ছবির মত চলে গিয়েছিল, কিন্তু চিরকালের মত পাকা ছাপ রেখে দিয়ে গিয়েছিল সুরেন সান্ন্যালের মনের পর্দায়।

—কে?

দোতলার সিঁড়ির বাঁকের মুখেই ঘটনাটা ঘটলো।

সুরেন নিজের ভাবনার জটিলতার মধ্যেই জড়িয়ে গিয়ে মশগুল হয়ে ছিল। তাই পাশের ঘর থেকে হঠাৎ সুখদাকে বেরিয়ে আসতে দেখে একটু চমকে উঠেছিল। তার ওপর জায়গাটা ছিল নিরিবিলি নির্জন। দিনের বেলাতেও একটু-একটু আবছা-আবছা। কিন্তু যদি অন্য কেউ সে-সময়ে সেখানে এসে পড়তো?

একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন দুজনেরই মুখের কথা হারিয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে সুখদাই প্রথম বলে উঠলো—আবার এসেছ?

সুরেন কী বলবে ঠিক করতে পারলে না। একটু হকচকিয়ে গেল।

সুখদা আবার বললে—আমি বার বার না তোমাকে আসতে বারণ করেছি, তবু তুমি কথা শুনবে না? তোমাকে চিঠি দিয়ে আসতে বারণ করেছি, তরলাকে দিয়ে বলিয়েছি, তবু কথা শোন না কেন?

সুরেন বললে—মা-মণি যে আমাকে ধনঞ্জয়কে দিয়ে ডেকে পাঠালো।

—ডাকুক গে মা-মণি! মা-মণির কথাই বড় হলো? আর আমি কেউ না?

সুরেন বললে—তাহলে তুমি মা-মণিকে গিয়ে কেন বলো না যে তুমি ব্রত করতে চাও না!

সুখদা বললে—আমি ব্রত করতে চাই না-চাই সে আমি বুঝবো, তোমার

সে-সব দেখবার দরকার নেই। তুমি কেন আসো?

সুরেন বললে—আমি না এলে মা-মণি যদি জিজ্ঞেস করে তখন আমি কী জবাবদিহি করবো? তখন তো মা-মণি আমাকেই দোষ দেবে! এ-বাড়িতে বাস করে এ-বাড়ির মা-মণির কথাই আমি অমান্য করবো?

সুখদা বললে—খবরদার বলছি, আমার কথার ওপর কথা বলতে এসো না। কে তোমাকে এ-বাড়িতে বাস করতে বলেছে? কেন তুমি এখানে এলে? কী মতলব তোমাদের? মা-মণির মাথায় হাত বুলিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি নিষে নিতে চাও? কিন্তু আমি এ-ও বলে রাখছি, আমি থাকতে তা তোমরা পারবে না—

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—কী সব যা-তা বলছো? মা-মণির সম্পত্তি কে নিতে চাইছে? কীসের সম্পত্তি?

সুখদা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলো—কীসের সম্পত্তি তা তোমার মামাকে জিজ্ঞেস কবো গিয়ে। তোমার মামা ভেতরে-ভেতরে কী মতলব হাসিল করতে চাইছে তা সবাই জানে!

সুরেন বললে—কিন্তু মামার কী মতলব তার আমি কী জানি?

সুখদা বললে—তাহলে আমার বিয়ের জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

—আমার মাথা-ব্যথা না মা-মণির মাথা-ব্যথা! মা-মণি তো তোমার বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে! মা-মণি বলেছে বলেই তো আমি...

কথা শেষ হওয়ার আগেই তেতলার সিঁড়ির মুখে কার পায়ের শব্দ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সুখদা আবার সুড়ুৎ করে যে-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর ওপর থেকে ধনঞ্জয় নিচের দিকে নেমে আসতেই সুরেনকে দেখে বললে—এই যে ভাগ্নেবাবু, আপনাকে ডাকতেই তো যাচ্ছিলুম—আপনার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আবার মা-মণি ডাকতে পাঠালে। চলুন—চলুন—

সুরেন একবার পাশের ঘরখানা দেখে নিলে। কিন্তু ততক্ষণে সুখদা কোথায় নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভূপতি ভাদুড়ী সকাল বেলাই মা-মণির কাছে গিয়ে কাজের কাগজ-পত্রগুলো দেখায়। এ সেই শিবশম্ভু চৌধুরীর আমল থেকে চলে আসছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মেয়েই সব দেখতো। দরকার হলে সই-সাবুদ দিত মা-মণি। পরামর্শ হতো। কোন্ বাড়িটার মেরামতি দরকার, কোন্ বাড়িটার ভাড়াটে উচ্ছেদ করতে হবে, কোন্ ভাড়াটের ভাড়া বাকি পড়েছে এই সব। ইদানীং সুখদার বিয়ের কথাবার্তাও হয় মা-মণির সঙ্গে।

মা-মণি বলে দিয়েছিল—সুখদার বিয়েটা দিয়ে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি, সেটাও তোমাকে দিয়ে হচ্ছে না—তাহলে আমি কি নিজে বেরোব পাত্র খুঁজতে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সেই কথাই তো বলতে এসেছি মা-মণি, এই দেখুন—

বলে নিজের কাগজ-পত্রগুলো বার করতে লাগলো। বললে—এই ঘটককেই

আমি তবিল থেকে সত্তর টাকা দিয়েছি। ঘুরে ঘুরে উত্তরপাড়ার ঘোষ-চৌধুরীদের বংশের ছেলেটিকে আমি পছন্দ করেছিলুম, তা তারা কি লিখেছে দেখুন। এ-চিঠিখানা আমি কাল বিকেলে পেয়েছি—

মা-মণি বললে—কিছু যৌতুক চায়, এই তো? তা আমি তো তোমাকে বলে দিয়েছি যে হাজার পঞ্চাশ টাকা আমি সুখদার বিয়েতে খরচ করবো। তার সঙ্গে রুপোর বাসন, স্টেনলেস্ স্টীলের সেট, একশো ভরির গয়না, জড়োয়ার সেট, আর তার ওপর তারা যত হাজার টাকা নগদ যৌতুক চায়, সবই দেবো—দিতে আমি কিছু কসুর করবো না, তা তো বলেই দিয়েছি—

—সে সব কিছু নয়, এখন অন্য ফ্যাকড়া বেধেছে মা মণি! বলে ভূপতি ভাদুড়ী একটা চিঠি বার করলে।

—আবার কীসের ফ্যাকড়া?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওরা নাকি একখানা উড়ো-চিঠি পেয়েছে। সেই-খানা আমার কাছে এনে দিয়েছে ঘটক। সেখানা দেখাতেই এনেছি আপনার কাছে—

উড়ো-চিঠি! উড়ো-চিঠি আবার কে দিতে গেল তাদের!

ভূপতি ভাদুড়ী ভেতর থেকে একটা কাগজ বার করলে। বেশ নীল রং-এর কাগজ একটা। ভাঁজ খুলে সেখানা মা-মণির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এইখানা পড়ুন—

মা-মণি চিঠিখানা পড়তে লাগলো। চিঠিখানার শিরোনামায় লেখা আছে—প্রজাপতয়ে নমঃ।

তারপর লেখা রয়েছে—যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর নিবেদন, মহাশয় শুনিতে পাইলাম আপনার প্রথম পুত্র শ্রীমান বিজয়েন্দ্রের সংগে মাধব কুন্ডু লেন নিবাসী ৺শিবশম্ভু চৌধুরীর শ্যালিকা শ্রীমতী হেমনলিনী দাসীর একমাত্র কন্যা কুমারী সুখদাবালা দাসীর শুভ-পরিণয় স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যে-বিবাহ উভয় পক্ষেরই অমঙ্গলকর তাহা সংঘটিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং মহাশয়কে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে...

হঠাৎ দরজার কাছে কার পায়ের শব্দ হতেই মা-মণি মাথা তুললো। ভূপতি ভাদুড়ীও দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। সে-ও দরজার দিকে মুখ ঘোরাল।

বললে—কে ওখানে?

—আমি মা-মণি, আমি—

বলে সুরেন এসে সশরীরে দরজার সামনে দাঁড়ালো।

মা-মণি বললে—এসেছিস? আয় আয় বোস্—

সুরেন ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ভূপতি ভাদুড়ী চিঠি পড়তে পড়তে হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে গেল। মা-মণি বললে—আয়, খাটের ওপরে বোস্, চান করে এসেছিস?

সুরেন মাথা নাড়লো। বললে—তোমার জ্বর ছেড়ে গেছে?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ, আজ এ-বেলা দুটি ভাত খাবো।

তারপর ডাকলে—তরলা, ও তরলা—সুখদার হয়েছে?

মা-মণি ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—কই, তারপর কী লিখেছে, পড়ো—

ভূপতি ভাদুড়ীর সুরেনের ঠিক এই সময়ে আসাটা ভালো লাগেনি। প্রথমে

একটু দ্বিধা হয়েছিল চিঠিটা পড়তে। ভাগ্নের সামনে জিনসটা জানাজানি হওয়াটা চায়নি ভূপতি ভাদুড়ী। বললে—পড়বো?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ো, সুরেন তো বাড়ির ছেলে, ওর সামনে পড়তে দোষ কী?

ভূপতি ভাদুড়ী আবার পড়তে লাগলো—যে-কন্যার সহিত মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ হইতেছে, সে-কন্যা আসলে দ্বিচারিণী। যাহার মন অন্য পুরুষে ন্যস্ত তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া মহাশয়ের বংশের কলঙ্কলেপন হইতে দিতে চাহি না বলিয়াই এই পত্র লিখিতেছি—ইতি—

—নিচে নাম লেখা রয়েছে কার?

মা-মণি তখন বেশ সোজা হয়ে বসেছে। আবার বললে—নিচেয় কার সই আছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না, কারো নাম নেই। উড়ো চিঠি!

—উড়ো চিঠি কে দিতে গেল?

সুরেন অবাক হয়ে সমস্ত শুনছিল। সুখদার বিয়ের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে বুঝতে পারলে। আরো বুঝতে পারলে যে সে-বিয়ে যাতে ভেঙে যায় সেই জন্যে কেউ উড়োচিঠি দিয়েছে।

—কিন্তু কে এ-চিঠি দিলে বলো তো? কাকে সন্দেহ হয় তোমার?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না কে এই শত্রুতা করবে। জিনিসটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল, এখন এই চিঠিখানার জন্যে সব কেঁচে গেল!

মা-মণি বললে—কিন্তু বিয়েতে তো উড়োচিঠি লোকে দেয়ই, তা বলে যা মিথ্যে তারা সেটাই বিশ্বাস করবে? তুমি একবার গিয়ে ওদের বলো না যে এ-সব উড়োচিঠিতে কি কেউ কান দেয়?

—আমি গিয়েছিলুম মা-মণি, এই চিঠি নিয়েই আমি গিয়েছিলুম। ঘোষ মশাইকে আমি গিয়ে চিঠি দেখালাম। বললাম—কোথাকার কে একখানা উড়োচিঠি দিলে আর আপনি বিশ্বাস করে বসে রইলেন?

মা-মণি বললে—তাহলে আমি একবার যাবো? আমি গিয়ে সব বুঝিয়ে বললে চলবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আপনার যাওয়া কি ভালো হবে মা-মণি? বিয়ে হলো না, থা হলো না, আগে থেকেই ভাবী বেয়ানের বাড়ি যাবেন? লোকে কী বলবে?

—লোকে যা-ই বলুক গে! আমাদের যখন মেয়ে তখন তো আমাদেরই দায়। লোকে কী ভাববে বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে?

তারপর বোধহয় হঠাৎ সুরেনের কথা মনে পড়লো। আবার ডাকলে—ও তবলা, তোদের হলো? ও সুখদা, সুরেন যে এসে বসে আছে রে! মুখপুড়ি গেল কোথায়?

কিন্তু ততক্ষণে ওদিকে দেরি হয়ে যাবে বলে মা-মণি নিজেই উঠে দাঁড়ালো। বললে—তুমি যাও ভূপতি, আমি এদিকটা সামলাই গে—

ভূপতি ভাদুড়ী কোনও উপায় না পেয়ে আস্তে আস্তে কাগজ-পত্র নিয়ে উঠে পড়ল।

সুরেন বললে—তুমি আবার জ্বরগায়ে কেন উঠতে গেলে মা-মণি!

মা-মণি বললে—উঠবো না? আমি না উঠলে চলে? আমি যেদিকে দেখবো

না সেই দিকেই সব চিত্তির করে বসবে। চল্, দেখি কী করছে মুখপুড়ি! একটা মিষ্টির থালা সাজাতে এত দেরি?

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে তরলা দৌড়তে দৌড়তে এসেছে—

—হয়ে গেছে মা-মণি! সব তৈরি।

—এত সময় লাগে তোদের তৈরি হতে? কোন্ সকালে তোদের তৈরি হয়ে নিতে বলেছি না! চল্, চল্—বলে সুরেনকে আসতে বলে নিজেই সামনের বারান্দার দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো। তারপর ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—ভূপতি, তুমি পরে এসো, তোমার সঙ্গে পরে ও-নিয়ে পরামর্শ করবো—

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের বড ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। সুরেনও পেছনে-পেছনে যাচ্ছিল। মা-মণি ঘরে ঢুকেই বললে—কোথায় রে তরলা, কোথায় তোরা?

তরলা দৌড়ে এল ভেতরে।

মা-মণি বললে—তোদের আক্কেল কী লা, এত বেলা হলো এখনও যোগাড়-যন্তর করতে পারলিনে? সুখদা কোথায় গেল? সে-মুখপুড়ি করছেটা কী?

ততক্ষণে তরলা একটা কার্পেটের আসন নিয়ে এসেছে. এনে পেতে দিবে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে। ধুপ জ্বালালে। মা-মণি বললে—খাবার এনেছিস?

তরলা বললে—এখুনি আনছি—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা-মণি বললে—বোস বাবা আসনের ওপর। আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছি তো সবাই অমনি ঢিলে দিয়েছে—এরা কেউ কিছু কাজের নয়, সবাই হয়েছে অকর্মার ঢেঁকি—

তরলা ততক্ষণে এনে দিয়েছে মিষ্টির রেকাবি। রাজভোগ, লেডিকেনি, সন্দেশ, মিহিদানা। আর একটা থালায ফল। এবার সুখদার নিজের আসার পালা। সুরেন চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু আগে সিঁড়িতে ওঠবার সময় যে-মেয়ে তাকে শাসিয়ে গিয়েছে, তার কোন্ মূর্তি দেখবে সেই কথাই তখন ভাবছিল সুরেন। সে কি সুরেনকে দেখে রাগ করবে? তাকে দেখে তাচ্ছিল্য করবে? যদি আশীর্বাদ করবার সময় সুখদা মাথা সরিয়ে নেয়?

—ওরে সুখদা, ও মুখপুড়ি, কোথায় গেলি?

আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে এসে হাজির হলো সুখদা। কোনও দিকে দৃষ্টি নেই, সোজা মুখ নিচু করে একেবারে সুরেনের সামনে এসে বসলো।

মা-মণি বললে—চান করেছিস?

সুখদা কোনও কথা বললে না। মিষ্টির রেকাবিটা হাতে তুলে নিলে।

—বলি চান করেছিস তুই? কথা বলছিস না যে?

তবু কথা বললে না সুখদা। মা-মণি এবার আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো—কথা বলছিস না যে? কী হলো তোর?

সুখদা মা-মণির মুখের দিকে গোল গোল চোখ পাকিয়ে বলল—কী বলবো?

মা-মণি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—অত রাগ কীসের? অত রাগ দেখাচ্ছিস তুই কাকে? কথা তোর কানে যাচ্ছে না? আমি যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মরছি, তবু তোর কথা কানে যাচ্ছে না?

সুখদা তেজ দেখিয়ে বললে—না—

—না মানে?

সুখদা বললে—না মানে, না।

মা-মণি বসেছিল একটা চৌকির ওপর। এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে—বললি?

সুখদা গুম্ হয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলো।

—কী বললি আবার বল্?

এবার বোধহয় সুখদার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বললে—আমি পারবো না ব্রত করতে!

মা-মণির মুখে যেন কে কালি লেপে দিলে। বললে—কী বললি? ব্রত করতে পারবি না?

সুখদার মুখ আবার বোবা হয়ে গেছে!

মা-মণি তখন বোধহয় রেগে আগুন। বললে—এত বড় শয়তান তুমি যে আমার মুখের ওপর কথা? তুমি ব্রত করবে না?

সুখদা স্পষ্ট গলায় বললে—না!

মা-মণি আর নিজেকে সামলাতে পারলে না তখন। এক হাতে সুখদার চুলের মুঠিটা ধরে পিঠের ওপর গুম্ গুম্ করে কিল মারতে লাগলো। তুই এত বড় বেয়াড়া হয়েছিস যে আমার মুখের ওপর কথা?

পিঠের ওপর কিল পড়তেই সুখদা টলে বসে পড়লো মেঝের ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে পাথরের রেকাবিখানা মেঝের ওপর পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। রাজভোগ, সন্দেশ, মিহিদানা সব মাটিতে পড়ে ঘরময় ছড়িয়ে গেল। সুরেন সে-দৃশ্য দেখে ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। এ কী ঘটলো তার চোখের সামনে! কেন তাকে নিজের চোখ দিয়ে এ-সব দেখতে হলো!

—মুখপুড়ি, হারামজাদী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি তোর ভালোর জন্যে ভেবে মরছি। অসুখ নিয়ে ও-ঘর থেকে দৌড়ে আসছি, আর তোর পেটে পেটে এত শয়তানি? কেন আজ চান করিসনি বল্? কেন ব্রত করিসনি, বল্ তুই? বিয়ে না করে কি তুই আইবুড়ো মাগী হয়ে থাকবি? তোর মতলবখানা কী তুই বল্?

সুরেনের চোখের সামনে এ-দৃশ্য আর ভালো লাগছিল না। বললে—মা-মণি, আর বোকো না তুমি—

—তুই থাম্!

বলে মা-মণি সুখদার চুলের মুঠি ধরে আবার টানলে। বললে—মড়াকান্নায় আমি ভুলবো না। বল্ তোর কী মতলবখানা! বল্! ভেবেছিস্ চিরটাকাল আমি তোকে খাওয়াবো? আমি আর ক'দিন শুনি? আমি চলে গেলে কে তোকে দেখবে, তা ভাবিস না?

এত যে মার খাচ্ছে তবু কিন্তু সুখদার মুখে কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

মা-মণি তবু ছাড়বার পাত্রী নয়। চুল ধরে টেনে বসাবার চেষ্টা করলে! বললে ভেবেছিস বোবা হয়ে থাকলে আমি তোকে ছেড়ে দেবো? ওঠ্, ওঠ্ বলছি, ওঠ্—

তবু ওঠে না সুখদা।

—উঠবি না? দাঁড়া আমি দেখছি তুই উঠিস্ কিনা।

বলে গায়ে যত শক্তি ছিল তাই দিয়ে সুখদার পিঠের ওপর দুম্ দুম্ করে অবার কিল মারতে লাগলো।

এবার আর থাকতে পারলে না সুরেন। আসন থেকে উঠে মা-মণির হাতটা ধরে ফেললে।

—ছাড়, ছাড়, হাত ছাড়—

সুরেন তখনও হাত ধরে আছে। বললে—ওকে আর তুমি মারতে পারবে না মা-মণি। মারলে ওর লাগে না বুঝি?

—হাত ছাড় তুই। লাগবার জন্যই তো মারছি ওকে। মেরে ওর পিঠ একেবারে ভেঙে দেবো। বল্ মুখপুড়ি, তোর মতলবখানা কী তাই বল! আমি যত ওর বিয়ের জন্যে ভেবে মরছি উনি তত বিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন!

সুখদা এবার এক ঝট্‌কা দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। বললে—আমি যদি বিয়ে না করি তো তোমার কী?

—তার মানে? তুই বিয়ে করবি না?

—না!

মা-মণির মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। সুরেনও সুখদার সেই চেহারা-খানা দেখে হতবাক্ হয়ে গেল। যেন এই রূপটাই সুখদার আসল রূপ। সেদিন অন্ধকারের আড়ালে যে-সুখদাকে দেখেছিল সুরেন. এ যেন সেই সুখদা।

—বিয়ে যদি না করিস তো কী করবি?

—কিছু করবো না। তুমি আমার বিয়ে দিও না।

মা-মণির সর্বাঙ্গ তখন থর-থর করে কাঁপছে। চোখের সামনে সুখদাকে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যে, এই একেই ছোটবেলা থেকে এ-বাড়িতে মানুষ করেছে মা-মণি!

তখনও মিষ্টিগুলো মেঝের ওপর গড়াচ্ছে। ঘরের এক কোণে তরলা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সমস্ত বাড়িটা যেন এক মুহূর্তে নির্লজ্জ নিরাভরণ হয়ে সুরেনের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করে উঠলো।

তখনও মা-মণি বলছে—কেন? বিয়ে করবি না তুই কেন, কী হয়েছে?

—আমি এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবো না।

মা-মণি যেন কী ভাবলে। তারপর বললে—তাহলে ফড়েপুকুরে তুই-ই বেনামী চিঠি দিয়েছিস!

সুখদা কিছু উত্তর দিলে না এ-কথার।—বল্! কথার উত্তর দে! কে তাদের উড়ো চিঠি দিয়েছে, বল্!

সুখদা বললে—আমি কী জানি কে দিয়েছে?

—তাহলে তারা সে-চিঠি ফেরত দিলে কেন আমাকে? এত খুঁজে খুঁজে আমি পাত্র ঠিক করলাম আর তুই সে-সম্বন্ধ ভেঙে দিলি? এতই যদি তোর অপছন্দ তো আমাকে আগে বললি না কেন? বল্, কেন আগে বললি না?

সুরেন কী করবে তখনও বুঝতে পারছিল না। মা-মণিদের পারিবারিক কথাবার্তার সাক্ষী থাকা উচিত নয় তার পক্ষে। সে এ-বাড়ির বাইরের লোক। এ-সব কথা শোনার অধিকারও তার নেই। তার একবার মনে হলো এখান থেকে সে চলে যায়।

মা-মণি তখন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে— বল্, কে চিঠি দিয়েছে? কাকে দিয়ে চিঠি দেওয়ালি? বল্—

বলে মা-মণি সুখদার চুলের মুঠি ধরতে গেল আবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

সুখদা মা-মণির হাতটা ধরে ফেলেছে।

—কী? এত বড় আস্পর্ধা? তুই আমার গায়ে হাত দিস্। আমি তোকে এতদিন খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলুম আর আমার ওপরেই তোর তম্বি?

সুখদাও তখন লজ্জা-শরমের বালাই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। বললে—তুমি রাখো তোমার সতীপনা। তোমার লজ্জা করে না আমার হেনস্থা করতে? ভেবেছ তোমার কীর্তিকলাপ আমি জানি না?

—তবে রে—

মা-মণি সেই অবস্থাতেই দু'হাত দিয়ে সুখদাকে শায়েস্তা করবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুরেন দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থামিয়ে দিতে গেল। কিন্তু তার আগেই সুখদার একটা হাত আচম্‌কা এসে লাগলো মা-মণির কপালে। আর সঙ্গে সঙ্গে মা-মণি ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে!

সর্বনাশ, সবে অসুখ থেকে উঠেছে মা-মণি। আর তারপর ওই বয়েস! পড়ে গিয়ে মা-মণির চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে হয়ে কড়িকাঠের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে রইলো।

সুরেন নিচু হয়ে মা-মণির মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—মা-মণি, তোমার লেগেছে?

মা-মণি ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে শুধু উচ্চারণ করলে—সুরেন—

যেন অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করে শব্দটা বেরোল। সুরেন আবার ডাকলে—মা-মণি, ও মা-মণি—তারপর চেয়ে দেখল পেছন ফিরে। সুখদা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। তার ওপাশে তরলা। তারা দু'জনেই যেন মা-মণির এই আকস্মিক বিপদপাতে হতবাক্ হয়ে গেছে। কারোরই যেন সংবিৎ নেই। মা-মণি একবার ওঠবার চেষ্টা করলে।

সুরেন বললে—কোথায় লেগেছে তোমার মা-মণি?

মা-মণি ক্ষীণ স্বরে বললে—আমি উঠতে পারছি না—

সুরেন তরলার দিকে চেয়ে বললে—দাঁড়িয়ে কী দেখছো তোমরা, ধরো না। মা-মণি যে উঠতে চাইছে—

তরলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

সুরেন তাকে বললে—তুমি একটা হাত ধরো, আমি এই হাতটা ধরছি—

দু'জনে ধরাধরি করতেই মা-মণি সাবধানে উঠে বসলো। তারপর দু'জনের কাঁধে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সুরেন বললে—চলো মা-মণি, তোমার ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসি তোমাকে—

সুখদা তখনও কাঠ হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে। তরলা আর সুরেনের কাঁধের উপর ভর দিয়ে মা-মণি তার নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলো। প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস। এককালে গায়ের মাংসগুলো আঁট ছিল নিশ্চয়ই। তখন সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল মা-মণির। কিন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সব ঝুলে পড়েছে। তার ওপর জ্বর থেকে উঠেছে আজ। মা-মণি হাঁফাচ্ছিল। মাঝখানে বারান্দায় একবার জিরিয়ে নিলে। তারপর আবার চলতে লাগলো।

বিছানার ওপর শুয়ে যেন একটু স্বস্তি পেলে মা-মণি। হাঁফাতে লাগলো অনেকখানি পরিশ্রমের পর।

সুরেন মুখের ওপর নিচু হয়ে বললে—মামাকে একবার ডাকবো মা-মণি? যদি ডাক্তার ডাকতে হয়!

মা-মণি ঘাড় নাড়লো।

—যদি তোমার হাড়-টাড় কিছু ভেঙ্গে গিয়ে থাকে?

মা-মণি আবার ঘাড় নাড়লো। বললে—না, কিছু করতে হবে না। আমি ভালো আছি—তোরা এখন যা—

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। খানিক পরে বললে—তোমার শরীর খারাপ, তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর মা-মণি—

মা-মণি বললে—তোর লেখা-পড়া আছে, তুই যা—

—কিন্তু তুমি যে একলা। তোমাকে কে দেখবে?

মা-মণি বললে—চিরকাল যে দেখে এসেছে সে-ই দেখবে—

—চিরকাল কে তোমাকে দেখে এসেছে?

মা-মণি বললে—তুই আর জ্বালাসনি আমাকে, তুই এখান থেকে যা দিকিনি—আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই—

সুরেন একটু দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর বললে—তাহলে তুমি কথা দাও, দরকার পড়লে তুমি আমায় ডেকে পাঠাবে?

মা-মণি বোধহয় বিরক্ত বোধ করছিল। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ খবর দেবো, তুই যা দিকি এখন আমার সামনে থেকে—

বলে মা-মণি মুখ ফিরিয়ে শুলো। সুরেন আর দাঁড়ালো না সেখানে। তরলার দিকে চেয়ে বললে—তুমি একটু মা-মণিকে দেখো তরলা, জানো! আর বাদামী কোথায়? তাকেও একবার ডেকে এনে কাছে বসে থাকতে বলো। তুমিও মা-মণির কাছে কাছে থেকো, বুঝলে?

তরলা সে-কথার কিছু উত্তর দিলে না। সুরেন চলেই আসছিল। আবার পেছন ফিরে তরলার দিকে চেয়ে বললে—যদি মা-মণি ডাকে তো ধনঞ্জয়কে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠিও, বুঝলে?

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘরের বাইরেই বারান্দা। লম্বা বারান্দা দিয়ে সোজা গিয়ে ডান দিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়েই নিচের একতলায় যাবার রাস্তা। সিঁড়ি দিয়ে সুরেন নিচের দিকেই নামছিল। হঠাৎ কী মনে হলো, একবার সামনের বড় ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেল। সেই ঘরখানাতেই ব্রতর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ঘরখানার সামনে যেতেই দেখলে সুখদা ঠিক সেই জায়গাটায় তখনও তেমনি করে পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেনকে দেখতে পেয়েই সুখদা চোখটা মাটির দিকে নামিয়ে নিলে। সুরেন আস্তে আস্তে সুখদার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দরজার দু'দিকের চৌকাঠটা দু'হাতে ধরে দাঁড়ালো।

বললে—তোমার কি আক্কেল বলে কিছু নেই? দেখছো বুড়ো মানুষ, তাকে ওইভাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে আছে?

সুখদা একবার শুধু মুখ তুলে চাইল। কিন্তু কিছু বললে না।

সুরেন আবার বললে—আমার সঙ্গে তুমি যা করো তা করো, আমি তাতে কিছু মনে করি না। আর আমি এ-বাড়ির কে যে মনে করতে যাবো! কিন্তু মা-মণি তো ছোটবেলা থেকে তোমায় মানুষ করেছে, তার সম্মান রেখে তো কথা বলতে হয়!

সুখদা এ-কথারও কোনও উত্তর দিলে না।

সুরেন বললে—তুমি বিয়ে করবে না সে-কথা মা-মণিকে সোজাসুজি বললেই তো পারতে। অত ভাণ করবার কী দরকার ছিল? ব্রত করবার নাম করে মিছিমিছি আমাকে গোটাকতক মিষ্টি খাইয়ে কার লাভটা হলো শুনি?

তোমার না আমার? না মা-মণির?

একটু থেমে সুরেন আবার বলতে লাগলো—কলকাতা শহরে আমি ছাড়া কি বামুন আর কেউ নেই? হাজার হাজার বামুন আছে! তাদের কাউকে ডেকে এই থিয়েটার দেখাতে পারতে! আমাকে কেন মিছামিছি...

কিন্তু কথার মাঝখানেই সুখদা ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপ্রিয় কথাগুলো শুনতে হয়তো তার আর ভালো লাগছিল না।

সুরেন থেমে গেল কথা বলতে বলতে। চেয়ে দেখলো মেঝের ওপর সেই ভাঙা পাথরের রেকাবিখানা তখনও পড়ে আছে। আর পাশেপাশে সেই রাজভোগ, সন্দেশ, লেডিকেনি, মিহিদানাগুলো ছত্রখান হয়ে ছড়ানো রয়েছে চারদিকে। কয়েকটা কানমাছি কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে এসে ভোঁ ভোঁ করে তার ওপর ঘোরাফেরা করছে!

সুরেন আস্তে আস্তে আবার নিচের দিকে নামতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার যেন কেমন মনে হলো সিঁড়িগুলো আরো নিচু হয়ে গেছে। যেন অনেকখানি পা বাড়িয়ে তবে পরের ধাপে নামতে হয়।

সকাল বেলার ঘটনার পর মনটা খারাপ হয়ে ছিল। দুপুর বেলা আর পড়ায় মন বসতে চাইল না। জামা-কাপড় বদলে নিয়ে সুরেন বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। আর ভালো লাগছিল না কিছু তার। কেন যে এ-বাড়িতে তাকে মামা নিয়ে এসেছিল কে জানে। এখানে না-এলেই যেন ভালো হতো।

বড়-রাস্তায় ট্রাম-বাস হু-হু করে চলেছে। কিন্তু সে-সব দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সোজা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলো সে। এ-রকম হেঁটে বেড়ানো ভালো। রাস্তাটা যেন বড় স্বাধীন। ধরা-বাঁধা রুটিনের গণ্ডী টেনে জীবনকে আঁকড়ে থাকা নয়। কাউকে বিশেষ করে এখানে খাতিরও করতে হয় না, কেউ খাতির চায় না। কেউ জিজ্ঞেস করবে না এখানে তোমার নাম-ধাম কুলজি!

হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখলে একেবারে শ্যামবাজারের মোড়ের ওপর এসে গেছে। চোখ দুটো ঘুরে ঘুরে একটা জিনিস খুঁজতে লাগলো। সেই ক্যালেন্ডারের দোকানটা. কোথায় গেল সেটা? দোকানটা কি উঠে গেল? সেই স্বামী বিবেকানন্দের ছবি, তার পাশে ছিল ঘোড়ায় চড়া [illegible] [illegible]

—কী রে! সুরেন? তুই এখানে? ফুটপাতের দিক থেকেই আওয়াজটা এসেছিল। সেদিকে মুখ ফেরাতেই দেখলো গাড়ির ভেতর বসে আছে সুব্রত। সুব্রত রায়!

সুরেনকে দেখে সুব্রত রাস্তায় নেমে এল। বললে—এখানে একলা-একলা কী করছিস রে?

সুরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—ভালো লাগছিল না, একটু বেড়াচ্ছি—

—তা বেড়াবার আর জায়গা পেলি না? এই ভিড়ের মধ্যে কী-রকম

বেড়ানো?

সুরেন বললে—মনটা ভালো নেই—

—কেন, মন ভালো নেই কেন রে? কী হলো তোর? পড়াশোনা হচ্ছে না?

সুরেন বললে—সে তুই বুঝবি না।

সুব্রত বললে—আয় ওঠ, গাড়িতে ওঠ—

সুরেন বললে—এখন আর ভালো লাগছে না ভাই কিছু। শুধু একলা থাকতে ইচ্ছে করছে। পড়তে বসেছিলুম, কিন্তু মন লাগলো না। সমস্ত সকালটা ছটফট করেছি।

—তুই যে দেখছি এই বয়েসেই বুড়ো হয়ে গেলি। সিনেমা দেখবি? এই-ই তো সিনেমা দেখবার বয়েস। একটা ভালো ছবি এসেছে লাইট-হাউসে, চল্—

—তুই যা ভাই, আমি কখনও সিনেমা দেখি না। তার চেয়ে কতদূর তোর প্রিপেয়ারেশন হলো বল্! হিস্ট্রী শেষ করে ফেলেছিস? আমি যা পড়ছি সব ভুলে যাচ্ছি—

শেষ পর্যন্ত জোর করে সুব্রত গাড়িতে তুলে নিলে সুরেনকে। তারপর কোথা দিয়ে গাড়ি চলছিল কিছু খেয়াল ছিল না সুরেনের। সুব্রতরা কী বুঝবে! বেশি ভাবা-টাবা পছন্দ করে না সুব্রতরা। দেবেশরাও ভাবে না। শুধু কথা বলে। অতই যদি কথা বলবে তো ভাববে কখন? মিনিস্টারের ছেলের বন্ধু হয়েও সুরেনের যেন কেমন ভালো লাগে না। কিছু যদি ভালো লাগতো তো সে-ও দেবেশদের মত পার্টি করতো, সুব্রতদের মত সিনেমা দেখতো, কিন্তু কেন যে কিছুই ভালো লাগে না তাও বুঝতে পারে না সে। এই যে কলকাতার মত শহরে সে আশ্রয় পেয়েছে বড়লোকের বাড়িতে, এই যে মিনিস্টারের ছেলের গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে, এটাও তো ভালো-লাগার পক্ষে একটা যথেষ্ট কারণ হতে পারতো। কিন্তু তা হলে খুঁজে বার করতে হয় কী সে চায়, কী পেলে তার ভাল লাগে! নিশ্চয় কিছু জিনিসের অভাব আছে তার; কী সে জিনিস? সেটার নাম কী? কী রকম চেহারা তার?

সুখদাকে কি তার ভাল লাগে?

কথাটা ভাববার মত। ভাল লাগলে তো বার বার তাকে দেখতে ইচ্ছে করতো। হয়তো ভয় করে। সুখদাকে নিশ্চয় ভয়ই করে তার। যাকে ভয় করে তাকে কি ভাল লাগে? অথচ মা-মণিকে তো দেখতে ইচ্ছে করে, মা-মণিকে ভালোও লাগে। বুড়োবাবুকেও ভালো লাগে, আর ভালো লাগে এই কলকাতা শহরকে।

হঠাৎ সামনের দিক থেকে একটা প্রোসেসান আসতেই ভাবনায় বাধা পড়লো।

লাল লাল কাপড়ের ওপর লেখা রয়েছে 'ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। পেছনে একদল লোক চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে।

সুব্রত বললে—জানিস, এরা বদমাইস্ লোক সবাই—

—বদ্‌মাইস্? কেন? কী করে এরা?

সুব্রত বললে—এরাই যত সব গণ্ডগোল করছে—দেখছিস না, রাস্তার বাস-ট্রাম সব বন্ধ করে দিচ্ছে। মানুষের কত অসুবিধে করছে—

সুরেন বললে—ওরা বোধহয় ধর্মঘট করবে—

সুব্রত বললে—ধর্মঘট করছে করুক না, কিন্তু রাস্তা-বাস-ট্রাম এভাবে

বন্ধ করে কেন?

মিছিলের লোকগুলো চিৎকার করতে করতে চলে গেল। সাধারণ ভদ্রলোকদের মত দেখতে। যেদিন থেকে কলকাতায় এসেছে সুরেন সেই দিন থেকেই এদের দেখে আসছে। তখন কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ্ থাকতো ওদের হাতে। তখন ওদের মুখের বুলি ছিল—'বন্দে মাতরম্'। তারপর 'বন্দে মাতরম্' আর শোনা যায় না। এখন 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' হয়েছে। মাধব কুণ্ডু লেন থেকে স্কুলে যাবার পথেও ওদের দেখেছে, আবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার পথেও দেখেছে। তখন সেক্রেটারি ছিলেন সুব্রতর বাবা। পুণ্যশ্লোক রায়। তিনি সাবধান করে দিতেন ছেলেদের। হেডমাস্টারকে বলে দিতেন—ছেলেদের যেন ও-সব ব্যাপারে জড়াতে দেবেন না।

সে-সব দিনে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলেই মামা খুব ভাবতো।

বলতো—কী রে, এত দেরি হলো তোর? কোথায় ছিলিস?

রাস্তায় এক-একদিন দোতলা বাসগুলো পুড়তো। ঢিল ছুঁড়তো রাস্তার লোকেরা। পুলিশ আসতো, গুলি চলতো। তখন সমস্ত শ্যামবাজার পাড়াটা থমথম করতো। রাত্রে কারফিউ হতো। সবাই সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত বাড়িতে বসে থাকতো। মা-মণি ডেকে পাঠাতো মামাকে। জিজ্ঞেস করতো—কী হয়েছে ভূপতি, কীসের গণ্ডগোল ওসব?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—গুলী চলেছে শ্যামবাজারের মোড়ে—

—কেন, গুলী চলেছে কীসের জন্যে? কী হয়েছিল?

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—হতভাগা ছেলে-ছোকরারা সবাই বাসে-ট্রামে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল—

মা-মণি বলতো—বেশ করেছে গুলী চালিয়েছে—

যেদিন সুখদাকে দেখতে আসবার কথা থাকতো সেদিন কেউ আর আসতে পারতো না। ভূপতি ভাদুড়ী একবার ঘর একবার বার করতো। বাহাদুর সিং সেদিন সেজেগুজে বন্দুক নিয়ে গেটে-এ পাহারা দিত। খাবার-দাবার তৈরি থাকতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই আসতে পারতো না। সুখদাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে মা-মণি বসিয়ে রাখতো। তারপর যখন শুনতো রাস্তায় পুলিশের গুলী চলেছে তখন বোঝা যেত কেউ আর আসবে না। তখন আবার সাজগোজ খুলে আটপৌরে শাড়ি পরে থাকতো।

এ-সব ঘটনা তখন ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক।

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে যেত। বলতো—কী হাল হলো কলকাতার! বেটারা কলকাতাটা একেবারে ছারখার করে দিলে রে—

সুব্রতর গাড়িটা তখন সুকিয়া স্ট্রীট পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। ওদিক থেকে অন্য গাড়িগুলো সামনের দিকে আসছে। দলে দলে সব গাড়িগুলো যেন জোট বেঁধে এগিয়ে আসছে। অন্য একটা গাড়ির ড্রাইভার মুখ বার করে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ওদিকে যাবেন না, গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, ওদিকে গুলী চলেছে—

সুব্রত বললে—সব মাটি করে দিলে—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন?

সুব্রত বললে—ওই তো সব কমিউনিস্টদের কাণ্ড! সকলের রাগ বাবার ওপর, যেন বাবাই গুলী করছে—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ধর্মতলায় তোর কিছু দরকার ছিল?

—হ্যাঁ রে! ওই জন্যেই তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। শ্যামবাজারের মোড়ে 'ইউনিভার্সাল টেলর্স'-এর দোকানে গিয়েছিলাম সুটের অর্ডার দিতে। দোকানটা বন্ধ দেখে ধর্মতলায় যাচ্ছিলাম। ভাবলাম সেলিম-মহম্মদের দোকানে সুটের অর্ডার দেবো—তাও হলো না।

—সুট কী হবে তোর হঠাৎ?

—সুট দরকার নেই? বলছিস কী তুই? কত পার্টিতে যেতে হয়, কত ফরেনাররা বাড়িতে আসে, তখন সুট না থাকলে লজ্জা করে যে!

সুরেন আরো অবাক হয়ে গেল, বললে—কেন, সুট না পরলে লজ্জা করবে কেন? তোর বাবা তো সুট পরে না—

—কে বললে পরে না? বাবার কত সুট আছে জানিস? বাবা যখন আমেরিকায় যায়, লন্ডনে যায় তখন তো শুধু সুট পরে। বাবা তো বিলেতের দরজিকে দিয়ে সুট করায় বরাবর—

পুণ্যশ্লোকবাবুকে কখনও সুট-পরা অবস্থায় দেখেনি সুরেন। কলকাতায় মীটিং-এ সব সময় খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুকে খুব ভালো দেখায়। যেমন ফর্সা রং, তেমনি স্বাস্থ্য। যখন বক্তৃতা দেন তখন লোকে মুগ্ধ হয়ে শোনে। পুণ্যশ্লোকবাবু বলেন—মানুষের দুর্গতি যে চরম সীমায় উঠেছে তা দেখে আমি অভিভূত হয়ে আছি। গরীব লোকের মুখে খাদ্য যেদিন দিতে পারবো সেদিন বুঝবো জীবনে সামান্য কিছু কাজ করতে পেরেছি। আর শুধু কি খাদ্য? গান্ধীজী বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষকে যেদিন তার মর্যাদা দিতে পারবো সেইদিনই বুঝবো রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জিনিসটা বড় শক্ত! গান্ধীজীর রামরাজ্যের কল্পনা সার্থক করবার জন্যেই আজ কংগ্রেস দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আপনারা সবাই মিলে এগিয়ে আসুন। আমাদের হাতে হাত মেলান। আপনাদের সহযোগিতা পেলেই তবে আমরা গান্ধীজীর স্বপ্ন সফল করতে পারবো। জয় হিন্দ্!

চারদিক থেকে চটাপট-চটাপট হাততালি পড়তো। সুরেনও হাততালি দিত। আর স্বপ্ন দেখতো কবে একদিন গান্ধীজীর কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে। আশেপাশের যত লোক সবাই বলতো—জয় হিন্দ—

আশ্চর্য, 'বন্দে মাতরম' কথাটা উঠেই গেল। তার জায়গায় এল 'জয় হিন্দ' আর 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'!

হায় রে, আজও মনে আছে মানুষকে দলে টানাটানির সে কী উত্তেজনা! দেবেশ রাগ করতো। বলতো—ও-সব ধাপ্পাবাজিতে কেন ভুলিস? গান্ধীটাই তো যত সর্বনাশের মূল!

—গান্ধীর নিন্দে করিসনি তুই, ও আমার ভাল লাগে না—

দেবেশ বলতো। গান্ধীর নিন্দে করতে বারণ করছিস তুই, কিন্তু দেখে আয়, যারা গান্ধীর ভক্ত তারাই ভেতরে-ভেতরে গান্ধীর কত বড় শত্রু! গান্ধী তো ছোট নেংটি পরে থাকতো, তাহলে তার চেলারা অত বাবুয়ানি করে কেন? তাদের বাড়িতে মেয়েদের পিয়ানো বাজনা শেখানোর জন্যে মেমসাহেব রাখা হয় কেন?

—তুই পর্মিলির কথা বলছিস?

দেবেশ বলতো—হ্যাঁ, পর্মিলির কথাই তো বলছি। এদিকে তো বাইরে ওরা গান্ধীর রামরাজ্যের কথা বলে বেড়াস, আর [illegible] পর্মিলি হোটেলে গিয়ে

মদ খায়, তা জানিস? বিলিতি হোটেলে গিয়ে বিলিতি মদ খায়—

—মদ?

সুরেন চমকে উঠেছিল। মেয়েমানুষ মদ খায় নাকি? তুই পমিলিকে মদ খেতে দেখেছিস?

দেবেশ বলেছিল—হ্যাঁ রে। শুধু মদ খাওয়া নয়, মদ খেয়ে টলতে দেখা গেছে. একেবারে খাঁটি বিলিতি মদ!

—তুই নিজের চোখে দেখেছিস?

দেবেশ বলেছিল—আমি নিজের চোখে দেখব কেন, আমাদের পার্টির লোকেরা দেখেছে। ফরেনার ছেলেদের সঙ্গে তাকে সেখানে নাচতে দেখেছে! তাদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করতে দেখেছে—

সুরেন বলেছিল—সব বাজে কথা, আমি ও-সব বিশ্বাস করি না। ওদের ওপর তোর রাগ আছে তাই তুই বলছিস। ও কখনও ও-রকম হতে পারে না।

সেদিন সত্যিই দেবেশের কথায় রাগই করেছিল সুরেন। বড়লোক বলেই দেবেশ সুব্রতদের দেখতে পারে না তাই-ই মনে হয়েছিল। তাই যেদিন দেবেশ হঠাৎ মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এসেছিল সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল সুরেন।

দেবেশ বলেছিল—কেমন, আমি যা বলেছিলুম তখন তা বিশ্বাস হলো তো? এখন তো ঘুঁষি মেরে তোর নাক ভেঙে দিয়েছে—

এর পর সুরেনের মুখে আর কোনো কথা বেরোয়নি!

দেবেশ বলেছিল—সেই জন্যেই তো ওদের সঙ্গে তোকে মিশতে বারণ করেছিলুম। ওরা তো ওই রকমই। সব বড়লোকেরাই ওদের মতন। মদ খেয়ে নেশা না করলে কেউ কাউকে ঘুষি মারতে পারে? নিশ্চয় খুব মদ খেয়েছিল।

সুরেন বললে—না রে, মদ খায়নি। আমি বলছি, তুই বিশ্বাস কর, সুব্রতর সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে আমার মুখে এসে ঘুঁষিটা লেগেছিল—

—আরে তুই বললেই আমি বিশ্বাস করবো ভেবেছিস? আমি ওদের চিনি না?

দেবেশ অনেক কথা বলেছিল। বরাবর বেশি কথা বলা স্বভাব দেবেশের। এতদিন দেবেশের কথার কোনও গুরুত্ব দেয়নি সে। কিন্তু এবার যেন একটু-একটু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো। মনে হয়েছিল ওর বাবা যখন খদ্দর পরে, তার মেয়ে কেন মেমসাহেবকে দিয়ে পিয়ানো শেখে। কেন অত সাহেবিআনা।

হঠাৎ সুব্রত বললে—চল্, আমাদের বাড়ি চল্—

সুরেন বললে—তোদের বাড়ি?

—কেন? আমাদের বাড়ি যেতে তোর আপত্তি কীসের?

—কিন্তু তোর দিদি যদি কিছু বলে আবার?

—কে? পমিলি? পমিলি কী বলবে? আমি কি পমিলিকে কেয়ার করি? তুই সেদিন দেখলি না, রঘুয়াকে আমি আবার রেখে দিলুম। দিদি তো তাকে ডিসচার্জ করে দিয়েছিল।

গাড়িটা ঘোরাতে হুকুম দিলে সুব্রত। তখনও প্রোসেসানটা চলেছে সার বেঁধে বেঁধে। চিৎকার করছে ঘুঁষি বাগিয়ে দেখাচ্ছে। সমস্ত রাস্তার লোকজনকে যেন ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য। যেন তারা যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। সবাই ধর্মতলার দিক থেকে মীটিং করে ফিরছে। আর কি, এবার সবাই তৈরি হও। আমরা জাগছি।

হঠাৎ দেখা গেল দেবেশকে! দেবেশও আবার একজন লীডার না কি?

দেবেশ দলের মধ্যে নেই। কিন্তু পাশে পাশে চলেছে চিৎকার করতে করতে। একবার দেবেশ চিৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আর সঙ্গে সঙ্গে লাইনের লোকেরা সুরে সুর মিলিয়ে বলছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সুরেনকে দেখতে পায়নি দেবেশ। সুব্রতকেও দেখতে পায়নি। সুরেন বললে—ওই দ্যাখ সুব্রত, দেবেশ যাচ্ছে—

সুব্রত দেখলে। কিন্তু কিছু বললে না। সেই দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

সুরেন বললে—দেবেশ আমাদের দেখতে পায়নি, ওকে ডাকবো?

সুব্রত বাধা দিলে। বললে—না।

সুরেন বললে—ও আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল কাল।

—তোদের বাড়িতে গিয়েছিল? কেন? তোদের বাড়িতে তো কখনও যেত না। হঠাৎ কী জন্যে গিয়েছিল? বই চাইতে?

সুরেন বললে—না, তা নয়, শুনেছে আমাকে পমিলি মেরেছে তাই জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল কী হয়েছে—

—তুই কী বললি?

সুরেন বললে—আসলে সে-জন্যে যায়নি। গিয়েছিল আমাকে ওদের পার্টির মেম্বার করে নিতে।

—পার্টির মেম্বার? খবরদার বলছি ওদের পার্টির মেম্বার হোসনে তুই। ওরা আমাদের দলের নয়। ওরা আমাদের দেখতে পারে না। আমরা যে আরাম করে আছি, এটা ওদের সহ্য হয় না। তাই ওরা দল পাকাচ্ছে।

সুরেন বললে—কিন্তু ওরা যে-সব কথা বলে তা তো মিথ্যে নয়?

—কী কথা বলে ওরা?

সুরেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেল। পমিলির মদ খাওয়ার কথাটা বলতে যেন কেমন বাধলো। পমিলির ভাই তো সুব্রত। বোনের নিন্দের কথা বলাটা ঠিক হবে না। কে চায় নিজেদের নিন্দে শুনতে? প্রশংসাটা শুনতে সবারই ভালো লাগে।

সুব্রত কিন্তু ছাড়লে না। বললে—কই, কী বলে বললি না তো?

সুরেন বললে—সে তোর শুনে দরকার নেই—

—না তুই বল্। বল্ না কী বলে ওরা?

সুরেন বললে—সে-সব আমি বিশ্বাস করিনি ভাই। আমি শুধু চুপ করে শুনে গিয়েছি—

সুব্রত তবু ছাড়লে না। বললে—না, তোকে বলতেই হবে। কী বলেছে —বল্।

সুরেন বললে—কিন্তু তুই আগে প্রতিজ্ঞা কর তোর দিদিকে সে-কথা বলবি না?

—না, বলবো না।

—ঠিক বলছিস্ তো? কিছুতেই বলবি না বল্?

সুব্রত বললে—আমি কেন মিছিমিছি বলতে যাবো। আমার কীসের বলবার দায়? তা আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে?

সুরেন বললে—না, তোর বিরুদ্ধে নয়—

—তাহলে পমিলির বিরুদ্ধে?

—হ্যাঁ।

—কী বলেছে?

সুরেন বললে—বলেছে তোর দিদি পমিলি নাকি হোটেলে গিয়ে মদ খায়!

সুব্রত কথাটা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর যেন কিছুই য়নি এমনি ভাবে বললে—আরে দূর, এই কথা! এই কথা বলতে তোর এত ভয়, এত লজ্জা?

বলে আবার হাসতে লাগলো হো-হো করে। যেন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে যাবে সে!

সুরেন বোকার মত চেয়ে রইলো সুব্রতর দিকে। সুব্রতর নিজের মায়ের পেটের বোন মদ খায় শুনেও এতটুকু বিচলিত হলো না।

সুব্রত থেমে বললে—তুই সত্যিই হাসালি দেখছি। মদ খায় তাতে দোষ কী? আমাদের বাড়িতে তো বাবাও মদ খায়। আমাদের বাড়িতে যখন আমেরিকানরা আসে, গেস্ট্‌রা আসে তখন তো পার্টি হয়! কক্‌টেল-পার্টি!

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—কক্‌টেল-পার্টি? কক্‌টেল-পার্টিটা কী জিনিস?

সুব্রত বললে—মদ খাওয়ার পার্টি—বড় বড় সাহেবরা বাড়িতে আসে বলে তো আমাদের বাড়িতে মদের বোতল থাকে। সেই বোতল থেকে ঢেলে-ঢেলে মাঝে-মাঝে পমিলি খায়, মাঝে-মাঝে আমিও খাই—

সুরেন যেন বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেছে, বললে—তুইও খাস?

সুব্রত বললে—আরে, আমি একলা কেন? কে না খায়। কে না খাচ্ছে? বিলেতে তো কেউ জল খায় না, জলের বদলে সবাই বীয়ার খায়। বীয়ারও তো মদ। মদ খেলে তো শরীর ভাল হয়। তুই ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করিস—

সুরেনের মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরোচ্ছে না।

সুব্রত বলতে লাগলো—আসলে তুই এখনও পাড়াগেঁয়ে রয়ে গেলি রে, এখনও তুই মানুষ হলি না—আজকে তুই একটু খাবি?

সুরেন বললে—কিন্তু তোর বাবা জানে যে তোরা খাস? তোর বোন পমিলি খায়?

—দূর, বাবা জানবে কী করে? আর সবাই জানে। রঘুয়া জানে! ওরাই তো সোডা ঢেলে দেয়, আর তাছাড়া মদ তো শুধু খেতে নেই। মদের সঙ্গে স্ন্যাক্‌স্‌ খেতে হয় যে—

সুরেন বললে—স্ন্যাক্‌স্‌ মানে?

সুব্রত বললে—মানে কিছু ভাজাভুজি। আলু ভাজা কিংবা মুরগী ভাজা, যা হোক একটা কিছু—তুই খাবি আজ?

সুরেন ভয় পেয়ে গেল। বললে—না ভাই, জানতে পারলে আমার মামা বকবে!

—তোর মামা জানতে পারবে কেন? ভালো করে পান-টান খেয়ে এলাচ-টেলাচ চিবিয়ে বাড়ি যাবি।

সুরেন বললে—দরকার নেই ভাই। তার চেয়ে আমি এখানেই নেমে যাই। শেষকালে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়বো, হয়তো টলবো খুব, সবাই টের পেয়ে যাবে।

—দূর, কে বললে টের পাবে! এই যে আমি মাঝে-মাঝে খাই, এই যে পমিলিও খায়, বাবা কি তা টের পায়? বাবা জানতেই পারে না মোটে—

সুরেন বললে—না ভাই, আমি দেখেছি মদ খেলে মানুষের কী অবস্থা হয়, তখন আর জ্ঞানই থাকে না—

সুরেনদের মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির সামনে দিয়ে অনেক মাতালকে যেতে দেখেছে সে। রাত ন'টা দশটার পর তারা টলতে-টলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটে।

সুরেন বললে—আমি এখানে নেমে পড়ি ভাই—

কিন্তু ততক্ষণে সুব্রতর গাড়িটা তাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। সুব্রত সুরেনের হাতটা ধরে বললে—আয়, চলে আয়—

প্রমীলা রায় কী করে পার্মিলি হলো তার একটা ইতিহাস আছে। পুণ্যশ্লোক রায় তখন সবে আরম্ভ করেছেন দেশের কাজ। পাড়ার স্কুল থেকে শুরু করে দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজোর সেক্রেটারি আর প্রেসিডেণ্ট হওয়া শুরু করেছেন।

সেই সময়েই শুরু হয়েছিল তাঁর ফ্যামিলির বাইরের জগতের সঙ্গে মেলা-মেশা। বার কয়েক ইংলণ্ড গেলেন। একবার রাশিয়াও ঘুরে এলেন। পার্টির ভেতরে-বাইরে পাড়ায় তাতে ইজ্জত বাড়লো। তখন থেকে ফরেনার কেউ এলেই তাকে নেমন্তন্ন করতে লাগলেন বাড়িতে! তাদের বাড়িতে এনে ককটেল পার্টি দিতে লাগলেন। তারা পরিচয় করতে চাইল ছেলের সঙ্গে, পরিচয় করতে চাইল মেয়ের সঙ্গে।

ছেলের নামটা তবু তারা উচ্চারণ করতে পারলো। কোনও রকমে বলতে পারতো—সুব্রট। কিন্তু প্রমীলার নাম তাদের জিভে আটকে গেল। তারা বলতে লাগলো—প্যামেলা।

সেই প্যামেলা থেকেই আস্তে আস্তে পার্মিলিতে দাঁড়িয়ে গেল। স্কুলে ভর্তি হবার সময়ও সেই পার্মিলি রয়ে গেল। তারপর সর্বত্রই পার্মিলি। সেই পার্মিলিই তখন বড় হয়েছে। বাড়িতেও আদর, স্কুলেও আদর। আদর পেয়ে-পেয়ে পার্মিলি যখন আরো বড় হলো তখন আর তাকে পায় কে। তখন তার ভক্ত-সংখ্যাও বেড়েছে, তাকে আদর করবার লোকেরও অভাব নেই। তারপর যখন থেকে পুণ্যশ্লোক রায় মিনিস্টার হয়েছেন তখন থেকে পার্মিলি যায় আকাশের চাঁদ হয়ে উঠেছেন—

নিচের ঘরেই বসতে যাচ্ছিল সুরেন।

সুব্রত বললে—না, ওপরে আয়—

—ওপরে?

সুরেনের কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। ওপরে যদি সুব্রতর দিদি থাকে?

সুব্রত বললে—দিদি তো এখন কলেজে রে—

সুরেন বললে—তাহলে তোর দিদি আসবার আগেই কিন্তু চলে আসবো ভাই—

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সুব্রত তাকে কোন দিক দিয়ে কোন দিকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালো। তারপর ডাকলে - রঘুয়া-

রঘুয়া আসতে সুব্রত বললে—বাবা বাড়িতে নেই তো?

রঘুয়া বললে—নেই—

—আর দিদি?

—দিদিমণিও নেই।

সুব্রত বললে—তাহলে একটা কাজ কর। দুটো কাচের গেলাস দিয়ে যা, আর দুটো সোডার বোতল নিয়ে আয়। আর এই নে একটা টাকা। মোড়ের দোকান থেকে তেলেভাজা নিয়ে আয় তো গরম-গরম—আট আনার তেলে-ভাজা নিয়ে আসবি—

সুরেন ভয়ে-ভয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছিল। এইটেই সুব্রতদের খাবার ঘর। এখানে বসেই ওরা দু'বেলা ভাত খায়। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি থেকে এ-বাড়ির খাবার-ঘরের অনেক তফাত। কাচের টেবিল। এক পাশে একটা রেফ্রিজারেটার। সুব্রত রেফ্রিজারেটার খুলে একটা মস্ত বড় বোতল বার করলে। সুরেন বোতলটার ওপর লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলে। বললে—ভাই, যদি কেউ দেখতে পায়?

কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোতে লাগলো বোতল-এর ছিপি খোলবার সঙ্গে সঙ্গে। সুরেনের মনে হলো এ-রকম গন্ধ সে কোথায় যেন শুঁকেছে আগে। কিন্তু কোথায়? খুব যেন চেনা-চেনা গন্ধটা।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—গন্ধটা আমার খুব চেনা-চেনা লাগছে ভাই—

গেলাসে ঢালতে ঢালতে সুব্রত বললে—আগে তুই কখনও মদ খেয়েছিস্ নাকি?

সুরেন বললে—না ভাই, কখ্খনো খাইনি—

—তাহলে তোর কখনও অসুখ হয়েছিল? ওষুধের মধ্যেও একটু-একটু মদ থাকে—

তারপর একটা গেলাস সুরেনের দিকে এগিয়ে দিলে সুব্রত। বললে—খা—

কিন্তু গেলাসটা মুখে তুলতে গিয়েও কেমন যেন সঙ্কোচ হতে লাগলো সুরেনের। ওদিকে হঠাৎ রঘুয়া এক ঠোঙা তেলেভাজা নিয়ে এসে হাজির। সোডার বোতল ঢেলে দিলে সুব্রত।

—এবার তুই যা—দেখিস কেউ যেন এদিকে না আসে।

রঘুয়া চলে গেল। সারা বাড়িটা ফাঁকা। কোথাও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। সুকীয়া স্ট্রীটের সেই ব্যস্ততামুখর রাস্তাটার মধ্যে এত বড় বাড়িটা যেন খুব ফাঁকা মনে হলো সুরেনের কাছে। যেন বড় গোপনে, যেন বড় সাবধানে সে মদ খেতে যাচ্ছে। কেউ দেখতে পেলে যেন মুশকিল হয়ে যাবে।

সুরেন বললে—দরজাটায় খিল লাগিয়ে দে ভাই, যদি কেউ এসে পড়ে—

সুব্রত বললে—কে আসবে? কেউ তো বাড়িতে নেই—

—কিন্তু এতখানি খাবো? যদি বাড়ি যেতে রাস্তায় টলে পড়ে যাই?

—দূর, টলে পড়বি কেন? আমরা কি বেশি খাবো? বলে নিজের গেলাসে একটু চুমুক দিলে। তারপর একটা আলুর চপ নিয়ে চিবোতে লাগলো। বললে—খা খা, বেশ গরম আছে—

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলো—মুরগীভাজা দিয়ে খেতে আরো ভালো লাগে, যেবার রাশিয়ান-ডেলিগেট্স্ এসেছিল, সেবার বাবা তাদের এখানে একটা কক্‌টেল পার্টি দিয়েছিল, তখন আমি খেয়েছি—

হঠাৎ এক সময়ে সুব্রতর খেয়াল হলো যেন। বললে—কী রে, তুই যে খাচ্ছিস না এখনও?

সুরেন তবু দ্বিধা করতে লাগলো। বললে—খাবো? কিছু হবে না তো? ঠিক বলছিস তুই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অনেকবার খেয়ে দেখেছি, কিছ্ছু হয় না।

—তাহলে যে রাস্তায় লোকদের নেশায় টলতে দেখেছি?

সুব্রত বললে—সে তো বেশি খায় বলে। দেখবি, কাল তোর মাথা কী রকম হালকা হয়ে যাবে। যা পড়বি তাই-ই মনে থাকবে। খা, খা তুই। ভয় কী তোর? আমি তো রয়েছি—

সুরেন আর দ্বিধা করলে না। ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে গেলাসে চুমুক দিলে একটুখানি। মনে হলো যেন একটা আগুনের ঢেলা সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে পেটে যেতে যেতে সমস্ত শরীরটাকে জ্বলিয়ে দিতে লাগলো। চোখের সামনে সব যেন ঝাপ্সা হয়ে আসতে লাগলো আস্তে আস্তে। আর কেমন চোখ দুটো বুজে আসতে লাগলো। চোখ দুটো বুজে থাকতে ভালো লাগলো।

—খা খা, আলুর চপ খা।

ছোটবেলা থেকে অখ্যাত অবজ্ঞাত থেকে থেকে কারো কাছে একটু আদর পেলে সুরেন যেন বেঁচে যেত। এ-সংসারে তার তো কোথাও আশ্রয় নেই। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে যে সে থাকে সেখানেই কি তার আশ্রয় অবধারিত! সেখানেও তো সুখদা তাকে বাড়ি থেকে তাড়াতেই চায়। সেও তো আসলে বুড়োবাবুর মতই ও-বাড়িতে অপাঙ্‌ক্তেয়। তার তো আসলে কেউ নেই। তাকে তার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে, নিজের ভার তাকে নিজেকেই বইতে হবে। কেবল নিজের বলতে এই সুব্রত! সুব্রতকে বড় ভালো লাগতে লাগলো। কই, আর কাউকে তো সুব্রত এমন বাড়িতে ডেকে এনে খাতির করে না। কত ভালো সুব্রত। কত অমায়িক, কত নিরহঙ্কারী। এত বড়লোকের ছেলে হয়েও সুব্রত তার সঙ্গে সমান ভাবে মেশে!

বড় ভালো লাগলো সুরেনের।

—আর খাবি? আর একটু ঢালবো? আশ্চর্য, বেঁচে থেকে যে এত সুখ তা আগে কে জানতো?

সুরেন বলতে লাগলো—জানিস সুব্রত, আমার ভাই কিছ্ছু ভালো লাগে না।

সুব্রত বললে—কেন? ভালো লাগে না কেন?

সুরেন বললে—সংসারে আমার কেউ নেই, জানিস? বাবা নেই মা নেই ভাই নেই বোন নেই—

সুব্রত বললে—সে তো আমারও নেই, আমার মা নেই, ভাই নেই—

—তোর তবু তো বাবা আছে, বোন আছে—

—দূর, ওদের সঙ্গে আমার খাপ খায় না। জানিস আমি বড় হলে এখানে থাকবো না। বিলেতে চলে যাবো। সেখানে এখানকার চেয়ে অনেক ভালো।

সুরেন বললে—আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাস ভাই, আমারও কলকাতা আর ভালো লাগে না। প্রথম-প্রথম ভালো লাগতো, যখন মামার সঙ্গে কলকাতায় প্রথম এসেছিলুম।

—তোর মামা তোকে বিলেতে যেতে দেবে?

সুরেন বললে—আর একটু দে ভাই, খুব ভালো লাগছে—

সুব্রত আবার বোতল থেকে খানিকটা মদ ঢেলে দিলে। বললে—তাড়াতাড়ি

খাসনি, আস্তে আস্তে খা, নইলে নেশা হয়ে যাবে—

সুরেন আবার চুমুক দিলে গেলাসে। বললে—শুধু একজনের জন্যে ও-বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না জানিস—

—কে? কার জন্যে তোর বাড়ি ছাড়তে কষ্ট হয়?

সুরেন বললে—সে একজন আছে ভাই, তুই তাকে চিনিস না।

—কে? তোর কে হয় বল্ না?

সুরেনের চোখের সামনে তখন সব কিছু মুছে গেছে। সে ভুলে গেছে যে সুকিয়া স্ট্রীটের সুব্রতদের বাড়িতে বসে কথা বলছে। আর একটা আস্ত তেলেভাজা মুখের ভেতরে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগলো। আঃ, বড় আরাম লাগছে তার।

—কী রে, কে, বললি না তো?

সুরেন বললে—ওই বাড়ির যে মালিক সে! আমরা সবাই তাকে মা-মণি বলি।

—মা-মণি!

সুব্রত বোধহয় তবু কিছু বুঝতে পারলে না। কার মা-মণি? কেন মা-মণি বলিস তাকে?

সুরেন বললে—তা জানি না। সবাই বলে আমিও বলি। আমার মামাও তাকে মা-মণি বলে ডাকে। কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসে ভাই। আমাকে রোজ বাড়ির ভেতরে ডেকে পাঠায় ভাই। অথচ আমি তো ও-বাড়ির কেউ না। বলতে গেলে আমিও একজন চাকরই তো। কিন্তু একদিন না গেলে রাগ করে—

—কেন? রাগ করে কেন?

সুরেন বলতে লাগলো। বললে—সে এক খুব মজার কাণ্ড ভাই। সুখদা বলে ও-বাড়িতে একটা মেয়ে আছে, মা-মণির দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, সে ব্রত করে কি না, তাই আমাকে গিয়ে রোজ আশীর্বাদ করতে হয়।

সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—তোকে আশীর্বাদ করতে হয়? সে কী রে? তুই এইটুকু ছেলে, তুই আবার আশীর্বাদ করবি কী করে!

—আমি যে বামুন রে। বামুনের ছেলেরা ছোট হলেও কায়স্থদের আশীর্বাদ করতে পারে।

—কী আশীর্বাদ করিস তুই?

—মা-মণি আমাকে যা শিখিয়ে দেয় তাই বলি। যাতে মেয়েটার ভালো বিয়ে হয়, যাতে বিয়ে হয়ে সুখে থাকে, সেই সব বলি আর মিষ্টি খাই। ভালো-ভালো মিষ্টি সব। কিন্তু মেয়েটা ভাই বিয়ে করতে চায় না—

সুব্রত অবাক হয়ে গেল। বললে—বিয়ে করতে চায় না মানে? একেবারে বিয়েই করবে না জীবনে?

সুরেন বললে—না ভাই।

—তুই বুঝি তাহলে ওই সব নিয়েই মেতে আছিস? তাহলে লেখা-পড়া করিস কখন?

সুরেন বললে—লেখা-পড়ার দিকে মন বসছে না ভাই মোটে—

—তা বসবে কী করে? ওদিকে মন থাকলে কখনও লেখা-পড়ায় মন বসে? কেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস?

সুরেন বললে—সেই জন্যেই তো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। বাড়িতে থাকলেই

কেবল ওই সব কথা মনে পড়ে—। কিন্তু রাস্তায় বেরোলেও নিস্তার নেই। ক্যালেণ্ডারের দোকানের সামনে ছবি দেখলেও বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়—

সুব্রত কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে যেতেই দেখলে সামনেই সুব্রতর দিদি। পমিলি।

—কী করছিস্ রে সুব্রত?

সুব্রত তাড়াতাড়ি বোতলটা আড়ালে সরিয়ে ফেলেছে। সুরেনও খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে পমিলিকে দেখে।

পমিলি ততক্ষণে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বললে—দেখি, কী করছিলি?

তারপর সব দেখে নিয়ে সুরেনের দিকে তাকালে। বললে—একেও খেতে দিয়েছিস?

সুরেন টপ্ করে বলে উঠলো—আমি খাই না, আমাকে জোর করে খাইয়েছে সুব্রত। সত্যি বলছি আমি এ-সব কখনও খাইনি আগে।

পমিলি হেসে উঠলো। বললে—তুমি যে খাও না তা আমি জানি। কিন্তু সুব্রত বললে আর অমনি খেয়ে নিলে? তোমার নিজের একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই?

সুব্রত বললে—কেন, আমরা খেলে দোষ নেই, আর ও খেলেই বুঝি যত দোষ? ও খেয়েছে বেশ করেছে।

সুরেন নিজের সাফাই গাইবার জন্যে বলতে লাগলো—না, আমি জানি এ খাওয়া দোষ। কিন্তু সুব্রত বললে বলেই আমি খেলুম।

—অন্য লোকে যদি তোমাকে বিষ খেতে বলে তো তুমি খাবে?

সুব্রত বললে—হুইস্কি বিষ কে তোকে বললে?

পমিলি ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুই চুপ কর। তোকে আমি কিছু বলেছি? আমিও তো হুইস্কি খাই, হুইস্কি যদি বিষ হতো তো আমি খেতুম? কিন্তু একে কেন খাওয়াতে গেলি! এ বেচারি ভালো ছেলে, একে কেন তুই গোল্লায় দিচ্ছিস?

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—তুমি এসব খেও না।

বলে সুরেনের সামনে থেকে গ্লাসটা টেনে নিলে। বললে—তুমি বাড়ি যাও, সুব্রতর সঙ্গে আর মিশো না। যাও—

সুরেন কী করবে বুঝতে পারলে না।

কিন্তু সুব্রত বললে—ও আমার বন্ধু, আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড্, আমি ওকে বাড়িতে ডেকে এনেছি, তুই কেন ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

পমিলি বললে—আমি ওর ভালোর জন্যেই বলছি—ও তোর সঙ্গে মিশলে খারাপ হয়ে যাবে।

সুব্রত বললে—ওর ভালোর কথা তোকে ভাবতে হবে না—তুই এখান থেকে যা—

পমিলি কিন্তু এ-কথা শুনে রাগলো না। বললে—তুই এত রাগছিস কেন? ও গরীবের ছেলে, শেষকালে যদি ওর নেশা ধরে যায়, তখন কী হবে?

সুব্রত বললে—তুই এখান থেকে যা না, তোকে এখানে কে আসতে বলেছে? তুই কলেজ থেকে এসেছিস এখন তোর ঘরে গিয়ে রেস্ট্ নে।

পমিলি বললে—না, আমি যাবো না। তুই একটা ছেলের কেরিয়ার খারাপ করে দিবি, আর আমি কিছু বলতে পারবো না?

তারপর সুরেনের হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। বললে—যাও, বাড়ি যাও—ওঠো—

ঠিক এতটা আশা করেনি সুরেন। মাথাটা তখন তার ঝিম্-ঝিম্ করছে। কেমন যেন একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব সমস্ত শরীরে। পর্মিলি হাত ধরে টানতেই সুরেন উঠে দাঁড়ালো।

পর্মিলি বললে—এসো—

সুব্রত রুখে দাঁড়ালো। বললে—কোথায় যাচ্ছিস? যাসনি। এখেনে বোস্—

সুরেনও আর তখন দাঁড়াতে পারছে না। ভয়ও করছে। যদি আরো বেশি খেয়ে ফেলে।

বললে—আমি যাই ভাই—

—তুই বোস্ না, আমি তো আছি। তোর ভয় কী?

সুরেন বললে—আমার মাথাটা কেমন করছে, শুতে ইচ্ছে করছে, আমি আর খাবো না।

সুব্রত বললে—খেতে তোকে কে বলছে? আমিও আর খাব না, এই দেখ বোতলটা ফ্রিজের ভেতরে তুলে রাখছি—

পর্মিলি ততক্ষণে সুরেনকে টেনে বাইরে এনেছে। ঘরের বাইরে এনে বললে—সেদিন তোমাকে ডাকলুম তুমি এলে না কেন?

সুরেনের কিছু মনে পড়লো না। বললে—কবে?

কী যেন সন্দেহ হলো পর্মিলির। বললে—তোমার খুব নেশা হয়েছে?

সুরেন বললে—তা জানি না।

—তোমার কিছু মনে পড়ছে না? সেই যে তোমার নাকে খুব লেগেছিল?

এতক্ষণে মনে পড়লো সব।

—কেন? এলে না কেন সেদিন? এই কথা বলবার জন্যেই তো সেদিন ডেকেছিলাম।

সুরেন বললে—কী কথা?

পর্মিলি বললে—সুব্রত যা করে করুক, ও যা করে তোমাকে তা মানায় না। ও যদি মদ খায় তুমিও খাবে? ওর সঙ্গে মিশতে বারণ করবার জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছিলুম।

—কিন্তু তুমিও তো মদ খাও?

অন্য সময় হলে এমন কথা পর্মিলিকে হয়তো বলতে পারতো না। কিন্তু তখন যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল সুরেন। পর্মিলি তাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। হঠাৎ সুরেনের মুখে এই কথা শুনেই কেমন থমকে গেল। বললে—আমি মদ খাই, কে বলেছে তোমাকে? সুব্রত?

সুরেন কার নাম করবে ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে—তুমি যে মদ খাও তা সবাই জানে!

পর্মিলি বললে—কিন্তু কে বলেছে তোমাকে তা বলতে হবে। বলো কে বলেছে?

—দেবেশ!

—দেবেশ কে?

সুরেন বললে—দেবেশ বলে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। সে বলেছে।

—কিন্তু সে কী করে জানলে? সে কি আমাকে মদ খেতে দেখেছে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

তবু যেন বিশ্বাস হলো না পর্মিলির। আবার জিজ্ঞেস করলে—আমাকে দেখেছে? কোথায়?

সুরেন বললে—হোটেলে—

এবার পর্মিলি যেন একটু ঝিমিয়ে এল। তারপর বললে—সে কি সুব্রতর বন্ধু?

সুরেন বললে—বন্ধু বটে, কিন্তু সুব্রতকে সে দেখতে পাবে না। সুব্রতর সঙ্গে তার ভাব নেই।

এতক্ষণে সুব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বললে—কী রে, এখানে দাঁড়িয়ে কী কথা হচ্ছে তোদের?

পর্মিলি এবার ঘুরে দাঁড়ালো সুব্রতর দিকে। বললে—তোর বন্ধুর কথা হচ্ছে—

—আমার বন্ধু? আমার কোন বন্ধু?

—দেবেশ! সে আমার নামে কেন লাগায় রে? আমি তার কী করেছি? সে বলে কি না আমি হোটেলে গিয়ে মদ খাই? এই সুরেনকে বলেছে!

সুব্রতরও তখন কিছুটা নেশা হয়েছে। বললে—তুই তো মদ খাস! মদ খাওয়া কি খারাপ? তুই আমি দু'জনেই তো মদ খেয়েছি—বাবাও তো খায়। খায় না? সত্যি কথা বললে অন্যায়টা কীসের?

পর্মিলি বেগে উঠলো। বললে—খবরদার বলছি সুব্রত, মিথ্যে কথা বলিসনি।

—আমি মিথ্যে কথা বলছি? তুই বলতে চাস্ তুই জীবনে কখনও মদ খাসনি? সুরেনের সামনে তুই সাধু সাজছিস্?

পর্মিলি হঠাৎ এক চড় কষিয়ে দিলে সুব্রতর গালে। তখন খুব রেগে গেছে পর্মিলি। সুরেনের ভয় হতে লাগলো আবার সেদিনকার মত হবে নাকি? সেই সেদিন যেমন ঝগড়া হয়েছিল।

সুব্রত রুখে দাঁড়ালো। বললে—তুই কেন আমাকে চড় মারলি?

সুরেন তাড়াতাড়ি সুব্রতর হাত দুটো গিয়ে ধরে ফেললে। বললে—ভাই সুব্রত, তুই চুপ কর—

—কেন চুপ করবো? ও বড় বলে আমাকে মারবে?

বলে পাশেই একটা কী পড়ে ছিল তাই তুলে নিলে। একটা ফুলগাছের খালি টব। আর একটু হলেই সেটা ছুঁড়ে মারত পর্মিলির দিকে। মাথায় গিয়ে লাগলে পর্মিলির মাথাটা দু'ভাগ হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই পর্মিলি দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সুব্রত সেই দরজার ওপরেই মাটির টব্‌টা নিয়ে দুম্-দুম্ করে মারতে লাগলো। মাটির টব্ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখনও সুব্রতর রাগ থামে না। সে তখন আরো শক্ত কিছু একটা জিনিস দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলবার চেষ্টায় এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো।

সুরেন বললে—এই সুব্রত, করছিস কী? থাম্ থাম্—

সুব্রত বললে—থামবো কেন? আমি দরজা ভেঙে ফেলব আজ। ভেঙে ওকে মারবো তবে থামবো—

সুরেন বললে—তোর পায়ে পড়ি ভাই, আমি চলে গেলে যা ইচ্ছে তুই করিস, এখন থাম্—

সুব্রত বললে—সেদিন তোকে মেরেছে। আজকে আবার আমাকে মারলে। আমি ওকে কিছুতেই ছাড়বো না। দেখি কেমন করে ও বাঁচে। দেখি কতক্ষণ ও দরজা বন্ধ করে থাকতে পারে—

—তাহলে আমি চললুম—

বলে সুরেন এগিয়ে যাচ্ছিল। সামনের সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামবার রাস্তা। হঠাৎ সুব্রতর বোধহয় খেয়াল হলো। ডাকলো—এই সুরেন, শোন্—

সুরেন তবু দাঁড়ালো না। সে তখন নেশার ঘোরে সামনের দিকেই যাচ্ছিল। সিঁড়ির শেষ ধাপের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রঘু। রঘু বললে—দাদাবাবু আপনাকে ডাকছেন বাবু—

সুরেন তবু তার কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে সোজা চলতে লাগলো।

ওপর থেকে সুব্রত ডাকলে—রঘু, রঘু, বাবুকে ডাক—

বলতে বলতে সুব্রত নিজেই নেমে এল নিচেয়। তারপর ছুটে গিয়ে পেছন থেকে একেবারে সুরেনকে জড়িয়ে ধরেছে। বললে—কী রে, শুনতে পাচ্ছিস না? তোর নেশা হয়েছে নাকি?

সুরেন বললে—তোর দিদি কী ভাবলো বল্ তো?

—কী আবার ভাববে! আমাদের ও-রকম রোজ হয়।

—তোদের মধ্যে ঝগড়া হোক কিন্তু আমার সামনে এ-রকম হওয়া কি ভালো? তোর দিদি ভাবলে, আমিও তোর ঘাড় ভেঙে মদ খেয়ে গেলাম।

—দূর পাগল। পর্মিলি নিজে মদ খায় বলে লজ্জা পেয়েছে তাই পালিয়ে গেল। দেখলি না আমার কথার কোনও উত্তর দিতে পারলে না?

সুরেন বললে—না ভাই, আমি আর তোদের বাড়ি আসবো না। এর পরে আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা করবে তোর দিদির কাছে। আমি যাই, আমাকে ছেড়ে দে—

সুব্রত বললে—দাঁড়া, তোকে একলা ছাড়বো না। তোর নেশা হয়ে গেছে। শেষকালে রাস্তায় এ্যাক্সিডেণ্ট্ করবি—

বলে ড্রাইভারকে ডাকলে। ড্রাইভার আসতেই সুব্রত বললে—এই বাবুকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো—

সুরেন আপত্তি করতে যাচ্ছিল! কিন্তু সুব্রত কোনও আপত্তি শুনলে না। একেবারে গাড়িতে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় বার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

সুরেন গাড়ির গদীর ওপর হেলান দিয়ে বসে চোখ দুটো বুঁজিয়ে পেছনে হেলান দিলে। তার মনে হলো কেন যে এ-বাড়িতে এল, আবার কেন যে এমনভাবে চলে যাচ্ছে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

কিন্তু তখন তো সুরেনের জানবার কথা নয় যে জীবনে কোনও জিনিসই ব্যর্থ হবার নয়। এই বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হলে যে তার জীবন-পরিক্রমা সম্পূর্ণ হতো না। নইলে এ উপন্যাসে পর্মিলির প্রসঙ্গ আসবেই বা কেন? শুধু মাধব কুণ্ডু লেনের মা-মণি, বড়োবাবু আর সুখদাকে নিয়ে লিখলেই তো একখানা মোটা উপন্যাস হয়ে যেত!

গাড়িটা তখন গড়-গড় করে স্বর্গ-নরক পেরিয়ে একেবারে ইতিহাসের সিংদরজার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলেছে।

এই-ই জীবন। জীবন বোধহয় সোজা পথে চলতে জানে না। নইলে গ্রামের এক-কোণের একটা ছেলে চিরকাল গ্রামে থাকতেই পারতো। কিন্তু কে তাকে শহরে আনলে? কার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে সে এই শহরে এল! এ শহর তখন নতুন জেগে উঠে চারদিকে সবে চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। তখনও চিনতে পারছে না, কাউকে। দু'শো বছরের ঘুম কি সহজে ভাঙবার? তখন যারা ক্ষমতা পেলে তারা তখন রাইটার্স-বিল্ডিংস্-এর গদীতে গিয়ে বসেছে। আমরা তাদের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। তোমরা আমাদের জন্যে এতদিন জেল খেটেছো, এতদিন কষ্ট করেছ, এবার আরাম করো। এবার দেশের উন্নতি করো। এবার আমাদের দুটো খেতে দাও, পরতে দাও, চাকরি দাও, আর বাস করবার মত একটা আশ্রয় দাও। তার বেশি আর কিছু চাই না। ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট এতদিন আমাদের কেবল শোষণ করেছে। আমাদের কেবল শাসন করেছে। এবার তোমাদের বসালুম সেই গদীতে, তোমরা এবার আমাদের পালন করো। শুধু পালন নয়, প্রতিপালনও করো। যেমন করে প্রতিপালন করবার প্রতিশ্রুতি তোমরা দিয়েছিলে স্বদেশী যুগে!

কিন্তু ইতিহাসের বিধান বোধহয় তা নয়। ইতিহাস-বিধাতা বোধহয় তখন অলক্ষ্যে কটাক্ষ করেছিলেন তোমাদের প্রতিশ্রুতি শুনে। নইলে এমন করে সব প্রতিজ্ঞা, সব প্রতিশ্রুতি বানচাল হয়ে গেল কেন?

সেদিন বিকেল বেলাই ডাক পড়লো সুরেনের। সুরেন ক'দিন সুকীয়া স্ট্রীটেও যায়নি, ওপরে মা-মণির কাছেও যায়নি। নিজের ঘরের চারটে দেয়ালের মধ্যে বন্দী থেকেই নিজের ভবিষ্যতের ভাবনাতে অস্থির ছিল। কী হবে অন্যের ভাবনা ভেবে। নিজের ভবিষ্যতের পথটা নিশ্চিন্ত করতে পারলে তবেই তো চারদিকে সকলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত হবে।

ধনঞ্জয়ই ডাকতে এসেছিল।

সুরেন বললে—বিকেল বেলা কেন? বিকেল বেলা তো আমাকে ডাকে না মা-মণি।

ধনঞ্জয় বললে—জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে থাকুন, মা-মণির সঙ্গে আপনাকে ফড়েপুকুরে যেতে হবে—

ফড়েপুকুর! সুরেন বুঝতে পারলে না। ফড়েপুকুরে কী করতে যাবে মা-মণি! ফড়েপুকুরে আবার কী কাজ পড়লো! আর ফড়েপুকুর কেন, মা-মণি তো কোথাওই যায় না কখনও। তবে আজ হঠাৎ বেরোচ্ছে কেন?

সুরেন বললে—তুমি যাও, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি—

এ জীবনে অনেক কিছু দেখেই সুরেন এখন সব-কিছু দেখার সার-মর্ম উপলব্ধি করে শেষ অধ্যায়ের আশায় বসে আছে। তা বলে অতীতটা কি তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে? অতীতই যদি মিথ্যে হয়ে যেত তো বর্তমানটা কী দিয়ে সে ভরাতো? কোন্ আশায় ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকতো?

আর আশ্চর্য, যে-সুখদার ভবিষ্যতের জন্যে মা-মণির অত ভাবনা সেই সুখদাই কি জানতো যে তার ভবিষ্যতের ভাঁড়ারে সব কিছুই বাড়ন্ত। টাকা,

ঐশ্বর্য, নিশ্চিন্ততা, কিছুরই তো কমতি ছিল না মা-মণির সংসারে। একদিন কোন্ গ্রাম ছেড়ে মা-মণির বিয়ের উৎসবে তার দিদিমা এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে। তখন থেকেই তো সুখদা দেখে আসছিল যে তার চারদিকে কোনও অভাব কোনও অভিযোগ নেই। সে যা ভেবেছে তা পূরণ করবার জন্যে মা-মণির দুটো হাত সব সময়ে উপুড় হয়েই আছে। সুখদার শাড়ি চাই, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম গেল ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে। সুখদার সিনেমা দেখতে ইচ্ছে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম গেল ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে।

এমনি করে ছোট থেকে সুখদা বড় হয়েছে। বড় থেকে আরো বড় হয়েছে। ছোট বেলায় সুখদা স্কুলে গেছে বাড়ির গাড়িতে করে। মা-মণি ভেবেছে গাড়িতে করে যখন স্কুলে গেছে তখন বাইরের ছোঁয়াচ থেকে সে রক্ষে পেয়েছে। তাই যখন ভূপতি ভাদুড়ী প্রথম উড়ো-চিঠিব কথা বললে তখন বিশ্বাস হয়নি। তা কেমন করে সম্ভব? সুখদাকে তো মা-মণি বরাবর চোখে চোখে রেখে এসেছে। বরাবব গাড়িতে করে স্কুলে পাঠিয়েছে! কে তার এমন শত্রুতা করবে?

মা-মণি নিজেও বুঝতে পারছিল না এ কেমন করে হতে পারে।

জামা-কাপড় বদলে সুরেন সোজা একেবারে ভেতরে গিয়ে মা-মণির ঘরের সামনে দাঁড়ালো। ধনঞ্জয় সামনেই ছিল। বললে—মা-মণি, ওই ভাগ্নেবাবু এসে গেছে—

তখন মা-মণির নতুন থান ধুতি পরা হয়ে গেছে। সুরেনকে দেখেই বললে—এসেছিস? আয়—

—কেমন আছ মা-মণি তুমি?

মা-মণির পাশে বাদামীও ছিল। সে সাহায্য করছিল মা-মণিকে।

মা-মণি বললে—ওবে ধনঞ্জয়, ভূপতি কোথায়? ভূপতি দেরি করছে কেন? ভূপতিকে খবর দিয়েছিস তো?

মা-মণিকে মনে মনে যেন ভীষণ ব্যস্ত মনে হলো তখন। এটা নিচ্ছে আলমারি থেকে, ওটা নিচ্ছে। কোন্‌টা নিতে ভুল হয়ে গেল সেই হিসেব করতেই বিব্রত।

হঠাৎ পেছনে পায়েব শব্দ হতেই সুরেন চেয়ে দেখলে—মামা আসছে। ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নেকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

—তুই? তুই এখানে যে?

সুরেন বললে—মা-মণি ডেকেছে—আমাকে সঙ্গে যেতে বলছে—

ভূপতি ভাদুড়ী সোজা ঘবের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মা-মণি বললে—এসেছ, ভালোই হয়েছে, সুরেনও তৈরি হয়ে এসেছে। গাড়ি তৈরি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, বাবলাল তৈরি হয়ে গাড়ি নিয়ে হাজির—

তারপর একটু থেমে বললে—আমার ভাগ্নেও যাবে নাকি মা-মণি?

মা-মণি জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতেই বললে—হ্যাঁ ও-ও যাক্, জায়গাটা চিনে রাখুক। তুমি ফড়েপুকুরে খবর দিয়ে রেখেছো তো যে আমরা যাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, খবর তো দিয়েই রেখেছি। তা কর্তা বলছিলেন যে এর জন্যে আর মা-মণির আসার কী দরকার। ওই চিঠিটা এসেছিল তাই পাঠিয়েছিলাম—

মা-মণি বললে—তা হোক, তবু বিয়ে বলে কথা, যাওয়া ভালো। আমরা

হলুম কন্যে পক্ষ, বুঝলে না?

তারপর আর দেরি করলে না। ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করে বললে—চলো, চলো—

সুরেনের দিকে চেয়েও মা-মণি বললে—চল্, চল্—

তারপর সদলবলে সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠলো। সাধারণতঃ মা-মণি ইদানীং কোথাও বেরোয় না। অর্জুন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার বাবা দুখমোচনও দেখছিল। ঠাকুর-চাকর সবাই চেয়ে দেখছিল আড়াল থেকে। এ যেন এক দৃশ্য। যেন এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

তারপর বাবুলাল গাড়িটা ছেড়ে দিলে। বাহাদুর সিং গেটে দাঁড়িয়েছিল দরজা খুলে। গাড়িটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা স্যালিউট্ দিলে।

ভূপতি ভাদুড়ী গাড়ির ওপরে বাবুলালের পাশে বসেছিল। সেইটেই নিয়ম। গাড়ির ভেতরে দরজা-জানালা বন্ধ করে বসেছিল মা-মণি আর সুরেন। মা-মণির মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর।

সুরেনই প্রথম কথা বললে। বললে—তোমার শরীর কেমন আছে মা-মণি?

মা-মণি বললে—শরীরের কথা ভাববার সময় থাকলে তো ভাববো! পোড়ারমুখীর বিয়েটা দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি রে—। পরের মেয়ে নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা—

গাড়িটা চলতে লাগলো আর সুরেন যেন আপন মনের আবেগে অনেক দূরে অনেক পৃথিবী পরিক্রমা করে বেড়াতে লাগলো। আশ্চর্য এই মা-মণি!

মা-মণি হঠাৎ বললে—সুখদা কখনও তোকে কিছু বলেছিল রে?

—কী সম্বন্ধে?

—এই বিয়ের কথা নিয়ে!

সুরেন বললে—আমি তো এ-বিয়ের কথা কিছুই জানতাম না মা-মণি! কালকেই সবে চিঠির কথা শুনলুম।

—হিতসাধিনী-ব্রতটাও মুখপুড়ী করলে না। একটা কথাও শুনবে না। আমি যা বলবো তার উল্টোটা করবে। কোথায় যে এখন পাত্র পাই!

যেন নিজের মনেই কথাগুলো বলে যেতে লাগলো মা-মণি!

সুরেন বললে—সুখদার যখন বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই তখন কেন ওর বিয়ে দিচ্ছ মা-মণি?

মা-মণি বললে—কী বলছিস তুই? মেয়ে হয়ে জন্মেছে, বিয়ে করবে না? চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবে?

—তোমার কোথায় বিয়ে হয়েছিল মা-মণি?

মা-মণি কথাটা শুনে হঠাৎ যেন চমকে উঠলো। বললে—আমার বিয়ের কথা বলছিস? কেন, তোকে কেউ কিছু বলেছে নাকি?

সুরেন বললে—না, বলবে আবার কে? কিন্তু বিয়ে তো তোমার হয়েছিল।

—দূর, আমার আবার বিয়ে! সে কবেকার কথা, এখন ভুলে গিয়েছি! বলে মা-মণি হঠাৎ থেমে গেল।

তারপর বললে—তা হঠাৎ আমার বিয়ের কথা তুললি যে?

সুরেন বললে—এমনি!

মা-মণি বললে—কেউ কিছু বলেছে তোকে?

সুরেন বললে—শুনেছি তোমার বিয়েতে নাকি খুব জাঁক-জমক হয়েছিল। খুব লোকজন খেয়েছিল?

মা-মণি এবার তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলে সুরেনের দিকে। বললে—কে বলেছে তোকে বল্ তো? আমার বিয়ের কথা তোকে কে বলেছে?

সুরেন বললে—তোমার বিয়ের কথা সবাই জানে!

—সবাই মানে কে? কে তোকে বলেছে?

সুরেন বললে—বাহাদুর সিং বলেছে, ঠাকুর বলেছে, অর্জুন বলেছে, দুখমোচন বলেছে, বুড়োবাবু বলেছে—সবাই তোমার বিয়ের গল্প শুনেছে!

—বুড়োবাবু? বুড়োবাবু কী বলেছে?

সুরেন বললে—তেমন কিছু বলেনি।

—তবু কী বলেছে শুনি?

—বলেছে খুব নাকি জাঁক-জমক হয়েছিল, অনেক লোকজন খেয়েছিল। মাধব কুণ্ডু লেনের চারিদিকে একেবারে গাড়ীর ভিড় লেগে গিয়েছিল। সাতদিন ধরে কাক-চিলের উৎপাতে লোকে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল—

মা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলে—আর কী বলেছে?

সুরেন বললে—আর কিছু বলেনি—

মা-মণি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু থেমে বললে—সুখদার বিয়েতেও আমি ঘটা করবো জানিস। আমার বিয়েতে যা ঘটা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি ঘটা করবো। লোকে দেখে বলবে যে হ্যাঁ, চৌধুরী-বাড়ির মেয়ের বিয়েতে ঘটা হয়েছিল বটে! বলে মা-মণি যেন খানিকক্ষণের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার বললে—মেয়ে তো তেমন মনের মত নয়, নইলে ওর কোনও সাধই মেটাতে বাকি রাখতুম না আমি—

আপন মনের দুঃখেই যেন খানিকক্ষণ ম্রিয়মাণ হয়ে রইল মা-মণি!

তারপর বললে—জানিস তোরও বিয়ে দেব আমি খুব ঘটা করে। তুই আমার কাছে থাকবি তো?

সুরেন বললে—মামা ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই, আমি আর কোথায়ই বা যাবো?

—কেন, আমি আছি—আমাকে কি তুই পর ভাবিস? আমার এতগুলো বাড়ি, এত সম্পত্তি, আমি মরে গেলে এ-সব কে দেখবে? তোদেরই তো দিয়ে যাবো রে সব। তোকে আর সুখদাকে—

আশ্চর্য, আজও ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মানুষ ভাবে এক রকম, হয় আর। মা-মণি কত আশা করেছিল যে একদিন মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি আর তার যাবতীয় সম্পত্তির মালিক করে দেবে সুখদাকে আর সুরেনকে। নিজের জীবনের যা কিছু অতৃপ্তি, অশান্তি সব কিছু পূরণ করবে সুখদাকে আর সুরেনকে দিয়ে। সুখদা তো বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ি চলে যাবে, তার যা পাওনা সেই অর্ধেক দিয়ে যাবে তাকে, আর অর্ধেক দিয়ে যাবে সুরেনকে। কিন্তু মা-মণির সব সঙ্কল্প কেন বানচাল হয়ে গেল!

হঠাৎ গাড়িটা থামলো এক-জায়গায় এসে। ভূপতি ভাদুড়ী তড়াক করে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিলে। ফড়েপুকুরের বিরাট বাড়িটা, বাড়ির কর্তাব্যক্তি মতন কে একজন অভ্যর্থনা করতে এল।

—আসুন, আসুন ভূপতিবাবু!

মা-মণি তখনও নামেনি গাড়ি থেকে।

ভদ্রলোক বললে—ওরে, বাড়ির ভেতরে খবর দে। চৌধুরী বাড়ির গিন্নী এসেছেন—

গাড়িটা অন্দর-মহলের দিকে আর একটু এগিয়ে গেল, ভূপতি ভাদুড়ী আর সুরেন বার-বাড়ির সদরে উঠে একেবারে দোতলার ফরাস-পাতা ঘরে গিয়ে হাজির। ফরাসের ওপর বসেছিলেন সরকার বাড়ির খোদ-কর্তা। তিনি তাদের দেখে তাকিয়ে থেকে একটু উঠে বসলেন।

—আসুন, আসুন ভূপতিবাবু—

ভূপতি ভাদুড়ী গিয়ে বসলো একটা তাকিয়ার পাশে, সরকার মশাই জিজ্ঞেস করলেন—মা-মণি এসেছেন নাকি?

—আজ্ঞে, ভেতরে চলে গেছেন!

—ইটি কে?

ভূপতি ভাদুড়ী সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—এটি আমার ভাগ্নে।

—ভাগ্নে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বোন-ভগ্নিপতি সবাই মারা গেছে, তাই ভাগ্নেটিকে আমার কাছে এনে রেখেছি।

সুরেন চারদিকে চেয়ে চেয়ে তখন দেখছে। এরাও বড়লোক। এখানে বিয়ে হচ্ছে সুখদার, তবু কেন তার ভালো লাগছে না? এখানে বিয়ে হলেও তো সুখদা সুখে থাকবে। কেন সুখদা মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে থেকে সুরেনকে তাড়াতে চাইছে। সে কি ভেবেছে সুরেন তার মা-মণির সমস্ত সম্পত্তির ভাগীদার হতে চায়? তার কী দায় পড়েছে সম্পত্তি চাইতে! তাকে কত বড় হতে হবে, তাকে কত কাজ করতে হবে। এরা কেউ ভাল নয়। এই বড়লোকেরা। সুব্রতরাও ভালো নয়। সুব্রত আর পর্মিলি ভাবে, তাদেব টাকাব জন্যে সুরেন তাদের বাড়ি যায়। তার চেয়ে দেবেশটা ভালো। দেবেশ হয়তো এইসব কারণেই বড়লোকদের ওপর চটা। দেবেশ তাই অত করে ওদের পার্টি অফিসে যেতে বলে।

বড় বড় ছবি দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। মানুষ-সমান সব। কয়েকটা মেমসাহেবদের ছবি। ছবিগুলো খারাপ। মেয়েমানুষের ছবিই বেশি। অনেকেব কাপড়-চোপড়ের ঠিক নেই। সুরেন খানিকক্ষণ দেখেই চোখ নামিয়ে নিলে।

খানিক পরে একটা চাকর ঘরে ঢুকলো—কর্তাবাবু, ভেতরে ঠাকমা-মণি একবার ডাকছেন—

ভদ্রলোক বাইরে উঠে গেলেন। ভূপতি ভাদুড়ী সুরেনেব চোখের দিকে চেয়ে চুপিচুপি বললে—হ্যাঁ রে, সুখদা তোকে কিছু বলেছিল?

সুরেন বললে—কীসের কথা?

—এই বিয়ে না-করার কথা? ওর চিঠি-টিঠি তুই লিখে দিয়েছিলি কখনও?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি কেন সুখদার চিঠি লিখে দিতে যাবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না তাই বলছি, তুই যেন আবার সুখদার চিঠি-টিঠি কিছু লিখে দিসনি। আমি মেয়েটাকে বাড়ি-ছাড়া করতে চাইছি আব একটা-না-একটা বাধা এসে পড়ছে—

সুরেন কিছু কথা বললে না। চুপ করে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার চুপি চুপি গলায় বলতে লাগলো—মা-মণি যখন যা বলবে সব শুনবি, বুঝলি? আমি তোকে বলেছি না যে মেয়েটার মতলব খারাপ, খারাপই তো, মতলব খারাপ না হলে এমন করে উড়ো-চিঠি কেউ লেখে? যত সব উড়ো ঝঞ্ঝাট

সুরেন মামার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কথাগুলো শুনছিল। বড় যেন কদর্য মনে হচ্ছিল মামাকে। মামার কীসের এত টাকার লোভ? লোভ কার জন্যে? মামা সারা জীবন চাকরি করেছে চৌধুরী-বাড়িতে। অনেক টাকা মামার হাত দিয়ে এসেছে গেছে, তবু এখনও লোভ গেল না কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী হঠাৎ ধমকে উঠলো—কী রে, কথার জবাব দিচ্ছিস নে কেন? জবাব দে?

—কীসের জবাব?

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—এই দেখ, আমি এদিকে ছেলেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাকা পোক্ত করবার চেষ্টা করছি, আর উনি অন্য কথা ভাবছেন। কী ভাবছিস শুনি? কী ভাবছিস?

সুরেন বললে—কিছু ভাবছি না।

—কিছু ভাবছিস না তো কথা কানে যাচ্ছে না কেন? লেখাপড়ার কথা ভাবছিস?

সুরেন বললে—না তো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—লেখা-পড়া করে কে কত মহাপীর হয়েছে দেখা গেছে। এখন থেকে সব বুঝতে শেখো, আমি আর ক'দিন? আমার যদি হঠাৎ একটা কিছু হয় তো তখন ও-বাড়িতে আর তোমার ঠাঁই হবে না, এইটি জেনে রেখো—পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। নিজের স্বার্থ নিজের বুঝে নিতে হবে। নিজের পাওনা-গণ্ডা না বুঝে নিতে জানলে কেউ আগ্ বাড়িয়ে তোমায় বোঝাতে আসবে না।

হঠাৎ কথার মধ্যে বাধা পড়লো। ভেতর থেকে বাড়ির খোদ-কর্তামশাই আবার ফিরে এলেন। আসতে আসতে বললেন—সব ঠিক হয়ে গেল ভাদুড়ী-মশাই। আপনারাও যেমন। আমি বৌমাকে তখনই বলেছিলাম যে ও-সব ফেরেব্বাজদের কাণ্ড। কেউ কি কারো ভালো দেখে? জানেন ভাদুড়ী-মশাই, আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এমন করেছে। আত্মীয়দের মত বড় শত্রু তো আর দুনিয়ায় কেউ নেই!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আত্মীয়রাই তো হলো বিষ। শাস্ত্রে বলেছে আত্মীয় যার নেই সংসারে সেই ব্যক্তিই সুখী। আরো বলেছে কী জানেন? বলেছে আত্মীয়-কুটুম্ব বিষবৎ পরিত্যাজ্য—

ততক্ষণে রুপোর রেকাবীতে জলখাবার এসে গিয়েছিল।

সরকার-মশাই বললেন—খান খান ভাদুড়ী-মশাই, মুখে দিন। তুমিও খেয়ে নাও হে খোকা—আপনার ভাগ্নেটি তো চালাক-চতুর ছেলে দেখছি ভাদুড়ী-মশাই—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—চালাক আর কোথায় দেখলেন! চালাক করবার জন্যেই তো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি। আসল বুদ্ধি তো বইতে লেখা থাকে না, লোকের সঙ্গে মিশলেই আসল বুদ্ধি বিবেচনা হয়। খা, খা তুই—

সুরেন খেতে লাগলো।

সরকার মশাই বললে—তাহলে গয়না-টয়না যোগাড় করতে আরম্ভ করে দিন আপনারা। ঘটক মশাইকে ডেকে এনে আপনাদের কাছে আসতে বলে দেব—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মা-মণির সঙ্গে পাকা-কথা হয়ে গেছে তো?

—আর কি কাঁচা আছে এখন? সব পাকা হয়ে গেছে। মা-জননীকে ডেকে

কাজটা ভালোই করেছিলেন ভাদুড়ী-মশাই।

ভেতর থেকে খবর এল গাড়ি মা-মণিকে নিয়ে সদরে যাচ্ছে।

ভূপতি ভাদুড়ী হাত-জোড় করে বললে—তাহলে উঠি বেয়াই মশাই, অনুমতি করুন।

সুরেন তখনও খাচ্ছে। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কী রে, এখনও তোর খাওয়া হলো না, ওঠ ওঠ, আর খেতে হবে না—

সরকার মশাই বললেন—না না, তুমি খাও-খাও—ভালো করে খাও। আর একটা সন্দেশ খাবে খোকা? সন্দেশ নাও—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল।—না না, আর খেতে হবে না। পরে খাবার অনেক সময় পাবে। এখন সম্বন্ধ তো হ'লো, তারপর বিয়েটা হয়ে গেলে কত খাবে খাক্ না—

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সুরেন। আর দেরি করা চলে না। ভূপতি ভাদুড়ী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সুরেনও চলতে লাগলো পেছন পেছন। পেল্লায় বাড়ি। মাধব কুণ্ডু লেনের মা-মণির বাড়ির চেয়েও বাড়িটা বড়। সদরে গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাবুলাল। সুরেন দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে উঠে বসলো। ভূপতি ভাদুড়ীও পা-দানিতে পা দিয়ে একেবারে মাথায় উঠে বসলো।

সুরেন মা-মণির দিকে চেয়ে দেখলে। মুখখানা যেন খুব খুশী খুশী ভাব। মা-মণি বললে—কী রে, তোকে খেতে দিয়েছিল ওরা?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

—কী কী খেতে দিলে?

সুরেন বললে—দুটো সিঙাড়া, দুটো সন্দেশ, একটা রাজভোগ।

—আর কিছু দেয়নি?

সুরেন বললে—আরো দিচ্ছিল, মামা বারণ করলে। বললে—বিয়েটা হয়ে গেলে তখন কত খাবে খাক না। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—সুখদার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল মা-মণি?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ। নিজে না এলে কি আর ঠিক হতো? ভূপতি তো বলছিল আমাকে আসতে হবে না। আমি সেই জোর করে এলুম বলেই তো হলো!

সুরেন বললে—উড়ো চিঠিটা কে দিয়েছিল মা-মণি?

—কে জানে কে দিয়েছে! কত শত্রুর লোক আছে সংসারে। কেউ তো কারো ভালো দেখতে পারে না। মিছিমিছি বদনাম দিয়ে বিয়েটা ভেঙে দেবার চেষ্টা করছিল।

সুরেন আর কিছু কথা বললে না। গাড়িটা গড় গড় করে ট্রাম রাস্তার ওপর দিয়ে আবার বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিল। সুরেনের মনে হলো সুখদার বিয়ে হয়ে যাওয়াটা যেন ভালোই হয়েছে। মা-মণি তো একটা ভাবনার হাত থেকে বাঁচলো। তখন আর কোনও সমস্যা থাকবে না মা-মণির।

মা-মণি হঠাৎ বলে উঠলো—এইবার তুইও বড় হ'। তোকে বিয়ে দিয়ে আমি ঘরে বউ আনবো।

সুরেন বললে—কিন্তু আমি বিয়ে করবো না মা-মণি—

—কেন রে, বিয়ে করবি না কেন?

সুরেন বললে যদি কোনও দিন বড় হই তখন বিয়ে করবো। আমি

অনেক বড় হতে চাই মা-মণি। অনেক অনেক বড়। বড় হতে না পারলে কেউ মানতে চায় না সংসারে।

মা-মণি বোধহয় অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাগুলো শুনে।

বললে—কে বললে তোকে এ-সব কথা!

সুরেন বললে—আমি জানি।

—কী করে জানলি তুই?

সুরেন বললে—আমার বইতে আছে।

মা-মণি বললে—রাখ তোর পাকা পাকা কথা। বড় হ' না। বড় হতে কে তোকে বারণ করছে? সুখদা চলে গেলে আমি ফাঁকা বাড়িতে একলা কী করে থাকবো? আমার তো একটা কথা বলবার লোক চাই রে—

মা-মণির কথার সুরে যেন কেমন করুণ রস মেশানো। সত্যিই তো, সুরেনের মনে হলো সুখদা চলে গেলে আর কাকে নিয়েই বা থাকবে মা-মণি। কাকে বকবে, কার ভালো-মন্দের কথা ভাববে!

ততক্ষণে গাড়িটা মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরী বাড়ির গেটের সামনে এসে গেছে। বাহাদুর গেট খুলে দিয়ে আবার স্যালিউট্ দিলে। বাবুলাল গাড়িটা নিয়ে একেবারে উঠোনের মধ্যে গিয়ে থামিয়ে দিলে।

কিন্তু হঠাৎ সুরেনের মনে হলো সমস্ত বাড়িটা যেন থম্ থম্ করছে' যেন বড় নির্জন, নিঃশব্দ অন্য দিনের চেয়ে। মা-মণিও নেমে সদরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তেতলায় চলে গেল। ওপরেও কারো সাড়া শব্দ নেই।

তরলা খবর পেয়েই দৌড়ে কাছে এসেছে।

—মা-মণি, সব্বনাশ হয়েছে।

—কী রে, কী সব্বোনাশ?

—দিদিমণি নেই।

—দিদিমণি নেই মানে? সুখদা? সুখদা নেই?

তরলার গলা আটকে যাচ্ছিল কথাগুলো বলতে।

—কী রে, কী হয়েছে বল? কথা বলছিসনে কেন? কোথায় গেল সুখদা? দোতলা দেখেছিস? বাথরুমে? যাবে কোথায় সে বাড়ি ছেড়ে? তুই কোথায় ছিলি?

তরলা বোবার মত হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল মা-মণির দিকে। তার মুখে তখন সব ভাষা সব ভাব নির্মূল হয়ে গেছে।

সেদিন মা-মণির সেই উৎকণ্ঠা দেখবার মত। এতদিন এত যত্নে এত কষ্টে এত উদ্বেগে তিনি দিন কাটিয়েছেন সুখদাকে শুধু একটু সুখী করবার জন্যে, আর সে-ই কি না এমন করে তার প্রতিদান দিলে।

মা-মণি বললে—তা কিছুই জানতে পারিসনি? তুই কী করছিলি? তোকে রাখা হয়েছে কীসের জন্যে? চোরে যদি সব চুরি করে নিয়ে যায় তো তাও তুই দেখতে পাবি না?

তরলা আর কী করবে, চুপ করে রইল।

মা-মণির তখনও কাপড় বদলানো হয়নি। সুখদার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো সেই অবস্থাতেই। ঘর ফাঁকা। ঘরে আর কীই-বা থাকবে। যেমন থাকে একখানা খাট। ওই খাটে ছোট বেলায় মা-মণি শুতো। তখন বিয়ে হয়নি মা-মণির। আর মাটিতে মেঝের ওপর শুতো বাদামী।

বাদামীও খবর পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বাদামী বললে—কী হয়েছে?

মা-মণি বললে—এই দেখ না, আমি একদিন বাড়িতে নেই, আর এদিকে তরলা বলছে সুখদা নেই বাড়িতে—

—সুখদা নেই? সুখদা নেই তো গেল কোথায় সে? সে আর যাবে কোথায়? এখেনেই কোথাও আছে—

তা বাড়ি তো আর কলকাতা শহর নয় যে কোথাও লুকিয়ে থাকলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একতলা, দু'তলা আর তিনতলা। এই তিনটে তলার মধ্যেই কোথাও-না-কোথাও আছে। ধনঞ্জয় ছিল কাছেই। সে দোতলায় খুঁজতে গেল। মা-মণিও নিজে গেল দোতলায়। দোতলায় এখন আর কে-ই বা থাকে। আগে শিবশম্ভু চৌধুরী নিজে দোতলায় বসতেন। কাজ-কর্ম দেখা-শোনা সবই দোতলায় বসে করতেন। ভূপতি ভাদুড়ী খাতা-পত্র নিয়ে ওখানেই আসতো। তিনি মারা যাবার পর ওখানে তেমন কেউ আর বসে না। সে-সব ঘর চাবি দেওয়া পড়ে থাকে। ধনঞ্জয় শুধু মাঝে মাঝে গিয়ে পরিষ্কার করে আবার তালা বন্ধ করে দেয়। ঠিক ওপরেও যেমন, দোতলাতেও তেমনি। একই মাপের ঘর সব।

—কই, এখানে তো নেই।

মা-মণি সমস্ত ঘরগুলোই দেখলে। থাকলে সে ঘরের মধ্যে থাকবে কেন? খাটের তলাতেই বা লুকোবে কেন? কী অপরাধ সে করেছে? কে তাকে বকেছে, মেরেছে, ভয় দেখিয়েছে? কেউ তো তার কিছু ক্ষতি করতে চায়নি, তার ভালোই চেয়েছে।

ভূপতি ভাদুড়ীকেও ডাকা হলো ওপরে। ভূপতি ভাদুড়ী সব শুনে অবাক। বললে—কিন্তু, এখন কী হবে? আমি যে ওদিকে পুরুত-মশাইকে খবর দিতে যাচ্ছিলাম। একটা দিন-ক্ষণ তো স্থির করতে হবে।

মা-মণি বললে—পুরুতকে পরে খবর দিও, আগে এদিকটা সামলাই—

ভূপতি ভাদুড়ী জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু যদি না পাওয়া যায়? তাহলে তো খবর দিতেই হবে ওদের ফড়েপুকুরের বাড়িতে, ওরাও তো পুরুত ডাকিয়ে দিন-ক্ষণ ঠিক করে আমাদের জানাবে—

সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মা-মণি তাড়াতাড়ি তেতলায় নিজের ঘরে উঠে গেল। কোথায় যেন একটা দুর্গম রহস্য বহুদিন ধরে মনের মধ্যে ওত পেতে ছিল, আজ তার সমাধান হয়ে গেল এই মুহূর্তে। এমন হবে তা যেন মা-মণি জানতো। এর জন্যে সমস্ত দায়িত্ব যেন মা-মণির।

বাদামী পেছন-পেছন ঘরে এসেছিল। সে বললে—পোড়ারমুখী তোমার মুখ পোড়াবে, তা তখনই জানতাম—

মা-মণি বললে—তা বাড়ি ছেড়ে সে কেন চলে গেল, তা তুই জানিস?

বাদামী বললে—ও আর জানতে হয় না, চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যায়। মুখে-চোখে মেয়েমানুষের কথা কি ভাল? কী রকম তোমার মুখের ওপর চোপা করতো, তা দেখনি?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ রে, তুই কিছু জানিস বাদামী, সত্যি করে বল্...

বাদামী বললে—আমি কী করে বলবো মা-মণি, যে পালাবো বলে পালিয়ে যায়, সে কী কাউকে বলে যায়?

—তাহলে সে কি আমাকে ছেড়েই চলে গেছে?

—তা আর যাবে কোথায়? তার কি যাবার কোন চুলো আছে?

মা-মণি কল-ঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু কোনও কিনারা পেলে না ভাবনার। ঘরের আলো জেবলে দিচ্ছিল বাদামী। মা-মণি আলো জ্বালতে বারণ করলে। অন্ধকারই যেন ভালো লাগতে লাগলো মা-মণির। ভালো ভালো, অন্ধকারই ভালো। ধনঞ্জয় রোজকার মত ঘর ঝাঁট দিতে এসেছিল। অন্যদিন মা-মণি ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ধনঞ্জয় দেখলে মা-মণি শুয়ে রয়েছে, আর ঝাঁট দিলে না। তারপর খানিক পরে তরলা এল ধুনো দিতে।

মা-মণি চোখ তুলে দেখলে। বাদামী নেই।

তরলাকে কাছে ডাকলে মা-মণি। বললে—ওরে তরলা, আমার কাছে আয় তো একবার—

তরলা কাছে এল। মা-মণি বললে--সত্যি করে বল্ তো, তুই কিছু জানিস?

তরলা বললে—আমি তো বলেছি মা-মণি, আমি কিছু জানি না।

—তা কী করে হয় বল্ তো, তুই-ই তো পাশে পাশে থাকতিস। তোর সঙ্গেই তো কথা হতো? কোনও দিন তোকে কিছু বলেছে সে? এখেনে কি তার কষ্ট হতো? এখেনে কি সে যত্ন-আত্তি পেত না? বল্ না, তুই কিছু জানিস? কখনও তোকে কিছু বলেছিল সে?

তরলা কী আর বলবে, তেমনি চুপ করে রইল।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলে—তা বিয়েই বা করতে চাইত না কেন সে? বিয়ে কি কেউ করে না? আমি বিয়ে করিনি?

কথাটা বলেই হঠাৎ থেমে গেল মা-মণি। হঠাৎ যেন নিজের অজ্ঞাতেই একটা সর্বনাশা আতঙ্কে গলাটা বুজে এল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসলো।

বললে—হ্যাঁ রে, সুখদা কি মোটেই বিয়ে করতে চাইত না? আর বিয়েই যদি না করবে তো কী করতো সে? মেয়েমানুষের বিয়ে ছাড়া আর কী গতি আছে, বল্! আমি তো তার ভালোর জন্যই বিয়ের ব্যবস্থা করছিলাম। আমি তো তার ভালোই চেয়েছিলুম। তার নিজের মা থাকলেও তো তার বিয়ে দিত। আর আমি কি তার নিজের মায়ের চেয়ে কিছু কম?

মা-মণি কথাগুলো বলতে বলতে বোধহয় কাঁদতে লাগলো।

তরলা বললে—চা এনে দেব মা-মণি?

—তুই আর বকিস্‌নি, থাম্! আমি বলে সে-মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে মরছি, এখন খিদের কথা ভালো লাগে! তুই যা, ঠাকুরকে খবর দিগে যা, আমি এ বেলা কিছু খাবো না—

তরলা চলেই যাচ্ছিল।

মা-মণি আবার ডাকলে। বললে—ওরে তরলা, শোন্, বলি আমাকে বলতে তোর বাধা কিসের? কোথায় গেল সে, বল্ না! তোকে কিচ্ছু বলে যায়নি? সে কী আর ফিরবে না আমার বাড়িতে? আর কখনও ফিরবে না?

সদাব্রতের মনে আছে সে রাত্রিতে বাড়িটা যেন কেমন নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল তার কাছে। তখন অতটা বুঝতে পারেনি। শীতের রাত অমন একটু নিঝুম হয়ই। রান্না-বাড়ির আলোটা যেন একটু সকাল-সকাল নিভে গিয়েছিল। বাহাদুর সিং লোহার গেটটা একটু আগে আগে বন্ধ করে দিয়েছিল। দুখমোচনদের ঘরের আওয়াজ অন্য দিনের চেয়ে বেশি সকাল সকাল থেমে গিয়েছিল। পড়তে

পড়তে প্রথম দিকে তেমন খেয়াল হয়নি। ক'দিন থেকে পড়ায় মন বসছিল না। নানা কারণে মনটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি রাত্রের খাওয়াটা সেরে নিয়ে এসে আবার দরজা জানালা বন্ধ করে এক মনে বই নিয়ে বসেছিল। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ছিল সুখদার বিয়ের কথাটা।

ফড়েপুকুরে গিয়ে সুরেনের প্রথমেই মনে হয়েছিল কত বড় বাড়ি! সত্যিই অত বড় বাড়িতে বিয়ে হবে সুখদার। খুব বড়লোক ওরা। ওই রকম বড়-লোকদের উপরেই তো দেবেশদের যত রাগ।

বুড়ো ভদ্রলোক কিন্তু বেশ অমায়িক। মনে আছে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করছিলেন—ইটি কে আপনার?

মামা বলেছিল—আমার বাপ-মা-মরা ভাগ্নে—

—বাঃ বেশ বেশ, আপনার ভাগ্নেটি বেশ বুদ্ধিমান—

সুরেন যে বুদ্ধিমান ছেলে এটা তিনি কী দেখে বুঝেছিলেন কে জানে। হয়তো কথার কথা। একটা ভালো কথা বলতে হবে বলেই বোধহয় বলা! অথচ সবাই-ই তো তাকে সরল-নির্বোধ বলেই জানে! সুব্রতও তাই জানে, দেবেশও তাই। সুখদাও তাকে মনে মনে সরল গো-বেচারা বলে মনে করে। কিন্তু কেউ তো জানে না যে, সে সব বুঝতে পারে, সব ধরতে পারে। সুখদা ভেবেছিল, কে যে তাকে চুমু খেয়েছিল তা সে জানতে পারেনি। যাক, বোকা হওয়ার জন্যে সুরেনের তো কোনও অসুবিধে নেই। বরং সুবিধেই অনেক।

ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে রাত দশটা বাজলো।

আরো দু ঘণ্টা পড়তে পারবে সুরেন। সে-সব দিনে সুরেন অনেক বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে পারতো। মনে আছে পরীক্ষার আগের দিন রাত তিনটে পর্যন্ত পড়েও সাধ মেটেনি।

মামা মাঝ-রাত্রে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল—কী রে, এখনও পড়ছিস? ঘুমোবি না? কাল তো এগ্‌জামিন তোর?

কিন্তু অত রাত পর্যন্ত না পড়লে কি পাশ করতে পারতো সুরেন শেষ পর্যন্ত? পরিশ্রম কবতেই হয়। জীবনে উন্নতি করতে গেলে পরিশ্রম তো অপরিহার্য। সেই যে নিতাই, তাদের গ্রামের ইস্কুলের নিতাই। সেই নিতাই-এর কথাও মনে পড়তো সুরেনের। ভগবান আছে কি নেই, তাই নিয়ে তর্ক করতো। বলতো—ভগবান যদি থাকবে তো ভাল মানুষদের সর্বনাশ হয় কেন? সেই নিতাইও কিন্তু খুব পড়তো। ক্লাশে ফার্স্ট হতো। তারপর একদিন ফট্ করে মরে গেল। আশ্চর্য! যা-ই বলো, মারা যাওয়াটা একটা আশ্চর্য কাণ্ড কিন্তু। এই নড়ছে চলছে খাচ্ছেদাচ্ছে, তারপর হঠাৎ একদিন টুপ করে মরে গেল। আগের দিনও জানতো না সুরেন। একসঙ্গে ইস্কুল থেকে এসেছে। খেলেছে। তারপর যে-যার বাড়ি চলে গেছে। তারপর শেষ রাত্তিরের দিকে হঠাৎ নিতাইদের বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ পেয়ে সবাই দৌড়ে গিয়েছে। তারপরেই শোনে—সব শেষ!

উঠোনের বাইরে গেট খোলার আওয়াজ হতে অবাক হয়ে গেল সুরেন। এত রাত্রে বাহাদুর আবার গেট খুলতে গেল কেন? এমন তো কখনও হয় না।

রাত তখন বারোটা। রাত দশটার সময়ই বাহাদুর সিং শেষ ঘণ্টাটা বাজিয়ে দেয় রোজ। তারপর সমস্ত রাত আর ঘণ্টা বাজাবার দরকার হয় না। একেবারে ভোর পাঁচটার সময় আবার বাজায়।

জানালাটা খুলে সুরেন উঁকি মেরে দেখলে। আলো জ্বলে উঠেছে।

মামারও গলা পাওয়া গেল। এত রাত্রে আবার মামা ঘুম থেকে উঠে কী করছে? তারপরেই দেখলে দু'জন পুলিশ-কনস্টেবল্!

পুলিশ-কনস্টেবল্ দেখেই সুরেন কেমন হতবাক্ হয়ে গেল!

এত রাত্রে, এই রাত বারোটার সময় এ-বাড়িতে পুলিশ কেন?

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলেই সোজা উঠোনের দিকে গিয়ে দেখলে আরো অনেকে এসেছে তখন সেখানে। পুলিশ দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আর মামার দফতরের ভেতরে একটা চেয়ারে বসে একজন পুলিশ-ইন্সপেক্টর নোট-বুকে কী সব লিখছে। আর মামাকে সব অনেক প্রশ্ন করছে।

দুখমোচন এসে আড়ালে দাঁড়িয়েছে। অর্জুনও এসেছে সঙ্গে। ঠাকুর-চাকর-ধনঞ্জয় তারাও রয়েছে এপাশে-ওপাশে। ফিস্-ফিস্ করে কথা বলছে। বাহাদুর সিংও গেটের পাশে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে।

সুরেন হতবাক্ হয়ে সকলের কথা শোনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সামনে যাকে পেলে তারই কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী হয়েছে গো? পুলিশ কী জন্যে?

ঠাকুর বললে সুখদা দিদিমণি পালিয়ে গেছে—

সামনে বাজ পড়লেও বোধহয় কেউ এত অবাক হয় না।

সুরেন বললে—সুখদা দিদিমণি? পালিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, পুলিশে খবর দিতে বলেছিল মা-মণি, তাই—

—তা পালালো কেন?

—কে জানে? দুর্মতি হয়েছিল হয়তো।

সুরেন বুঝতে পারলে না। বললে—কীসের দুর্মতি? এখানে কি কেউ বকেছিল?

ঠাকুর বেশি কথা বলতে পারলে না। সুরেন গিয়ে দাঁড়ালো মামার দফতরের জানালার কাছে।

পুলিশ-ইন্সপেক্টর তখন মামাকে বলছে—আপনারা তখন কোথায় ছিলেন?

মামা বলছে—আমরা তখন সুখদার জন্যেই বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে যে-বাড়িতে সেই বাড়িতে পাকা-কথা বলতে গিয়েছিলাম।

—বিয়ে কি সেখানেই পাকা হয়ে গিয়েছিল?

মামা বললে—হ্যাঁ, আমরা তো বিয়ের কথা পাকাপাকি করেই বাড়ি এলাম। এসে শুনলাম মেয়ে বাড়িতে নেই।

—এই বিয়ের জন্যে মেয়ে কি কিছু আপত্তি জানিয়েছিল?

মামা বললে—হ্যাঁ, সে বিয়ে করতেই চাইত না—

—কেন, বিয়েতে কেন আপত্তি ছিল তার? অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে জানাশোনা ছিল? মেলামেশা?

মামা বললে—তা তো জানি না।

—একলা কোথাও বেরোত? ট্রামে-বাসে কোথাও যেত? কারো সঙ্গে মেলামেশা করতো?

মামা বললে—না স্যার, তা তো কখনও শুনিনি, কখনও দেখিওনি—

—স্বভাব-চরিত্র?

মামা গলা নিচু করলো এবার। তারপর মাথা নিচু করে বললে—স্বভাব-চরিত্রটা তেমন ভালো ছিল না স্যার—

সুরেন কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। অথচ এই মামাই কতদিন কত

ঘটককে সুধদার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বড় গলা করে বলেছে। আর আজ এমন করে সব উল্টো বলছে!

—কেন, স্বভাব-চরিত্র খারাপ ছিল সেটা কীসে বুঝলেন?

মামা বললে—মাঝে-মাঝে একটা ছেলে আসতো বাড়িতে। তার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি আমি।

—কেন, আপনাদের তো পর্দানশিন বাড়ি, কী করে কথা হতো?

মামা বললে—আমার সন্দেহ হতো কথা হতো, আমি হাতে-নাতে কখনও দু'জনকে কথা বলতে দেখিনি—

—ছেলেটা কী রকম দেখতে?

—ফরসা, লম্বা, একটু গোঁফ আছে। চেহারাটা দেখবার মত।

—কী নাম?

মামা বললে—নামটা জানি না।

—কী করে বলে মনে হয় আপনার?

মামা বললে—আমার যতদূর মনে হয় সে ট্যাক্সি চালায়।

পুলিশ-ইনস্‌পেক্টর জিজ্ঞেস করলে—ট্যাক্সি চালায়? কিন্তু যে ট্যাক্সি চালায় সে এ-বাড়িতে কী সূত্রে আসে? আপনাদের বাড়িতে গেটে দরোয়ান রয়েছে, এত কড়াকড়ি, আর তাছাড়া আপনাদের মেয়েও তো কোনও কলেজে পড়েনি বলছেন। তাতে দু'জনের পরিচয় হওয়ার সুযোগ হলো কী করে?

মামা বললে—তা জানি না। তবে আমি তো দেখিনি কিছু, শুধু সন্দেহ করছি। ট্যাক্সির নম্বরও আমি কিছু বলতে পারবো না। তবে আমাদের মেয়েকে কলেজে পড়ানো হয় না বটে কিন্তু বাইরে যে একেবারে যায় না তা তো নয়। বাইরে যায় ন'মাসে ছ'মাসে—

—কোথায় যায়?

মামা বললে—এই ধরুন, মা-মণির সঙ্গে হয়তো কখনও কাশী গেল, কি এখানেই কালীঘাটের মন্দিরে গেল। অত দূরে তো ঘোড়ার গাড়ি যায় না, তখন ট্যাক্সি করতে হয়—

সুরেন কান পেতে সব শুনছিল। তার চোখের সামনে যেন এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। এ-সব কথা তো সে জানতো না। ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড চলেছে তা নজরেই পড়েনি। তবে কি মা-মণিও সব জানে! এরা কেউ তাকে কিছুই বলেনি এতদিন। এতদিন শুধু বোকার মতন সে ভেবে এসেছে, সে সব জানে। কিন্তু পৃথিবীর অনেক কিছুই তার জানতে এখনও সত্যিই বাকি!

—আচ্ছা, ঠিক আছে, খবর পেলে পরে আপনাদের জানাবো।

বলে পুলিশ-ইনস্‌পেক্টর উঠে দাঁড়ালো। বাইরের উঠোনে তখন সবাই আবার আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। সুরেনও সরে গেল সামনে থেকে। মামা দেখতে পেলে খারাপ হবে। কন্‌স্টেবল্‌ দুটো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ-ইনস্‌পেক্টর ঘর থেকে বেরোতেই তারাও তার পিছন-পেছন চলতে লাগলো। বাহাদুর সিং গেট খুলে দিয়ে সেলাম করলে। তারা চলে যেতেই আবার শব্দ করে গেট বন্ধ করে দিলে।

সুরেন আর দাঁড়ালো না সেখানে।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিলে প্রথমে। তারপর দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। দিয়ে শুয়ে পড়লো। তখন আর পড়বার মন

নেই। কেবল মনে হতে লাগলো এ কেমন করে হয়! এ কেমন করে সম্ভব হতে পারলো! ট্যাক্সি-ড্রাইভার, ফরসা, লম্বা, গোঁফ আছে। দেখতে ভালো। অনেক মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলো সুরেন। এমন লোককে তো কখনও এ-বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখেনি। কে সে? কী করে পরিচয় হলো সুখদার সঙ্গে। আব পরিচয়ই যদি হলো তো না-বলে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে? এই এত বড় বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আশ্রয় সব কিছু ছেড়ে? ছেলেটা কি ফড়ে-পুকুরের সরকারদের চেয়েও বড়লোক? না কি মা-মণির চেয়ে? যদি তার সঙ্গে এ-বাড়ি ছেড়ে চলেই যাবে তাহলে সুরেনকে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কেন?

চোখ বুজে ভেবে ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাওয়া গেল না। যতবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে ততবার ঘুরে ফিরে কেবল সুখদার কথাগুলো মনে পড়ে যেতে লাগলো।

তারপর যখন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লো, তখন সুখদা, দেবেশ, সুব্রত, পমিলি, মামা, পুলিশ-ইন্‌সপেক্টর, বুড়োবাবু, সব একাকার হয়ে গেল। আর কিছু মনে রইল না।

মানুষের জীবন যে কত বিচিত্র তার পরিচয় সারা জীবন ধরে পেয়েছে সুরেন। নইলে কোথায় মাধব কুণ্ডু লেন, কোথায় সুকীয়া স্ট্রীট, আর কোথায় এই বৌবাজার ষ্ট্রীট—বৌবাজার ষ্ট্রীটের রাস্তার ধারের এ-বাড়িটা অনেকবাব দেখেছে সুরেন, কিন্তু কখনও এমন করে সোজা-স্পষ্ট নজর দিয়ে দেখেনি।

দেবেশ বললে—এই বাড়িটা। এই বাড়িটার দোতলাতেই আমাদের পার্টির অফিস—

বাড়িটার পাশ দিয়ে এক ফালি রাস্তা। সেই সরু গলি দিয়ে একেবারে সোজা ভেতরে ঢুকে যেতে হয়। সেখানেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। ভাঙা-চোরা সিঁড়ি, কাঠের ভাঙা রেলিং। ওপরে উঠতে গেলে রেলিংটা নড়বড় করে।

ভেতরে দলের লোকজন যা ছিল, তাদের সঙ্গে পূর্ণবাবুও ছিল। সামনে ইলেকশান আসছে। তাতে পার্টির ম্যানিফেস্টো বার করা দরকার। দিল্লী, পাটনা, বোম্বাই সব অফিসে চিঠি চলে গেছে। সব ডেলিগেটরা দু'-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে। পূর্ণবাবু কলকাতা অফিসের প্রেসিডেণ্ট। আজকেও একটা সাব-কমিটির মীটিং আছে।

হঠাৎ দেবেশ ঢুকলো। সঙ্গে আর একটা নতুন মুখ।

পূর্ণবাবুর কাছে এসে দেবেশ বললে—পূর্ণদা, এর কথাই বলেছিলাম আপনাকে—

পূর্ণবাবু চিনতে পারলে না। বললে—কে? কার কথা বলেছিলে?

দেবেশ বললে—সেই সুরেন। সুরেন সান্ন্যাল—আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে -

তখনকাব সময়ে অমন অভিজ্ঞতা সুরেনের কাছে নতুন। একটা ঘর। ঘরই শুধু। ঘরের ভেতরে তেমন কোনও আসবাব-পত্র নেই! এক কোণের দিকে

একটা রং-চটা টেবিল পড়ে আছে। পাশে দু'একটা হয়ত চেয়ারও ছিল। আর মাটিতে লম্বা মাদুর পাতা। খানিকটা মাদুর, আর খানিকটা মেঝে শতরঞ্জিতে ঢাকা।

মাঝখানে পূর্ণবাবু বসে ছিলেন। তাদের টাউন এ্যাকাডেমির টিচার।

পূর্ণবাবু বললেন—এসো এসো—

দেবেশ বললে—আমি অনেকদিন থেকেই আসতে বলছি স্যার, কিন্তু সামনে একজামিন বলে আসতে পারছিল না, তবু জোর করে ওকে এনেছি—

পূর্ণবাবু বললেন—তোমায় তো দেখেছি—

দেবেশ বললে—হ্যাঁ স্যার, এ তো আমাদের সঙ্গেই পড়ে—এ আর আমি আর সুব্রত, সবাই আমরা এক ক্লাসের ছাত্র—

—সুব্রতর সঙ্গেও তোমার ভাব আছে নাকি? পূর্ণবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

দেবেশই সুরেনের হয়ে জবাব দিলে। বললে—সুব্রতদের বাড়িতে যে এ খুব যায় স্যার। খুব ভাব এর সঙ্গে। তার জন্যেই তো একে আমি সাবধান করে দিয়েছি—

সুব্রতর বাড়িতে বেশি যাওয়ার কথাটা পূর্ণবাবুকে না বললেই পারতো দেবেশ। হয়তো দেবেশ কথাটা ইচ্ছে করেই বললে। যেন জানিয়ে দিলে যে সুরেন পূর্ণবাবুদের দলে নয়। তা ছাড়া ঘরে তো আরো অনেক লোক রয়েছে। তারাই বা কী ভাবছে! তারা ভাবছে এই ছেলেটা এমন এক বাড়িতে যায়, যেখানে যাওয়া অন্যায়। হয়তো অন্যায়। কিন্তু অন্যায়ই যদি হবে তো সবাই মিলে ওদের গরীব করে দিলে পারে! যারা অন্যায় করে তারা কেন সমাজের চোখের সামনে অত মাথা উঁচু করে আছে। কেন সুব্রতর বাবাকে অত লোক ভক্তি-শ্রদ্ধা করে! কেন ওদের অত টাকা! ও-টাকা কেড়ে নিলেই পারে সবাই জোর জুলুম করে!

সুব্রত বলতো—আমাদের ওপর ওদের অত রাগ কেন জানিস? রাগ বাবা কংগ্রেসের লোক বলে! আগে কংগ্রেসের লোক হলে লোকে মানতো, এখন আর মানে না—

সুরেন বলতো—কেন, আর মানে না কেন?

সুব্রত বলতো—হিংসে হয় সকলের। আগে তো আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আগে বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, কিন্তু এত বড় বাড়ি ছিল না, এমন বিলিতি গাড়িও ছিল না। আগে আমাদের বাড়িতে এত লোকও আসতো না। আগে বাবা পাড়ায়-পাড়ায় প্রত্যেক লোকের বাড়িতে বাড়িতে পায়ে হেঁটে যেতো, দেখা করতো, কথা বলতো সকলের সঙ্গে। আগে সকলের বিপদে-আপদে, মেয়ের বিয়েতে চাঁদা দিত, টাকা দিত যে—

—তা এখন আর দেয় না কেন?

সুব্রত বলতো—এখন যে বাবা আর মোটে সময় পায় না। এখন ঘুম থেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে লোক এসে হাজির হয়, আবার যখন বাবা এ্যাসেম্ব্লি থেকে ফেরে তখনও দলে-দলে লোক আসে সঙ্গে সঙ্গে—

সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—অত লোক কেন আসে? কী চায় তারা?

সুব্রত বলতো—চাওয়ার কি শেষ আছে তাদের? মিনিস্টারের হাতেই তো সব। বাবা ইচ্ছে করলেই তো একজনকে বড়লোক করে দিতে পারে। সেই-জন্যেই তো সবাই বাবাকে খোসামোদ করে। একটা মদের দোকানের লাইসেন্স যদি কেউ পেয়ে যায় তো সে রাতারাতি হয়ে যাবে একেবারে মালামাল—

—মদের দোকানের লাইসেন্স?

সুব্রত বলেছিল—শুধু কি মদ, আরো কত রকমের লাইসেন্স, কত রকমের পারমিট আছে, তার কি ঠিক আছে? বাবার হাতে সমস্ত ক্ষমতা। বাবা ইচ্ছে করলেই সকলকে পারমিট দিতে পারে। হাসপাতালে বেড পাওয়া যাচ্ছে না কারো, বাবার এক টেলিফোনে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে—

দেবেশদের পার্টির অফিসে বসে পূর্ণবাবুর কথা শুনতে শুনতে সেই সব কথাগুলোই মনে পড়তে লাগলো। ওই পমিলির কথাটাও মনে পড়লো। অত ভালো মেয়ে, অত মিষ্টি কথা, কিন্তু চেহারায় যেন কত অহঙ্কার মেশানো। অথচ কী চমৎকার ব্যবহার করেছিল সেদিন সুরেনের সঙ্গে।

পমিলি বলেছিল—তুমি আর এ-বাড়িতে আসবে না জানো?

আশ্চর্য, সুরেনের চরিত্র খারাপ হয়ে গেলে যেন পমিলিরই ক্ষতি! কিন্তু সুরেন ভালো থাকলো কি খারাপ হয়ে গেল, তাতে পমিলির কী আসে যায়? সে তো পমিলিদের কোনও উপকারেই আসবে না কোনওদিন। পমিলি-দের সঙ্গে সুরেনদের তো কোনওদিনই মিলবে না।

পমিলিই সুরেনকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি যে সুব্রতর কাছে আসো তোমার বাবা-মা জানে?

সুরেন বলেছিল—আমার বাবা-মা কেউই নেই—

—তাহলে কে আছে?

—আমার মামা আছে।

—তোমার মামা জানে যে তুমি এখানে আসো?

সুরেন বলেছিল—হ্যাঁ—

পমিলি জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তোমার মামা জানে আমরা কী রকম লোক, আমার বাবা কী করে?

সুরেন বললে—তা জানে। আমি যে সব বলেছি মামাকে।

—কিন্তু আজ যে এখানে মদ খেলে, এটাও গিয়ে মামাকে বলবে?

এ-কথার কোনও উত্তর দিতে পারেনি সুরেন। মদ খাওয়ার কথা কি কাউকে বলা যায় নাকি? মদ খাওয়ার কথা শুনলে মামাই বা কী ভাববে! হয়তো আর আসতেই দেবে না সুব্রতদের বাড়িতে। আর যদি মা-মণি একথা জানতে পারে তো খুব বকবে তাকে। মামাকে বলে হয়তো লেখাপড়া করা বন্ধ করে দেবে।

খানিক পরে রাস্তায় বেরিয়ে দেবেশ বললে—শুনলি তো সব তুই?

সুরেন কিছুই শোনেনি। যতক্ষণ পূর্ণবাবুর সামনে বসে ছিল ততক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তবু বললে—হ্যাঁ শুনলুম—

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—কেমন লাগলো কথাগুলো?

সুরেন চলতে চলতে বললে—ভালো—

দেবেশ বললে—আসলে যারা চোর যারা ওই রকম খদ্দর পরে দেশসেবার ছদ্মবেশ ধরেছে তাদের হটিয়ে দেওয়া চাই। সামনে তো ভোট আসছে, দেখবি এবার পূর্ণবাবু ভোটে দাঁড়াবে। তোদের বাড়িতে ক'টা ভোট?

সুরেন বললে—তা তো জানি না—

দেবেশ বললে—জানতে হবে তোকে। শুধু জানতে হবে নয়, সকলকে দিয়ে পূর্ণবাবুকে ভোট দেওয়াতে হবে—

সুরেন বললে—আচ্ছা—

দেবেশ তবু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—আচ্ছা বললে চলবে না! এতক্ষণ সব শুনলি তো? এতগুলো চোর-ডাকাত-বদমাইস দেশটাকে লুটে-পুটে খাবে এটা কি সহ্য করা যায়? পূর্ণবাবু তাই ঠিক করেছে এবার আমাদের পার্টি থেকে দাঁড়াবে।

চলতে চলতে সুরেন হঠাৎ বললে—জানিস দেবেশ, আমার মা-মণি এবার খুব বিপদে পড়েছে ভাই—

—তোর মা-মণি—সে আবার কে?

সুরেন বললে—তোর কিছু মনে থাকে না। তোকে বলিনি, আমি যে বাড়িতে থাকি সে বাড়ির মালিককে আমি মা-মণি বলে ডাকি! সেই মা-মণির একটা মাসতুতো বোন ছিল বাড়িতে, সে হঠাৎ বাড়ি থেকে পালিয়েছে—

দেবেশ বুঝতে পারলে না। বললে—পালিয়েছে? পালিয়েছে মানে?

—পালিয়েছে, মানে পালিয়ে গেছে!

দেবেশ বললে—সে তো বুঝলুম, কিন্তু কেন পালিয়েছে? পালিয়ে কোথায় গেছে?

সুরেন বললে—তা কেউ জানে না। পুলিশে খবর দিয়েছে মামা। সেই জন্যে পুলিশ বাড়িতে এসেছিল। তারা এন্‌কোয়ারি করছে এখন।

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—কেন পালালো? তুই কিছু জানিস?

সুরেন বললে—আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কেউই কিছু বুঝতে পারছে না। এমন করে যে হঠাৎ পালিয়ে যাবে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। অথচ মেয়েটা ভালো ছিল ভাই। একটা বিরাট বড়লোকের বাড়িতে বিয়ের সব ঠিক-ঠাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মোটে বিয়ে করতে চাইত না।

—কত বয়েস?

সুরেন বললে—এই বছর সতেরো আঠারো হবে।

দেবেশ গম্ভীরভাবে বললে—ওই বয়েসটা খারাপ। কী রকম দেখতে?

—খুব সুন্দর।

দেবেশ মাথা নাড়তে লাগলো। বললে—একে ওই বয়েস, তায় দেখতে ভাল, এ রোগ শিবের অসাধ্য। কলকাতা সহরে খুঁজে বার করা মুশকিল! আর তাছাড়া কলকাতায় আছে কি না কে জানে। হয়তো কলকাতা ছেড়ে দিল্লি-বোম্বাই-মাদ্রাজ কোথাও-না-কোথাও চলে গেছে—

সুরেন ভয় পেয়ে গেল। বললে—তাহলে তুই বলছিস তাকে পাওয়া যাবে না?

দেবেশ এবার সুরেনের মুখের দিকে চাইলে। বললে—তাকে পাওয়া যাক আর না-যাক, তাতে তোর কী? তোর ভয় কীসের? তোর কে সে?

সুরেন সামলে নিলে নিজেকে। বললে—না, আমার কেউ হয় না সে—

—তাহলে? তাহলে তুই অত ভাবছিস কেন?

কথাটা সত্যি! সুখদা যদি তার কেউ না-ই হবে তাহলে সে অত ভাবছে কেন? তার যেখানে খুশী যাক না সে। তাতে তো সুরেনের কিছু আসছে-যাচ্ছে না। সুরেন তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলো। বললে—আমি যাই ভাই দেবেশ, আমার একটু তাড়া আছে—

দেবেশ পেছন পেছন এগিয়ে কাছে এল। বললে—অত তাড়া কিসের? আমিও তো যাবো, আমারও তো একজামিনের পড়া আছে। জানিস, এই যে পূর্ণবাবুর কাছে আসি, এ কেন আসি? লেখাপড়া করে একজামিনে পাশ

করে কিছু হবে না। দেশের গভর্মেণ্ট যদি ভালো না হয় তো আমাদের হাজার চেষ্টাতেও কিচ্ছু হবে না। দেখছিস না, যারা একজামিনে ফার্স্ট হচ্ছে তারা দু'শো তিনশো টাকা মাইনের চাকরি পাচ্ছে, আর যারা ফেল করছে তারা দু' হাজার তিন হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। এ কেন হয়?

সুরেন হঠাৎ বললে—এই, তুই সেদিন বলেছিলি না যে পমিলি মদ খায়? ওই সুব্রতর বোন?

দেবেশ বললে—হ্যাঁ, মদ খায় তো—আমি তো নিজের চোখে দেখেছি—

সুরেন বললে—হ্যাঁ ভাই, তুই ঠিকই বলেছিলি, ওরা মদ খায়।

—তুইও দেখেছিস খেতে?

সুরেন বললে—কাউকে তুই বলিসনি যেন, ওদের বাড়িতে ওদের রেফ্রিজারেটারের মধ্যে মদের বোতল থাকে। আমাকে একদিন খাইয়েছে।

—তুইও খেয়েছিস?

সুরেন বললে—তুই কাউকে বলিসনি। আমাকে জোর করে খাওয়ালে সুব্রত। আমি একটুখানি চেখে দেখেছিলাম। কিন্তু সুব্রত অনেকখানি খাইয়ে দিলে।

—তারপর? তারপর কী করলি? তুই সত্যি সত্যি খেলি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ ভাই, খেলুম!

দেবেশ খানিকক্ষণ সুরেনের মুখের দিকে সোজা হাঁ করে চেয়ে রইল: বললে—আমি তোকে বলেছিলুম ওরা খায়! বলিনি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, তুই বলেছিলি। ওর বোনও খায়। ওই পমিলি—

—সেও তোর সামনে খেলে নাকি?

সুরেন বললে—না, সে খেলে না। আমি খাচ্ছি দেখে আমাকে খেতে বারণ করলে। বললে—মদ খাওয়া খারাপ। গরীব লোকদের মদ খেতে নেই। একবার নেশা হয়ে গেলে তখন ছাড়া মুশকিল—

দেবেশ বললে—তাহলে দেখছি জ্ঞানপাপী—

সুরেন বললে—না রে ভাই, মেয়েটা সত্যিই ভালো। মদ খেলে কী হবে, কিন্তু মদ খাওয়া খারাপ তা জানে। আমাকে ধরে এনে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে—

দেবেশ বললে—আর তুইও অম্নি গলে গেলি—?

সুরেন বললে—আমি ভাই এখান থেকে ট্রামে উঠি, আর হাঁটতে পারছি না—তোর বাড়ি তো ওদিকে—

দেবেশ বললে—তাহলে ভোটের কথাটা মনে রাখিস। পূর্ণবাবুকে ভোট দিতে হবে।

—আচ্ছা—বলে সুরেন ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার ভিড়ের মধ্যে উঠে পড়লো।

ভোর বেলা থেকে যে-বাড়িতে কলরব শুরু হয়ে যায়, আর একেবারে রাত এগারোটা পর্যন্ত যে-বাড়ি সরগরম থাকে, সেই বাড়িটাই ক'দিন থেকে কেমন যেন ঝিমিয়ে এসেছিল। অথচ এমন কী আর পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন যা হয়েছে সে তো বেশির ভাগ ভেতরে। একেবারে যেন অন্তঃসারশূন্য

হয়ে গেছে অন্তঃকরণটা, একটা লোক মাত্র সংখ্যায় কমেছে। তাতে হিসেবের তেমন কিছু তারতম্য না-হওয়ারই কথা। যতখানি চালের ভাত রোজ চড়াতো ঠাকুর, ততখানি চালই চড়ানো হচ্ছিল, ধনঞ্জয় যেমন রেশনের দোকানে গিয়ে রেশন নিয়ে আসে, তেমনিই আসতে লাগলো। ভূপতি ভাদুড়ী ঠিক তেমনি করেই রোজ নিজের দফতরে বসে হিসেবের খাতা লিখতে লাগলো। এ-বাড়ির একটা মেয়ে যে এতদিনকার অভ্যস্ত গন্ডী পেরিয়ে নিরুদ্দেশের দিকে পাড়ি দিলে তার আঘাতে এ-বাড়ির বাইরের জগতে কোথাও কোনও ফাটল ধরলো না।

শুধু মা-মণি যেন ভেতরে ভেতরে আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

বাদামী বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। সে সন্ধ্যেবেলা মা-মণির পায়ের কাছে বসে পা দুটো টিপতে এলে মা-মণি পা সরিয়ে নিত। বলতো—না থাক। তরলা ঘরের ভেতরে এসে খাবার কথা জিজ্ঞেস করলে মা-মণি শুধু বলতো—না, এখন থাক, পরে। তেতলার সংসারে ভেতরটায় শুধু থম্ থম্ করে। কিন্তু মাধব কুণ্ডু লেনের পাড়ায় যথারীতি দোকান-পাট পসারী নিয়ম করে বেচা-কেনা করে। গেটের সামনে ঠিক আগেকার মত গোঁফ পাকিয়ে পাহারা দেয় বাহাদুর সিং। আর বাড়ির উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে দুখমোচন ঠিক আগেকার মতই ভূপতি ভাদুড়ীর ঘরখানার দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে। একটু কাজে গাফিলতি হলেই সরকার-বাবুর কাছে বকুনি খেতে হবে।

সুরেন উঠোনের মধ্যে দিয়ে একবার গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়, আবার খানিকক্ষণ পরে বাড়ির ভেতরে এসে ঢোকে। তারপরে বাহাদুর সিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে—আচ্ছা বাহাদুর সিং—

বাহাদুর সিং সেলাম ঠোকে। বলে—কী ভাগ্নাবাবু—

সুরেন বলে—আচ্ছা, বাইরের লোক কেউ এলে তুমি তাকে ভেতরে ঢুকতে দাও কেন বাহাদুর?

হঠাৎ এ-প্রশ্নে অবাক হয়ে যায় বাহাদুর সিং। বলে—লোক কত কাজে আসে হুজুর, আমি তো জিজ্ঞেস করে তবে ছাড়ি—

সুরেন বললে—তুমি সকলের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করো?

—হ্যাঁ, করি হুজুর। আপনার দোস্ত্‌রা আসে, তাদের জিজ্ঞেস করি কার কাছে যাচ্ছে, কার সঙ্গে তারা দেখা করবে। আপনার নাম তারা বলে তবে তাদের ছাড়ি—

সুরেন বাধা দিয়ে বলে—না না, আমার বন্ধুদের কথা হচ্ছে না, একজন ফরসা মতন লোক মাঝে-মাঝে এ-বাড়িতে আসে, তাকে তুমি ঢুকতে দাও কেন?

—ফরসা আদমী?

বাহাদুর সিং ঠিক বুঝতে পারলে না। সব বাবুরাই তো ফরসা। কোন ফরসা বাবুকে সে ছেড়েছে তা সে ঠিক করতে পারলে না। চোর-ডাকুরাও তো ফরসা হতে পারে। তাদের তো কখনও ভেতরে ঢুকতে দেয়নি বাহাদুর সিং। চোর-ডাকাতি যাতে না হয় সেই জন্যেই তো বাহাদুর সিংকে রাখা হয়েছে। কোনও কি চুরি হয়েছে বাড়িতে? কখনও কি ডাকাতি হয়েছে? যখন কাজ করতে করতে এক ফাঁকে চাপাটি বানিয়ে নেয়, তখনও তো নজর রাখে গেটের দিকে, কেউ বেওয়ারিশ লোক যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—তাহলে সুখদা দিদিমণি পালিয়ে গেল কী করে!

এর জবাব দিতে পারলে না বাহাদুর সিং। সুরেন আবার বললে—দিদিমণি তো একলা যায়নি, নিশ্চয়ই কেউ ছিল তার সঙ্গে। একজন ফরসা মতন লোক ছিল, তুমি দেখতে পেলে না? তার বেলাতেই তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? রাত বিরেত নয় কিছু নয়, সন্ধ্যেবেলা তোমার চোখের সামনে দিয়ে লোকটা দিদিমণিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল আর তুমি দেখতে পেলে না?

এ-সব কথার জবাব একবার দিয়েছে সে ভূপতি ভাদুড়ীকে, আর একবার দিয়েছে পুলিশের দারোগা সাহেবকে। এ পাড়ার থানায় গিয়েও সে এজাহার দিয়েছে। তার জবান খাতায় লিখে নিয়েছে দারোগা-সাহেব। কিন্তু তার জবানে কেউ খুশী হয়নি।

আবার সেই একই জবাব জানতে চাইছে ভাগ্নেবাবু।

বাহাদুর সিং বললে—হুজুর, কসুর হয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে গেছি, এখন নজরে কম দেখি—

রেগে যায় সুরেন। বলে—নজরে কম দেখ তো চাকরি ছেড়ে দাও। পাহারা দেওয়াই তোমার কাজ, পাহারাই যদি ভাল করে না দিতে পারো তো এ-চাকরি করছো কেন? মাইনে নিচ্ছ কেন? তুমি নোকরি ছেড়ে দাও। তোমার বদলে অন্য লোক রাখবো আমরা। এমন লোক রাখবো যে চোখে দেখতে পায়, যে কাজে ফাঁকি দেয় না!

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো সুরেন। খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল সত্যি। বললে—তোমার গাফিলতির জন্যে কত বড় সর্বোনাশ হয়ে গেল দেখ দিকিনি বাড়ির। মা মণি ক'দিন ধরে খাচ্ছে না তা জানো? মা-মণি কারোর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছে না তো জানো? চুপ করে থাকলে চলবে না। বলো, উত্তর দাও—

তখনও রাগ থামেনি সুরেনের। একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—তুমি মানুষ না কী, বল তো বাহাদুর সিং? বাড়িতে কত অশান্তি চলেছে এর জন্যে তা তুমি জানো? দিদিমণির বিয়ের সব পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তোমার ভুলের জন্যে সব ফেঁসে গেল? এতে মানুষের মনে কী কষ্ট হয় তুমি বুঝতে পারো না? জানো, কুটুমদের কাছে কী-রকম লজ্জায় পড়তে হলো মা-মণিকে? মা-মণি সেই লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পর্যন্ত পারছে না তা জানো? এতদিন হয়ে গেল অথচ আমাকে এ-ক'দিনের মধ্যে একদিনও মা-মণি ডেকে পাঠাচ্ছে না। মনে কতখানি কষ্ট পেলে এমন হয় তা তুমি বুঝতে পারো না? আর তোমাকে এত কথা বলা বৃথা, তুমি এ-সব কথা বুঝবেই বা কী করে? ছি ছি, তোমার জন্যে এত বড় সর্বোনাশটা হয়ে গেল—

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ পেছন থেকে ভূপতি ভাদুড়ী এসে হাজির হয়েছে।

বললে—কী রে, এখানে দাঁড়িয়ে তুই এর সঙ্গে কী বক্-বক্ করছিস?

সুরেন পেছন ফিরে চমকে উঠলো। কিন্তু মুখে কিছু উত্তর দিলো না।

মামা আবার বললে—বাহাদুরকে তুই কী বলছিলি? কার লজ্জা হয়েছে? লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না? কার কষ্টের কথা বলছিস?

তবু সুরেনের মুখে কোনও কথা নেই। ভূপতি ভাদুড়ী এবার বাহাদুর সিং-এর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—ভাগ্নেবাবু তোমায় কী জিজ্ঞেস করছিল বাহাদুর সিং, ঠিক ঠিক বল তো?

বাহাদুর সিং বললে—হুজুর, ভাগ্নাবাবু বলছিল আমার গাফিলতিতে দিদিমণি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

—আর কী জিজ্ঞেস করছিল?

বাহাদুর সিং বললে—আর জিজ্ঞেস করছিল একজন ফরসা আদমীকে আমি কেন বাড়িতে ঘুশতে দিয়েছি..

ভূপতি ভাদুড়ী হঠাৎ সুরেনের হাতটা ধরে টান দিলে। বললে—চল্, লেখা নেই পড়া নেই, কেবল যার-তার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি হচ্ছে...

বলে টানতে টানতে একেবারে সুরেনের ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এল। তারপর তক্তপোষটার ওপরে জোর করে বসিয়ে দিলে। বললে—বোস্—

সুরেন বসলো। ভূপতি ভাদুড়ী বলতে লাগলো—তুই কী রে? তোর কি কোনও কালে বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু হবে না? বরাবর নীরেট গো-মুখ্যু হয়ে থাকবি?

সুরেন বোকার মত হাঁ করে চেয়ে রইল মামার দিকে। কী বোকামি সে করেছে তা সে অনেক ভেবেও বুঝতে পারলে না।

ভূপতি ভাদুড়ী বলতে লাগলো—তোকে আমি পই-পই করে বলেছি না ওই হারামজাদী ছুঁড়ির ব্যাপারে তুই থাকবি না! ও পালিয়ে গেল তাতে তোর কী? তোর কাটা ধানে কি সে মই দিয়েছে?

সুরেন আরো হতবাক্ হয়ে গেল মামার কথা শুনে। সুখদার ব্যাপারে তাকে মাথা না-ঘামাতে কবে বারণ করলে মামা!

—তোর কি এতটুকু বুদ্ধি থাকতে নেই। আমি তো তোকে বলেই দিয়েছি যে একদিন এই আমার কাজ-কম্ম তোকেই সব দেখতে হবে! ছুঁড়িটা চলে গেলে তো তোরই ভাল রে! সে চলে গেলে তোরই তো লাভ। তোর আর ভাগীদার কেউ রইল না। এই লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি, এর কোনও ওয়ারিশানই রইল না। এই সোজা সরল কথাটা তোর মাথায় ঢোকে না?

সুরেন মামার কথায় আরো হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মামা এই বাড়ির ম্যানেজার, তার বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারা কি সহজ?

ভূপতি ভাদুড়ী আবার বলতে লাগলো—এই জন্যেই তো বলে গেঁয়ো বুদ্ধি! এতদিন কলকাতায় এসেছিস, এতদিন ধরে কলের জল পেটে ঢুকলো, তাও তোর ভালো করে মাথা খুললো না? চিরকালই কি ষাঁড়ের গোবর হয়ে থাকবি? ছুঁড়িটা যে বিয়ে করতো না, এ কেন? সব সম্পত্তি আমি গ্রাস করবো সেইটেই ছিল ভয়। এখন তো ভালোই হলো! আপদ দূর হলো। তার সঙ্গে তোর কীসের সম্পর্ক? তার জন্যে তুই অত বকছিলি কেন বাহাদুর সিংকে? আর তাছাড়া, সব ব্যাপারে তুই মাথা ঘামাসই বা কেন? ওই যে বুড়োবাবু ও গামছা পেলে কি না-পেলে তাতে তোর কী? একটা গামছার কি কম দা ভেবেছিস? পাঁচসিকের কমে একটা গামছা আজকাল মেলে? সে-পয়সা বাঁচলে তো তোরই থাকবে! মা-মণি তো চিরকাল বাঁচতে আসেনি। চিরকা বাঁচবেও না। চিরকাল কেউ বেঁচে থাকেও না। তখন? তখন কী হবে? তখ তো সব তোকেই দেখা-শোনা করতে হবে! আমিও কি চিরকাল বাঁচবো! বাঁচবে না, তাহলে? তাহলে এত কার জন্যে করি? করি তোর জন্যে। তোর ভালো জন্যেই এত মতলব ভাঁজছি আর তুই কি না ছুঁড়িটা কোথায় গেল তাই ভে মরছিস! গেছে, আপদ গেছে। এখন কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসবো, আর ফিরে না আসে—

বলে একটু হাঁফ টেনে নিলে। তারপর আবার বলতে লাগলো—খবরদার বলছি, তুই আর ও-সব ব্যাপারে থাকবিনি! যাতে ভালো হয় তা আমি করছি, এখন আমার হাত-যশ আর তোর কপাল...

বলে ভূপতি ভাদুড়ী আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে উঠোন পেরিয়ে নিজের দফতরের দিকে চলে গেল। যেত না, কিন্তু হয়তো মনে পড়ে গেল অনেক কাজ পড়ে আছে! সুরেন কিন্তু তখনও চুপ করে সব জিনিসটা গোড়া থেকে ভাবতে লাগলো। এতদিনে যেন সমস্ত ব্যাপারটার একটা সামান্য মানে পাওয়া গেল। কিন্তু আবার যেন অনেকখানি অজ্ঞাত রয়ে গেল। তাহলে পুলিশের ইন্সপেক্টারের কাছে মামা অমন কথা বলতে গেল কেন? কে সেই ফরসা মতন ছেলেটা? ট্যাক্সি চালায়? কী নাম তার? মামা কি তাহলে তাকে চেনে?

মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরীদের বাড়িতে আরো রাত হলো। আস্তে আস্তে গেটের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজলো। রান্না-বাড়িতে ঠাকুর ভাত নামিয়ে ডাল চড়ালো উনুনে। ভূপতি ভাদুড়ী একমনে চোখে চশমা এঁটে হিসেবের খাতা দেখছিল। হঠাৎ একটা চেহারা দেখেই চমকে উঠলো। আচমকা বলে উঠলো—কে?

লোকটা খানদানী লোক। ময়লা আদ্দির পাঞ্জাবি, কিন্তু গিলে করা। গলায় সরু সোনার হার। কালো পাড় কোঁচানো ময়লা ধুতি। পায়ে পেটেণ্ট লেদার পাম্প‌্শু। দেখেই মনে হয় এককালে অবস্থা ভাল ছিল। বিপাকে পড়ে ময়লা জামা-কাপড় অঙ্গে উঠেছে। ঠোঁটের দু'পাশে কাঁকড়া-বিছের মত পাকানো ছুঁচলো গোঁফ।

—কী হলো? তুমি আবার কেন?

লোকটা অমায়িক হেসে চেয়ারটায় বসে পড়লো।

বললে—চমকে উঠো না বাবা। বলছি, একটু জিরোতে দাও। আমি এলেই তুমি অমন চমকে ওঠো কেন বলো তো ম্যানেজার? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক? একটু জিরিয়ে নিয়ে বলছি, অনেক দূর থেকে এসেছি তো, হাঁফ লেগেছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু আমার যে এখন অনেক কাজ, আমার যে কথা শোনবার সময় নেই—

—আমারও সময় নেই ম্যানেজার। আমিও কাজের লোক।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কী কথা চটপট বলো—

লোকটা হাসতে লাগলো। বললে—আমার তো একটা ছাড়া আর কোনও কথা নেই ম্যানেজার। বার বার একটা কথাই আমি বলে থাকি—

—কী কথা? কথাটা কী, আগে বলো?

—তুমি তো জানো ম্যানেজার, আবার রসিকতা করছো কেন মিছিমিছি? টাকা ছাড়া অন্য কিছু কথা কখনও তোমাকে বলেছি?

বলে লোকটা পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেছি নরেশ রাত করে তুমি এ বাড়িতে এসো না, এতে লোকে সন্দেহ করবে।

নরেশ দত্ত বনেদী বংশের মানুষ। এককালে রাতটাই ছিল তার দিন।

দিনের বেলা ঘুমোতো আর রাতের বেলাটা জাগতো। রাত জাগতে জাগতে যখন লিভার পচে গেল তখন হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন চোখের সামনে থেকে সবাই সরে গেছে। আগে আশেপাশে সব সময় মোসাহেব ঘুরতো, তারাও তখন উধাও।

তখন সন্ধান পেল ভূপতি ভাদুড়ীর। ভূপতি ভাদুড়ীও তখন একটা লোক খুঁজছে নরেশ দত্তর মত। যে ভূপতি ভাদুড়ীকে সাহায্য করতে পারবে। ভূপতি ভাদুড়ীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে।

এও শোভাবাজারের দত্ত-বাড়ির ছেলে। একদিন শোভাবাজারের বাড়ির ভাড়া আদায় করতে গিয়ে আলাপ-পরিচয় হলো।

ভূপতি ভাদুড়ী জিজ্ঞেস করলে—স্বাস্থ্য এমন হলো কেন?

নরেশ দত্ত বললে—স্বাস্থ্যের আর দোষ কী, ম্যানেজার, স্বাস্থ্যের ওপর অত্যাচার তো কম করিনি!

—এখন চলছে কী করে?

নরেশ দত্ত বললে—এখন তো আর চলছে না। ওই একখানা বাড়ি আছে, সেখানাও বন্ধক পড়ে গেছে। ভাড়া পাই না। একটা ভালো-টালো দেখে পার্টি দেখে দাও না ম্যানেজার, যে লাখখানেক টাকা ধার দিতে পারে!

—লাখখানেক টাকা?

ভূপতি ভাদুড়ী প্রথমটায় চমকে উঠেছিল টাকার অংকটা শুনে। পরে বুঝেছিল, যে-বংশের ছেলে নরেশ দত্ত সে বংশে লাখ টাকার কমে কেউ কথা বলে না। লাখ টাকার কমে কারো পেট ভরে না।

তা সেই-ই হলো প্রথম সূত্রপাত।

তারপর একবার সোজা মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এসে হাজির।

ভূপতি ভাদুড়ী চিনতে পারলে। জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার? হঠাৎ কী মনে করে?

নরেশ দত্ত বললে—তোমাকে সেই টাকার কথা বলেছিলুম ম্যানেজার, তোমার দেখছি কিছুই মনে থাকে না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এত লোক থাকতে আমাকে তুমি বলছো টাকার কথা? আমি গরীব মানুষ, দেড় শো টাকা মাইনে পাই, আমি কোত্থেকে টাকা পাই বলো দিকিনি?

নরেশ দত্ত বললে—টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছ তুমি, আর বলছো কিনা তোমার টাকা নেই? চৌধুরী বাড়ির ম্যানেজারের টাকার অভাব এ-কথা শুনলে যে লোকে হাসবে হে! তুমি বলছো কী?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ঠিক আছে, এত দূর এলে, একটু চা-টা খাও, বিশ্রাম করো, খালি হাতে তোমাকে ফেরাব না।

কথাটায় কাজ হলো। চা এল, সিগারেট এল। পান এল। বনেদী ঘরের ছেলে, এখন না-হয় পড়েই গেছে, কিন্তু তার একটা ইজ্জত তো আছে। কারো ইজ্জতে হাত দিতে ভূপতি ভাদুড়ী চায় না।

তারপর যখন নরেশ দত্ত চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফুঁ-ফুঁ করে সিগারেট টানছে তখন ভূপতি ভাদুড়ী কথাটা পাড়লে।

বললে—এ-সব কথা তো কাজের সময় হয় না, অনেক ভেবে-চিন্তে তবে এর উত্তর দিতে হয়। তুমি বরং অন্য সময়ে এসো নরেশ, এখন আমি ব্যস্ত আছি -

ব্যস্ত না ছাই। ওটা বলতে হয়। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় ভূপতি ভাদুড়ী এইটুকু বুঝেছে যে চট করে কাউকে কথা দিতে নেই। বিশেষ করে যে-কথায় কারো উপকার হবে। আর উপকারের কথাই যদি ধরা যায় তো তোমার উপকার আমি মিছিমিছি করতে যাবো কেন? তুমি কে হে আমার পিসেমশাই-এর খুড়ো?

নরেশ দত্ত পোড় খাওয়া লোক। বিনয়ে গদ্‌গদ হয়ে উঠলো।

বললে—তা হলে কবে আসবো ম্যানেজার?

ভূপতি ভাদুড়ী চটে গেল। বললে—আচ্ছা, তুমি আমাকে সব-সময়ে ম্যানেজার-ম্যানেজার করো কেন বলো তো? আমি কি ম্যানেজার?

নরেশ দত্ত বললে—ম্যানেজার নয় তো কী? আমি তো তোমাকে ম্যানেজার বলেই জানি!

—না, এস্টেট-ম্যানেজার। এস্টেট-ম্যানেজার বলবে। যারা ইংরিজী জানে না তারা আমাকে ম্যানেজার বলে ডাকবে। তুমি তো লেখাপড়া জানা লোক হে। তোমার মুখে ম্যানেজার শুনলে রাগ হয় না?

নরেশ দত্ত মাফ চেয়ে নিয়েছিল তখনই। টাকাটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত বরাবর এস্টেট-ম্যানেজার বলেই ডাকতো। এখন ম্যানেজার বলে। এখন বলে—আরে, যার নাম আরশোলা তার নামই পাখী, তুমি আর আমাকে ইংরিজী শিখিও না ম্যানেজার, আমি তোমার চেয়ে বেশি ইংরিজী জানি—

ভূপতি ভাদুড়ীও রেগে যায়। বলে—দেখ, বেশি চেঁচিও না বলছি, আমি তোমাকে দারোয়ান ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারি, তা জানো?

—আমিও তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি, তা জানো? আমাকে চটিও না বলছি চটলে আমি লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবো!

তখন ভূপতি ভাদুড়ীও একটু নরম হয়। বলে—তুমি চটো কেন নরেশ? তুমি অল্পেতে অত চটো কেন? তোমার নিশ্চয়ই প্রেশার হয়েছে, ডাক্তার দেখাও, ডাক্তার দেখাও। এতগুলো টাকা তোমাকে দিলুম তবু তোমার অভাব মেটে না?

নরেশ দত্ত বলে—ক'টা টাকা দিয়েছ শুনি?

—কেন, তুমি জানো না কত টাকা নিয়েছ তুমি? নেবার সময় তো নোট-গুলো গুণে নিয়েছ। মনে নেই?

নরেশ দত্ত বললে—মাত্তোর তো দু'হাজার টাকা দিয়েছ, তাও খেপে খেপে এক থোকে কখনও একশোটা টাকাও দাওনি, তাতে আমার পেট ভরে?

—তা আমার কি টাকার গাছ আছে যে নাড়া দেবো আর ঝর-ঝর করে ঝরে পড়বে? আর টাকা হবে না, যাও—

নরেশ দত্তও বনেদী বদমায়েস লোক। বললে—ভদ্দরলোকের মেয়ের ইজ্জত নিয়ে কথা, বেশি বাড়াবাড়ি কোর না বলছি, সব ফাঁস করে দেবো—

—আবার চেঁচাচ্ছো?

—চেঁচাবো না? সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তির জন্যে তুমি ভদ্দরলোকের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করছো, আর আমি চুপ করে থাকবো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে ডাকবো বাহাদুর সিংকে?

—ডাকো না, ডাকো? আমি তোমার দারোয়ানকে ভয় করি নাকি? ডাকো দারোয়ানকে, আমিও হৈ-চৈ করে হট্টগোল করবো। মাধব কুণ্ডু লেনের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার লোককে জানিয়ে দেবো, তুমি জোচ্চোর, তুমি ভদ্দর-

লোকের বাড়ির মেয়ে বার করে নিয়ে গেছ।

—খবরদার বলছি, মিথ্যে কথা বোল না। আমি মেয়ে বার করে নিয়ে গেছি, না তুমি বার করিয়ে নিয়ে গেছ? ভেবো না আমি জেলে গেলে তোমাকে পুলিশ ছেড়ে দেবে। তোমাকে সুদ্ধু জেলে পুরবে তা মনে রেখো। তখন তোমার গাঁজা খাওয়া, রাবড়ি খাওয়া বেরিয়ে যাবে।

নরেশ দত্ত কেমন যেন নরম হয়ে এল এবার।

বললে—সেই জন্যেই তো চেঁচাতে চাই না। ভালো কথায় তোমার কাছে কিছু টাকা চাইতে আসি, তাও তুমি তেরিয়া-মেরিয়া করে ওঠো। কেন, আমি কি অন্যায্য কিছু বলেছি? দু'হাজার টাকায় মেয়ে-ফাঁসানো যায়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা এই রকম করে নরম গলায় কথা বললেই হয়! রাগারাগি করলে আমারও কড়া কথা বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।

বলে ক্যাশ-বাক্সটা খুলে একটা দু'টাকার নোট বার করলে। বাক্সটা বন্ধ করে সেটা নরেশ দত্তর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—যাও, আর কথা বাড়িও না—

নোটটা ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিয়ে সেখানাকে ভালো করে দেখলে। বললে—একি, দু'টাকা? দু'টাকায় তো এক-পাঁটও হবে না, তাহলে মালই বা খাবো কী আর চাটই বা খাবো কী? অন্ততঃ একখানা আস্ত নোট দেবে তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওর বেশি হবে না, আর নেই—

ভূপতি ভাদুড়ী আবার বললে—মেয়েটাকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছ তো?

নরেশ বললে—আরে, সে আর বলতে! তুমি আমার কাছে কথার নড়চড় পাবে না।

—আর কখনও এখানে ফিরে আসবে না তো?

নরেশ দত্ত বললে—তুমি কী যে বলো মাইরি ম্যানেজার, একটা লগেটো ছোকরার সঙ্গে তার বিয়ে দিইয়ে দিয়েছি। সে আরামসে সেখানে ঘরকন্না করছে, সে কেন মরতে এখানে ফিরবে? এখানে তার কে আছে? মা আছে, না বাপ আছে, না ভাইবোন আছে? সে কোন্ দুঃখে ফিরবে?

—ঠিক আছে—বলে ভূপতি ভাদুড়ী আবার ক্যাশ-বাক্সের ডালাটা খুলে ধরলে। যেন একটু স্বস্তি হলো নরেশ দত্তর কথাটা শুনে।

বললে—এই শেষ কিন্তু নরেশ। আমায় কেটে ফেললেও আমি আর তোমায় টাকা দিচ্ছিনে, এই বলে রাখলুম। আর যদি কখনও সুখদা ফিরে আসে তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

নরেশ দত্ত ততক্ষণে টাকা ক'টা ট্যাঁকে গুঁজে ফেলেছে। ফেলে ফোকলা দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। বললে—আর ইয়ারকি কোর না মাইরি ম্যানেজার, আস্ত দশটা টাকা না হলে নেশা হবে না, সব্বোনাশ হয়ে যাবে, আটটা টাকা দাও—দাও মাইরি, দাও—

হঠাৎ বাইরে কে যেন দরজা ঠেলতে লাগলো—সরকার-বাবু, অ সরকার-বাবু—

—কে?

ভূপতি ভাদুড়ী লাফিয়ে উঠলো তক্তপোষ ছেড়ে। বললে—কে? ঠাকুর? যাচ্ছি, তুমি যাও—

তারপর নরেশ দত্তর দিকে চেয়ে বললে—আমায় খেতে ডাকতে এসেছে, তুমি এবার যাও, আর দেরি কোর না—

নরেশ দত্ত নাছোড়বান্দা লোক। বললে— তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ম্যানেজার, আর গোটা আষ্টেক টাকা দাও, না দিলে রাত্তিরে আমার ঘুম আসবে না।

—তাহলে বলো, আর কখনও আসবে না?

নরেশ দত্ত জিভ কেটে বললে—মাইরি বলছি ম্যানেজার, আমি মা-কালীর দিব্যি করে বলছি, আমি আর কখ্‌খনো তোমার কাছে টাকা চাইতে আসবো না।

উঠতে যাচ্ছিল। ভূপতি ভাদুড়ীও পেছন-পেছন উঠছিল। বললে—তাহলে ওই কথাই রইলো নরেশ, জীবনে যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা না হয়!

—ঠিক আছে, ওই কথাই রইলো। বলে নরেশ দত্ত উঠোন পেরিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে—একটা কথা শোনো নরেশ—

নরেশ দত্ত ফিরে দাঁড়ালো।

ভূপতি বললে—সেখানে গিয়ে সুখদা কান্নাকাটি করেনি তো?

—আরে না না, তুমি অত ভাবছো কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এখান থেকে যাবার সময়?

নরেশ দত্ত বললে—এখান থেকে যাবার সময়ও খুব হাসতে হাসতে চলে গেছে।

—এ-বাড়ির চাকর-ঝি-দারোয়ান কেউ জানতে পারেনি তো?

নরেশ দত্ত বললে—আরে সে ব্যাপারে এ-শর্মা খুব চালাক ছেলে ম্যানেজার। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে গিয়েছি। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে কালীকান্ত তাকে তুলে নিয়ে গেছে—

—কালীকান্ত?

ভূপতি ভাদুড়ী চিনতে পারলে না কালীকান্তকে।

নরেশ দত্ত বললে—আরে, কালীকান্ত আমার মতই এক্সপার্ট, জোচ্চোরি-বিদ্যে তাকে শেখাতে হবে না। সে এসব করে করে বহুদিন ধরে হাত প্যাকিয়েছে।

—আর বাহাদ্দুর সিং? আমার দারোয়ান?

নরেশ দত্ত বললে—তোমার দারোয়ান বলে কি পীর নাকি? আমারই লোক তাকে চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল—

হঠাৎ আবার পেছন থেকে ডাক এল—অ ম্যানেজারবাবু, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে—

নরেশ দত্ত আর দাঁড়ালো না। ভূপতি ভাদুড়ীও নরেশকে রাস্তা পার করে দিয়ে আবার উঠোন দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলতে লাগলো।

আর সেদিন অপেক্ষা করতে পারলে না সুরেন। কেমন যেন বড় ইচ্ছে

করতে লাগলো মা-মণিকে দেখতে। বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করতে থাকে সারাদিন। বইতেও মন বসে না, খেতেও ইচ্ছে করে না। ঘুমও হয় না ভাল করে। ঘুমের মধ্যেও কেবল স্বপ্ন দেখে। মনে হয় মা-মণি যেন কাঁদছে। কেন চলে গেল মেয়েটা? কেন এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল? কীসের কষ্ট হচ্ছিল এখানে?

সেদিন ভূপতি ভাদুড়ীকে ডেকে পাঠিয়েছিল মা-মণি।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলে—পুলিশে কিছু খবর-টবর দিলে ভূপতি?

—আজ্ঞে মা-মণি, তারপর তো আর কিছু খবর পাইনি!

মা-মণি বললে—তা খবর নাও। জলজ্যান্ত মেয়েটাকে কতদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না, আর তুমি চুপ করে বসে আছ? তোমার একটা আক্কেল-গম্যি কিছু নেই?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে, আমি তো বললুম আপনাকে একটা ফরসা মতন ছেলেকে প্রায়ই দেখতাম বাড়িতে—

—তা দেখতেই যদি, কিছু বলোনি কেন? যে-সে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকবে?

ঘরে ঢোকবার মুখেই হঠাৎ মামার গলা পেয়ে সুরেন সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। সুরেন জানতেই পারেনি যে মামা তখন মা-মণির কাছে যাবে। সুরেন কী করবে বুঝতে পারলে না। একবার চলে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় মা-মণির গলা শুনতে পাওয়া গেল।

মা-মণি বলছে—ট্যাক্সি-ড্রাইভার কী করে বাড়িতে ঢোকে? বাহাদুর সিং তাহলে কী করতে আছে? তাকে তাহলে ছাড়িয়ে দাও—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলবো ভাবছিলাম মা-মণি। বাহাদুর সিংকে দিয়ে আর কাজ চলবে না। ওকে ছাড়িয়ে দেওয়াই ভালো—

হঠাৎ মা-মণির গলা পাওয়া গেল। —কে রে? ওখানে কে রে? কে?

সুরেন কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। তারপর আর দেরি না করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তুই? আয়—এতদিন কী হয়েছিল তোর?

ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে সুরেন যেন কেমন মুষড়ে পড়লো। এ-সময়ে মামাকে মা-মণির ঘরে আশা করেনি। বেছে বেছে ঠিক এই সময়েই বা এল কেন সে? আর বেছে বেছে ঠিক এই সময়েই কিনা মামাকে মা-মণির কাছে আসতে হয়!

সুরেন আস্তে আস্তে চোরের মত ঘরের কোণে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো।

মামা তার দিকে একবার চাইলে। কিন্তু কিছু কথা বললে না।

মা-মণি ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে আবার আগেকার মত কথা বলতে লাগলো। বললে—দাও বাহাদুর সিংকে ছাড়িয়ে। ও বুড়ো হয়ে গিয়েছে, ওকে দিয়ে আর কাজ হবে না—

মামা বললে—দেখি, একটা নতুন লোক খুঁজে তারপর ওকে ছাড়াবো—

—আর পুলিশের থানায় আর একবার যাও তুমি। ওদের তাগাদা না দিলে কি ওরা কাজ করবে? ওদের কীসের মাথা-ব্যথা?

মামা বললে—দেখি, আজই একবার আবার যাবো। যেদিকে না-দেখবো

সেদিকেই সবাই ঢিলে দেবে। আর একটা কথা...

হঠাৎ যেন কী একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে এমনি ভাবে ভূপতি ভাদুড়ী আবার উঠতে গিয়েও থেমে গেল।

বললে—আপনি একবার উকীলের বাড়ি যেতে বলেছিলেন মা-মণি, তা কালকে আমি গিয়েছিলুম—

—কী জন্যে উকীলের বাড়ি যেতে বলেছিলুম? মনে পড়ছে না তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সেই যে আপনার মনে নেই...

বলতে গিয়েও কথাটা শেষ করলে না ভূপতি ভাদুড়ী। ভাবলে, মা-মণিই হয়তো বাকিটা পূরণ করে দেবে।

তা মা-মণির সত্যিই মনে পড়ে গেল। ভালোই হলো।

মা-মণি বললে—দেখ ভূপতি, তুমি নিজেই ভেবে দেখ না, আমি কিছু কি অন্যায় বলেছি?

ভূপতি ভাদুড়ী কথাটা লুফে নিলে। বললে—না, না, অন্যায় কথা কেন বলবেন মা-মণি? আপনি তো অন্যায় বলবার লোক নন। আসলে আমিও ভেবে দেখেছি। ভেবে ভেবে সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি সেদিন। কর্তামশাই থাকতেও আমিই তো স [illegible] আমাকে প্রায়ই কাছে ডাকতেন! বলতেন ভূপতি, আমার আর বেশি দিন নয়, এত সম্পত্তি, এ আমি কাকে দিয়ে যাবো?

বলতে বলতে ভূপতি ভাদুড়ীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। যেন সমস্ত সুখের অতীত-দিনগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

মা-মণি বললে—যাক্ গে সে-সব পুরনো কথা, উকীল কী বললে তাই বলো। কোন্ উকীল? হরনাথ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যাঁ, হরনাথবাবু ছাড়া এ-সব ব্যাপারে আমি আর কার পরামর্শ চাইবো? যার-তার কাছে গিয়ে যা-তা বলা যায় না তো? তিনি বললেন—মা-মণি যা ভেবেছেন, খুব ভালো কথাই ভেবেছেন।

হরনাথবাবুকে দেখেছে সুরেন। কালো চাপকান পরা উকীল। বৃদ্ধ মানুষ। একটা ভাঙা মোটরগাড়িতে করে আসতেন মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে তরতর করে চলে যেতেন মামার দফতরে। বেশিক্ষণ দাঁড়াতেন না। কী জন্যে আসতেন, কেন আসতেন, তা জানতো না সুরেন। জানতে ইচ্ছেও করতো না। হরনাথবাবু এলেই মামা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতো। তারপর হরনাথবাবু বললে তবে বসতো।

হরনাথবাবু কিছু কাগজ-দলিলপত্র নিয়ে আবার চলে যেতেন। মামা গিয়ে তাকে গাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিত। এ-সব বহুদিন থেকে দেখে এসেছিল সুরেন। সুরেন জানতো, ও-সব এ-বাড়ির বৈষয়িক ব্যাপার। ও-ব্যাপারে সুরেনের কৌতূহল প্রকাশ করা অন্যায়।

সেদিন হঠাৎ সেই হরনাথবাবুর কথা উঠতে সুরেন বুঝতে পারলে এতক্ষণ বৈষয়িক ব্যাপারেই মা-মণির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এ-সময়ে তার আসা উচিত হয়নি।

হঠাৎ সুরেন বললে—আমি এখন যাই মা-মণি—

মা-মণি মুখ ফিরিয়ে বললে—কেন, যাবি কেন, কী বলতে এসেছিলি বল্ না?

সুরেন ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠেছে। বললে—আমি পরে আসবো, তোমরা এখন কাজের কথা বলছো—

—কিছুই কাজের কথা নয়, তুই বোস—বলে মা-মণি ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন এসো ভূপতি—তুমি বরং হরনাথবাবুকে নিয়ে একবার আমার কাছে এসো। আমার সামনে সব কথা হওয়াই ভালো—

ভূপতি ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালো। বললে—সে হলে তো খুব ভালোই হয মা-মণি, আপনার মুখ থেকেই সব শোনা ভালো—

—কিন্তু আমার কোথায়-কোথায় কত-কত সম্পত্তি আছে, তার একটা ফর্দ আমায় করে দেবে। তারপর কোম্পানীর শেয়ার কী কী আছে সেগুলোও আমাকে দেবে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে-সব তো ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিয়েছি—

—ব্যাঙ্কে গিয়ে সেগুলোর একটা লিস্ট করে আনবে। কোনগুলো বাবার কেনা, আর কোনগুলো আমার কেনা, তাও আলাদা-আলাদা করে সাদা কাগজে লিখে আনবে। আমি দেখতে চাই, মরে যাবার আগে সব হিসেব-পত্তোর ঠিকঠাক করে রেখে যেতে চাই—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ও-কথা বলবেন না, ভালোয় ভালোয় সবকিছু রেখে যেতে পারলে তবে মনে শান্তি পাই—নিজের চোখে সব দেখতে হচ্ছে, এর জন্যে আগের জন্মে কত পাপ করেছিলুম, তাই ভাবি—

এ কথায় মা-মণি কোনও উত্তর দিলে না।

ভূপতি ভাদুড়ী বলতে লাগলো—সুখদা যে শেষকালে এমন ভাবে চলে গেল, তাও চোখ মেলে দেখতে হলো। জানেন মা-মণি, যেদিন থেকে সুখদা চলে গেছে সেদিন থেকে রাত্রে দু'চোখ এক করতে পারিনি। ঠাকুর বলে—সরকার-বাবু, এমন না-খেয়ে থাকলে শরীর আপনার কেমন করে টিকবে! আমি কিছু বলি না ঠাকুরকে। ও তো বুঝবে না মা-মণি আমাদের দুঃখটা—

এতদিন পরে সেই দিনকার কথাগুলো ভাবলে মামার ওপর সত্যিই ঘেন্না হয়। যে-মানুষটা সুরেনের ভালোর জন্যে এতটা মিথ্যাচার করতে পেরেছিল, সে তো জানতো না যে, এই এত সম্পত্তি, এত কোম্পানীর শেয়ারের চেয়ে মানুষের ভালবাসাটাকেই সুরেন বেশি মূল্য দিয়েছিল। আর তা ছাড়া মামারই বা দোষ কী? কে-ই বা সম্পত্তির চেয়ে ভালবাসাকে বেশি মূল্য দেয়!

মামা চলে যেতেই মা-মণি সটান বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছিল।

সুরেন বললে—আমার কোনও কাজ নেই মা-মণি, শুধু দেখতে এসেছিলাম তুমি কেমন আছ।

মা-মণি বললে—ভালো নেই রে আমি, মোটে ভালো নেই—

সুরেন বললে—তাহলে ডাক্তার দেখাও না কেন? ডাক্তার ডাকতে বলবো মামাকে?

মা-মণি হাসলো। অত বেশি বয়েসেও হাসলে মা-মণিকে কেমন চমৎকার দেখাতো—। যখন মা-মণির বিয়ে হয়েছিল তখন তাহলে মা-মণি আরো কত সুন্দর ছিল তা কল্পনা করে নিতে কষ্ট হয় না।

হাসতে হাসতে মা-মণি বললে—দূর, ডাক্তার কি মনের রোগ সারাতে পারে? মনের রোগ কখনও সারে না।

সুরেন বললে—মনের রোগ? মনে আবার তোমার কীসের রোগ মা-মণি?

মা-মণি বললে—সে তুই বুঝতে পারবি না; যার মনে অসুখ আছে সে-ই কেবল বুঝতে পারে।

—মনের অসুখ কী করে হয়?

মা-মণি হাসতে লাগলো—মনে কষ্ট পেলে হয়, আবার কীসে হবে?

সুরেন তবু কিছু বুঝতে পারলে না।

জিজ্ঞেস করলে—তোমার মনে বুঝি কেউ কষ্ট দিয়েছে মা-মণি?

মা-মণি বললে—সে-সব কথা শুনে তোর দরকার নেই—

সুরেন বললে—সুখদা তোমায় খুব কষ্ট দিয়েছে, না?

মা-মণি বললে—সুখদার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক, বল্? সুখদা তো আমার নিজের কেউ নয়! সে আমার মেয়েও নয়, নাতনীও নয়। নিজের লোক কষ্ট দিলে সেই কষ্টটা বেশি মনে লাগে, সুখদা কি আমার নিজের কেউ?

—তাহলে? তাহলে তোমার নিজের লোক কে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?

মা-মণি সুরেনকে দুই হাতে কাছে টেনে নিলে। তারপরে দু'হাতে তাকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—তুই যদি বড় হতিস তোকে সব বলতুম, তুই যে ছোট, ছোট বয়েসে কি সব বোঝা যায়?

বলতে বলতে বোধহয় কেঁদেই ফেলেছিল মা-মণি। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসলো। বললে—একটা কথা তোকে বলি, কাউকে বলবি না তুই বল্?

সুরেন বললে—না, কাউকে বলবো না—

—তোর মামাকেও না?

সুরেন বললে—তোমাকে কথা দিচ্ছি, মামাকেও বলবো না—

মা-মণি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে কী যেন ভেবে নিলে। তারপর বললে—আমি মারা গেলে তুই আমার কথা ভাববি?

সুরেন বললে—ও-কথা কেন বলছো?

মা-মণি বললে—ভাববি কিনা বল্ না, ভাববি না?

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি হঠাৎ মরার কথা বলছো কেন?

—তা কি বলা যায়? মরার কথা কেউ বলতে পারে না। স্বয়ং যমরাজও বলতে পারে না। আমার মত মানুষের মরে যাওয়াই ভালো। আমি আবার একটা মানুষ!

সুরেন মুখ নিচু করে বললে—হঠাৎ তোমার মুখে এ-কথা এল কেন মা-মণি?

মা-মণি বললে—না রে, মরতে আমার খুব ইচ্ছে করে, এমন করে বেঁচে থাকতে আর ভাল লাগে না।

সুরেন বললে—কী বলছো তুমি মা-মণি, তোমার এত টাকা, এত সম্পত্তি, এত কোম্পানীর শেয়ার। তুমি কোন্ দুঃখে মরতে যাবে?

মা-মণি হাসতে লাগলো। বললে—তুই ছেলে মানুষ কি না, তাই ওই কথা বললি। টাকা, সম্পত্তি, কোম্পানীর শেয়ার, ও-সব নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? টাকা আমার স্বর্গে বাতি দেবে?

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি যে এখুনি মামাকে তোমার সব সম্পত্তির

একটা হিসেব আনতে বললে? ও-সব তাহলে কী জন্যে চাইলে?

মা-মণি হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে সুরেনের দিকে ফিরিয়ে বললে—সব তোকে দিয়ে দেবো বলে!

সুরেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—আমাকে? দিয়ে দেবে?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ, কেন, তুই নিবি না? আমি যদি তোকে দিই তো তুই ফিরিয়ে দিবি? আমার জিনিস নিতে তোর খারাপ লাগবে? বল্, খারাপ লাগবে? বল—

সুরেন বললে—না না, সে-কথা বলছি না আমি--

মা-মণি বললে—না, তুই সত্যি করে বল্। তুই নিবি না?

মনে আছে, সুরেন সেদিন মা-মণির কথাটা পুরোপুরি যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। এত লোক থাকতে তাকে কেন মা-মণি সব দিয়ে দিতে চায়? মামাও তো তাকে বলেছিল এই চৌধুরী বাড়ির সব সম্পত্তি দেখাশোনা একদিন তাকেই করতে হবে। কিন্তু এ তো দেখাশোনা নয়, এ যে একেবারে দিয়ে দেওয়া। দানপত্র করে দেওয়া!

সুরেন বললে—কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকেই বা তুমি দিতে যাবে কেন মা-মণি?

মা-মণি বললে—এত লোক? এত লোক আমার কে আছে? তুই তো জানিস আমার কেউ নেই। ছোটবেলা থেকে সুখদাকে কাছে রেখেছিলুম, মেয়ের মত করে মানুষ করেছিলুম। সে-ও চলে গেল। এখন কাকে দিয়ে যাবো এ-সব? আমার বাবা অনেক কষ্ট করে, অনেক পরিশ্রম করে এইসব সম্পত্তি করেছিল, আমি চলে গেলে সে-সব নষ্ট হয়ে যাবে, সবাই লুটেপুটে খাবে। কার ভরসায় আমি মরবো?

সুরেন বললে—মামা তো দেখছে, তখনও মামাই দেখবে—

মা-মণি বললে—দূর, তোর মামা তো ম্যানেজার, সে কি আর নিজের লোকের মত করে দেখবে?

সুরেন বললে তা আমিও তো তোমার পর মা-মণি, আমিও তো তোমার নিজের লোক নই!

মা-মণি এবার সুরেনের দিকে আরো কাছ ঘেঁষে এল। বললে—তুই আমার নিজের লোক হবি সুরেন? হবি নিজের লোক?

সুরেন কিছু বুঝতে পারলে না। হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো মা-মণির দিকে।

মা-মণি আবার বললে—কী রে হাঁ করে দেখছিস কী তুই? কথার উত্তর দে—

সুরেন বললে—কী উত্তর দেবো আমি?

মা-মণি বললে—কেন, নিজের লোক হবি কি না সেটা বলতে পারছিস না?

সুরেন বললে- আমি তো তোমার পর মা-মণি, আমি কী করে তোমার নিজের লোক হবো?

মা-মণি বললে কেন, তুই তো আমাকে মা-মণি বলিস, তুই আমার ছেলে হতে পারিস না?

সুরেন মাথা নিচু করে রইলো।

মা-মণি সুরেনের চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা উঁচু করে ধরলো। বললে—আমার ছেলে হতে তোর এত লজ্জা রে সুরেন? তা আমাকে মা-মণি বলে ডাকতে তো তোর লজ্জা করে না!

সুরেন হঠাৎ উঠলো। বললে—আমি যাই মা-মণি, আমার পড়া আছে—

মা-মণি বললে—যাবি, তা তার আগে আমার কথার উত্তর দিয়ে যা—

সুরেন বললে—তুমি যখন বলছো তখন আমার আর কিছু বলবার নেই মা-মণি—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে সুরেন। এক নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা দোতলায় নামবার সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে লাগলো। খুব অন্যমনস্ক হয়ে নামছিল। এতখানি ভালবাসা, এতখানি বিশ্বাস, এতখানি নির্ভরতা তো কই, সে কারো কাছ থেকে জীবনে কখনও পায়নি!

কিন্তু দোতলার মুখের কাছে নামতেই হঠাৎ একেবারে মামার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সুরেন অবাক হয়ে গেল মামাকে দেখে। মামা তো অনেকক্ষণ ঘর থেকে চলে এসেছে। হাতে তখনও বিষয়-সম্পত্তির কাগজ-পত্র রয়েছে। সুরেনকে দেখে ভূপতি ভাদুড়ী একেবারে একগাল হাসি হেসে এগিয়ে এল।

বললে—কী রে, এতক্ষণ কী বলছিল তোকে মা-মণি!

সুরেন কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। শুধু বললে—না, তেমন কিছু নয়—

মামা বললে—তেমন কিছু নয় মানে কী? কী বললে সেটা বলবি তো?

সুরেন প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বললে—এই মা-মণির শরীর খুব খারাপ এইসব কথা বলছিল।

মামার যেন তবু সন্দেহ গেল না। জিজ্ঞেস করলে—শুধু শরীর খারাপের কথা? আর কিছু কথা হয়নি?

সুরেন বললে—সে-সব কথা তেমন কাজের কিছু নয়—

—তা বাজে কথাও কী-কী হলো তাও তো বলবি।

সুরেন বললে—না, সে-সব আমার মনে নেই—

বলে নিচের দিকে নামতে যাচ্ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী ধরে ফেললে—কী আহাম্মক ছেলে রে তুই, নিজের ভালোটাও তুই বুঝতে পারিস না? আমি কোথায় তোর ভালোর জন্যে ভেবে-ভেবে মরছি, আর তুই কিনা রাগ করছিস? আমি কিছু অন্যায়টা বলেছি তোকে? এই লাখ-লাখ টাকার সম্পত্তি, এতগুলো কোম্পানীর শেয়ার, ওই বুড়ী মরে গেলে সব যাতে তুই পাস তারই চেষ্টা করছি, আর তোর কেবল রাগ? আমার ওপর এত রাগ তোর কীসের? আমি কি টাকা নিয়ে স্বর্গে যাবো? আমার আর কে আছে রে বাপু। যা-কিছু করছি সব তো তোর ভালোর জন্যেই করছি, আমার তো কলাটা! আমার বয়েস হয়েছে, আমি আর ক'দিন?

সুরেন তবু উত্তর দিলে না কিছু। আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিচেয় নামতে লাগলো।

ভূপতি ভাদুড়ীও নামতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে। বললে—বল্ না কী বলছিল বুড়ী? আমি তো সেই শোনবার জন্যেই এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বল্ না কী বললে? রাগ করছিস কেন।

সুরেন বললে অন্য কোনও কথা হয়নি। এ[illegible] শুধু সুখদার কথা

হয়েছিল—

—সুখদা?

ভূপতি ভাদুড়ী যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। বললে—সুখদার কথা কেন উঠলো? এত কাণ্ড হলো তবু এখনও সুখদার কথা মনে আছে? সে-ছুঁড়ির কথা বুড়ী তুললো, না তুই তুললি?

সুরেন বললে—আমিই তুললাম—

ভূপতি ভাদুড়ী আরো রেগে গেল।

বললে—তোর কি আক্কেল-গম্যি কিছুই থাকতে নেই? দেখছিস কত সামলে-সামলে আমি চলছি, কত কাণ্ড করে সে-ছুঁড়িকে আমি এ-বাড়ি থেকে সরিয়েছি, আর তুই কি-না তার কথাই বার বার মনে করিয়ে দিস্? তোর কবে বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে?

সুরেন হঠাৎ ফোঁস করে উঠলো মামার দিকে। বললে—তুমি তাকে সরিয়েছ সেকথা তো আগে বলোনি?

ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নের হাবভাব দেখে ভয় পেয়ে গেল। বললে—ও আমি একটা কথার কথা বললাম। তা সে চলে গেছে সে তো ভালোই হয়েছে। তাতে তোরই তো পোয়া বারো। তা নিয়ে তুই মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

সুরেন তবু ছাড়লে না। বললে—সত্যি তুমি জানো সুখদা কোথায়?

ভূপতি ভাদুড়ী তাচ্ছিল্যভাবে বলে উঠলো—আরে দূর, তুইও যেমন। আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আমি তার কথা ভেবে-ভেবে মরছি।

—কিন্তু সেদিন পুলিশ-ইনস্পেক্টারের কাছে যে তুমি বললে একটা ফরসা মতন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে সে চলে গেছে!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি বললুম আর তুইও বিশ্বাস করে ফেললি? পুলিশের কাছে অমন বলতে হয়।

—কিন্তু, সত্যি বলো না, যদি জানো তো বলে দাও সে কোথায় গেল। মা-মণি তার জন্যে বড্ড মুষড়ে পড়েছে।

ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নের হাবভাব দেখে অবাক। বললে—এই দ্যাখ, আমি যে-কথা জিজ্ঞেস করছি সে-কথার উত্তর নেই কেবল সুখদা-সুখদা করে অজ্ঞান। তোর সঙ্গে কথা বলাও পাপ—

বলে ভূপতি ভাদুড়ী আর দাঁড়ালো না। হন্ হন্ করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

জীবনের অলি-গলি দিয়ে চলতে চলতে এমন অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যাদের কথা সারা জীবনেও আর ভোলা যায় না। অনেক চেনা মুখ স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেলেও, তারা অম্লান হয়ে থাকে চিরকাল। এমনি একটি চেনা মুখ সুখদা। সামান্য দু'একটা ঘটনা, দু'একটা টুকরো স্মৃতি, সেইটুকু নির্ভর করেই সুরেনের মাধব কুণ্ডু লেনের জীবন-যাত্রা শুরু হয়েছিল। তেমনি ছিল পর্মিল। তেমনি ছিল সুব্রত, দেবেশ পূর্ণবাবু।

কিন্তু কে জানতো তাদের সকলের মধ্যে সুখদা এমন করে জড়িয়ে পড়বে

তার জীবনের সঙ্গে? নইলে কেনই বা আবার সে ফিরে এল ওই চৌধুরী বাড়িতে? সেই ক'মাসের ব্যবধানে কেনই বা তার অমন দুর্দশা হলো?

সেদিন সুখদার চেহারা দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তখন নরেশ দত্তর ব্যাপারটা জানতো না সুরেন। এর পেছনে যে তার মামা ভূপতি ভাদুড়ী আছে তাও তখন সে জানতো না, সুরেন কেন, কে-ই বা সে-সব ঘটনা জানতো?

হঠাৎ একদিন সুখদা এসে হাজির। একটা ট্যাক্সি থেকে নামলো সুখদা। সঙ্গে আর একজন পুরুষ মানুষ। ও কে? সুখদার মাথার সিঁথিতেও সিঁদুর!

অত দিন পরেও কিন্তু চিনতে পেরেছে সুরেন।

সুরেন একেবারে ট্যাক্সিটার সামনে গিয়ে হাজির হলো। লোকটা তখন ট্যাক্সি-ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে।

সুরেন বললে—আপনিই তো সুখদার সঙ্গে এসেছেন? আপনি কে?

সুখদা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। আবার বাইরে বেরিয়ে এল। সুরেনকে দেখে একটু যেন সঙ্কোচ হলো। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। সুরেনকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে লোকটাকে নিয়ে সঙ্গে করে একেবারে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। বললে—এসো, আমার পেছনে পেছনে এসো—

সুরেন তখন একমনে লোকটার দিকে দেখছে। যেন বড় চেনা-চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখেছে তাকে। এগিয়ে গিয়ে বললে—আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—

কিন্তু সে-কথার উত্তর দেবার আর সুযোগ হলো না। সুখদা তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

সেদিন অবাক হয়ে যাবার মত ঘটনাই ঘটলো বটে। সারা বাড়িতে সোরগোল উঠলো। তরলা এল। বাদামী এল। ধনঞ্জয় এল। চাকর-বাকর-ঝি-ঠাকুর, এমনকি বড়োবাবু পর্যন্ত উঠোনে ছুটে এল সুখদাকে দেখতে...কিন্তু সে-কথা এখন থাক। আগে থেকে সব ঘটনা বলে দিলে গল্পের আগ্রহ কমে যায়, গল্পের গতিও ব্যাহত হয়। তার আগেকার অন্য অনেক ঘটনা বলতে হবে। সে সেই পরীক্ষা দেবার সময়ের কথা। সমস্ত রাত জেগে পড়াশোনা করতে হয় তখন। ভোরবেলা থেকে পরীক্ষার তোড়জোড় চলে। ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছোতে হবে টাউন স্কুলে। টাউন স্কুলেই সকলের সীট পড়েছিল।

সেদিনও খেয়েদেয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেছে সুরেন। যতক্ষণ সময় পায় পড়া চলে। রাস্তায় চলতে-চলতেও বই খুলে পড়তে-পড়তে যায়। ফুটপাথে সকাল-বেলার ভিড়।

একটা জায়গায় আসতেই নজরে পড়লো একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মুখের দিকে নজর পড়তেই সুরেন কেমন চমকে উঠলো। ঠিক এই রকম চেহারারই বর্ণনা দিয়েছিল মামা। ফরসা মুখ, বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল।

সুরেন সেই ফুটপাথের ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর একদৃষ্টে দেখতে লাগলো লোকটার দিকে। এরই সঙ্গে সুখদা পালিয়ে গেছে নাকি?

আস্তে আস্তে সুরেন ট্যাক্সিটার কাছে এগিয়ে গেল। সুরেনকে দেখে ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবেন?

সুরেন বললে—কোথাও যাবো না। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—

ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—কী কথা?

সুরেন বুঝতে পারলে না কী ভাবে কথাটা পাড়বে। তারপর বললে—আচ্ছা, আপনি মাধব কুণ্ডু লেন চেনেন?

মাধব কুণ্ডু লেন! লোকটা বেশ যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো। যেন মাধব কুণ্ডু লেনের নামই শোনেনি। বললে—আচ্ছা, উঠুন—

সুরেন বললে—না, আমি যাবো না। আমি শুধু এমনি জিজ্ঞেস করছি আপনি মাধব কুণ্ডু লেনের নাম শুনেছেন কিনা! আমি সেখানেই থাকি কি না।

—তা জিজ্ঞেস করছেন কী জন্যে?

এর উত্তর কী দেবে তা বুঝতে পারলে না সুরেন। ভালো করে চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো শুধু। মামার মুখ থেকে যা শুনেছিল সেই বর্ণনার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। ঠিক সেই রকম ফরসা, সেই রকম কোঁকড়ানো চুল। ট্যাক্সি চালায়। ট্যাক্সি-চালানো লোকের সঙ্গে কেন পালালো সুখদা! পালাবার আর লোক পেলে না! আর তাছাড়া পালাতেই বা গেল কেন? ফড়েপুকুরের ঘোষদের বাড়িটা কী-এমন দোষ করেছিল!

আর বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করবার অবসর ছিল না।

—কিছু মনে করবেন না, আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

বলে সুরেন আবার সোজা চলতে লাগলো। ট্যাক্সিওয়ালা লোকটা অবাক হয়ে সুরেনকে দেখতে লাগলো। কত রকমের মানুষ আছে দুনিয়ায়! ট্যাক্সি যদি দরকার হয় তো বলো। তা নয়, আজেবাজে কথা বলা সকলের স্বভাব হয়েছে আজকাল। ট্যাক্সিওয়ালা ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই নিয়ে ধরিয়ে নিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা খদ্দের।

—চলুন।

—কোথায় যাবেন?

ভদ্রলোক বললে—কোথায় যাবো তা জেনে আপনার কী দরকার?

ট্যাক্সিওয়ালা বললে—আমার চাকা খারাপ আছে। এখন যেতে পারবো না—

ভদ্রলোক যেন কী ভাবলে। বললে—তাহলে মিটার ডাউন করে বসে আছেন কেন? কারখানায় নিয়ে যান না গাড়ি—

ট্যাক্সিওয়ালার যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমন সিগারেট খাচ্ছিল তেমনই খেতে লাগলো। ভদ্রলোক নিজের মনে গজগজ করতে করতে অন্য ট্যাক্সির খোঁজে গেল। ট্যাক্সিওয়ালাটা গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইলো। দুনিয়ায় কত রকমের লোকই যে আছে! সবাই বলে—চলুন। আরে, কোথায় যাবি তা বলবি তো! এখন যদি বেলুড় যেতে বলিস তো ফেরার সময় কী হবে? ফেরার সময় কি মিটার উঠিয়ে আসবো? সব বে-আক্কেলে লোক। আবার কোথাও কিছু নেই, বলে কিনা—মাধব কুণ্ডু লেন চেনেন? মাধব কুণ্ডু লেন চিনি কিনা তা জেনে তোর দরকার কী?

ট্যাক্সিওয়ালা আর একবার [illegible] সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সামনের দিকে চেয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলো

সেদিন ঠিক সময়েই গিয়ে সুরেন পরীক্ষা দিতে বসেছিল। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা। ভয়-ভয় ছিল মনে, পড়া ভালো তৈরি হয়নি। পড়তে গেলেই সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেত। পড়তে গেলেই একগাদা ভাবনার ভিড় মাথায় এসে ঢুকতো। সুখদার কথা মনে পড়তো। পমিলির কথা মনে পড়তো। মা-মণির কথা মনে পড়তো। মনে পড়তো সেই ছেকার নিতাই-এর কথা। বার বার কেবল মনে পড়তো মা-মণির সেই কথাগুলো। মা-মণি বলেছিল, তোর যখন খুশী আসবি আমার এখানে, বুঝলি?

কিন্তু মামার ভয়ে সব সময় যাওয়া হতো না। মা-মণির ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরেই মামা এসে হাজির হতো। বলতো—কী জিজ্ঞেস করলে তোকে মা-মণি?

অনেক পড়া তখনও শেষ করতে বাকি। অনেক রাত পর্যন্ত পড়তে পড়তে যখন হঠাৎ জ্ঞান হতো, দেখতো সামনে বই-এর পাতা খোলা রয়েছে আর সে শুধু সেইদিনকার সেইসব কথাই ভেবে চলেছে। রাত্রে ঠাকুর এসে খেতে ডাকতো। জিজ্ঞেস করতো—আজ খাবে না ভাগ্নেবাবু?

সকলের খাওয়ার পর একলা-একলা গিয়ে খেতে বসতো সুরেন। তখন রান্নাবাড়ির ঝুল-মাখা দেয়ালগুলো আরো কালো হয়ে এসেছে।

হঠাৎ বুড়োবাবুর কথা মনে পড়তো।

জিজ্ঞেস করতো—ঠাকুর, বুড়োবাবুকে তো আর দেখতে পাই না, বুড়োবাবু বেঁচে আছে তো?

ঠাকুর বলতো—বেঁচে আছে না তো কি মরে গেছে? মরে গেলে আমাদের জ্বালাবে কে?

আহা! সুরেন বলতো—না, তাই জিজ্ঞেস করছি, অনেক দিন দেখিনি কি না। সামনে এগজামিন আসছে তো, তাই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

ঠাকুর হঠাৎ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা ভাগ্নেবাবু, শুনেছি নাকি দিদিমণি একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে?

সুরেন মুখ তুললো। বললে—তোমাকে কে বললে?

ঠাকুর বললে—সবাই বলাবলি করছে—

—সবাই মানে কারা?

ঠাকুর বললে—এই বাড়িতে যারা কাজকর্ম করছে তারা সবাই। বাইরের লোক আর কে এ নিয়ে কথা বলবে। পুলিশ এসেছিল তো, তাই সবাই দেখেছে—

সুরেন আবার খেতে খেতে বললে—আমি কিছু জানি না। আমাকে ও-সব কথা কিছু জিজ্ঞেস কোর না।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। ঠাকুর খানিকটা ডাল ঢেলে দিলে ভাতের ওপর।

—আবার ডাল দিলে কেন? আমায় সারা রাত জাগতে হবে তা জানো? পেট ভরে খেলে কি রাত জাগা যায়?

—খান না ভাগ্নেবাবু। না খেলে শরীরটা টিকবে কেন?

হঠাৎ ঠাকুর কেন সদয় হলো তার ওপর তা বুঝতে পারলে না সুরেন। যেন অন্য দিনের চেয়ে বেশি দরদ, বেশি স্নেহ।

ঠাকুর বললে—একদিন এ-সব তো আপনাকেই দেখা-শোনা করতে হবে ভাগ্নেবাবু! আপনি তো লেখাপড়া জানা লোক, ম্যানেজারবাবু তো আপনার মত লেখাপড়া জানেন না।

—কে তোমাকে বললে এ-সব কথা?

ঠাকুর বললে—শুনিচি ভাগ্নেবাবু, আমি সব শুনিচি—

সুরেন বললে—আর কী শুনেছো?

ঠাকুর বললে—আর কী শুনবো? তবে আপনি ম্যানেজার হলে আমাদের দিকে একটু দেখবেন ভাগ্নেবাবু।

পড়তে পড়তেও এই সব কথা কেবল মনে পড়তো সুরেনের। ওরা সবাই জেনে গেছে। যে-কথা এতদিন শুধু মামা জানতো আর সে জানতো, এখন সেটা সবাই জেনে গেছে। হয়তো সুখদা চলে না গেলে এসব কথা উঠতও না, মা-মণিও তাকে কাছে ডেকে এমন আদর করতো না। টাউন-ইস্কুলের বাইরে অনেক ছেলের ভিড়। বড় বড় লোকের ছেলেরা গাড়ি করে এগজামিন দিতে এসেছে। সুব্রত এসেছে বোধহয়। দেবেশ? দেবেশ এসেছে নাকি? বুকটা দুরদুর করছে তখনও। কারো সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে হলো না সুরেনের। ফেল করলে মুখ দেখাবে কী করে?

ঘণ্টা বাজতেই হলের দরজা খুলে দেওয়া হলো।

সুরেন নম্বরটা খুঁজতে খুঁজতে একটার পর একটা বেঞ্চি পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। একেবারে ঠিক সামনের বেঞ্চে সীট পড়েছে তার। একেবারে হেড্-গার্ডের সামনে। টুলটার ওপর বসে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। চেনা-মুখ কয়েকটা নজরে পড়লো। ওই যে তারক রয়েছে, রবি রয়েছে। সকলেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

ঢং করে আবার একটা ঘণ্টা পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে গার্ডরা কোশ্চেন-পেপার দিতে লাগলো সকলকে। চারদিক চুপ। যেন এইবার রায় বেরোবে তাদের মামলার। কোশ্চেন-পেপার দেখলেই বুঝতে পারবে জজ ফাঁসির হুকুম দিলে, না বে-কসুর।

সুরেন মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে লাগলো—হে মা-কালী, যেন পাশ করতে পারি, হে মা-কালী, যেন ফেল না করি...

ঠিক সাড়ে চারটের সময় ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তেই সুরেন খাতা থেকে মুখ তুলে চাইলে। ঘাড়-পিঠ তখন বেশ ব্যথা করছে। গার্ড এসে খাতা কেড়ে নিয়ে গেল। ফাউনটেন-পেনটার কালি ছিটকে সার্টের ওপর পড়েছিল। দাগ লেগে গেছে জামাটায়।

বাইরে আসতেই সুব্রত দেখতে পেয়েছে—এই সুরেন?

সুরেন পেছন ফিরে দেখলে, সুব্রত। গাড়ির ভেতরে বসে আছে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—কী রকম দিলি রে?

সুরেন বললে—ভালো নয় ভাই, তুই?

সুব্রত বললে—মন্দ নয়, আমার সব জানা কোশ্চেন পড়ে গেছে—

—কে থেকে জেনেছিলি?

সুব্রত বললে—আমার মাস্টারমশাই ওই 'এসে'টা করিয়ে দিয়েছিল।

তারপর গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—আয়, তোকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবো, হেঁটে হেঁটে যাবি কেন?

গাড়িতে উঠে সুরেন জিজ্ঞাসা করলে—দেবেশকে দেখেছিস? দেবেশকে তো দেখতে পেলাম না। তারক, রবি সবাইকে দেখলুম, আমার দু' তিনটে বেঞ্চির পেছনে সিট্ পড়েছিল।

সুব্রত বললে—দেবেশ এগজামিন দেবে না—

সুরেন চমকে উঠলো, বললে—সে কী? এগজামিন দেবে না তো কী করবে? পড়া ছেড়ে দেবে?

সুব্রত বললে—ভাই, ওর কথাই আলাদা, ওরা বলে, এগজামিনে পাশ করলেও যখন চাকরি হবে না তখন পাশ করে কী হবে!... চল্, আমাদের বাড়ি চল্—

—না, তোদের বাড়ি এখন যাবো না।

সুব্রত কিছুতেই ছাড়তে চায় না! জোর করে সেদিন নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। বললে—তোর দেরি হবে না, তোকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবো। আর বুধবারের আগে তো আব এগজামিন নেই—

সুব্রতর বাড়িতে যেতে সুরেনের তত ভালো লাগছিল না। সারাদিন এগজামিন দিয়েছে, তারপর গায়ের জামায় কালি লেগে গেছে, এ-অবস্থায় সুব্রতদের মত শৌখীন লোকদের বাড়িতে যাওয়া যায় না।

কিন্তু সুব্রত নাছোড়বান্দা ছেলে। সে যা চাইবে তা করবেই। কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

কিন্তু বাড়ির সামনেটায় গিয়ে সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—এ কী রে তোদের বাড়ির সামনে এত গাড়ির ভিড় কেন?

সুব্রতও জানে না কীসের ভিড়। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললে—বাবার বন্ধুরা সব এসেছে বোধহয়।

সত্যিই তাই। ভেতরে গিয়ে সুব্রত দেখলে বাবার বসবার ঘর অন্ধকার: কিন্তু দোতলার হল-ঘরটা আলোয়-আলো হয়ে গেছে। চাকর-বয় খানসামা-বাবুর্চি ছোটাছুটি করছে। নীচে থেকে কিছু দেখা যায় না।

সুব্রত নিজের পড়বার ঘরের দরজাটা খুলিয়ে নিয়ে বললে—আয় এইখানে বসি, বোধহয় কোনও ফরেন ডেলিগেট এসেছে—

—ফরেন ডেলিগেট মানে?

সুব্রত বললে—আমেরিকা-টামেরিকা থেকে সব ডেলিগেট আসে তো ইণ্ডিয়ায়, তারাই হয়তো এসেছে, বাবা তাদের নেমন্তন্ন করেছে বাড়িতে—ওরা প্রায়ই আসে! হয়তো কক্‌টেলপার্টি হচ্ছে—

ওপরে তখন খুব গোলমাল চলছে, সারা বাড়িটাই আলোয়-আলো হয়ে গেছে। যারা পাড়ার লোক, তারা এরকম দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। তবু পাড়ার লোকজন কিছু ভিড় করেছে সেখানে। এত বড় বাড়ি, এখানে সাধারণ কোনও লোকের ঢোকবার অধিকার নেই। অথচ সাধারণ লোক হয়েও সুরেন ঢুকেছে। এতে যেন খানিকটা গৌরববোধ আছে। সকলের চেয়ে একটু উঁচু হওয়া। সাধারণের মধ্যে একটু বিশিষ্ট হওয়া। মানুষ তো এইটেই চায়, একটু ক্ষমতা শুধু। একটু ক্ষমতার জন্য লোকে অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলিয়ে দেয়।

সংসারে বেঁচে থেকে ওইটুকুই লাভ। নইলে তো পুণ্যশ্লোক রায় ওকালতি করে প্রচুর টাকা জমিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। তা হলে ঘরের খেয়ে এই বনের মোষ তাড়াবার দরকারটা কী? কোথাকার কোন্ দেশ থেকে কয়েকজন লোক এসেছে, তাদের কুলশীলও জানা নয়, তাদের দামী-দামী মদ খাইয়ে কী লাভ?

না, লাভ আছে বৈকি, পাড়ার লোক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, তোমরা সকলে দেখো, আমি তোমাদের চেয়ে কত বড়, তোমাদের মধ্যে আমি কত বিশিষ্ট। আমেরিকা থেকে ইণ্ডিয়ায় যারা বেড়াতে এসেছে, তারা তোমাদের বাড়িতে না গিয়ে আমার বাড়িতে এসেছে।

রঘু আসতেই সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—কী রে, ক'জন সাহেব এসেছে?

রঘু বললে—অনেক দাদাবাবু, অনেক। সায়েব মেম-সাহেব মিলিয়ে প্রায় বারোজন। সকলে খুব মদ খাচ্ছে, হোটেল থেকে খানা এসেছে, খানসামা-বাবুর্চি'রাও এসেছে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—তা আমাদের এখানে কিছু পাঠিয়ে দিতে বল্! আমরাও তো খাবো—

রঘু চলে যাচ্ছিল। সুব্রত আবার জিজ্ঞেস করলে—দিদিমণি কোথায় রে?

রঘু বললে—দিদিমণি তো ওখানেই রয়েছে, মেম-সাহেবদের সঙ্গে কথা বলছে—

বলে চলে গেল। সুরেন বললে—তোর দিদির খুব সুবিধে—

সুব্রত জিজ্ঞেস করলে—কেন?

সুরেন বললে—তোর দিদি তো ইংরিজী ইস্কুলে পড়েছে, ভালো ইংরিজী বলতে পারে। তুই ইংরিজী ইস্কুলে পড়লি না কেন?

সুব্রত বললে—আমি তো প্রথমে দিদির মত ইংরিজী ইস্কুলেই ভর্তি হয়েছিলুম, তারপর বাবা আমাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে ওরিয়েণ্টাল-অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিলে।

—কেন?

—বাবা যে ইস্কুলের সেক্রেটারী হতে চাইলে। নিজের ছেলে ইস্কুলে না পড়লে ভোটে দাঁড়াবে কী করে? তাই আমি লরেটো ছেড়ে এখানে ভর্তি হলুম—

পুণ্যশ্লোকবাবুর সেই-ই হলো উন্নতির শুরু। প্রথমে ভোটে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারি, তারপর পাড়ার সার্বজনীন দুর্গাপুজোর প্রেসিডেণ্ট তারপর মণ্ডল কংগ্রেস। মণ্ডল কংগ্রেস থেকে একেবারে এ-আই-সি-সি। ধাপে ধাপে পুণ্যশ্লোকবাবু কেবল ওপর দিকে উঠেছেন আর খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা বেড়েছে তাঁর। তারপরে একেবারে মিনিস্টার হয়ে সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁচেছেন। এখন সকাল থেকে লোক আসে নানা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে। আর যতক্ষণ না শোবার ঘরে ঘুমোতে যান ততক্ষণ লোক লেগে থাকে পেছনে। কেউ আসে শুধু কুশল জিজ্ঞেস করতে, কেউ আসে বাসের পারমিট নিতে, কেউ চাকরি, কেউ চাকরির প্রমোশন। মোট কথা, একটা-না-একটা ব্যাপার লেগেই আছে তাদের।

সুরেন বেশ ভালো করে দুটো বাড়িকে মিলিয়ে দেখছিল। তুলনামূলক বিচার করে দেখে এটুকু শুধু বুঝেছিল যে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে যেটা সত্যি, এই সুকীয়া স্ট্রীটের বাড়িতে সেটা মিথ্যে। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এমন করে মদ খাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারবে না কেউ। অথচ এখানে

ওটা কত সহজ। সত্য কি তবে দু'রকম? একই মানুষের পৃথিবীতে দুটো সত্য কী করে থাকে? যেমন সূর্য একটা, সত্যও তো তেমনি একটা হওয়া উচিত!

খাওয়া-দাওয়ার পর সুরেন চলে আসছিল, তখন বোধহয় ওদের পার্টিটা ভাঙলো। ওপর থেকে তখন সবাই নিচেয় নেমে আসছে। সুরেন দেখলে অনেকগুলো সাহেব হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে নেমে আসছে। সঙ্গে কয়েকজন মেমসাহেবও আছে। তাদের মধ্যে পুণ্যশ্লোকবাবুও কথা বলতে বলতে নামছেন।

সুব্রত আর সুরেন ঘরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ নজরে পড়লো, একজন সাহেব পর্মিলির সঙ্গে একমনে গল্প করতে করতে নামছে। তারা দু'জনে যেন দল-ছাড়া। ওদিকে অন্য সবাই ততক্ষণ এগিয়ে বাগান পেরিয়ে রাস্তার দিকে চলেছে।

সিঁড়ির নিচেয় একটু অন্ধকার মতন। সেখানে দাঁড়িয়ে সাহেবটা তখনও পর্মিলির সঙ্গে গল্প করছে একমনে। সমানে গড়-গড় করে ইংরিজী কথা বলে চলেছে পর্মিলি। কোনও দিকে খেয়াল নেই পর্মিলির আর সাহেবটার! কথাগুলো বুঝতে পারলে না সুরেন। সুরেনও বুঝতে পারলে না, সুব্রতও বুঝতে পারলে না। হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো।

হঠাৎ সাহেবটা পর্মিলিকে জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে। তারপর পর্মিলির ওপরে আকণ্ঠ চুমু খেতে লাগলো। সুরেনের সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। সে সুব্রতর দিকে চেয়ে দেখলে। সুব্রতও সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

সুরেন বললে—সাহেবটা ও কী করছে রে? তোর দিদিকে যে চুমু খাচ্ছে—

সুব্রতর চোখ-মুখ কান বোধহয় তখন গরম হয়ে গেছে রাগে। বললে—দাঁড়া, আমি স্কাউনড্রেলটাকে দেখাচ্ছি মজা। ভেবেছে কেউ দেখতে পাচ্ছে না—

সুরেন সুব্রতর হাত দুটো ধরে ফেললে। বললে—চুপ কর ভাই, সাহেবটার গায়ে খুব জোর। ও তোকে মেরে ফেলতে পারে।

সুব্রত আর একটু হলেই দরজার খিল খুলে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কিন্তু তার আগেই সাহেবটা পর্মিলিকে ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। তার বন্ধুর দল তখন সবাই গাড়িতে উঠছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। পুণ্যশ্লোকবাবু তাদের সঙ্গে গল্প করছেন। খুব খুশী মেজাজ। হয়তো ভবিষ্যতে আমেরিকায় যাবেন, তার রাস্তা তৈরি করে রাখছেন।

সাহেবটা চলে যেতেই সুব্রত দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

—পর্মিলি!

পর্মিলি জানতে পারেনি যে সুব্রত পাশের ঘরেই আছে। সুব্রতকে দেখে যেন চমকে উঠলো।

—তুই সাহেবটাকে চুমু খাচ্ছিলি কেন?

পর্মিলি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বললে—তোর কী তাতে? খেয়েছি বেশ করেছি। তোকে সর্দারি করতে কে বলেছে?

সুব্রত বললে—তুই ভাবছিস কেউ দেখেনি? এই সুরেন সাক্ষী আছে।

এও দেখেছে—

বলে পেছনে ফিরে ডাকলে—এই সুরেন, এদিকে আয় তো—

সুরেনের সমস্ত শরীর তখন ভয়ে হিম হয়ে গেছে, এই ক'দিন আগে একটা কাণ্ড করে গেছে সে, আবার আজকে একটা কেলেঙ্কারী-কাণ্ড করবে নাকি!

—আয়, এগিয়ে আয়! লুকিয়ে আছিস কেন, বেরিয়ে আয়!

আস্তে আস্তে জড়সড় পায়ে সুরেন বেরিয়ে এল। যেন তাকে বধ করতে কেউ খাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুব্রত বললে—এই তো, সুরেনও দেখেছে তুই সাহেবটাকে চুমু খাচ্ছিলি—

পর্মিলির কিন্তু লজ্জা নেই। একেবারে সোজা সামনে এগিয়ে এল। সুরেনের সামনে এসে দাঁড়ালো। সুরেনের দিকে মুখ রেখেই জিজ্ঞেস করলে—কী দেখেছ তুমি?

সুরেন বোকার মতন চুপ করে রইলো।

পর্মিলি আবার বললে—বলো কী দেখেছ?

সুব্রত এগিয়ে এসে সুরেনকে বাঁচিয়ে দিলে।

বললে—শুধু ও কেন, আমিও তো দেখেছি—তোর লজ্জা করে না আবার কথা বলতে? তুই কি ভেবেছিস তুই কলেজে পড়িস বলে আমার চেয়ে বেশি বুঝিস?

পর্মিলিও পেছ-পা হবার মেয়ে নয়। বললে—হ্যাঁ, আমি বেশি বুঝি। চুমু খেলে দোষটা কী? চুমু তো সবাই সবাইকে খেতে পারে। সিনেমায় চুমু খেতে দেখিসনি তুই?

সুব্রত বললে—চুমু খাওয়া ভাল কি মন্দ তা তুই আমাকে শেখাবি নাকি? এখন যদি বাবাকে আমি বলে দিই তখন তোর কী হবে?

—বল্ না, বল্ বাবাকে। বাবা আমাকে কিছুছু বলবে না—

সুব্রত বললে—আচ্ছা আমি যাচ্ছি, গিয়ে বলছি সব বাবাকে—

বলে সত্যিই সুব্রত বারান্দা পেরিয়ে বাগানটার দিকে চলে গেল। সুরেনও তার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যেতে চাইছিল। হঠাৎ পর্মিলি তার হাতখানা ধরে ফেললে। বললে—তুমি কোথায় পালাচ্ছো?

চমকে উঠেছে সুরেন। বললে—আমি যাই, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এখানে আসতুম না। সুব্রত আমাকে জোর করে এ-বাড়িতে নিয়ে এল। তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, তার মধ্যে আমাকে কেন টানছো?

পর্মিলি বললে—আমি জানি তুমি কী জন্যে আমাদের বাড়িতে আসো—

সুরেন বললে—সত্যি বলছি বিশ্বাস করো, আমি আসতে চাইনি এই জন্যেই, কিন্তু সুব্রত আমাকে টেনে নিয়ে এল—

কথার মধ্যিখানেই থামিয়ে দিয়ে পর্মিলি বললে—কিন্তু আজকে আমাদের বাড়িতে আমেরিকানদের পার্টি আছে, তা তুমি জানতে না বলতে চাও?

সুরেন বললে—সত্যি বলছি আমি জানতুম না—

পর্মিলি বললে—তাহলে এগজামিনেশনের পরে বাড়ি না গিয়ে এখানে এলে কেন? তোমার বাড়ির লোকরা ভাববে না?

সুরেন বললে—আমার জন্যে বাড়িতে ভাববার কেউ নেই—

—কেউ নেই মানে?

সুরেন বললে—আমাদের নিজেদের বাড়িই নেই—

—মা-বাবা? ভাই-বোন?

সুরেন বললে—কেউ নেই। শুধু একজন মামা আছে। মামা যে-বাড়িতে চাকরি করে আমি সেই বাড়িতেই খাই থাকি—

এবার পমিলির কী হলো কে জানে, পমিলি সুরেনের হাত ছেড়ে দিলে। ছেড়ে দিতেই সুরেন চলে যাচ্ছিল।

পমিলি আবার ডাকলে—শোনো—

কিন্তু ততক্ষণে ওদিক থেকে সুব্রত আর তার বাবা হঠাৎ এসে পড়েছে। পুণ্যশ্লোক রায় খুব হাঁফাচ্ছেন তখন। সন্ধ্যেবেলাটা খুবই ঝঞ্ঝাটে কেটেছে। আমেরিকান ডেলিগেটদের নিয়ে অনেকক্ষণ তোয়াজ করতে হয়েছে। ফরেনাররা ইণ্ডিয়ার গেস্ট হয়ে এসেছে, তাদের খাতির না করলে চলবে কেন? তা ছাড়া নিজের কেরিয়ার আছে। আমেরিকার প্রিয়-পাত্র হতে গেলে তাদের খাতির করাই বুদ্ধিমানের কাজ! প্রতিদানে একদিন তারাও আবার আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাতির করবে। জীবন যত জটিল হয়ে উঠেছে রাজনীতিও তো তত জটিল হয়ে উঠেছে। আগে সোজাসুজি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেই রাজনীতিক হওয়া যেত। পেট্রিয়ট বলে নাম কেনা যেত। এখন দিনকাল বদলে গেছে। এখন ঘরে ঘরে তোমার শত্রু। এখন পার্টিতে পার্টিতে শত্রুতা। একটু অপযশ হলেই অপোজিশান-পার্টি তোমার হাঁড়ি হাটে ভেঙে দেবে। তাছাড়া, ভোটাররাও আর সে-রকম নেই। এখন ভোটাররা চালাক হয়ে গেছে। তারাও করুণার ছিটেফোঁটা চায়। তা না দিলেই অন্য দলে গিয়ে জুটবে। আবার পাঁচ বছর পরে যখন ভোট হবে তখনকার কথা ভেবে চলতে হয়। এখন রাজনীতি করা অনেক শক্ত হয়ে গেছে।

মনটা বড় বিষিয়ে ছিল পুণ্যশ্লোকবাবুর। বিষিয়ে তো থাকবেই। ছোটবেলা থেকে কেরিয়ার করবার ঝোঁক। এই এত বছরের চেষ্টার ফলে এখন তবু একটু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তবু শান্তি নেই মনে। চারদিকে শত্রুরা ওত পেতে আছে, কখন মিনিস্ট্রি কেড়ে নিতে পারবে। অথচ তারই মধ্যে হাসতে হবে, লেকচার দিতে হবে, স্টেটমেন্ট দিতে হবে। এ্যাসেম-ব্লিতে কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে। তার ওপর আছে পার্টি। এই আজকে যেমন পার্টি হলো।

—কী হয়েছে? —এ কে?

সুব্রত বললে—এ আমার বন্ধু বাবা, সেই যে বলেছিলুম তোমাকে—

পুণ্যশ্লোকবাবু চাইলেন সুরেনের দিকে—

—তুমি সুব্রতর সঙ্গে পড়ো? ওরিয়েণ্টাল অ্যাকাডেমীর ছাত্র?

সুরেন মাথা নিচু করে বললে—হ্যাঁ—

—কেমন পরীক্ষা হলো তোমার?

সুরেন বললে—ভালো হলো না—

—কেন?

সুব্রত বললে—না বাবা, ও খুব ভালো রেজাল্ট করবে। ও মুখে ওইরকম বলছে—

সুরেন বললে—আমার দেরি হয়ে গেছে, আমি আসি—

—যাবে ?

সুরেন বললে—আমি যেতে দেরি করলে মামা আবার ভাববে—

—তুমি তো ওই মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরীদের বাড়িতে থাকো ?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

—ভালো, ভালো। চৌধুরীদের কর্তা তো মারা গেছেন, এখন কে আছেন তাঁর ?

ঠিক এই প্রশ্নই বহুদিন আগেও একদিন তিনি করেছিলেন। সেই একই ধরনের প্রশ্ন। খুব হাসিমুখ। খুব প্রসন্নচিত্ত। একটু আগেই তার নিজের মেয়ের চরিত্রে যে-ঘটনা ঘটে গেছে, তা তার কানে গেলেও যেন তাঁর রাগ করতে নেই।

সুব্রত বললে—বাবা. দিদিকে তুমি জিজ্ঞেস করো, আমি ঠিক বলেছি কি না—

পুণ্যশ্লোকবাবু সে-ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন—সে পরে হবে—

বলে সুরেনকে বললেন—তুমি এসো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—এসো আমার সঙ্গে—

পুণ্যশ্লোকবাবু কথাটা বলে আগে আগে চলতে লাগলেন, আর পেছনে সুরেন। পুণ্যশ্লোকবাবু তার নিজের সেই ঘরে গিয়ে বসলেন। নিজের চেয়ারটায়।

বললেন—বোস—

সুরেন সামনের একটা চেয়ারে বসলো। চারিদিকের দেয়ালে ছবি। দেশের নাম-করা সব বড় বড় লোক। সি. আর. দাস, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু। কে নেই ? সবাই যেন হাঁ করে দেখছেন সুরেনের দিকে। যেন বলছেন—কার সামনে তুমি বসে আছ তা জানো ? উনিও আমাদের মত একজন মহাপুরুষ। ওঁর মৃত্যুর পরে উনিও আমাদের মত ছবি হয়ে সকলের বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে উঠবেন।

—তুমি কোন দলে ?

সুরেন একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বুঝতে পারলে না প্রশ্নটা।

বললে—আজ্ঞে ?

পুণ্যশ্লোকবাবু বেশ মিহি করে আবার বললেন—তুমি কোনও দলেটলে আছ নাকি ?

সুরেন বললে—আমি তো কোনও দলে নেই...

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—না, আমি বলছি, আজকাল তো আবার দেশে দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সময় এ-সব দল-টল ছিল না। আমরা শুধু জানতাম মহাত্মাজীকে। আমরা শুধু জানতে চাইতুম কেমন করে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। কিন্তু এখন তো আর সে-সব নেই। এখন আবার আর এক দল উঠেছে, তারা আমাদের তাড়াতে চাইছে, যেন আমরা কেউ না, যেন আমরা দেশের জন্যে কিছু করিনি, যেন আমরা দেশের জন্যে কিছু ভাবি না—

সুরেন চুপ করে রইলো। কিছু উত্তর দিলে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তুমি সেই সব দল-টলে নেই তো ?

সুরেন বললে—না, আমি কোনও দলে নেই—

—না, থেকো না। তুমি ছেলেমানুষ বলেই তোমায় বলছি। এই বয়েসটাই বড় বিপজ্জনক বয়েস। এই বয়েসেই যত গণ্ডগোল ঘটে, খুব সাবধানে থাকবে! তোমাদের পাড়াতে, যে-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো, তাদের বোঝাবে যে, আমরাই ব্রিটিশদের তাড়িয়েছি, সুতরাং আমাদের যেটা পাওনা সেটা তাদের দেওয়া উচিত—আমরাও তো দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী—

সুরেন এর উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারলো না। শুধু চুপ করে রইলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এবার যাও তুমি, তোমার অনেক দেরি হয়ে গেল—

সুরেন উঠলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু আবার বললেন—তাহলে কথাগুলো মনে রেখো, বুঝলে? সব সময় কথাগুলো তোমাদের মনে রাখা উচিত। লেখাপড়া অবশ্য করবে, কিন্তু এ-সব কথাও তোমাদের ভাবা উচিত। কারণ তোমরাও তো একদিন বড় হবে, বড় হয়ে তোমরাই তো আবার দেশের কর্ণধার হবে। তখন তোমাদের সব জিনিস বুঝে-সুজে কাজ করতে হবে—

তারপর একটু থেমে বললেন—যাও, কিন্তু যাবে কীসে?

সুরেন বললে—হেঁটেই চলে যাবো, কিংবা ট্রামে—

—না, হেঁটে যেতে হবে না।

বলে ড্রাইভারকে ডাকলেন। তারপর ড্রাইভার আসতেই তাকে বলে দিলেন সুরেনকে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে পেঁৗছিয়ে দিতে।

সুরেন নমস্কার করে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাইরেই সুব্রত দাঁড়িয়ে-ছিল।

কাছে এসে বললে—কী রে, বাবা কী বললে তোকে?

ততক্ষণে ড্রাইভার তাগাদা দিলে। বললে—আসুন বাবু—

আর কথা বলবার সময় হলো না। সুরেন গিয়ে গাড়িতে উঠলো। সুরেন চলন্ত গাড়িটা থেকে বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে। কিন্তু পর্মিলিকে আর কোথাও দেখা গেল না। আস্তে আস্তে গাড়িটা বাগান পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো উত্তর দিক বরাবর—

এমনি করেই প্রত্যাহের জীবন গড়িয়ে গড়িয়ে একদিন মহাজীবনে গিয়ে তা ঠেকে! সব মানুষই এমনি করে এগিয়ে চলে। এমনি করেই পৃথিবী আপন কক্ষ-পথে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে আবার হয়তো একদিন কখন আপনার গতিপথকে অস্বীকার করে উল্কা হয়ে অন্য পথে মোড় ফেরে। তখন হয় বিপ্লব।

কিন্তু মামারই যেন যত যন্ত্রণা।

মামা বলেন—তোকে নিয়ে তো মহা মুশকিল হলো। তোকে যত মানুষ করতে চাই, ততই তুই অবুঝ হয়ে উঠিস। কিন্তু আমি তো আর পারছি না—

সত্যিই সব কিছু তখন বদলে গেছে সুরেনের চোখে। স্কুল পেরিয়ে

বৃহৎ পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়ানো। সে এক মহা বিপ্লবই বটে। সুব্রত তখন নেই। সে একদিন আমেরিকা চলে গেল। এক কলেজেই পড়তো সুরেনের সঙ্গে। কিন্তু আর তার সঙ্গে দেখা হলো না। আগের দিন শুধু একবার দেখা করতে এসেছিল। আমি চলে যাচ্ছি রে--

সুরেন আবক হয়ে গিয়েছিল। বললে—কোথায়?

সুব্রত বললে—আমেরিকায়—

কলেজে পড়তে পড়তে আমেরিকায় চলে যাওয়ার ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। কত দূর চলে যাবে সুব্রত। কত কত দূর। সেখানে গিয়ে সুব্রত কী করবে সেটা বড় কথা নয়। দূরে চলে যেতে পারবে, সেটাই বড়।

—ক'দিন লাগবে সেখানে যেতে?

—পাঁচ ছ'দিন, মাঝে লন্ডনে একদিন থাকবো—

পাঁচ দিন! পাঁচ দিনে আমেরিকা। বড় লোকের ছেলে সুব্রত। কেমন করে বাইরে যাবার চান্স পেলে সে, তা আর জানবার কৌতূহল হয়নি তার সেদিন। পুণ্যশ্লোকবাবুর ছেলে আমেরিকা যাবে না তো যাবে কে?

সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—সেখানে গিয়ে কী পড়বি?

কী পড়বে সুব্রত তা নিজেও জানে না। জানবার হয়তো দরকারই নেই তার।

সুব্রত বললে—তা জানি না। বাবা পাঠিয়ে দিচ্ছে, আমিও যাচ্ছি—

তারপর একটু থেমে বললে—আর তা ছাড়া বাবার ওপরে তো আর কথা বলা চলে না। বাবা যা ভালো বুঝেছে তাই-ই করছে—

তা সত্যিই একদিন সুব্রত ইন্ডিয়া ছেড়ে সুদূর বিদেশে চলে গেল। প্রথম দিনটা খুব খারাপ লেগেছিল সুরেনের। ভারি মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন ধরে সুব্রতর সঙ্গে ভাব, এতদিন ধরে একসঙ্গে একই ইস্কুলে পড়ে এসেছে এখন একটু-একটু ফাঁকা লাগবে বৈকি!

আর তারপর মাধব কুন্ডু লেনের বাড়িটারও যেন আর সে মোহ ছিল না আগেকার মত। সেই প্রথম-প্রথম সুখদা থাকবার সময় খুব ভালো লাগতো। মা-মণি ডাকতো, বোশেখ মাসের ব্রত করবার সময় নতুন ধুতি দিয়েছিল পরতে। আর তারপর সেই সুখদা একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। যেন সব কিছু বদলে গেল তারপর থেকে!

সেদিন মামা ডাকলে—কী রে, কোথায় থাকিস সারাদিন? তোর তো আর দেখাই পাওয়া যায় না—

সুরেন বললে—আমি তো শুধু কলেজে যাই আর বাড়িতে আসি—

—বাড়িতে আসি? কাল কোথায় ছিলি? কাল সন্ধ্যেবেলা?

সুরেন বললে—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলুম—

—কেবল বন্ধু আর বন্ধু! বন্ধুর বাড়িতে গেলে কি বারোটা হাত গজায়? কে তোর বন্ধু শুনি?

সুরেন বললে—সুব্রত। সুব্রত রায়, আমার সঙ্গে পড়তো—

—তোদের সঙ্গে তো অনেকেই পড়ে, তাদের সকলের বাড়িতে যাস তুই? তারা কী রকম ছেলে? বড়োলোক?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, খুব বড়োলোক। তার বাবা মিনিস্টার—

—মিনিস্টার? পুণ্যশ্লোক রায় নাকি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, তারই ছেলে—সে কালকে আমেরিকা চলে গেল কিনা—

—আরে তাই বল, আমাদের উকীলবাবুর ছেলে! সে-ই তোর সঙ্গে পড়তো?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—উকীল না, উকীল না, মিনিস্টার—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে ওই হলো। এই পুণ্যশ্লোক রায়ই তো ছিল আমাদের এস্টেটের উকীল। যাকে বলে এ্যাড্ভোকেট। কত টাকা আমাদের খেয়েছে।

কথাটা সুরেনের ভালো লাগলো না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমাদের এস্টেটের কাজে কতবার চৌধুরীবাবুর কাছে ধরনা দিয়েছে। আমার এই কাছারি-ঘরে এসে কতদিন চৌধুরীবাবুর জন্যে হা-পিত্যেস করে বসে থেকেছে—

সুরেন বললে—কিন্তু আমি তো কোনওদিন দেখিনি—

—আরে তুই দেখবি কী করে? তুই তখন কোথায়? তুই তখন জন্মাসইনি! সেকি আজকের কথা!

সুরেন বললে—আমাকে তাই জিজ্ঞেস করছিলেন পুণ্যশ্লোকবাবু—

—কী জিজ্ঞেস করছিলেন?

—জিজ্ঞেস করছিলেন এখন এ-বাড়িতে কে-কে আছে!

—জিজ্ঞেস করছিলেন নাকি? তুই কী বললি?

সুরেন বললে—আমি বললুম যে চৌধুরীবাবুর এক বিধবা মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই!

ভূপতি ভাদুড়ী চুপ করে রইলো।

বললে—তা শুনে উকীলবাবু কী বললেন?

সুরেন বললে—কিছু বললেন না। শুধু শুনলেন।

—তা তো শুনবেনই। কথা বলবার কি আর তাঁর এখন সময় আছে। এখন হয়তো আর চিনতেই পারবেন না।

সুরেন বললে—তার ছেলে আমেরিকায় চলে গেল কাল—

—গেল কেন? কী করতে?

সুরেন বললে—পড়তে—

—কী পড়তে?

—তা জানি না। সুব্রত নিজেও জানে না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তো জানবেই না। জানবার তো আর দরকার নেই। এখন তো কাউকে জানলেই বিপদ। তা তুই পরিচয় দিলিনে কেন?

সুরেন বললে—পরিচয় তো দিলুম! বললুম, আমার মামা চৌধুরীবাড়ির এস্টেট-ম্যানেজার—

—তা চিনতে পারলেন আমাকে?

সুরেন বললে—কই, তা তো কিছু বললেন না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হুম্। তা কেন বলবেন! তা বললে যে নিজে ছোট হয়ে যাবেন!

তারপর একটু থেমে বললে—আমার সকলকে চেনা হয়ে গেছে, বুঝলি? সকলকে চেনা হয়ে গেছে। সাধ করে কি আর এখন কাউকে বিশ্বাস করিনে?

আগে করতুম। এখন দেখছি সব ঝুটো! তুই যত ভালোই হোস, সবাই তোকে বোকা বলবে। আর একটু বাঁকা হ', দেখবি সবাই তোকে ভক্তি করবে. মানবে, সবাই তোকে সাচ্চা লোক বলবে—

তারপর বোধহয় নিজেই বুঝতে পারে, এ-সব ভারি-ভারি কথা ভাগ্নেটা বুঝবে না। ওকে বলা বৃথা।

বলে—যাক, এ-সব কথা তো বলা বৃথা। বড় হয়ে যখন ঠেকবি তখন আমার মতন শিখবি। এসব কি আর কাউকে ধরে-বেঁধে শেখানো যায়, এ আপনিই শিক্ষা হয়, সংসারের চাপে পড়ে লোক আপনিই শেখে—

বলে যেন বিরক্ত হয়েই মামা আবার ঘর থেকে বাইরে চলে যায়। সুরেন বুঝতে পারে মামাও যেন তার মত কোনও অশান্তিতে ছটফট করছে। অথচ মামার যে কীসের অশান্তি তা বুঝতে পারে না সুরেন। মামার তো কোনও সঙ্গীও নেই, কোনও বন্ধুও নেই। বলতে গেলে মামার কেউই নেই। এই সমস্ত সম্পত্তিটাই যেন মামার সব। এই সমস্ত-কিছুই যেন মামার নিজের। এর তদারকি. এর তদবির করতেই যেন মামার সোয়াস্তি।

ভূপতি ভাদুড়ী ঘর থেকে চলে যাবার পরও সুরেন মামার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখতে লাগলো।

মনে পড়লো সুব্রতর কথা। সুব্রতর প্লেনটা ছাড়বার কথা ছিল রাত সাড়ে দশটার সময়। সুরেনের ইচ্ছে ছিল যাবার আগে দমদমের এয়ারপোর্টে গিয়ে শেষ বারের মত দেখা করে আসবে।

সুব্রতকেও বলেছিল সে-কথা।

সুব্রত বলেছিল—তুই এয়ারপোর্টে যাবি?

সুরেন বলেছিল—গেলে হয়—

সুব্রত বলেছিল—তাহলে এক কাজ কর না, আমাদের বাড়িতে তুই চলে আয় না রাত্তির বেলা।

—তারপর?

সুব্রত বলেছিল—তারপর আমার গাড়িতেই তুই যাবি। আবার গাড়ি যখন ফিরবে, তখন সেই গাড়িতেই ফিরে আসবি—

—কিন্তু তোদের গাড়িতে অন্য লোক থাকবে না?

সুব্রত বললে—আমার গাড়িতে আর কে থাকবে, আমি একলাই যাবো—

—তোর বাবা?

সুব্রত বললে—না, বাবা যাবে না—

সুরেন বললে—তাহলে এক কাজ কর না। আমার বাড়ির সামনে দিয়েই তো যাবে. আমি মাধব কুণ্ডু লেনের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, আমাকে তুলে নিস। তুই ক'টার সময় বাড়ি থেকে বেরোবি?

সুব্রত বললে—তোর বাড়ির সামনে আমি ঠিক রাত ন'টার সময় হাজির হবো। তোকে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াতে হবে না, তুই খেয়েদেয়ে বাড়িতেই তৈরী হয়ে থাকিস—

তা ঠিক সেই কথাই হয়েছিল সুব্রতর সঙ্গে। [illegible] সেই জন্যেই সুরেন তৈরী ছিল।

ঠাকুরকে আগে থেকেই ভাতের তাগাদা দিয়ে রেখেছিল সুরেন।

ভাতটা নামতেই ঠাকুর ডাকতে এল। বললে—খেতে আসুন ভাগ্নেবাবু—

অথচ এমন যে হবে তা কল্পনাও করতে পারেনি সুরেন। নতুন একটা সার্ট, নতুন একটা ট্রাউজার বার করে পরে নিয়েছিল। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটা তখন ঝিমিয়ে এসেছে। মা-মণির খাবার নিয়ে ধনঞ্জয় ভেতরে চলে গিয়েছে। ভূপতি ভাদুড়ীও সকাল সকাল খেয়ে নিয়েছে।

সুরেন গেটের কাছে যেতেই বাহাদুর সিং সেলাম করলে।

সুরেন বললে—বাহাদুর, আমি এখন একটু বেরোব—

বাহাদুর সিং বললে—বহুৎ খুব হুজুর—

—ফিরে আসতে আমার এই ধরো সাড়ে এগারোটা বাজবে। আমি সেই দমদমায় যাচ্ছি, গাড়িতে যাবো গাড়িতে আসবো, তুমি যেন আবার গেট ছেড়ে কোথাও যেও না।

বাহাদুর সিং বললে—নেহি হুজুর—নেহি যায়ে গা—

—হ্যাঁ, খুব সাবধান। একবার তোমার গাফিলতিতে সুখদা দিদিমণি পালিয়ে গিয়েছিল। আবার যেন কিছু বিপদ না হয়—

বাহাদুর সিং-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে এমনি কথা হতে লাগলো। —দিন-কাল বড় খারাপ হয়ে গেছে। দুনিয়া বদলে গেছে। এখন কাউকেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। খুব মন দিয়ে পাহারা দেবে। বুঝলে?

হঠাৎ বাইরে এসে সুব্রতদের গাড়িটা থামলো। গাড়ির ভেতর থেকে সুব্রত ডাকলে—এই চলে আয়—

সুরেন বাইরে বেরোতেই বাহাদুর সিং শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু গাড়ির কাছে গিয়েই সুরেন অবাক হয়ে গেল।

সুব্রত গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—আয়, এদিকে আয়—

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে সুরেন দেখলে সুব্রত একলা নয়। সুব্রতর দিদি পর্মিলিও বসে আছে পাশে।

সুরেনের মুখের ভাব দেখে সুব্রত বললে—দিদি ছাড়লে না, তাই দিদি-কেও নিয়ে এলুম। —ওকে তুই বাড়িতে পেঁছে দিস ফেরবার সময়, বুঝলি—

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক তেমনি বিভ্রান্তিকর। সে-অবস্থায় পড়লে অন্য মানুষ কী করতো তা কল্পেনাও করতে পারা যায় না। বিশেষ করে সুরেনের মত নির্বিরোধী লোক। সংসারে যারা নির্বিরোধী তাদের ওপরেই বোধহয় যত বিরোধের চাপ পড়ে। এমন হবে জানলে সে কি একগাড়িতে যেতে রাজী হতো? আর কীসের দরকার তার এয়ার-পোর্টে যাবার? সে কি কখনও প্লেন দেখেনি? আর প্লেন যদি না-ই দেখে থাকে তো সে তো যে-কোন একদিন দমদমে গিয়ে দেখে আসতে পারতো। কেন সে সুব্রতর সঙ্গে যাবার কথা দিলে?

—কী রে, কথা বলছিস না কেন, উত্তর দে?

এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো সুরেনের। বললে—কীসের উত্তর? কী কথা?

সুব্রত বললে—পর্মিলি কী বলছে শুনতে পাচ্ছিস না?

—কী ?

এতক্ষণে সুরেন মুখ ফিরিয়ে দেখলে পর্মিলির দিকে।

পর্মিলি হাসতে হাসতে বললে—তুমি অত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছ কেন ?

সুরেন সহজ হয়ে গাড়ির সিটের গায়ে হেলান দিলে। বললে—কই, না তো, আমি তো ঠিক ভালো করেই বসে আছি—

পর্মিলি হেসে উঠলো। সুব্রতও হাসলো। দু'জনের আওয়াজে সুরেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

তারপর সহজ হবার আপ্রাণ চেষ্টায় বললে—তুই চলে যাচ্ছিস, আমার আর কেউ কথা বলবার মত লোক রইলো না কলকাতায়।

সুব্রত বললে—দেখছিস পর্মিলি, সুরেনটা কেমন সেণ্টিমেন্টাল।

পর্মিলি বললে—তুমি তো দেখছি লাইফে উন্নতি করতে পারবে না সুরেন—

সুব্রত বললে—ও এখনও জানে না যে, জীবনের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা কেবল স্ট্রাগ্‌ল—চক্ষুলজ্জা করলেই তাকে পস্তাতে হবে—

সুব্রতর মুখ থেকে এ-কথাগুলো শুনে সেদিন সুরেন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। আগেও অনেক রকম উল্টো-পাল্টা কথা বলেছে সুব্রত, কিন্তু এমন করে পর্মিলির সামনে তাকে কখনই ছোট করেনি।

গাড়িটা তখন বেলগাছিয়ার ব্রিজ পেরিয়ে পুব দিকে এগিয়ে চলেছে। ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে বস্তিগুলো তখন খুব ম্রিয়মাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা একবার একটা ঝাঁকুনি দিলে। সুরেন নিজেকে সামনে নিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলো। আর একটু হলেই সে ওদের গায়ের ওপর ঢলে পড়তো।

—দ্যাখ্, একটা কথা মনে রাখিস, এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। কারোর জন্যে যদি একটু চোখের জল ফেললি তো গেলি! এখানে কেউ কারো সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না।

সুরেনের ভাল লাগছিল না। বললে—ও-সব কথা থাক—

সুব্রত বললে—ওসব কথা থাকবে কেন? যা বলছি ভালো করে শোন। আমি চলে যাচ্ছি, তখন তোকে সামলাবার আর কে রইলো? কলকাতার মানুষ-গুলো কখন কার সর্বনাশ করতে পারবে দিনরাত তারা সেই ভাবনাই তো ভাবছে—

পর্মিলি সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—কেন, আমাদের বাড়িতে তুমি আর আসবে না?

সুরেন কথাটার মানে বোঝবার জন্যে পর্মিলির দিকে অবাক হয়ে চাইলে। চেয়েই আবার চোখ দুটো অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে।

সুব্রত বললে—দেখছিস তো তোর কথা শুনে কি-রকম লজ্জা পেয়ে গেল ও—

পর্মিলি বললে—না না, আমি বাজে কথা বলছি না। তুমি এসো আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে—

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। সুব্রত না-থাকলে সুরেন যে কোন্ সূত্রে ধরে ওদের বাড়ি যাবে তা ওর মাথায় এল না।

—আসিস, বুঝলি, আমাদের বাড়ি ছাড়া তোর যাবারও জায়গা নেই।

তারপর দিদির দিকে মুখ ফিরিয়ে সুব্রত বললে—জানিস পর্মিলি, ও একটা অদ্ভুত ছেলে। আমি ছাড়া আর কোথাও আর কারোর সঙ্গে মিশতে পারে না—

পর্মিলি বললে—তা হলে সারা দিন কী করো?

সুব্রতই ওর হয়ে জবাব দিলে। বললে—সারাদিন কলেজ করার পর নিজের বাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

—পড়ো, নাকি শুধু বই মুখে দিয়ে বসে থাকো কেবল?

সুব্রত বললে—আরে না। কেবল ভাবে—

—কী ভাবে?

সুব্রত বললে—এই আকাশ-পাতাল!

—আকাশ-পাতাল মানে? আকাশ-পাতাল কী এত ভাববার আছে? আমি তো একলা বেশিক্ষণ বসে থাকতেই পারি না।

সুব্রত বললে—আমিও তো তাই। কিন্তু ও পারে—

পর্মিলি সুরেনের চিবুকটা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এসে বললে—কী, তুমি সত্যিই চুপ করে আকাশ-পাতাল ভাবো নাকি? সত্যি?

সুরেন নিজের মুখটা পর্মিলির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—তোমরা কী পেয়েছ আমাকে, আমাকে কি পাগল পেয়েছ নাকি?

সুরেনের মুখের ভাব দেখে সুব্রতও হেসে উঠলো, পর্মিলিও হেসে উঠল।

সুরেন বললে—তোমাদের কি অন্য কথা নেই কিছু আর?

সুব্রত বললে—তুই রাগ করছিস কেন?

সুরেন বললে—রাগ করলুম কোথায়? মানুষ এক-একটা নেচার নিয়ে জন্মায়, আমার নেচারের জন্যে কি আমি দায়ী? আমি একলা-একলা আকাশ-পাতাল ভাববো না তো কী করবো? কোথায় যাবো? কার কাছে যাবো? মানুষের মত কি মানুষ আছে কলকাতায়?

—কেন, কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষ কি সবাই জানোয়ার, আর একলা তুই-ই মানুষ? সব মানুষ যদি একরকমই হবে তো তোরই কি এ পৃথিবীতে বাঁচতে ইচ্ছে করবে?

সুরেন চুপ করে রইলো। কোনও উত্তর দিল না।

সুব্রত আবার বললে—সকলকে নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে রে! এ-পৃথিবী যেমন তোর পৃথিবী, তেমনি তাদেরও তো পৃথিবী!

সুরেন হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু এক-একজন কেন আরাম করে থাকবে, আর এক-একজন কেন কষ্ট পাবে? তাদেরও তো আরাম করবার অধিকার আছে!

—কে? কার কথা বলছিস তুই? তুই কি পূর্ণবাবুর কথা বলছিস? পূর্ণবাবু তোকে এইসব কথা শিখিয়েছে!

—না!

সুব্রত বললে—তবে?

সুরেন সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কিন্তু তুই যে-দেশে যাচ্ছিস, সেখানে কি সব লোকই আরাম করছে? সেখানেও তো কষ্ট-পাওয়া লোক আছে—

সুব্রত বললে—সে যখন সেখানে যাবো তখন দেখতে পাবো—

সুরেন বললে—কিন্তু সেখানে না গিয়েও সেখানকার লোকের লেখা বই পড়েই তো আমি সব জেনে গেছি—

—কী জেনে গেছিস?

সুরেন বললে—সেখানেও অনেক মানুষের সুখ নেই—

সুব্রত বললে—সুখের কথা আলাদা! আমার বাবা তো বড়লোক. আমরা বড়লোকের সন্তান। বাবার টাকার শেষ নেই, তার ওপর আমার বাবা মিনিস্টার, আমার বাবাই কি সুখে আছে. না আমরাই সুখে আছি?

সুরেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সুব্রতর মুখের দিকে!

তারপর খানিক থেমে বললে—তোদের আবার কীসের কষ্ট?

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে—তুই আমাদের কতটুকু জানিস?

—তার মানে?

সুব্রত পর্মিলির দিকে চাইলে! বললে—দেখছিস পর্মিলি, আমাদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের কী ধারণা? আরে, তুই যদি আমাদের ভেতরের কথা জানতিস, তাহলে তোরও মন খারাপ হয়ে যেত—

সুরেন বুঝতে পারলে, ও-সব ব্যাপার নিয়ে আর বেশি কথা বাড়ানো ভাল নয়। আরো বুঝতে পারলে যে, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায় সেটাই সবটুকু নয়।

সুব্রত হঠাৎ হেসে উঠলো। বললে—মিছিমিছি মন খারাপ করে বেড়াসনি। তোর বাড়িতে কোন্ এক বুড়োবাবুকে দেখে তোর কষ্ট হয়, তোর বাড়িতে কোন্ এক সুখদা না কে. তার জন্যেও তোর দুঃখ হয়, এ-রকম মন নিয়ে কি পৃথিবীতে বাঁচা যায়?

—সুখদা? সুখদা তোমার কে?

সুরেনের হয়ে সুব্রতই জবাব দিলে। বললে—সে ওর সাত-কুলের কেউ না, তবু তার জন্যেই ওর মাথাব্যথা।

—তার মানে? তুমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলে নাকি?

এবারও সুরেনের হয়ে সুব্রত জবাব দিলে। বললে—আরে না। সে মেয়েটা একটা ছেলের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে. তার জন্যে সুরেনের যত দুঃখ—

পর্মিলি এবার সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে—কেন, পালিয়ে গেছে কেন?

সুব্রত বললে—প্রেম করলে সুরেনের সঙ্গে, আর পালিয়ে যাবার বেলায় গেল অন্য ছেলের সঙ্গে, ওই রকমই তো হয়।

সুরেন প্রতিবাদ করে উঠলো। পর্মিলির দিকে চেয়ে বললে—না না. তুমি বিশ্বাস কোর না. আমি কারোর সঙ্গে প্রেম করিনি। ডাহা মিথ্যে কথা। সে আমার বোনের মত! আর তা ছাড়া সে আমাকে ভালো-চোখেও দেখতো না, আমাকে দিনরাত খোঁটা দিত—

—খোঁটা দিত মানে?

সুরেন বললে—সে আমাকে ও-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইতো। সে চাইতো না যে আমি ও-বাড়িতে থাকি।

—কেন?

সুরেন বললে—সে অনেক কথা। সে-কথা বলতে অনেক সময় লাগবে—

পর্মিলি বললে—বলো না, শুনি—

সুব্রত বাধা দিয়ে বললে—আরে না পর্মিলি. তা নয়, একদিন সে সুরেনের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল—

সুরেন বলতে গেল—না. মিথ্যে কথা ; তা নয়—

কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে এয়ার-পোর্টে এসে গেছে। এয়ার-পোর্টের লাল-লাল আলোগুলো চোখের সামনে জ্বলছে।

রাত্রের এয়ার-পোর্টের এমন একটা শক্তি আছে যা সহজে সকলকে এক মুহূর্তে একাকার করে দেয়। সবাই আলাদা আলাদা, আবার সবাই-ই একক। সকলে মিলে যেন একটা অখণ্ড মানুষ হয়ে একটা ছাদের তলায় জড়ো হয়েছে। সবাই দূরের যাত্রী। সবাই একটা অনিশ্চিত রোমাঞ্চের ছোঁয়া লেগে নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে।

সুব্রত যখন ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন সুরেন আর পর্মিলির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার অন্য ভাবনা, অন্য দায়িত্ব। সুরেন আর পর্মিলির কথা যেন তার আর ভাববার দরকার নেই। আমি চললাম, আর তোমরা রইলে। আমার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তোমাদের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার আর কোনও যোগ রইলো না। এবার তোমাদের আমাকে ভুলে যাবার পালা।

—এখানে বোস।

এতক্ষণে যেন সুরেনের সংবিৎ ফিরে এল। একটা গদি-আঁটা সোফার ওপর বসে পড়েছে পর্মিলি। বব্ করা চুলগুলো ঝাঁকানি দিয়ে নেড়ে নিয়ে নিজের হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কী বার করছে। তারপর অনেক চেষ্টার পর একটা লিপস্টিক্ বার করলে। সেটা নিয়ে ঠোঁটে বুলোতে লাগলো, আর ব্যাগে আঁটা আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগলো।

—কই, বসলে না? সুব্রতর আসতে এখন দেরি আছে।

সুরেন বসে পড়লো। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—কিন্তু প্লেন ছাড়তে তো আর বেশি টাইম নেই. সাড়ে দশটা বাজতে তো আর কুড়ি মিনিট মাত্র বাকি--

—প্লেন কি সব সময়ে ঠিক টাইমে ছাড়ে?

সুরেন আর কি বলবে! বলবার কিছু খুঁজে পেল না।

হঠাৎ এক সময়ে পর্মিলি বললে—সুখদা কে?

সুরেন কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল। এখনও মনে করে রেখেছে নাকি কথাটা।

পর্মিলি আবার বললে—তোমার নিজের কেউ হয়?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—সুখদার কথা জেনে তোমার কি লাভ?

পর্মিলি বললে—লাভ আর কী. কিছুই লাভ নেই। কিন্তু তোমাকে দেখলে বোঝার কোনও উপায় নেই যে পেটে পেটে তোমার এত রস!

সুরেন বললে—আমার কিন্তু সত্যিই কোনও দোষ ছিল না—

—বা রে, আমি কি তাই বলেছি না কি? চুমু খাওয়া কি দোষের?

সুরেন চমকে উঠলো। বললে—সুব্রতর কথাটাই তুমি বিশ্বাস করলে? অথচ জীবনে কেউ আমাকে ভালবাসেনি, আমিও কাউকে ভালবাসিনি—

পর্মিলি হাসতে লাগলো। বললে—কে ওসব কথা তোমায় জিজ্ঞেস করেছে?

সুরেন বললে—না, তুমি হয়তো ভাবছো আমি অন্য ছেলেদের মত—আমি তা মোটেই নই। জানো, আমি যে-বাড়িতে থাকি সেখানেও আমার আপন বলতে কেউ নেই—

—কেন, তোমার মামা?

সুরেন বললে—মামাও আমার আপন নয়—

—তার মানে? তোমার মামা নিজের মামা নয়?

সুরেন বললে—না, নিজেরই মামা বটে, কিন্তু মামাও নিজের স্বার্থের কথাই বেশি ভাবে, আমার ভাল-মন্দের কথা বেশি ভাবে না—

—কেন, তোমার মামার তো আর কেউ নেই!

সুরেন বললে—নিজের কেউ নেই বলেই আমাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে, নিয়ে এসে আমার লেখাপড়ার খরচ যোগাচ্ছে। আসলে মামা চায় চৌধুরীদের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গ্রাস করাতে—

—তোমাকে দিয়ে? কী রকম করে?

সুরেন বললে—সে অনেক কথা, সে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, এখানে এইটুকু সময়ে বলা যাবে না—আর তো মাত্র কুড়ি মিনিট আছে—

পর্মিলি বললে—না না, বলো শুনি, ভেরি ইণ্টারেস্টিং তো—

—কিন্তু সে শুনতে কি তোমার ভাল লাগবে? আমাদের মত গরীব লোকদের কথা তোমার শুনতে খারাপ লাগবে। আর তা ছাড়া—

পর্মিলি বললে—তাছাড়া কী? থামলে কেন, বলো?

সুরেন বললে—তাছাড়া, সে-সব কথা তুমি বুঝবেও না—

পর্মিলি বললে—খুব বুঝবো, এমন কিছু শক্ত সাবজেক্ট নয় সেটা—বলো।

সুরেন চেয়ে দেখলে পর্মিলির দিকে। পর্মিলি যেন সহানুভূতিতে নরম হয়ে এসেছে খুব। চারদিকে যাত্রীদের ভিড়। মাঝে মাঝে লাউড স্পীকারের অস্পষ্ট ঘোষণা। রাত হয়ে গেছে অনেক। হয়তো মামা জানতেও পারছে না, সে এখানে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, মা-মণির কাছ থেকে যে-স্নেহ পেয়ে সে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল, এই পর্মিলির কাছেও, এই পর্মিলির গলার সুরেও যেন সেই স্নেহের আমেজ।

শুনতে শুনতে পর্মিলি হঠাৎ বললে—তারপর?

সুরেন বললে—তারপর আর তাকে পাওয়া গেল না—

—পাওয়া গেল না মানে?

সুরেন বললে—মানে তাকে সরাবার জন্যেই আমার মামা সেই লোকটাকে টাকা দেয়।

—তা সুখদাকে সরিয়ে দিয়ে তোমার মামার লাভ কী?

সুরেন বললে—মা-মণির অত সম্পত্তি সব নিজে গ্রাস করবে বলে!

—কিন্তু মামা অত সম্পত্তি কার জন্যে গ্রাস করবে? কে আছে তোমার মামার?

সুরেন বললে—কেন? মামা আছে, আমি আছি—

পমিলি বললে—তাহলে তুমি আপত্তি করছো কেন? তোমারই তো লাভ হবে তাতে?

সুরেন বললে—কিন্তু আমি মনে করি সেটা অন্যায়। অন্যায় ভাবে অন্য লোকের সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া কি ভালো? আসলে তো ও-সম্পত্তি সুখদারই পাওয়া উচিত। সুখদাই ছোটবেলা থেকে ও-বাড়িতে মানুষ হয়েছে, মা-মণি সুখদাকে ছোটবেলা থেকে নিজের মেয়ের মত করে মানুষ করেছে—

—কিন্তু ধরো, এখন যদি তোমার মা-মণি হঠাৎ মারা যায়, তখন ও-সব কে পাবে?

সুরেন বললে—অত সব আমি ভেবে দেখিনি।

পমিলি বললে—তাহলে তুমি যদি সবই জানো তাহলে মা-মণিকে সব বলে দিলেই পারো—

সুরেন বললে—তা তো পারি, তাহলে মা-মণি যদি সব শুনে মামাকে তাড়িয়ে দেয়, তখন কোথায় যাবো আমি? তাহলে যে আমার কলকাতায় থাকা বন্ধ হয়ে যাবে, আমার লেখাপড়ার খরচ কে দেবে?

পমিলি বললে—আমরা দেবো—

—তোমরা? তোমরা মানে?

পমিলি বললে—আমরা মানে আমি।

—তুমি? তুমি দেবে?

পমিলি বললে—কেন, আমি দিতে পারি না?

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি কেন দিতে যাবে? আর তোমার কাছ থেকে আমি কোনও সাহায্য নিতে যাবোই বা কেন? তুমি আমার কে?

পমিলি হাসতে লাগলো আবার। বললে—কেন, কারো চ্যারিটি নিলে তোমার আত্মসম্মানে বাধবে? তা যদি বাধে তো ধার হিসেবেই নিও! যখন তোমার সামর্থ্য হবে তখন না-হয় ফেরত দিও—

সুরেন অবাক হয়ে গেল পমিলির কথা শুনে। এ-রকম কথা পমিলির মুখ থেকে শুনবে তা তো সে আশা করতে পারেনি। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সে পমিলির মুখের দিকে।

পমিলি বললে—অমন করে আমার দিকে চেয়ে দেখছ কী?

সুরেন বললে—সত্যিই তুমি দেবে?

পমিলি বললে—সত্যি না তো মিথ্যে? মাসে মাসে ক'টা টাকা দিতে আমার কী? আমি তো কত টাকাই মাসে-মাসে বাজে খরচে ওড়াই। আর তার জন্যে আমায় কাউকে কৈফিয়তও দিতে হবে না—

সুরেন অভিভূতের মতো চেয়ে রইলো পমিলির দিকে। পুরুষ-মানুষ হলে পমিলির হাত দুটো সে কৃতজ্ঞতায় জড়িয়ে ধরতো। কিন্তু পমিলি কী ভাববে তাই ভেবে সে চুপ করে রইলো।

পরে বললে—আচ্ছা, কেন তুমি দিতে যাবে? তোমার কীসের স্বার্থ আমাকে টাকা দেওয়ায়? আমাকে সাহায্য করায়?

পমিলি বললে—আরে, এ তো মহা মুশকিল, লোকে পরকে টাকা ধার দেয় না?

সুরেন বললে—সত্যিই, আর কিছু নয়?

পমিলি বললে—আর কী হতে যাবে? তুমি ভেবেছ আমি তোমাকে

ভালবেসে ফেলেছি? দূর, আমি ভালো-কালো বাসি না কাউকে। ও-সব আমার আসে না। তুমি তাই করো। তুমি মা-মণিকে গিয়ে সব বলে দাও, তুমি যা কিছু জেনেছ, যা-কিছু শুনেছ সব বলে দাও—

সুরেন তখনও অন্যমনস্ক হয়ে আছে। যেন তার কানে তখনও কোনও কথা যাচ্ছে না। সে যেন পমিলির পাশে বসে অন্য এক রাজ্যে চলে গেছে।

হঠাৎ সুরেন পমিলির আরো কাছে ঘে'ষে বসলো।

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছিল তা আর বলা হলো না। হঠাৎ সুব্রত হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। হাঁফাচ্ছে তখন সে।

বললে—মহা মুশকিল হয়েছে, ইমিগ্রেশন-অফিসাররা জ্বালিয়ে খেলে একেবারে। খালি সন্দেহ করে, ভাবে আমি বুঝি স্পাই, কেবল আমার ফটোর সঙ্গে আমার মুখের চেহারা মিলিয়ে দেখে—

পমিলি বললে—কাস্টমস্-এর ঝামেলা মিটেছে তোর?

সুব্রত বললে—এইবার মিটবে—সুটকেস্ একেবারে তছনছ করে ফেলেছে, আবার সব নতুন করে গুছিয়ে রেখে এলাম—

সুরেন বললে—আর কত দেরি?

সুব্রত বললে—প্লেন একটার আগে আর ছাড়ছে না। তোর দেরি হয়ে যাবে, তোরা বরং দু'জনে চলে যা—ড্রাইভারকেও আটকে রেখেছি—

সুরেন পমিলির মুখের দিকে চাইলে।

পমিলি বললে—তাহলে বাবাকে একটা বরং টেলিফোন করে দিই, বাবা হয়তো দেরি হলে ভাববে—

সুব্রত বললে—বাবা কি আর এখন বাড়িতে আছে? কংগ্রেস-ভবনের মীটিং করছে হয়তো—

পমিলি বললে—তাহলে তুই থাক, আমরা চলি, গিয়ে একটা চিঠি ড্রপ্ করে দিস্ তুই—

সুব্রত বললে—তাহলে সুরেনকে তুই ওর বাড়িতে নামিয়ে দিস—

এয়ার-পোর্ট থেকে গাড়িটা যখন দমদমের রাস্তায় পড়লো তখন বেশ রাত হয়েছে। পেছনে পাশাপাশি দু'জনে বসে ছিল। গাড়িটা চলছে, কিন্তু সুরেনের মনটা কেবল একটা জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। কেবল মনে হচ্ছিল, কোথাও যেন একটা কাঁটা বি'ধে আছে মনের খাঁজে। ভাবতে গেলেই কাঁটাটা খচ্ খচ করে বি'ধছে।

পমিলি হঠাৎ বললে—সুব্রতর জন্যে তোমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে বুঝি?

হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে আবার বাস্তব জগতে ফিরে এল সুরেন। বললে—না হ্যাঁ—

তারপর ভাল করে সামলে নিয়ে বললে—অনেকদিন এক সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়েছি তো, তাই। এতকাল মেলামেশা যা-কিছু করেছি সবই তো সুব্রতর সঙ্গেই। সুব্রত চলে গেলে একটু একটু ফাঁকা তো লাগবেই।

—তোমার আর কোনও বন্ধু নেই?

সুরেন বললে—আর একজন আছে। সে সুব্রতকে পছন্দ করে না। আমি যে সুব্রতর সঙ্গে মেলামেশা করি সেটাও সে চায় না।

—কে সে?

সুরেন বললে—তার নাম দেবেশ—সে কমিউনিস্ট—

—কমিউনিস্ট মানে?

সুরেন অবাক হয়ে গেল—বললে—কমিউনিস্ট মানে জানো না? আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো? বড়লোকদের দেখতে পারে না। তোমরা বড়লোক বলে সে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না। আমি তোমাদের বাড়ি যাই বলে সে ঠাট্টা করে আমাকে।

—ঠাট্টা করে কেন? ঠাট্টা করার কি আছে?

সুরেন বললে—তার ধারণা, আমি স্বার্থের জন্যে সুব্রতর সঙ্গে মিশি—বড়লোকদের সঙ্গে মিশলে তো অনেকেরই স্বার্থ-সিদ্ধি হয়! ওদের ধারণা সবাই বুঝি ওদেরই মতন! আমি কিন্তু সত্যি বলছি, কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে মিশি না সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রত আমার সঙ্গে মিশতো বলেই আমি ওর সঙ্গে মিশতুম। আমি তোমাদের বাড়িতে কিছুদিন না গেলে ও নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেত। তুমি ঠিক জানো না, ও আমাকে কত ভালোবাসে।

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো—অথচ আমার সঙ্গে মিশে ওরও কোনও স্বার্থই নেই। আমি লেখাপড়াতেও খুব ভাল ছেলে নই যে আমার সঙ্গে মিশে ওর কিছু সুবিধে হবে।

পমিলি বললে—সুব্রত আমার নিজের ভাই বলে বলছি না ও সত্যিই ভালো। আমরা সব সময়ে ঝগড়া করি বটে, কিন্তু আমার ভাইকে তো আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না।

সুরেন বললে—তা তো বটেই—

পমিলি বললে—কিন্তু তোমার যদি কখনও দরকার হয় তো তুমি এসো আমাদের বাড়িতে, এই তোমাকে বলে রাখছি—

সুরেন বললে—আমার আর কীসেরই বা দরকার পড়বে—

পমিলি বললে—কেন, টাকার দরকারও তো পড়তে পারে তোমার—

—টাকা!

কথাটা শুনে যেন কেমন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না সুরেনের। ভাল করে সোজাসুজি চাইলে পমিলির মুখের দিকে। বললে—টাকার দরকার হলে তুমি দেবে?

পমিলি বললে—হ্যাঁ দেবো। এখন তোমার টাকাব দরকার আছে?

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে—টাকার দবকাব কার নেই বলো না! টাকার দরকার তো সকলের। টাকার জন্যেই সবাই দৌড়ঝাঁপ করছে সংসারে। টাকার জন্যে মানুষ এমন কাজ নেই যা করতে পারে না।

—তার মানে?

সুরেন বললে—সব কথা তোমাকে বলা যায় না! নইলে শুনে তুমি অবাক হয়ে যেতে!

—বলো না, বলতে দোষ কি?

সুরেন বললে—আমার নিজের মামার ব্যাপার। নিজের মামা হলে কী হবে, তার যে ব্যবহার আমি দেখেছি তা আমারই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সেইটে শোনার পর থেকে আমার নিজের ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছে, জানো—আমার নিজেকেও আর বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। আমরা সত্যিই দিন-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছি, সমস্ত জাতটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে—

পমিলি বললে—ও-সব থাক, তোমার মামার ব্যাপারটা বলো—

সুরেন বললে—সে-সব না-ই বা শুনলে!

—না, তবু বলো শুনি!

সুরেন বললে—অত যখন পীড়াপীড়ি করছো, তা হলে বলি—আমার মামা যে-কাজ করছে তা পশুতেও করে না। আমার মামা টাকার লোভে একটা মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে!

—মেয়ে বিক্রি করে দিয়েছে? নিজের মেয়ে?

সুরেন বললে—নিজের মেয়ে না-ই বা হলো, কিন্তু মেয়ে তো! তার বাপ-মা থাক আর না-ই থাক, তারও তো প্রাণ বলে একটা জিনিস আছে!

—মেয়েটা কে? নাম কী? সুখদা? যার কথা তুমি বলছিলে?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। নামটা তখনও মনে করে রেখে দিয়েছে পমিলি।

বললে—তুমি তো দেখছি, ঠিক মনে করে রেখে দিয়েছো? তুমি হলে কারো এমন সর্বনাশ করতে পারতে?

কথা বলতে বলতে সুরেনের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ রাস্তার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলো।

বললে—এ কী? এ যে মাধব কুণ্ডু লেন ছাড়িয়ে চলে এসেছি—আমাকে এখানে নামিয়ে দাও—নামিয়ে দাও—

সত্যিই তখন একেবারে সুব্রতদের সুকীয়া স্ট্রীটের বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে প্রায়। সুরেন বললে—কথা বলতে বলতে আমার মোটে খেয়াল ছিল না।

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। সুরেন গাড়ির দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু পমিলি বললে—নামছো কেন, তোমাকে তোমার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—অনেক রাত হয়েছে, যাবে কী করে?

সুরেন বললে—এইটুকু রাস্তা আমি বেশ চলে যেতে পারবো। তোমায় ভাবতে হবে না।

পমিলি বললে—না না, তা হয় না। গাড়ি যখন রয়েছে তখন কেন মিছিমিছি হাঁটতে যাবে এতটা রাস্তা!

—তা হোক্—বলে সুরেন নেমেই পড়লো রাস্তায়।

পমিলি বললে—না ওঠো, এত রাত্তিরে তোমায় আমি হেঁটে যেতে দেবো না। ওঠো, গাড়িতে ওঠো—

সুরেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বললে—তুমি কেন পীড়াপীড়ি করছো, আমি তো বলেছি আমার কোন কষ্ট হবে না। আমি একটা রিক্সা করে না হয় চলে যাবো'খন—

পমিলি বললে—ছেলেমানুষি কোর না। যা বলছি করো, ওঠো গাড়িতে—

পমিলির গলায় যেন আদেশের সুর বেজে উঠলো। সুরেন আর দ্বিধা করতে পারলে না। আবার গাড়িতে উঠলো। উঠতেই গাড়িটা আবার চলতে লাগলো উত্তরমুখো।

সুরেন বললে—তোমার মিছিমিছি দেরি হয়ে গেল আমার জন্যে!

পার্মিলি বললে—হোক দেরি, এটুকু দেরিতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কলকাতা সহরে আজকাল রাত্তির বেলা নিরাপদ নয়—

সুরেনের কেমন ভালো লাগলো পর্মিলির এই ব্যবহারটা। সুব্রতর কথা আলাদা। সে না হয় তার বন্ধু। কিন্তু পর্মিলি তার কে! তাদের সঙ্গে তার অবস্থার আকাশ-পাতাল প্রভেদ! তবে কেন এতখানি স্নেহ তার মত এক দুস্থ ছেলের জন্যে!

—তোমার গল্পটা কিন্তু আর একদিন শুনবো!

—কোন্ গল্পটা? সুখদার গল্প?

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ। সুব্রতর মুখে জেনেছিলাম আগে। তখনই ভাল লেগেছিল! হিতসাধিনী-ব্রত করার গল্প, তোমাকে একদিন জোর করে ধরে চুমু খাওয়ার গল্প—

সুরেন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে রইলো কথাটা শুনে।

পর্মিলি আবার বললে—তোমার জীবনে দেখছি বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক রকম!

সুরেন বললে—বলবো সব একদিন। কিন্তু তুমি যেন আর কাউকে ওসব বোল না। কারণ সুব্রত ছাড়া আর কেউ ও-সব জানে না. ওকেই সব বিশ্বাস করে বলতুম। ও চলে গেল, এখন আর কথা বলবার কেউ রইলো না—

গাড়িটা ততক্ষণে মাধব কুণ্ডু লেনের মোড়ে এসে পড়েছিল।

সুরেন বললে—এইখানেই আমি নেমে যাই—

পর্মিলি বললে—কোন বাড়িটা?

সুরেন বললে—এই গলিটার ভেতরেই আমাদের বাড়িটা—আমি এটুকু হেঁটে যেতে পারবো—

পর্মিলি বললে—না, তা কেন, একেবারে তোমাদের বাড়ির সামনেই তোমাকে পৌঁছিয়ে দিক—

অগত্যা. তাই হলো, পর্মিলি ড্রাইভারকে গলির ভেতরে গাড়িটা ঢোকাতে বললে। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি চারদিক। বহুকালের পুরনো বনেদী পাড়া এ-অঞ্চলের, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। যেটুকু আলো আছে রাস্তায় তা ল্যাম্প-পোস্টের। গাড়িটা তারই আলোয় পথ ঠিক করে চড়া হেডলাইট জ্বালিয়ে এঁকেবেঁকে সামনের দিকে চলতে লাগলো।

চৌধুরী-বাড়ির সদরের উঠোনে কিন্তু তখন বেশ হৈ-চৈ বেঁধে গেছে কিছু আগে থেকেই!

নরেশ দত্ত বেশ বনেদী হতচ্ছাড়া। ঠিক সেই দিনেই যে সে আসবে তা কে জানতো? মদের পয়সার টান পড়লেই তার টনক নড়ে। যখন আর কোথাও পয়সার সন্ধান পায় না, তখন আসে ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে।

ভূপতি ভাদুড়ী রোজকার মত সেদিনও কাজ-কর্ম সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাইরে বাহাদুর সিং-এর হাঁক-ডাক শুনেই জেগে উঠলো।

—কে?

নরেশ দত্ত জবাব দিলে—আমি নরেশ দত্ত, ম্যানেজার—নরেশ দত্ত—

ঘরের ভেতর থেকেই ভূপতি ভাদুড়ী জাবাব দিলে—আজ রাত্তিরে আর দেখা হবে না, কাল এসো, কাল সকালে।

সেই উঠোন থেকেই নরেশ দত্ত চিৎকার করে উঠলো—আজই দরকার ম্যানেজার, বড় ঠ্যাকায় পড়ে এসেছি, একবার দরজাটা খোল. একটা জরুরী দরকার আছে—

বাহাদুর সিং তখন গেট খুলে দিয়ে অপরাধীর মত একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সেও নরেশ দত্তর সামনে এগিয়ে এল। বললে—হুজুর, আপ্ চলা যাইয়ে—

নরেশ দত্ত তখন খেপে আছে। বললে—আরে বাবা, তুমি অত খেপছো কেন? তোমার কী? তুমি তো হুকুমের চাকর! চেনো আমি কে? আমি নরেশ দত্ত, শ্যামবাজারের দত্তবাড়ির ছেলে, তা জানো?

নেশার জিনিস সময় মত না পেলে যে-কোনও ভদ্রলোকের মেজাজই বিগড়ে যায়, তা নরেশ দত্ত তো কোন্ ছার।

ভূপতি ভাদুড়ী হন্তদন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বললে—কী হলো? ঝগড়া কীসের? কী হয়েছে, কী?

—এ্যাই যে ম্যানেজার, এই দ্যাখ না মাইরী, তোমার দারোয়ান ব্যাটা কী-রকম হয়রানি করছে। ব্যাটা গেটই খুলতে চায় না—কেন, আমি চোর না ডাকাত? তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তো ম্যানেজার যে, আমি একটা ভদ্দরলোকের ছেলে, শ্যামবাজারের দত্তবাড়ির বংশধর আমি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তুমি আর আসবার সময় পেলে না? বেছে বেছে এই রাত্তির বেলাতেই আসতে হয়!

নরেশ দত্ত হেসে ফেললে। বললে—তুমি তো নেশা করো না ম্যানেজার, নেশা করলে বুঝতে, নেশার কোনও সময় অসময় নেই!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা কী বলবে বলো। কী বলতে এসেছ?

নরেশ দত্ত একেবারে গলে গেল ভূপতি ভাদুড়ীর কথায়, বললে—আমি আর কী করতে আসবো ম্যানেজার। তোমার সঙ্গে কি আমার আড্ডা দেওয়ার সম্পর্ক যে এত রাত্তিরে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে আড্ডা দেবো! আর এত রাত্তিরে কেউ আড্ডা দেয়?

—তাহলে? তাহলে কী চাও?

নরেশ দত্ত বললে—ওই তোমার দোষ ম্যানেজার ..

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল এবার সত্যি সত্যি। বললে—তোমাকে তো আমি বলেছি যে, আমাকে ম্যানেজার বলে ডাকবে না। এস্টেট-ম্যানেজার বলে ডাকবে। আমি চৌধুরী বাড়ির এস্টেট-ম্যানেজার। তোমাকে তো সে-কথা কতবার বলেছি।

—আচ্ছা আচ্ছা বাবা, এস্টেট ম্যানেজার বললে যদি তুমি খুশী হও তো তোমাকে এস্টেট-ম্যানেজার বলেই ডাকবো। কিন্তু আমাকে কিছু [illegible] হবে যে—

হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ী বেঁকে বসলো। নরেশ দত্তর মুখে যেন কীসের গন্ধ পেলে। বললে—তুমি আবার মদ খেয়েছ?

—মদ? তুমি যে আমাকে অবাক করলে মাইরি! আমি মদ খাই না একথা কোন শালা তোমাকে বলেছে? খাবার মধ্যে আমি তো মদই খাই—ভাত খাই আর না-খাই, মদটাই তো আমি পেট পুরে খাই। যখন হাতের রেস্তো ফুরিয়ে যায় তখনই শুধু তোমার কাছে আসি! টাকা থাকলে কখনও আমি তোমার কাছে এসেছি? বলো, তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো?

এতক্ষণে গোলমাল শুনে কিছু লোক এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে। ভূপতি ভাদুড়ী তাদের দেখে তেড়ে গেল—তোরা কী দেখতে এসেছিস রে এখেনে? কী দেখতে এইচিস? বেরো, বেরো, বেরো এখেন থেকে—

দুখমোচন, আর দুখমোচনের ছেলে অর্জুন, তারাও নিজেদের আস্তানা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। রান্না-বাড়ির ঠাকুরই সব চেয়ে শেষে খাওয়া-দাওয়া করে। তার খেয়ে-দেয়ে শুতে রোজ রাত বারোটা বাজে। সেদিন তখনও শুয়ে পড়েনি। আর বুড়োবাবু! বুড়োবাবুর রাত্রিতে এমিনিতে ঘুমই আসে না। আওয়াজটা বুড়োবাবুর কানেও গিয়েছিল। সদর-গেটের দিক থেকে শব্দটা এসে ভেতর-বাড়িতেও পৌঁচেছিল।

বুড়োবাবু খোঁড়াতে খোড়াঁতে এসে হাজির হয়ে দেখলে, বেশ ভিড় জমে গেছে উঠোনে। অন্ধ মানুষ, চোখে ভাল দেখতে পায় না। তবু ভূপতি ভাদুড়ীর গলা শুনতে পেলে।

বললে—ও রে, কী হয়েছে রে এখানে? কে কাকে বকছে?

ঠাকুর বললে—বুড়োবাবু, আপনি কেন এখানে এলেন? চোখে দেখতে পান না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন যে।

—তুমি থামো। আমি জিজ্ঞেস করছি এক কথা, আর তুমি বলছো আর-এক কথা। বলি হয়েছে কী, তা তো বলবি তোরা?

দুখমোচন মুশকিল আসান করে দিলে। বললে—ম্যানেজারবাবু রাগারাগি করছেন, আপনি কেন ঝামেলা করতে এখেনে এসেছেন বুড়োবাবু!

বুড়োবাবু বললে—কী হয়েছে তাই তোরা বল্ না।

ঠাকুর বললে—কী হয়েছে তা জেনে আপনার লাভ কী? আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমোনগে যান্ না—

—আরে বুড়োমানুষের কি অত সহজে ঘুম আসে! আওয়াজের চোটে ঘুমই এল না বলে!

বাহাদুর সিং এত সব কাণ্ড কিছু বুঝতে পারছিল না। নরেশ দত্ত লোকটাকে সে আগেও দেখেছে। আগে যখন লোকটা আসতো তখন ধুতি-কুর্তা বেশ ফিটফাট ছিল। লোকটা ট্যাক্সি করে এসে নামতো। বাহাদুর সিং গেট খুলে দিয়ে সেলাম বাজাতো। কিন্তু দিনে দিনে কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগলো বাবুর চেহারা। ধুতি-কুর্তা ময়লা হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

একদিন ম্যানেজারবাবু বাহাদুর সিংকে ডেকে বলে দিয়েছিল—দেখ বাহাদুর সিং এই বাবুটা এলে আর ভেতরে ঢুকতে দেবে না!

বাহাদুর সিং তখনই বুঝেছিল এ লোকটা সাঁচ্চা বাবু নয়। ঝুটো। তখন থেকেই লোকটাকে দেখলে বলতো—নেহি সাব, ম্যানেজারসে মোলাকাত্ নেহি হোগা—

কিন্তু নরেশ দত্তও নাছোড়বান্দা। দু'একবার দেখা না হওয়ায় ফিরে গেছে বটে, কিন্তু হতাশ হয়নি ঘার ফির আবার এসেছে। আবার ম্যানেজারবাবুকে

বিরক্ত করেছে। আবার কাকুতি-মিনতি করে কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

প্রত্যেকবার ভূপতি ভাদুড়ী বলেছে—এইবার শেষবার কিন্তু নরেশ, আর কিন্তু কিছু পাবে না, তা বলে রাখছি—

নরেশ দত্ত প্রত্যেকবারই খুশী হয়ে বলেছে—আরে হ্যাঁ ম্যানেজার, এইবারই শেষবার, আর কোন্ শালা তোমার কাছে আসছে—একবার হাইকোর্টের রায়টা বেরিয়ে যাক, তখন টাকার পাহাড়ের ওপর আয়েস করে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাবো—

ভূপতি ভাদুড়ী বলেছে—হাইকোর্টের রায়ও বেরিয়েছে, আর তুমিও টাকা পেয়েছ!

নরেশ দত্ত রেগে বলেছে—কী যে বলছো তুমি ম্যানেজার, হাইকোর্টে যদি না জিতি তো সুপ্রীম-কোর্ট আছে না!

ভূপতি ভাদুড়ী বলেছে—আছে তো সবই, কিন্তু তোমার নেশা না ছাড়লে কোটি টাকা পেলেও তোমার অভাব ঘুচবে না, তা বলে রাখছি—

নরেশ দত্ত যাবার সময় বলে গেছে—এবার এই বদ নেশা ছেড়ে দেবো ম্যানেজার, এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি—

তা সত্যিই ভূপতি ভাদুড়ীর পা ছুঁতে যেত নরেশ দত্ত, কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ীই তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে বাধা দিত। বলতো—থাক্ থাক্, অত ভক্তি ভাল নয় হে—

নরেশ দত্ত বলতো—না না, আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ. পায়ে হাত দিলে পুণ্যি হয়—

এই রকমই চলছিল এতদিন। এতদিন নরেশ দত্ত এলে দুটো-একটা টাকা দিয়েই নিরস্ত করেছে ভূপতি ভাদুড়ী। প্রত্যেকবারই ভেবেছে নরেশ দত্ত বোধহয় আর আসবে না। বাহাদুর সিং বোধহয় আর তাকে ঢুকতে দেবে না বাড়ির ভেতরে। কিন্তু প্রত্যেকবারই এক অদ্ভুত উপায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে. আর ভূপতি ভাদুড়ীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এইবারই হলো চরম। একেবারে এত রাত্রে কখনও আসেনি নরেশ দত্ত এর আগে। আর এইবারই প্রথম জানাজানি হয়ে গেল।

বুড়োবাবু দেখলে লোকটাকে। অন্ধকারে ভাল করে দেখতে না পেলেও দেখলে। ঠাকুর দেখতে না পেলেও দেখলে। ঠাকুর দেখলে, ধনঞ্জয় দেখলে। দুখমোচন দেখলে। অর্জুন দেখলে। দেখে কিছু বুঝতে পারুক না-পারুক, দেখতে তো পেলে নরেশ দত্তকে।

নরেশ দত্ত সকলকে দেখে যেন জোর পেয়ে গেল। বললে—ওই দ্যাখ ম্যানেজার, সবাই আমাদের দেখছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা দেখলো তো বয়ে গেল আমার। আমি কি ওদের ভয় করি?

নরেশ দত্ত বললে—আমি যদি বলে দিই?

—কী বলে দেবে?

নরেশ দত্ত হাসলো। বললে—তোমার মতলব সব ফাঁস করে দিই?

—আমার কী মতলব?

—তুমি মেয়ে-চুরির কারবার ধরেছ!

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। বললে—বেরোও এখান

থেকে, বেরিয়ে যাও, বদমাস কাঁহিকা, ইয়ার্কি করার জায়গা পাওনি! কালীকান্ত তোমার লোক না আমার লোক? আমি তাকে চিনতাম না সে আমাকে চিনতো? কে চিনিয়ে দিলে কালীকান্তকে? তুমি মনে করেছ পুলিশে ঘাস খায়? তাদের বুদ্ধি নেই? জানো, বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশ ডেকে তোমার হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দিতে পারি? বলতে বলতে ভূপতি ভাদুড়ী নরেশ দত্তকে একেবারে সদর-গেটের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল।

নরেশ দত্ত বললে—রাগ করছো কেন মাইরি ম্যানেজার—

তারপর পেছনের চাকর-বাকরদের দিকে তেড়ে গেল—এ্যাই, তোরা এখানে কী দেখছিস রে? তোদের কাজকম্ম নেই? এখানে হাঁ করে কী দেখছিস? যা, বেরো, বেরিয়ে যা সব—সব চাকরি খেয়ে দেবো তোদের—যা, বাড়ির ভেতরে যা—

সবাই তাড়া খেয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিকে গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াতেই সবাই অবাক হয়ে গেছে। এত রাত্রে আবার চৌধুরী বাড়ির সামনে গাড়ি এল কার?

ভূপতি ভাদুড়ীও অবাক হয়ে গেছে।

নরেশ দত্ত এতক্ষণে যেন একটু সাহস পেলে। জানুক, সবাই জানুক তার কথা! সবাই দেখুক ম্যানেজারের নেমকহারামী! সেও গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে।

বাহাদুর সিং এগিয়ে গেল গেট খুলতে।

ভূপতি ভাদুড়ী তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে চিনতে না পেরে বললে—কে রে গাড়িতে? গাড়িতে কে এল?

বাহাদুর সিং চিনতে পেরেছে। ভাগ্নেবাবু গাড়ি থেকে নামছিল। কিন্তু গাড়ির ভেতরে একজন জেনানা বসে আছে!

ভূপতি ভাদুড়ী আর একবার জিজ্ঞেস করলে—কে বাহাদুর সিং? গাড়িতে কে?

বাহাদুর সিং বললে—ভাগ্নেবাবু ঔর এক জেনানা হুজুর—

—জেনানা?

জেনানা শুনেই সবাই চমকে উঠেছে। সবাই উৎসুক হয়ে সেই দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে সত্যি সত্যিই ভাগ্নেবাবু গাড়ি থেকে নামছে আর গাড়ির ভেতরে একজন কমবয়েসী মেয়েমানুষ বসে আছে।

পমিলির অবস্থা তখন বেশ অস্বস্তিকর। এতগুলো লোক তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখছে, এটা তার গায়ে এসে যেন খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল। তারপর এত রাত। এত রাত্রে সুব্রতর বন্ধুর সঙ্গে একলা গাড়ি করে তার বাড়িতে পেঁৗছিয়ে দিতে এসেছে, এটাও তৃতীয় পক্ষের কাছে সন্দেহজনক।

ভূপতি ভাদুড়ী ভাগ্নেকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে সোজা এগিয়ে এসেছিল।

সোজাসুজি সুরেনকে প্রশ্ন করে বসলো—কী রে, তুই এত রাত্তিরে কোত্থেকে?

সুরেন কিছু উত্তর দেবার আগেই ভূপতি ভাদুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলেন—ও কে? গাড়িতে ও কে বসে আছে?

সুরেন আর কী বলবে। তবু বললে—ও পমিলি, সুব্রতর বোন—

বাহাদুর সিং হাঁ করে সব শুনছিল। নরেশ দত্তও অবাক হয়ে পর্মিলির দিকে চেয়ে দেখছিল। পেছনে আর যারা যারা ছিল, সবাই আরও এগিয়ে এসেছিল মজা দেখবার জন্যে।

ভূপতি ভাদুড়ী জিজ্ঞেস করলে—তা এত রাত্তিরে তুই ওর সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলি? তোর পড়াশুনো নেই, যার-তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

সুরেন সে-কথার উত্তর না দিয়ে পর্মিলির দিকে চেয়ে বললে—তুমি যাও এবার—

ভূপতি ভাদুড়ী মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে—কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তুমি আমার ভাগ্নেকে?

সুরেন বললে—সুব্রত আমেরিকায় গেল তাকে এয়ার-পোর্টে তুলে দিতে গিয়েছিলাম—

—তা আমাকে বলে গেলি না কেন? আমি জানি যে, তুই তোর ঘরে ঘুমোচ্ছিস। আমাকে তো বলে যেতে হয়!

বলে পর্মিলির দিকে আবার ফিরলে। বললে—তুমি যাও মা, রাত হয়ে গেছে, এত রাত্তিরে কি সোমত্ত মেয়ের বাইরে থাকা উচিত—

এবার পর্মিলি গাড়ি থেকে নামলো। ঝলমলে শাড়ি আর ঢলঢলে রূপ দেখে ভূপতি ভাদুড়ী দু'পা পিছিয়ে এল।

পর্মিলি ভূপতি ভাদুড়ীর সামনে এসে বললে—আপনি কি সুরেনের মামা?

ভূপতি ভাদুড়ী মেয়েটার সাহস দেখে হকচাকিয়ে গেল।

বললে—হ্যাঁ—

পর্মিলি বললে—আপনার ভাগ্নেটি তো ভালো, আপনি ও-রকম কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী আরও অবাক হয়ে গেল! বললে—ও-রকম মানে? আমি কী-রকম?

পর্মিলি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমার মুখ দিয়ে নিজের গুণপনা না-ই বা শুনলেন, আমি সব জানি- আমি কিন্তু আপনার সব কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিতে পারি—

—কাকে কী বলছো তুমি? আমার কী কীর্তিকলাপ?

সুরেন ভয় পেয়ে গেল। পর্মিলি সত্যি সত্যিই সব বলে দেবে নাকি?

মামার সামনে এগিয়ে এসে বললে—মামা, তুমি চলে এসো—

—কেন, চলে আসবো কেন?

বলে ভূপতি ভাদুড়ী সুরেনের দিকে চাইলে। বললে—তুই আমার নামে নিশ্চয়ই কিছু বলেছিস। বল, তুই কি বলেছিস? আমি কার কী করেছি যে, আমার নামে ও দোষ দেবে? আমি তোকে কলকাতায় এনে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করার এই ফল?

সুরেন সে-কথার উত্তর না দিয়ে পর্মিলির দিকে ফিরে বললে—তুমি চলে যাও পর্মিলি, তোমার রাত হয়ে যাবে!

পর্মিলি হাসতে লাগলো। যেন মজা পেয়েছে খুব।

বললে—আমি তো চলে যাবোই, তবু তোমার মামাকে একবার বাজিয়ে দেখছি—

নরেশ দত্ত এতক্ষণে কাণ্ডকারখানা দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় নষ্ট করেছে সে। তার কাছে সময় বড় দামী জিনিস। নেশার সময় নষ্ট

হলে নেশাখোর মানুষ মাত্রেরই খারাপ লাগে।

বললে—ম্যানেজার, আমার কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদিকে—

—তুমি থামো! দেখছো একটা ঝামেলা চলেছে—বলে ভূপতি ভাদুড়ী ধমক দিয়ে উঠলো নরেশ দত্তকে।

নরেশ দত্ত বললে—তোমার ঝামেলা থাকবেই, তা বলে আমাকে কেন আটকে রেখে দিয়েছ?

বেশি কথা না বাড়িয়ে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি কালকে এসো, এখন আমার কথা বলবার সময় নেই।

নরেশ দত্তও কম নয়, বললে—কালকে আসবো মানে? আজকের নেশার দাম দেবে কে তাহলে? নেশার জিনিস মাগনা কে দেবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বলে উঠলো—তুমি তো আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক হে, বলছি কাল এসো; আর তবু তুমি ঘটঘট করছো?

নরেশ দত্তও গলা চড়িয়ে দিলে।

বললে—তা আমি ঘটঘট করছি না তুমি ঘটঘট করছো? আমাকে টাকা দিয়ে দিলেই তো আমি চলে যাই—আমিও তো কাজের লোক, কাজ বুঝি একা তোমারই, আমার কাজ থাকতে নেই!

—বাহাদুর সিং, বাহাদুর সিং—

বলে চিৎকার করে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী। এপাশ-ওপাশ চেয়ে দেখতে লাগলো বাহাদুর সিং-এর সন্ধানে।

বাহাদুর সিং পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—এই তো বাবু আমি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এই, একে গলা ধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দে তো—যত সব বে-আক্কেলে লোক আসে আমার কাছে। যা দেখতে পারি না তাই হয়েছে—

বাহাদুর সিং নরেশ দত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নরেশ দত্ত দু'পা পেছিয়ে চিৎকার করে উঠেছে—খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবে না. আমি সব ফাঁস করে দেবো, আমায় চেনো না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—থাক. থাক বাহাদুর সিং, গায়ে হাত দিতে হবে না। আমি দেখছি—

বলে নরেশ দত্তকে নিয়ে আড়ালে গিয়ে কী সব ফিসফিস করে বলতে লাগলো। কিন্তু নরেশ দত্তর গলা শোনা যেতে লাগলো।

সে বলতে লাগলো—না না, তা বললে শুনবো না ম্যানেজার, আমি টাকা না পেলে এক পা-ও নড়ছিনে। আবগারি দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমাকে যেমন করে হোক নেশা যোগাড় করতেই হবে, নগদ টাকা না হলে আমি উপোস করবো যে—টাকা না নিয়ে আমি এক পা-ও নড়ছিনে—

সুরেন তখন সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে।

পমিলির কাছে গিয়ে বললে—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রাত হচ্ছে, বাড়ি যাও—

পমিলি সে-কথায় কান না দিয়ে বললে—ওরা কারা?

—কাদের কথা বলছো?

পমিলি বললে—ওই যে উঠোনের ভেতরে দাঁড়িয়ে দেখছে?

সুরেন বললে—ওরা এ-বাড়ির চাকর-বাকর—আর ও-পাশের ওই লোকটা

হচ্ছে বুড়োবাবু, গামছা পরা—

সুরেন আবার বললে—ওর কথা তোমায় পরে বলবো, তুমি এখন যাও—

পমিলি বললে—যাচ্ছি আমি, একটু দেখে নিই তোমাদের বাড়িটা, এই বাড়িতেই তুমি থাকো তাহলে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, কিন্তু সে-কথা পরে তোমাকে বলবো। তুমি এখন চলে যাও! দেখছ সবাই আমাকে সন্দেহ করছে—

পমিলি বললে—তোমাকে সন্দেহ করবে কেন?

সুরেন বললে—সন্দেহ করবে না? এত রাত্তিরে তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে করে বাড়িতে ফিরছি, এতে তো সন্দেহ হবারই কথা—

—কেন? আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরলে দোষ কী?

সুরেন বললে—সে তুমি বুঝবে না। পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবো। তুমি এখন বাড়ি যাও, বলছি বাড়ি চলে যাও—

পমিলি বললে—কিন্তু তার আগে তোমার মামাকে একবার এক্সপোজ করে যাবো না?

সুরেন বললে—না না, তোমার পায়ে পড়ছি পমিলি—তুমি আর থেকো না এখানে, তুমি যাও—

পমিলি বললে—কিন্তু এই অত্যাচার সহ্য করবে তুমি? এই অন্যায় করে যাবে একজন লোক আর সবাই চুপ করে মুখ বুজে থাকবে?

সুরেন বললে—দোহাই তোমার, তুমি যাও, এমন হবে জানলে আমি তোমাকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতাম না। সত্যি বলছি তুমি যাও—

পমিলি বললে—তুমি এত ভীতু কেন? এ-বাড়ি থেকে তোমায় যদি তাড়িয়ে দেয় তো তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে। আমাদের বাড়িতে থাকলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না—

সুরেন পমিলির হাত দুটো ধরে ফেললো। বললে—সত্যি বলছি তুমি যাও পমিলি তুমি আর আমার যন্ত্রণা বাড়িও না—

পমিলি রেগে গেল। বললে—তুমি মেয়েমানুষ নাকি? তোমার সত্যি কথা বলার সাহস নেই? তুমি পুরুষ মানুষ নও?

সুরেন বললে—বলছি তো ও-সব কথার উত্তর এখন দেবো না, এখন দেখতে পাচ্ছ না, সবাই আমাদের দিকে কী-রকম ভাবে চেয়ে দেখছে? তুমি চলে যাও—

ওদিকে হঠাৎ ধনঞ্জয় এসে হাজির হয়েছে।

সে এসে ডাকতে লাগলো—ম্যানেজারবাবু, ও ম্যানেজারবাবু—

ভূপতি ভাদুড়ী এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেলে। নরেশ দত্তকে সামলাতেই তার কাল-ঘাম ছুটে যাচ্ছিল। বললে—কী রে ধনঞ্জয়? কী হলো, ডাকছিস কেন?

ধনঞ্জয় বললে—মা-মণি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—

—মা-মণি? বলিস কী রে? এত রাত্তিরে? এত রাত্তিরে আবার কীসের দরকার পড়লো?

ধনঞ্জয় বললে—কী জানি, গোলমাল শুনে মা-মণির ঘুম ভেঙে গেছে, আমাকে বললেন আপনাকে ডেকে আনতে—

—এ্যাই দেখেছ কাণ্ড! যত গণ্ডগোল বাধালে তুমি!

বলে নরেশ দত্তকেই দোষ দিলে ভূপতি ভাদুড়ী। বললে—তোমার জন্যেই যত গণ্ডগোল। তুমি আর সময় পেলে না, এই রাত দুপুরে এলে ঝামেলা করতে।

তারপর ধনঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বললে—তুই যা ধনঞ্জয়, আমি আসছি—

ধনঞ্জয় বললে—আপনাকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন—চলুন—

—কী জ্বালা!

তারপর ভেতরে যেতে গিয়েই নজরে পড়লো সুরেনের দিকে, পমিলির দিকে। একটা শক্ত কথা মুখ দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিলে। তারপর নজরে পড়লো বুড়োবাবুর দিকে। আর কাউকে না পেয়ে বুড়োবাবুর ওপরেই যত রাগ গিয়ে পড়লো।

বললে—তুমি বুড়ো মানুষ, গামছা পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে কী দেখছো শুনি? যাও, যাও এখান থেকে, যাও—

বলতে বলতে ভূপতি ভাদুড়ী সেই অত রাত্রে অন্দর-মহলের সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ঢুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসতে লাগল।

নরেশ দত্তর মুখ দিয়ে একটা গালাগালি বেরিয়ে গেল।

বললে—দুঃশালা, নেশার নিকুচি করেছে—

বলে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু পেছন থেকে কার ডাক শুনে মুখ ঘোরালো।

বললে—কে?

সুরেন কাছে এগিয়ে গেল। বললে—আপনি কী করতে আসেন এ-বাড়িতে?

নরেশ দত্ত অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, আসতে নেই?

সুরেন বললে—আসতে নেই কেন; আমি বলছি যে আপনি কী-দরকারে আসেন?

নরেশ দত্ত বললে—কিন্তু তুমি কে?

সুরেন বললে—আমি ম্যানেজার মশাই-এর ভাগ্নে। উনি আমার মামা হন—

নরেশ দত্ত বললে—ও, ভাগ্নে যখন তখন তো নরাণাং মাতুলঃ ক্রমঃ। তুমিও দ্বিতীয় ম্যানেজার। তা আমার একটা উপকার করতে পারবে তুমি?

—কী উপকার, বলুন?

নরেশ দত্ত যেন করুণায় বিগলিত হয়ে গিয়ে বললে—পারবে কিনা তাই বলো না বাবা!

সুরেন বললে—চেষ্টা করবো উপকার করতে আপনি বলুন না?

নরেশ দত্ত বললে—আমি খুব বড় ঘরের ছেলে বাবা! কতগুলো টাকা আমার প্রপার্টিতে আটকে গেছে। তুমি যদি আমাকে একটু দয়া করো!

—বলুন, কী ভাবে দয়া করবো?

নরেশ দত্ত বললে—এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, কিছু টাকা আমাকে দিতে পারবে!

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কত?

—এই টাকা দশেক?

সুরেন বললে—অত টাকা তো মামা আমাকে দেয় না, আমার কাছে দুটো টাকা আছে, আমি আপনাকে দিতে পারি।

—তা তাই-ই দাও। দুটো টাকা দুটো টাকাই সই। আজ রাতটা চালিয়ে নেব।

পর্মিলি গাড়ির ভেতরে বসে বসে সবই শুনছিল। এবার হঠাৎ নেমে এল। এসে একেবারে সুরেনের হাতটা চেপে ধরলে।

সুরেন চমকে গেছে। সে তখন টাকাটা পকেট থেকে বার করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাধা পাওয়ায় থমকে গেল। বললে—কী?

পর্মিলি বললে—না, তোমাকে টাকা দিতে হবে না।

নরেশ দত্ত টাকা দুটো নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ এই ব্যাপারে রেগে গেল। বললে—তুমি কে? ম্যানেজারের ভাগ্নে আমাকে টাকা দিচ্ছে তাতে তুমি বাধা দেবার কে?

পর্মিলি বললে—আমি যে-ই হই, টাকা আপনি পাবেন না।—ওকে তুমি টাকা দিও না সুরেন। আমি সব শুনেছি এতক্ষণ! নেশা করবার জন্যে কেন টাকা দেবে?

তারপর নরেশ দত্তর দিকে ফিরে বললে—টাকা আপনি কী করবেন?

নরেশ দত্ত যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—বা রে, এ তো বড় জুলুম দেখছি। ওর টাকা ও দিচ্ছে, তুমি এর মধ্যে কথা বলছো কেন শুনি? এর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

তারপর সুরেনের দিকে ফিরে বললে—এ কে গো? এ তোমার কে হয়?

সুরেন বললে—ও আমার বন্ধুর বোন!

—বাঃ বাঃ বাঃ, বাঃ বাঃ বাঃ—বেশ! বন্ধুর বোন! বেশ সুন্দরী বোন তো?

পর্মিলি আর থাকতে পারলে না। একেবারে ঠাস করে একটা চড় মেরে দিলে নরেশ দত্তর গালে। দুর্বল মানুষ, একটু আঘাত খেয়েই একেবারে টলে গেল। কান্নার মতন একটা শব্দ বেরোল তার মুখ দিয়ে।

বললে—মেরে ফেললে রে বাবা, মেরে ফেললে আমাকে—

সুরেনের ভয় লেগে গেল। মরে যাবে নাকি লোকটা। যদি মরে তো সেও এক বিপদ। তখন পুলিশের হাঙ্গামা হবে। তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। তখন মামাও হয়তো তাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে!

তাড়াতাড়ি লোকটাকে ধরে তুলতে গেল সুরেন। কিন্তু অত বড় লাশ, ধরে তোলাও সহজ ব্যাপার নয়।

তুলতে যেতেই পর্মিলি সুরেনের হাত দুটো আবার ধরে ফেললে।

বললে—ও মরুক, ওর মরে যাওয়াই ভালো—আসল শয়তান একটা—

সুরেন বললে—কিন্তু মামা দেখলে কী ভাববে বলো তো?

পর্মিলি বললে—যে নাকি অত বড় পাপ করতে পারে, তার শাস্তি হওয়াই উচিত—

—কিন্তু যদি আমায় আর বাড়ি ঢুকতে না দেয়?

পর্মিলি বললে—যদি না ঢুকতে দেয় তো তুমি আমাদের বাড়িতেই থাকবে—

—কী যে বলো!

বলে সুরেন লোকটাকে আবার ধরে তুলতে গেল। পর্মিলি জোর করে তার হাত দুটো ধরে টেনে নিলে। বললে—বলছি ওকে তুলো না—

—কিন্তু তা বলে লোকটা রাস্তায় এই রকম করে পড়ে থাকবে?

পর্মিলি বললে—থাক, পড়ে থাক। ওর জন্যে তোমার অত মায়া কেন? যে-লোকটা মেয়ে পাচার করতে পারে, তার ওপর আবার কীসের মায়া-দয়া?

এতক্ষণে বুড়োবাবু কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির। বললে—কী গো ভাগ্নেবাবু, কী হলো এখানে?

জিনিসটা বেশি দূর গড়ায় এটা সুরেন চাইছিল না।

পর্মিলির দিকে চেয়ে বললে—তুমি এবার চলে যাও পর্মিলি, তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে—

পর্মিলি সে-কথায় কান না দিয়ে বললে—ও লোকটা কে, বলো তো?

সুরেন বললে—এরই নাম তো বুড়োবাবু—

—কে বুড়োবাবু?

সুরেন বললে—তোমাকে তো এর কথা বলেছি, বড় কষ্ট বুড়োবাবুর। দেখছো না গামছা পরে আছে। একটা কাপড় পর্যন্ত পায় না। কিন্তু এ-সব কথা পরে হবে, তুমি এখন যাও—

—কিন্তু তুমি আবার কবে আসবে? কবে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

সুরেন বললে—ছুটি পেলেই যাবো।

—কবে তোমার ছুটি?

বুড়োবাবু অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। একবার রাস্তার ওপর পড়ে থাকা নরেশ দত্তর দিকে দেখছিল, আর একবার ওদের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছিল না এ-সব কী হচ্ছে? এ বাড়িতে আসার পর থেকেই যেন তার সবকিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। এ-বাড়িতে আসার আগের ইতিহাসটা এখন স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু যেদিন থেকে এখানে এসেছে...এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে, সেদিন থেকেই মনে হয়েছে সংসার বড় কঠিন। এ সংসারে জোর করে খেতে না চাইলে কেউ খেতে দেয় না, জোর করে না চাইলে পরনের গামছাটুকুও কেউ দেয় না। কিন্তু সেই জটিলতার মধ্যেও বুড়োবাবু যেন কোথায় সেই জট ছাড়াবার সূত্র সন্ধান করতে চেষ্টা করতো।

—তুমি কে? কী করতে এসেছিলে গো এত রাত্তিরে?

নরেশ দত্ত বোধহয় বুড়োবাবুর গলার আওয়াজে একটু সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়েছিল।

সেই ভাবে শুয়ে শুয়েই বললে—আমার হাতটা একটু ধরো তো গো, আমি উঠে দাঁড়াই—

বুড়োবাবু নিজের একটা হাত নরেশ দত্তর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

সুরেন পর্মিলির দিকে চেয়ে বললে—তুমি আর মিছিমিছি কেন কষ্ট করছো এত? তুমি যাও—

পর্মিলি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। মুখ ঘুরিয়ে বললে—তুমি এই বাড়ির মধ্যে থাকো কী করে?

সুরেন বললে—প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম যে এ-বাড়িতে বোধহয় বেশিদিন থাকলে পাগল হয়ে যাবো—

পর্মিলি গাড়িতে বসে বললে—সত্যিই পাগল হয়ে যাবে!

সুরেন বললে—তাও তো তুমি সবটা দেখতে পেলে না—

পর্মিলি বললে—যতটুকু দেখেছি আর যতটুকু তোমার মুখ থেকে শুনছি,

তাতেই বাকিটা বুঝে নিয়েছি—

সুরেন বললে—কিন্তু সত্যিই বলো তো, এ-বাড়িটা কি কলকাতা থেকে আলাদা?

—তার মানে?

সুরেন বললে—এখন তো আরো অনেক বছর কাটলো এই কলকাতায়, এই কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখলাম এই ক'বছরে, অনেক সময়ে তো কলকাতাতেই থাকতে ইচ্ছে করে না।

পর্মিলি ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বললে—চলো, বাড়ির দিকে চলো—

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—একটু রিয়ালিস্ট্ হও, সংসারে আইডিয়ালিস্ট্ হলে চলে না—

—কিন্তু পর্মিলি...

—কী?

সুরেন বলতে গিয়েও বোধহয় থেমে গিয়েছিল। তারপর বললে—আই-ডিয়ালিস্ট হলে কি তোমাদের বাড়িতেই আমি কখনও যেতুম? তোমাদের বাড়িটাও তো রিয়ালিটির চরম!

পর্মিলি অন্ধকারের মধ্যেই যেন একটু হাসলো। শ্লেষের হাসি।

বললে—ঠিক আছে, আজ কথা শেষ হলো না। পরে তোমাকে এর উত্তর দেবো—বলতেই গাড়িটা ছেড়ে দিলে। মাধব কুণ্ডু লেন পেরিয়ে যখন গাড়িটা একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো তখনও খানিকক্ষণের জন্যে সুরেন সেই এক ভাবেই সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

এত রাত্রে মা-মণি কখনও ভূপতি ভাদুড়ীকে ডাকে না। সাধারণতঃ বাইরের ঘটনা কখনও ভেতরের অন্দর মহলের ওপর ছায়াপাতও করে না। কিন্তু সেদিন অন্যরকম। বলতে গেলে ভূপতি ভাদুড়ীর জীবনে ব্যতিক্রমও বটে।

অনেক দিন থেকে বাইরের সমস্যাগুলোর ভার ভূপতি ভাদুড়ীর ওপর ছেড়ে দিয়েই মা-মণি নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু রাত্রের মাঝখানে হঠাৎ গণ্ডগোল হওয়াতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তরলাকে ডাকলে মা-মণি।

জিজ্ঞেস করলে—সদরে গণ্ডগোল কীসের রে?

তরলা 'দেখে আসছি' বলে ধনঞ্জয়কে সদরে পাঠিয়েছিল। ধনঞ্জয় এসেই সব খবর দিলে। বললে—ম্যানেজারবাবুর কাছে একটা পাওনাদার এসেছে।

পাওনাদার! মা-মণি অবাক হয়ে গিয়েছিল। পাওনাদার এত রাত্রেই বা আসবে কেন? তাছাড়া ম্যানেজারকে তো বলা আছে, কারোর পাওনা-গণ্ডা যেন পড়ে না থাকে।

ধনঞ্জয় বললে—লোকটা নেশাখোর মা-মণি—

নেশাখোর কথাটা শুনেই কেমন যেন রাগ হয়ে গেল মা-মণির।

বললে—তাহলে ভূপতি ভাদুড়ীকে একবার ডাক তো। নেশাখোর পাওনাদার বাড়িতে এসে কেন চড়াও হবে! ভূপতি কেন পাওনা ফেলে রাখে?

সেই ধনঞ্জয়ই গিয়ে ডেকে আনলে ভূপতি ভাদুড়ীকে। ভূপতি ভাদুড়ী ঘরে ঢুকেই বললে—আমাকে ডেকেছেন মা-মণি?

মা-মণি রাত শুরু হবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এরকম ঘুমিয়ে পড়াই তার অভ্যেস। কী-ই বা তার কাজ। নিজের শরীরটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কোনও কাজই তার নেই বলতে গেলে। কেবল মনে হতো একটা কাজ থাকলে যেন ভালো হতো তার। কোথা থেকে কেমন করে যেন সমস্ত সংসারটা টাকার চাকার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। সুখদা মেয়েটা ছিল, তাকে সাজিয়ে-গুছিয়েও তার অনেকটা সময় কেটে যেত। একটা ঝগড়া করবার মত লোকও ছিল বাড়িতে।

কিন্তু এখন!

ঘুমিয়ে মা-মণি সেই আগেকার স্বপ্নটাই দেখছিল। লাবণ্যময়ী যেন শ্বশুর-বাড়ি গিয়েছে। সে-ও বেশ ঘটা হয়েছিল। শিবশম্ভু চৌধুরী নিজের মেয়ের বিয়েতে যে-ঘটা করেছিলেন, পাথুরেঘাটার দত্ত বাড়ির কর্তাও তেমনি। ভাইপোর বৌভাত।

উলু দিয়ে কনে-বরণ হলো। দুধে-আলতায় পা রাখলে নতুন বৌ। তারপর রান্নাবাড়ি। দত্তবাড়ির বিরাট রান্নাঘরে একটা দশ-সেরি লোহার কড়ায় দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল। কড়া থেকে গরম দুধ ফোসকার মত ফুলে ফুলে উথলে পড়ছিল। সেইটে দেখবে নতুন-বৌ। তার মানে নতুন-বৌ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দত্তবাড়ির নতুন লক্ষ্মীলাভ হবে।

পোঁ শব্দ করে যেন শাঁখ বেজে উঠলো। পাতলা বেনারসীর আড়ালে লাবণ্যময়ী দত্তবাড়ির কুল-তিলককে দেখলে। আহা, সে কী রূপ! সে কী চেহারা! বর দেখে যে চৌধুরীবাড়ির সবাই ধন্য ধন্য করেছিল তা কিছু অন্যায় করেনি।

লাবণ্যময়ীর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বাদামী। নতুন বউ। শিবশম্ভু চৌধুরী ঝি'কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সঙ্গে। সেও ছোট! লাবণ্যময়ীর সঙ্গে বয়েসের বেশি তফাত নেই। বিধবা। তারও একদিন এমনি করে বিয়ে হয়েছিল। এমনি বর এসেছিল। কিন্তু অল্প বয়েসের বিয়ে। তখন আর তার কিছুই মনে নেই।

—তরলা!

ঘুমের মধ্যেই তরলাকে ডেকেছিল মা-মণি।

—কী মা-মণি!

মা-মণি বললে—অত গোলমাল হচ্ছে কীসের রে!

আর তারপরেই এক সময় ভূপতি ভাদুড়ী নিজেই এসে হাজির হয়েছিল।

—গোলমাল কীসের ভূপতি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আজ্ঞে মা-মণি আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছিলাম ওদের, গোলমালটা কীসের?

মা-মণি বললে—কে নাকি পাওনাদার এসেছে, বলছিল ধনঞ্জয়, নেশাখোর পাওনাদার--

পাওনাদার?

ভূপতি যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—পাওনাদার? কিন্তু আমি

তো কারো কোনও পাওনা ফেলে রাখি না!

—তাহলে কে? নেশাখোর মানুষ ঢুকলো কী করে বাড়িতে?

ভূপতি বললে—আমি তো তাই বাহাদুর সিংকে বকছিলাম। যাকে-তাকে ঢুকতে দেয় বাড়িতে। বুড়ো হয়ে গেছে। বেশি কিছু বলতেও পারিনে।

মা-মণি বললে—না, না, ওকে তুমি ছাড়িয়ে দাও ভূপতি। যে সদর গেট খুলে রাখে তাকে ডিউটি দিতে দিও না। শেষকালে অন্দরে চোর-ডাকাত ঢুকে পড়বে কোনদিন। এমনি করে সুখদা চলে গেল, কেউ জানতেই পারলো না—

—আমি কালই ওকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি—

বলে ভূপতি ভাদুড়ী নিচের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, মা-মণি আবার ডাকলে।

বললে—আর একটা কথা শোনো!

ভূপতি ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে গেল, বললে—বলুন—

মা-মণি বললে—আমার সেই উকীলবাবুর আসার কথা ছিল, কী হলো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কাল তো হাইকোর্টে গিয়েছিলুম সেই কথা বলতে। উকীলবাবু বললেন—আসছে শুক্কুরবার আসবেন দেখা করতে। একটা আপীলের কেস নিয়ে বড় ব্যস্ত আছেন। আমার সব দিকে নজর আছে মা-মণি।

—ছাই নজর আছে!

বলে মা-মণি রাগের ভঙ্গিতে বলে উঠলো—তোমায় আমি কতবার না বলেছি, আমার কোথায়-কোথায় কত সম্পত্তি আছে তার একটা ফর্দ আমায় করে দেবে।

ভূপতি বললে—আজ্ঞে তা তো আমি করে রেখেছি—

মা-মণি রেগে গেল আবার, বললে—ফর্দ করে তোমার কাছে রেখে দিলে তো চলবে না, আমার কাছে দেবে তুমি সেগুলো। আমি দেখতে চাই আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কী-কী আছে।

ভূপতি বললে—আজ্ঞে, আমি তো বলেছি মা-মণি, সেগুলো ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিয়েছি!

মা-মণি বললে—ব্যাঙ্কে গিয়ে সব ফর্দ করে আসবে। দলিল-দস্তাবেজ যা-কিছু আছে সব জিনিসের ফর্দ আমার চাই। কোন্‌গুলো বাবার কেনা, আর কোন্‌গুলো আমার কেনা, তাও আলাদা-আলাদা করে সাদা কাগজে লিখে আনবে। মরে যাবার আগে আমি সব বুঝে-শুনে তার একটা বিলি-ব্যবস্থা করে যেতে চাই—

ভূপতি বললে—সব আলাদা কাগজে ফর্দ করে রেখে দিয়েছি মা-মণি, কাল সকালেই আনবো—

—হ্যাঁ আনবে, আমি ভুলে গেলেও তুমি আমাকে মনে পড়িয়ে দেবে, আমার কি আর সবকিছু এখন মনে থাকে? মনে করিয়ে দিতে হয়।

ভূপতি বললে—ঠিক আছে মা-মণি, আমি কালকেই সব গুছিয়ে নিয়ে আসবো—

বলে ভূপতি ভাদুড়ী আবার আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এল। ধনঞ্জয় ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে কোলাপ্‌সিবল্‌ দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

ভূপতি ভাদুড়ী বাইরে থেকে বললে—ভাল করে বন্ধ করেছিস তো

খনগুয়? হ্যাঁ বাবা, ভাল করে বন্ধ করবি। দিন-কাল ভাল নয়, কার মনে কী আছে কে বলতে পারে!

তারপর উঠোনে এসেই দেখলে সেখানে আর কেউ নেই, উঠোন ফাঁকা। সদর গেটের কাছে গিয়ে দেখলে বাহাদুর সিং গেট-এ তালাচাবি লাগিয়ে দিয়ে পাশের গুম্‌টি ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঘরটার সামনে গিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী ডাকলে—বাহাদুর সিং—

ভেতর থেকে বাহাদুর বেরিয়ে এল।

ভূপতি ভাদুড়ী ধমকে উঠলো—গেটে চাবি দিয়েছো?

—জী হাঁ, হুজুর!

—সেই মাতালটা কোথায় গেল?

বাহাদুর সিং বললে—চলা গিয়া হুজুর!

—আর ভাগ্নেবাবু?

বাহাদুর সিং বললে—ভাগ্নেবাবু আপনা ঘরমে হ্যায় হুজুর—

—আর সেই জেনানাটা? সেই যে ভাগ্নেবাবুর সঙ্গে গাড়িতে করে এসে নেমেছিল!

বাহাদুর সিং বললে—সো ভি চলা গিয়া হুজুর—

—ঠিক আছে। খুব হুঁশিয়ার থাকবে। মা-মণি তোমার নোক্‌রি খেয়ে দেবে বলছিল। আমি বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রেখেছি, তা জানো?

—হুজুর, আপ্‌কা মেহেরবানি।

—আচ্ছা, যাও, এখন ঘুমোও—

বলে ভূপতি ভাদুড়ী আবার নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলো। ঝকমারি হয়েছে পরের বাড়িতে কাজ করা। পরের চাকরি করতে করতেই জীবনটা কেটে গেল। অথচ এতে লাভ নেই কানাকড়ি, কৈফিয়ত দিতে দিতেই হয়রান। কবে যে দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবো মা! কবে তুমি মুক্তি দেবে মুক্তিদায়িনী!

সেদিনই হঠাৎ যেন ভূত দেখে চমকে উঠলো সুরেন। সোজা জীবনে এমন চমকে ওঠা সচরাচর ঘটে না।

তখন অনেক দিন কেটে গেছে। জীবনকে চিনতে যেন তখন আর বেশি বাকি নেই মনে হয়েছে। অথচ এমন কোনও লোক আছে নাকি, যে বলতে পারে জীবনকে সে পুরোপুরি চিনে ফেলেছে। প্রতি মুহূর্তে যে বিস্মিত হয় সে-ই তো আসলে বেঁচে থাকে। বিস্মিত হওয়া কি অত সোজা? সুরেনের দীর্ঘ জীবনের ফাঁকে ফাঁকে এমনি কত বিস্ময়, কত চমক, কত অবাক হবার কাহিনী জমে আছে তা আমি না জানালে কি কেউ জানতে পারতো?

সুরেন সান্ন্যাল সেই কথাই আমাকে বলেছিল।

বলেছিল—সেই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটার দিকে চাইলে সেসব কথা যেন আজ স্বপ্ন বলে মনে হয় আমার কাছে, সেই গেটটা এখনও আছে। সেই বাড়িটাও এখনও আছে, কিন্তু সে-বাড়িটা আর এখন সে রকম বাড়ি নেই। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়িটার চেহারাও যেন বদলে গেছে।

বললাম—কেন?

সুরেন সান্ন্যাল বললে—সেই কাহিনীই তো আপনাকে বলছি।

—আপনার সেই বন্ধু সুব্রত? সে আমেরিকা থেকে ফিরেছে?

সুরেন সান্ন্যাল বললে—সব আপনাকে বলবো। সুব্রতর বোন পর্মিলির কথাও বলবো। সুখদার কথাও বলবো। সুখদা, সেই যে মেয়ে একদিন পালিয়ে গিয়েছিল চৌধুরীবাড়ি থেকে, সে যে আবার ফিরবে তা আমি কিছু কল্পনাও করতে পারিনি—

—কী রকম?

সুরেন সান্ন্যাল সেদিন হরনাথবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। উকীল হরনাথবাবু। ক'দিন ধরে খুবই ঘন ঘন যেতে হচ্ছিল সেখানে।

ভূপতি ভাদুড়ী বলেছিল—যা-কিছু করছি সব তোর জন্যেই করছি। আমার আর কী! আমি তো গঙ্গামুখো পা করে বসে আছি। এই সাড়ে সাত লাখ টাকার সম্পত্তি সব তোরই হবে। তখন বুঝবি, কেন আমি তোর জন্যে এত কাণ্ড করেছি।

প্রথম-প্রথম সুরেন মামার কথায় কান দিত না। তখন কম বয়েস ছিল। দেবেশ যা বলতো তাই-ই বিশ্বাস করতো। ভাবতো, দেবেশরাই একদিন হাতে স্বর্গ এনে দেবে। কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করে কোথাও আর কোনও চাকরি পাওয়া গেল না। তখন একদিকে চাকরির চেষ্টা আর একদিকে উকীলের বাড়িতে গিয়ে ধরনা দেওয়া, এই ছিল তার কাজ।

উকীল হরনাথবাবু পাকা লোক। প্রতিদিন গিয়ে সুরেন বসে থাকে। আরো দশটা মক্কেল ঘিরে থাকে তাঁকে। সুরেন তাড়াহুড়ো করে। বলে—আমি অনেকক্ষণ বসে আছি হরনাথবাবু—

হরনাথবাবু বললেন—তা বাপু বসে তো থাকতেই হবে, আইন-আদালতের ব্যাপারে তো তাড়াহুড়ো করলে চলবে না—

সুরেন বললে—তাহলে আজকে আসি, বরং কাল আসবো—

—হ্যাঁ, একটু সকাল-সকাল করেই এসো, সকাল-সকাল ছেড়ে দেবো—

তারপর সুরেন ছাড়া পেয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিল। অন্য দিনের মত উকীলবাবুর কাছ থেকে এসেই মা-মণির কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হতো উকীল কী বললে। কবে দলিল তৈরি হবে, কবে দলিল রেজিস্ট্রি হবে, ইত্যাদি সব বলতে হতো মা-মণিকে।

কিন্তু সেদিন মা-মণির ঘরের কাছে যেতেই চমকে উঠলো। সুখদা না?

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে! সুখদাও সুরেনের দিকে চেয়ে দেখে কেমন যেন হতবাক হয়ে গেল। এমন করে এই বাড়িতে আবার দেখা হয়ে যাবে তা যেন সুরেন ভাবতে পারেনি।

মা-মণি বললে—কে রে? সুরেন? আয় আয়—এই দেখ কে এসেছে—

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। ঘরে থাকবে না ঘর থেকে চলে যাবে তাও সে ঠিক করতে পারলে না।

সুখদা মা-মণির দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে—আমি আসি তাহলে—

মা-মণি বললে—কোথায় যাবি তুই?

সুখদা বললে—আমি যেখানেই যাই তা তোমার ভেবে লাভ কী? আমার

ভালো-মন্দ তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে—

মা-মণি বললে—এতদিন তোকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করে আজ তার এই ফল? এতদিনের সব কষ্ট তাহলে আমার জলে গেল? আমি তোর কেউ না?

সুখদা বললে—না, কেউ না।

—হ্যাঁ রে, আজ তুই ওই কথা বলতে পারলি আমাকে? তোর চলে যাবার পর থেকে আমি কতদিন খাইনি, কত রাত ঘুমোইনি, তার খবর রেখেছিস?

সুখদাও তেমনি। তারও গলা যেন চড়ে উঠলো।

বললে—কেন খাওনি? কেন ঘুমোওনি? কে তোমাকে খেতে-ঘুমোতে বারণ করেছিল? সাধ করে যদি কেউ না খায়, না ঘুমোয় তো আমি কী করবো?

মা-মণি সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—ওরে শোন, মেয়ের কথা শোন। শুনছিস তো ওর কথা! বলে, আমি নাকি সাধ করে খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি।

মা-মণি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠলো। তারপর সুখদার একটা হাত খপ করে ধরে ফেললে।

বললে—তুই আর চলে যাসনি মা, তুই চলে গেলে আমি যে আর বাঁচবো না মা—

সুরেন এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ কোথা থেকেই বা সুখদা এল এতদিন পরে তাও বুঝতে পারলে না। কিন্তু কোথায় গেল সেই লোকটা, যে সুখদাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল?

সুখদা বললে—সেদিন তোমার এ-সব কথা মনে ছিল না যেদিন তুমি আমার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলে? যেদিন আমি তোমার বোঝা হয়ে উঠেছিলুম?

—তুই বলছিস কী? তুই বুকে হাত দিয়ে বল তো আমি তোকে কোনদিন হতচ্ছেদ্দা করেছি? তোকে কখনও বুঝতে দিয়েছি যে, তোর নিজের মা নেই?

সুখদা বললে—সেই কথা বলবার জন্যেই তো আমি আজ এসেছি। সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম যে, আমি কী দোষ করেছি যে আমার জীবনটা তুমি এমন করে নষ্ট করে দিলে?

মা-মণি বললে—তোর সব কথার জবাব আমি দেবো, কিন্তু তুই আগে বল তুই আর এখান থেকে যাবি না!

সুখদা বললে—আমার এখানে থাকবার কি আর অধিকার আছে?

মা-মণি বললে—তোর কি মাথাখারাপ হয়েছে? তুই এ-সব কী বলছিস?

—হ্যাঁ ঠিকই বলছি। আমার কপালে সুখ নেই তাই তোমার এত সোহাগ আমার সইল না। সে-কথা ভেবে আর কী করবো! আমারই কপালের দোষ! যদি কিছু টাকা দিতে তো আমার কিছু উপকার হতো। সে যখন দেবে না তখন আমি আর থেকে কী করবো? আমি যাই—

সুরেনের মুখে এতক্ষণে যেন কথা ফুটলো।

বললে—এত করে বলছে মা-মণি, তুমি না-হয় এখানেই থাকলে, এই মা-মণির কাছে—

সুখদা চোখ বড় বড় করে তাকালো এবার সুরেনের দিকে। বললে—কেন, সব গ্রাস করেও তোমার আশা মিটছে না? আমাকেও গ্রাস করতে চাও?

মা-মণি বললে—ওমা, ও কী কথা বলছিস? সুরেন আবার তোর কী

করলে? ও বেচারি তো কারো সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না, ওকে কেন খোঁটা দিচ্ছিস?

সুখদা বললে—কেন, ও-ই তো তোমার সব! ওকেই তো তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে যাবে মরার আগে! আমি কে? আমি কি তোমার কেউ হই?

সুরেন বললে—এসব তুমি কী বলছো সুখদা? আমি তো এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন মিছিমিছি আমার নামে দোষ দিচ্ছ?

—তুমি চুপ করো, তোমাকে আর কথা বলতে হবে না। তলায়-তলায় কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমার আর তা জানতে বাকি নেই। আমি দুটো টাকা চাইলেই যত দোষ হয়ে যায়। টাকার যদি দরকার না হতো তো আমি এ-বাড়িতে আসতুম না। আজ টাকার দরকার বলেই হাত পাততে এসেছি এখানে। ভেবেছিলাম অন্ততঃ এখান থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে না—

বলে সুখদা আবার যেদিক দিয়ে এসেছিল সেইদিক দিয়েই চলে যাচ্ছিল।

মা-মণি সুরেনকে বললে—ওরে সুরেন, ম্যানেজারকে একবার ডাক না, সে আসুক—ও মেয়ে তো কারোর কথাই শুনছে না—

সুখদা বললে—আসুক না ম্যানেজার, আমি কি কাউকে ভয় করি?

সুরেন তাড়াতাড়ি নিচেয় নেমে মামার ঘরের দিকে গেল। ভূপতি ভাদুড়ী তখন সবে কাছারির কাজকর্ম গুছিয়ে তুলছে। সারাদিন হরনাথ উকীলের বাড়িতে কেটেছে। যে-ক'টা দিন মা মণি বেঁচে আছে তার মধ্যেই কাজটা গুছিয়ে ফেলতে হবে। সময় বড় কম। ভূপতি ভাদুড়ী আর ক'দিনই বা। তার মধ্যে সবকিছুর একটা ফয়সালা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এক-একটা দিন যায় আর মনে হয়, যেন একটা যুগ কেটে গেল।

সুরেন গিয়ে ডাকতেই ভূপতি ভাদুড়ী চমকে উঠেছে।

—কী রে? কী হয়েছে? আবার কী হলো?

সুরেন বললে—মা-মণি একবার তোমাকে ডেকেছে এখুনি। সুখদা এসেছে—

সুখদা! ভূপতি ভাদুড়ী একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। বলে কি ভাগ্নে! সুখদা আবার কোত্থেকে এল?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে তুই ঠিক দেখেছিস? সুখদা, না আর কেউ?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, আমি ঠিক দেখেছি—

- তা এতদিন পরে কোত্থেকে এল সে? সে আপদ তো বিদেয় হয়ে গিয়েছিল, আবার এল কী করে? কে আনলো তাকে?

সুরেন বললে—তা জানি না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তোর সঙ্গে দেখা হলো কী করে?

সুরেন বললে—আমি যে ওপরে মা মণির কাছে গিয়েছিলুম। সেখানেই দেখলুম।

—কী বলছে সে?

সুরেন বললে—মা-মণির কাছে টাকা চাইতে এসেছে।

—টাকা!

টাকার নাম শুনেই ভূপতি ভাদুড়ী লাফিয়ে উঠলো যেন!

—তা সবাই কেবল টাকাটাই চিনেছে? নরেশ দত্তর টাকার দরকার হলেই এখানে আসবে, সুখদার টাকার দরকার হলে এখানে আসবে! এখানে কি টাকার গাছ আছে নাকি? বাহাদুর সিং কোথায়? বাহাদুর সিংকে একবার ডাক তো—

সুরেন গিয়ে বাহাদুর সিংকে ডেকে নিয়ে এল।

বাহাদুর সিং ভয়ে ভয়ে এসে ম্যানেজারবাবুকে সেলাম করল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বাহাদুর সিং, সুখদা কখন বাড়িতে ঢুকলো? কে তাকে ঢুকতে দিলে? তুমি দেখেছ তাকে ঢুকতে?

বাহাদুর সিং বললে—হাঁ হুজুর, দিদিমণি একটা রিক্শা চড়ে এসেছিল—

—তুমি কেন ঢুকতে দিলে তাকে?

—হুজুর, দিদিমণিকে ঢুকতে দেবো না?

ভূপতি ভাদুড়ী গর্জে উঠলো—খবরদার! আবার আমার মুখের ওপর কথা! আমি বলেছি না যে, বাজে লোককে কখনও ঢুকতে দেবে না আমার অনুমতি ছাড়া? আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছি? তুমি এ-বাড়ির ম্যানেজার, না আমি ম্যানেজার? তোমার কথা থাকবে, না আমার কথা থাকবে, বলো?

বাহাদুর সিং বললে—হুজুর, আপনার কথা থাকবে, আপনিই ম্যানেজার—

—তাহলে?

এর উত্তর আর বাহাদুর সিং-এর মুখ দিয়ে বেরোল না। সে অসহায়ের মত, অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে নিজের মনেই পাগলের মত বকতে লাগলো—আমার হয়েছে জ্বালা। আমিই উকীলের বাড়ি যাবো, আবার আমিই বাড়ি সামলাবো। তোর তো একটা কোনও বুদ্ধি নেই। এখন কোনদিক সামলাই। আমি একলা মানুষ কোন কাজটা করি?

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে নিজের গায়েব ঝালটা মেটাবার চেষ্টা করলে। বললে—তোর জন্যেই তো আমার এই ঝামেলা। আমি কার জন্যে এত খেটে মরি? আমার এত কীসের খাটবার দায়? পারবো না আমি এত খাটতে, এত খেটে মরতে। সেই সকাল বেলা কাছারিতে গেছি আর সারাদিন খেটেখুটে বাড়িতে এসে যে একটু হাত-পা ছড়িয়ে জিরোব তার উপায় নেই। লেখাপড়া করে তুই কার ছেরাদ্দ করছিস? আমার, না তোর নিজের?

সুরেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী হাত-পা গুটিয়ে তক্তপোষটার ওপর উঠে বসলো।

বললে—চুলোয় যাক সব। আমি আব ভাবতে পারিনে। আমার ভাববার কী দরকার? আমার ভাবতে বয়ে গেছে। যা ইচ্ছে কর তোরা, আমি এই গ্যাঁট হয়ে বসলুম—

তারপর যেন মনে পড়ে গেল যে ভূপতি ভাদুড়ী এ-বাড়ির ম্যানেজার; বাহাদুর সিং-এর দিকে চেয়ে বললে—তুমি বেরোও দিকি, তুমি বেরিয়ে যাও—আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও—নিকাল যাও আমার ঘর থেকে, নইলে ডিসচার্জ করে দেবো তোমাকে, যাও, ভাগো হিয়াঁসে—

ভূপতি ভাদুড়ী যেন কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সুরেন যেমন এসেছিল তেমনি আবার চলে যাচ্ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী ধমক দিয়ে উঠল—তুই চলে যাচ্ছিস যে বড়? কোথায় যাচ্ছিস?

সুরেন বললে—ওপরে—

—ওপরে? কেন? ওপরে যেতে তোকে কে বলেছে? আমি পই-পই করে বলেছি না যে, আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোথাও যাবি না। কারো সঙ্গে

মিশবি না? ও মেয়েটার সঙ্গে কে তোকে মিশতে বলেছে? ও কাদের বাড়ির মেয়ে? আমি দেখেই বুঝেছি ওর হাব-ভাব ভাল নয়, তোর সঙ্গে তার অত কীসের খাতির? সে তোর কে?

হঠাৎ ধনঞ্জয় ঘরে ঢুকলো। বললে—ম্যানেজারবাবু, মা-মণি আপনাকে ডাকছেন—

যেন এতক্ষণে স্বস্তি ফিরে পেলে ভূপতি ভাদুড়ী।

—কী বাবা ধনঞ্জয়, মা-মণি ডেকেছেন? কেন রে?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে, সুখদা দিদিমণি এসেছে—

ভূপতি ভাদুড়ীর মুখে একগাল হাসি ফুটে উঠলো। বললে—সুখদা দিদিমণি? তাই নাকি? তা কী হয়েছিল রে তার এ্যাদ্দিন? কোথায় ছিল? চল চল—

বলে ভূপতি ভাদুড়ী তক্তপোষ ছেড়ে উঠলো। কোথায় রইল তার সেই রাগ, আর তার সেই বকুনি। তারপর ধনঞ্জয়ের পেছনে-পেছনে চললো অন্দরে। এতক্ষণ যে-মানুষটা একেবারে রেগে-মেগে তোলপাড় করে ফেলছিল, সেই মানুষটাই আবার একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

সুরেন সব লক্ষ্য করছিল। তারপর মামার সঙ্গে সেও অন্দরের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু ভূপতি ভাদুড়ী দেখতে পেয়েছে। বললে—তুই আবার আসছিস কী করতে? তুই কী করতে আসছিস? তোর লেখাপড়া নেই?

সুরেন আর এগোল না। ভূপতি ভাদুড়ী ধনঞ্জয়ের সঙ্গে অন্দর-মহলে ঢুকে গেল।

সুরেন সেদিন নিজের ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বার বার ভেতরে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করলো সেখানে কী হচ্ছে। জানালার বাইরের দিকে চেয়ে অন্দর-মহলের গেটটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। এইখান দিয়েই হয়তো সুখদা নিচেয় নামবে। হয়তো মা-মণির সঙ্গে ঝগড়া করবে খুব। হয়তো বাড়ি থেকে চলে যেতে চাইবে, আর মা-মণিও তাকে যেতে দেবে না—একটা কিছু হবেই।

আস্তে আস্তে উঠোনের ওপর অন্ধকার আরও নেমে এল। প্রতিদিনকার মত দুখমোচন উঠোনের আর গেটের আলো জেবলে দিলে। বাহাদুর সিং আবার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সুরেন চুপ করে বসে রইল সেই ঘরটার মধ্যে। মাথার মধ্যে ঝড় বয়ে যেতে লাগলো যেন। এতদিন কোথায় ছিল সুখদা? এতদিন কী করছিল? কার সঙ্গে নরেশ দত্ত সুখদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল? যদি কলকাতা থেকে চলেই গিয়েছিল তো আবার এল কেন? টাকার জন্যে?

সুখদাকে একবার একলা পেলে সেই কথাটাই সুরেন জিজ্ঞেস করতো।

জিজ্ঞেস করতো—কেন তুমি চলে গিয়েছিলে? তুমি নিজের ইচ্ছেয় গিয়েছিলে, না আর কেউ জোর করে তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? কোনটা সত্যি? নরেশ দত্ত কত টাকা নিয়েছে মামার কাছে!

হঠাৎ দেখলে, গেটের কাছে বাহাদুর যেন কার সঙ্গে কথা বলছে।

নজরটা পড়তেই লোকটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে সুরেন। বেশ লম্বা, ফরসা চেহারা। মাথায় বড় বড় ঢেউ খেলানো চুল।

বাহাদুরের গলাটাই কানে এল। সে বলছে—অন্দর যানে নেহি দেগা—

লোকটাও যেন কী বলছে ঠিক কানে এল না।

কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো সুরেনের। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লোকটাকে আরও স্পষ্ট করে দেখলে।

সুরেন জিজ্ঞেস করল—কাকে চাই আপনার?

লোকটা বলল—আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না দারোয়ানটা। বলছে ম্যানেজারবাবুর হুকুম চাই। কোথায়, ম্যানেজার কোথায়?

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে আপনার কী দরকার?

লোকটা বললে—আরে মশাই, আমার বউ এসেছে এ-বাড়িতে—

—আপনার বউ?

লোকটা বললে—হ্যাঁ, আমার বউ না তো কার বউ? আমার বউকে এ-বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য কাজে গিয়েছিলুম আমি, এখন তাকে নিয়ে যেতে এসেছি—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আপনার বউ-এর নাম কী?

লোকটা বললে—সুখদা। সুখদা দেবী। সুখদা বললেই চিনতে পারবে সবাই।

সেদিন সেই অভাবনীয় ঘটনায় যেন হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল সুরেন। কী বলবে তাও যেন সে এক নিমিষে ভেবে বার করতে পারলে না। একদিন যে তাকে এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে তাও সে কখনও কল্পনা করেনি।

বললে—আপনার নামটা কী বলুন তো?

লোকটা বললে—কালীকান্ত। কালীকান্ত বিশ্বাস বললেই চিনতে পারবে—

কালীকান্ত বিশ্বাস! সুরেন যার জন্যে এতদিন রাস্তায়-ট্রামে-বাসে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই লোকটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এ যেন ভাবাই যায় না।

বাহাদুরকে বললে—বাহাদুর, তুমি গেট খুলে দাও, আমি মামাকে বলবো'খন—

কালীকান্ত বিশ্বাস বললে—ম্যানেজার আপনার মামা বুঝি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, আপনি চেনেন তাঁকে?

কালীকান্ত বললে—চিনি না, কিন্তু শুনেছি সব—মহা বদমাস লোক। পাজির পা-ঝাড়া। কিছু মনে করবেন না মশাই, আমি ঢের-ঢের লোক দেখেছি, এমন লোক কখনও দেখিনি—

ততক্ষণে বাহাদুর গেট খুলে দিয়েছে। সুরেন বললে—আসুন, ভেতরে আসুন—

তারপর উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেল কালীকান্ত বিশ্বাসকে। পাঞ্জাবি ধুতি সবই ঠিক পরেছে, কিন্তু বড় ময়লা। বাবড়ি চুল মাথায়, পায়ে একটা ছেঁড়া লপেটা জুতো। সেই ধুলোভরা জুতো নিয়েই লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকলো।

বললে—এদের অবস্থা তো খুব ভাল, কী বলেন?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, ভালো—

কালীকান্ত বললে—কত টাকার সম্পত্তি হবে বলুন দিকিনি? কত লাখ?

সুরেন বললে—মামার কাছে শুনেছি লাখ সাত-আট—

কালীকান্ত আবার জিজ্ঞেস করলে—ওয়ারিসান কে এই সম্পত্তির!

সুরেন বললে—তা জানি না—

কালীকান্ত অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী বলেন, আপনার মামা ম্যানেজার আর আপনি জানেন না এ-সম্পত্তির ওয়ারিসান কে?

সুরেন বললে—আমার মনে হয় ওয়ারিসান কেউ নেই—

—কেউ নেই? শিবশম্ভু চৌধুরীর কোনও ভাই, কি ভাইপো, কি ভাগ্নে? কিংবা আর কোনও নিকট-আত্মীয়।

সুরেন বললে—আমি যতদূর জানি, কেউ নেই—

—তাহলে বুড়ী মারা যাবার পর এ-সব কে পাবে?

সুরেন বললে—তা জানি না।

কালীকান্ত বললে—তবে যে নরেশদা বলেছিল, সব ম্যানেজার মারবে। মানে, ম্যানেজার মারবার তালে আছে! ম্যানেজারের কে আছে?

সুরেনের ভালো লাগছিল না এ-সব আলোচনা করতে। তবু বলল—কেউ নেই—

—তাহলে সব তো আপনার কপালে নাচছে মশাই! বেশ আছেন আপনি, এদিকে আমরা শালা টাকা-টাকা করে খুন হয়ে যাচ্ছি—আর আপনি বেশ ফাঁকতালে পরের টাকা বাগিয়ে বসে আছেন—

তারপর বেশ পা তুলে জম্পেশ করে বসলো কালীকান্ত তক্তপোষের ওপর। বললে—দিন, একটা সিগ্রেট দিন—

সুরেন বললে—সিগারেট আমার কাছে নেই—আনিয়ে দিতে পারি—

—সে কি মশাই, সিগ্রেট খান না নাকি?

সুরেন বললে—না—

—তাহলে বিড়িই দিন, আতুরে নিয়ম নাস্তি। আমি বিড়িই খাই, হঠাৎ আজকে একটা সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছিল।

সুরেন বললে—আমি বিড়ি-সিগারেট কিছুই খাই না—

—সে কী? কোনও নেশাই নেই? বলেন কী? থাকেন কী করে? তাহলে আপনার খরচই নেই মশাই, সব টাকাটাই ব্যাঙ্কে তুলে রেখে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে কেবল সুদ খাবেন—

সুরেন কিছু বললে না দেখে কালীকান্ত বললে—ওরা কোথায়?

—কারা? কাদের কথা বলছেন?

—মানে আমার বউ। ভেতরে গেছে, কিন্তু এখনও আসছে না তো?

সুরেন সে-কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি আপনার স্ত্রীকে টাকা আনতে পাঠিয়েছেন?

কালীকান্ত বললে—তা না হলে আসতে যাবো কেন এখানে? আমাদের এখানে আসবার কীসের দায়?

সুরেন নিজের কৌতূহল আর বেশীক্ষণ দমন করতে পারলে না। বললে—আপনার সংগে সুখদার বিয়ে হলো কী করে?

—বিয়ে?

কালীকান্ত যেন তাজ্জব হয়ে গেল। পরে বললে—কেন? সকলের বিয়ে যেমন করে হয় তেমনি করেই হয়েছে। সকলের বিয়েই তো এক রকম করে হয়, একই নিয়ম!

—কে আপনাদের বিয়ে দিলে?

—কেন, নরেশদা!

—নরেশ দত্ত? কিন্তু আপনাদের বিয়ে তো লুকিয়ে হয়েছিল!

কালীকান্ত এবার হেসে উঠলো। বললে—লুকিয়ে বিয়ে না হলে কি আমার সঙ্গে সুখদার বিয়ে হতো মশাই? আমি তো একটা লোফার। আমার চেয়ে কত ভালো ভালো পাত্তোর পেত সুখদা!

—কিন্তু বিয়ে করে আপনি সুখদাকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

কালীকান্ত বললে—ঘুরলুম। দেশ ঘুরলুম খুব। শালা খুব দেশভ্রমণ হলো। হিল্লি-দিল্লি মথুরা-বৃন্দাবন, কাশী-গয়া, কিছু আর বাদ দিইনি। যে-ক'টা টাকা নরেশদা দিয়েছিল সব খরচ করলুম ঘুরে ঘুরে—

সুরেন বললে—কিন্তু এদিকে যে খুব খোঁজাখুঁজি পড়ে গিয়েছিল আপনাদের নিয়ে।

কালীকান্ত বললে—তা খোঁজাখুঁজি পড়বে না? আমি তো জানতুম হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তা হৈ-চৈ পড়বে বলেই তো লুকিয়ে-চুরিয়ে বিয়ে করলুম মশাই—এখন বিয়ে করলুম বটে, কিন্তু টাকাটা তো আর হাতছাড়া করবো না। টাকা আমার চাই—

—কিন্তু মা-মণি যদি টাকা না দেয়?

কালীকান্ত রেগে গেল। বললে—টাকা দেবে না মানে? কেস করবো না? মামলা করবো না? মামলা করে ভূপতি ভাদুড়ী আমার সঙ্গে পারবে? ভেবেছে মেয়েটা তো একটা লোফারের সঙ্গে পাচার হয়ে গেল, এবার রাস্তা ক্লিয়ার—সেটি হতে দেবো না—

তারপর যেন একটু টনক নড়লো। বললে—এখনও নামছে না কেন বলুন তো? মেয়েটাকে আটকে-ফাটকে রাখলো নাকি? একবার দেখে আসুন না—

সুরেন বললে—এখন মা-মণি মামাকে ডেকেছে, আমি গেলে বকবে—

—তাহলে আমি যাবো?

সুরেন বললে—না না, আপনি গেলে সব জানাজানি হয়ে যাবে—

কালীকান্ত বললে—তা জানাজানি হলোই বা, আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি? আমার বিয়ে করা বউ, আমি কারও পরোয়া করি?

বলে সত্যি সত্যিই তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

সুরেন বললে—না না, আপনি বসুন, আমি ভেতরে গিয়ে দেখছি। আপনি গেলে একটা কেলেঙ্কারি হবে শেষকালে। অনেকদিন পরে সুখদা এসেছে তো, তাই মা-মণি হয়তো ছাড়তে চাইছে না—বসুন আপনি—

বলে সুরেন নিজেই উঠোন পেরিয়ে আবার আস্তে আস্তে অন্দর-মহলের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

ভেতরে মা-মণির ঘরের সামনে তখন তুমুল কাণ্ড চলছে। কতদিনকার সাধের মেয়ে মা-মণির। মেয়েই তো! কোন্ এক ফুল-মাসীমা, আজ তার সমস্ত পরিচয়ই এ পরিবার থেকে মুছে গেছে—তখন ছোট ছিল সুখদা, একেবারে ছোট। তখনই লাবণ্যময়ীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় থেকেই সুখদা এ-বাড়িতে রয়ে গেছে যেন মা-মণির মেয়ের মত; মেয়ের মতই বড় হয়েছে এখানে, মা-মণির পাশে পাশে সব সময় ঘুরঘুর করেছে, আবার সেই মা-মণির চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ-ব্যথা কি সহজে ভুলতে পারে

মা-মণি?

মা-মণি এখনও বলছে—কিন্তু তার আগে বল, কেন তুই এখান থেকে চলে গেলি? আমি তোর কী করেছি? আমি তোকে খেতে দিইনি না পরতে দিইনি?

সুখদাও তেমনি তেজের সঙ্গে বলছে—খেতে পরতে দেওয়াটাই কি বড় কথা হলো?

মা-মণি বললে—বড় কথা নয়? একটা মেয়ে মানুষ করতে কত খরচ হয় তা তুই কী করে জানবি?

সুখদা বললে—টাকা যে খরচ করেছ বলছো, তা সে-টাকা তুমি কি রোজগার করেছ, না তোমার বাবার সম্পত্তি পেয়ে তার মালিক হয়েছ?

মা-মণির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো।

বললে—তুই আমার মেয়ের বয়সী হয়ে আজ এই কথা বললি?

সুখদা বললে—বলবোই তো। আমি কি তোমাকে ভয় করি নাকি যে বলতে ভয় পাবো? কার টাকা? কার জন্যেই বা তুমি সে-টাকা জমাবে? আমি ছাড়া কে আছে তোমার? আমার জন্যে খরচ করবে না তো কার জন্যে খরচ করবে? সে-টাকা কি তোমার সঙ্গে যাবে?

—ওরে পোড়ারমুখী, তোর ছোট মুখে এত বড় কথা?

সুখদা বললে—তুমি যত ছোট আমাকে ভেবেছ তত ছোট আমি নই: সময়ে বিয়ে দিলে এতদিনে আমার দশটা ছেলে-মেয়ে হয়ে যেত!

—তা তোর বয়েস আমি জানি না ভেবেছিস?

সুখদা বললে—ছাই জানো, জানলে কতদিন আগে আমার বিয়ে দিয়ে দিতে!

—সে কী রে? আমিই তোর বিয়ে বন্ধ করেছি, না তুই-ই বিয়ে করতে চাইতিস না। আমি তোকে দিয়ে কত হিতসাধিনী-ব্রত করিয়েছি, তখন তুই-ই তো বলতিস বিয়ে করবি না, তুই-ই তো বলতিস বিয়ে দিয়ে তোকে আমি বাড়ি থেকে দূর করে দিচ্ছি—

সুখদা বললে—তাই-ই তো দিতে চাইতে? আমি পাছে বাড়িতে থাকলে সব টাকা পাই, তাই বিয়ে দিয়ে আমাকে দূর করে দিতে চাইতে। আমি তা বুঝতুম না মনে করেছো?

—ওমা, পেটে-পেটে তোর এত বুদ্ধি? আমি তোর বিয়ে দিয়ে তোকে দূর করে দিতে চাইতাম?

সুখদা সে-কথার জবাব না দিয়ে বললো—কিন্তু সে-কথা এখন থাক, তুমি আমায় টাকা না দিলে আমি চলে যাবো—

মা-মণি বললে—টাকা তুই কী করবি?

সুখদা বললে—টাকা দিয়ে মানুষ কী করে? আমার বিয়ে হয়েছে, আমার সংসার করতে হয়, তাতে টাকা লাগে না? আমার টাকার ভীষণ টানাটানি চলছে বলেই তোমার কাছে এসেছি—

—তা তোর যে বিয়ে হয়েছে, কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে? কে সে?

সুখদা বললে—কেন, তার সঙ্গে তোমার কীসের দরকার?

মা-মণি বললে—তা জামাইকে মানুষ দেখে না? মানুষের দেখতে ইচ্ছে হয় না? তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি তো! দেখি কেমন তোর বর, কী

রকম মানুষ! সে কোথায়?

সুখদা বললে—সে নিচেয় আছে—

—তাকে ডাক, আমার কাছে তাকে ডেকে নিয়ে আয়—

হঠাৎ ভূপতি ভাদুড়ী ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

—এই যে ভূপতি, এই দেখ কে এসেছে। পোড়ারমুখী সুখে থাকতে কোথায় গিয়েছিল, এখন টাকার দরকার পড়েছে তাই এসেছে আমার কাছে—বলছে জামাই নাকি এসেছে, এসে নিচে দাঁড়িয়ে আছে! তুমি একবার ডেকে আনো তো—

ভূপতি ভাদুড়ী ভালো করে চেয়ে দেখলে সুখদার দিকে।

যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলে—শেষ পর্যন্ত তুমি এলে মা! মা-মণি তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে একশা হয়ে গিয়েছিল—আমরাও ভেবে ভেবে অস্থির—

সুখদা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, কোনও উত্তর দিলে না। তারপর বললে—আপনি নরেশ দত্তকে চেনেন ম্যানেজারবাবু?

—নরেশ দত্ত?

ভূপতি ভাদুড়ী যেন আকাশ থেকে পড়লো। আবার একবার জিজ্ঞেস করলে—নরেশ দত্ত? কেন বলো তো মা? কী করে সে?

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—আপনি চেনেন কিনা তাই আগে বলুন—

ভূপতি আমতা আমতা করে বলতে লাগলো—শোভাবাজারের দত্তবাড়ির ছেলে তো? কি রকম চেহারা বলো দিকিনি? দত্তবংশের কত ছেলে—সকলকে কি আর মনে রাখা যায় মা, আমারও তো বয়েস হচ্ছে—

সুখদা বললে—বোকা সাজবেন না, সোজাসুজি বলুন চেনেন কিনা।

ভূপতি ভাদুড়ী হঠাৎ বলে ফেললে—চেহারা দেখলে চিনতে পারি মা—

সুখদা বললে—খুব চেনেন আপনি, আর না-চেনবার ভান করবেন না। বলুন কত টাকা সে নিয়েছে আপনার কাছে?

ভূপতি ভাদুড়ী যেন আবার আকাশ থেকে পড়লো। বললে—টাকা? আমার কাছে টাকা নেবে সে? কেন, আমি তাকে টাকা দিতে যাবো কেন? আমার টাকা কোথায়? আমি বলে গরীব লোক। আমি পরকে টাকা ধার দেবো?

সুখদা বললে—মা-মণি না জানতে পারে, কিন্তু আমি সব জানি ম্যানেজারবাবু? আমি সব শুনেছি—

মা-মণি এবার বলে উঠলো—কী বলছিস তুই মা? ভূপতিকে তুই কী বলছিস? ও কাকে টাকা দিয়েছে? নরেশ দত্ত কে?

সুখদা বললে—তুমি চুপ করো মা-মণি! তুমি বুড়ো মানুষ, তুমি কিছুই টের পাও না, কিন্তু আমি সব জেনেছি। তোমার চোখের আড়ালে অনেক কিছুই হচ্ছে, যা তোমার কানে পৌঁছয় না।

মা-মণি বললে—তা তুই কী জানিস তাই-ই বল না—

এতক্ষণে দরজা দিয়ে দেখা গেল কে যেন আসছে।

মা-মণি সেদিকে চেয়ে ঠিক ঠাহর করতে পারলে না। বললে—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

তরলা বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সে সামনে এসে বললে—ও ভাগ্নেবাবু মা-মণি!

মা-মণি বললে—কে? আমাদের সুরেন? তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে

আসতে বল—

সুরেন আর দাঁড়ালো না সেখানে। আস্তে আস্তে ভেতরে এসে ঢুকলো।

মানুষের জীবনে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেই একঘেয়েমির ক্লান্তিকরতা। কিন্তু যেখানে সেই মানুষ ইতিহাস, সেখানে নাটকও ঘটে। যুদ্ধের পর কলকাতার মানুষের জীবনে ক্লান্তিকরতা নেমে এলেও নিঃশব্দে কত বাড়ির, কত সমাজের অন্দর-মহলে নাটকের মহলা চলেছে তার কে হিসেব রেখেছে! বাইরে থেকে তা তো বোঝা যায় না, দেখাও যায় না।

একদা এমনি করেই এ বাড়িতে সুখদার আবির্ভাব হয়েছিল। সেদিন কেউই জানতে পারেনি যে, একদিন তাকে নিয়েই আবার এত অশান্তির নাটক জমে উঠবে।

সুরেন সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলে—কি রে? কিছু বলবি?

সুরেন বললে—সুখদাকে ডাকতে এসেছি—

—সুখদাকে? কেন?

ভূপতি ভাদুড়ীও অবাক হয়ে গেছে। বললে—সুখদাকে? তোর কীসের দরকার সুখদাকে?

সুরেন মামার দিকে না চেয়ে মা-মণিকে বললে—একজন সুখদাকে ডাকতে এসেছে—

—কে? কে ডাকতে এসেছে?

প্রশ্নটা যেন সুরেনকে করা হলো না। করা হলো সুখদাকে। মা-মণি সুখদাকে জিজ্ঞেস করলে—কি রে? তোকে কে ডাকতে এসেছে?

কিন্তু উত্তর দিলে সুরেন। বললে—যার সঙ্গে সুখদার বিয়ে হয়েছে সে-ই ডাকতে এসেছে।

মা-মণি যেন আকাশ থেকে পড়লো। এমন একটা খবর শোনবার জন্যে যেন তৈরি ছিল না মা-মণি! বললে—কই রে? কে সে? কোথায়?

সুরেন বললে—নিচেয়, আমার ঘরে বসে আছে।

মা-মণি বললে—ভূপতি, তুমি নিয়ে এসো, নিয়ে এসো তাকে, নিয়ে এসো—

তারপর সুখদার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ রে, জামাইকে বাইরে বসিয়ে রেখে এলি কেন? এখানে নিয়ে আসবি তো—যাও যাও ভূপতি, নিয়ে এসো জামাইকে—

ভূপতি কী করবে যেন ভেবে পেলে না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এল।

সেই আমেরিকা থেকে সুব্রত চিঠি লিখেছিল দিদিকে। পমিলিকে। অনেক দিন চিঠি দিতে পারেনি। নতুন জায়গায় গিয়ে সব যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। অমন হয়। একেবারে অন্ধকার থেকে আলোতে গেলে যেমন হয় আর কি!

শেষকালে লিখেছিল—সুরেনের খবর কী রে? সেই ভালোমানুষ ছেলেটার কথা মনে পড়লে মনে হয়, সে এখানে এলে হয়তো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলতো। সে কি বি-এ পাশ করেছে? তার ঠিকানা সঠিক জানি না বলে তাকে চিঠি লিখতে পারিনি। তোর সঙ্গে দেখা হয় নাকি? সে কি আমাদের বাড়িতে আসে?

ওই পর্যন্ত। আর বেশি কিছু লেখেনি।

পরের দিন ক্লাবে যাবার পথে গাড়িটা নিয়ে বেরোল পমিলি। ড্রাইভারকে বললে—একবার শ্যামবাজারের দিকে চল তো জনার্দন—

জনার্দন যথারীতি পার্ক-স্ট্রীটের দিকে এগোচ্ছিল, গাড়িটা আবার ঘুরিয়ে নিলে। জনার্দন রায়-সাহেবের বাড়ি অনেক দিন চাকরি করছে। এ-বাড়ির হাল-চাল জেনে গেছে। জনার্দন জানে এ-বাড়ির মেয়েকে নিয়ে কোথাও যেতে গেলে যাওয়ার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করতে নেই। সেখানে গিয়ে কোনও বাড়ির ভেতরে তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়ে এলেও কোনও কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই। চাকর চাকরই। চাকরের কাজ হুকুম তামিল করা। এমন কি গাড়ি চালাবার সময় পেছনে ফিরে তাকাতেও নেই, পেছন ফিরে তাকিয়ে কথাও বলতে নেই। ওতে মনিবের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

কত দিন পুণ্যশ্লোক রায় কংগ্রেস অফিসে রাত বারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে তারপর বাড়ি এসেছে। কত লোক জনার্দনকে জিজ্ঞেস করেছে—তোমার বাবু কী বলছেন?

জনার্দন জিজ্ঞেস করেছে—কীসের কী?

তারা জিজ্ঞেস করেছে—তুমি তো সব সময় কাছাকাছি থাকো, তুমি কিছু শোননি?

—আমি কী শুনবো?

তারা বলেছে—না, জানো এবার ইলেকশানে কাকে নমিনেশন দেবার কথা উঠেছে?

জনার্দন বলেছে—তা শুনিনি কিছু।

জনার্দন জানতো ওরা সব খবরের কাগজের লোক। ওরা মিনিস্টারদের ড্রাইভারদের কাছ থেকে খবর নেবার চেষ্টা করে। তাদের অসাধ্য কিছু নেই। কেউ চায় চাকরি, কেউ চায় পারমিট। সাহেব যদি ইচ্ছা করে তো এক-একজনকে রাজা করে দিতে পারে। সাহেবের ইচ্ছে হলেই চারশো টন সিমেণ্ট দিতে পারে। কিংবা লোহার পারমিট। তারপর আছে চাকরি। সে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টেই হোক আর ফুড-ডিপার্টমেণ্টেই হোক।

জনার্দন বলে—আমার কাছে কেন জিজ্ঞেস করছেন, আমি কিছুই জানি না—

কিন্তু শেষকালে দু'একটা খবর বেরিয়ে গিয়েছিল খবরের কাগজে। সে-সব খবর বেরোবার পর সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। একেবারে লিস্ট বেরিয়ে গিয়েছিল নামের। কাকে কাকে পারমিট দেওয়া হয়েছিল সিমেণ্টের, অথচ তারা বাড়িই করেনি! তারপর কনফারেন্স। এক-একটা কনফারেন্স হলেই দু'তিন শো লোক সারা বছরের রোজগার করে ফেলতো। কাকদ্বীপের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এক লাখ বাঁশ সাপ্লাই-এর অর্ডার পেয়ে গিয়েছিল একবার। তার নামও বেরিয়ে গিয়েছিল।

পুণ্যশ্লোকবাবু জনার্দনকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ রে জনার্দন, তুই কাউকে কিছু বলেছিস?

জনার্দন তো অবাক। কাকে আবার সে কী বলবে? বললে—না হুজুর, আমি তো কাউকে কিছু বলিনি!

—তাহলে শুকদেব সরকারের নাম ওরা জানলো কী করে? শুকদেব সরকারের বাড়ি যে গিয়েছিলাম তা খবরের কাগজের লোকদের তো জানবার কথা নয়!

—আজ্ঞে, তা আমি কী করে বলবো?

পুণ্যশ্লোকবাবু বলেছিল—তাঁকে আমি বাঁশের সাপ্লাই করিয়ে দিয়েছি সে তো কারো জানবার কথা নয়!

জনার্দন বলেছিল—কিন্তু আমি কাউকেই কিছু বলিনি কখনও—

—আচ্ছা যা—

কিন্তু সেইদিন থেকেই পুণ্যশ্লোকবাবুর ড্রাইভার বদলে গেল। বাঙালী ড্রাইভার থাকার অসুবিধেটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল পুণ্যশ্লোকবাবু। হুজুরদের গাড়িতে বসে যে-সব কথা হয় তা শুনতে পায় ড্রাইভার। বাঙালী ড্রাইভার হলে তা বুঝতেও পারে। কোনও কথা মন খুলে বলবার উপায় নেই।

তখন থেকে সাহেবের গাড়ি চালাবার জন্যে এল নতুন ড্রাইভার। সে পাঞ্জাবী। এক বর্ণও বাঙলা বোঝে না। গভীর ষড়যন্ত্র হলেও তার কোনও মানে বুঝতে পারে না পাঞ্জাবী ড্রাইভার। পুণ্যশ্লোকবাবু অনেক করে পরীক্ষা করে নিয়েছিল তাকে। মাত্র কয়েক মাস হলো কলকাতায় এসেছে। সেই-ই ড্রাইভারের চাকরি পেয়ে গেল পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছে।

তখন থেকে বাড়ির ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে নিয়ে আসা-যাওয়ার কাজ পড়লো জনার্দনের ওপর।

কিন্তু স্বভাব বদলায়নি। আগে যেমন সাহেবের কাছে, মেমসাহেবের কাছেও তেমনি। পর্মিলি মেমসাহেব কোথায় যায়, কাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামানো কাজ নয় জনার্দনের। গঙ্গার ধারে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে পর্মিলি মেমসাহেব বলে—জনার্দন, এবার তুই যা—

জনার্দন অনেক দূরে মাঠের মধ্যে গিয়ে বসে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিকে কিছু দেখতে পাবার উপায় নেই। চুপ করে সে সেখানে বসেই থাকে। আর অনেক দূরে গাড়িটার ভেতরে পর্মিলি মেমসাহেব আর তার বন্ধু বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী করে তা জানবার জন্যে জনার্দনের বিন্দুমাত্র কৌতূহলও হয় না।

তারপর যখন গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে তখন জনার্দন আস্তে আস্তে উঠে গাড়ির কাছে যায়। তখন আবার হুকুম মত গাড়িতে স্টার্ট দেয়। যখন যেদিকে যেতে বলে সেইদিকে যায়।

—বাঁ দিকে। বাঁ দিকে।

রাস্তাটা ঠিক মনে ছিল পর্মিলির। মাধব কুণ্ডু লেন। সরু গলি একটা। আশেপাশে চালা-ঘরের দোকান। কোনওটা মুড়কি-বাতাসার, কোনওটা চায়ের। তারই পাশ দিয়ে দিয়ে একেবারে বাঁকের মুখে বিরাট বাড়িখানা।

বাড়িটার সামনে লোহার গেট।

পর্মিলি জনার্দনকে থামতে বললে। তারপর জনার্দনকে বললে—দেখ তো

জনার্দন, ভেতরে সুরেনবাবু আছে কিনা—

জনার্দন হুকুমের চাকর। দারোয়ানটা দাঁড়িয়ে ছিল।

জনার্দনের কথা শুনে কাকে যেন ডেকে জিজ্ঞেস করলো—ভাগেনবাবু আছে?

—কে? কে ডাকছে?

কে একজন লোক ভেতর থেকে সামনে এল। বললো—কে? কাকে চাই?

তারপরেই নজরে পড়লো বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ভেতরে একটা মেয়ে।

কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে গেট পেরিয়ে সোজা গাড়িটার সামনে মেয়েটার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

—সুরেনবাবু আছেন? সুরেন সান্ন্যাল?

লোকটা বললে—কীসের দরকার বলুন তো? আপনি কে?

পর্মিলির খারাপ লাগলো প্রশ্নটা। বললে—আমি যে-ই হই, সুরেনবাবু আছে কিনা তাই বলুন।

লোকটা বললে—তা বললে তো শুনবো না, আপনি কোত্থেকে আসছেন আগে বলতে হবে। তার সঙ্গে আপনার কীসের দরকার?

পর্মিলি বললে—সে-সব শুনে আপনার কী লাভ? সে আছে কিনা আমি তাই জানতে চাই।

—যদি বলি আছে?

পর্মিলি রেগে গেল। বললে—আপনি তার কে হন?

—আমি?

লোকটা দাঁত বার করে হেসে উঠলো। বললে—তা বললে কি আপনি বুঝতে পারবেন? আমি এ-বাড়ির মালিক। আমার নাম কালীকান্ত বিশ্বাস—

পর্মিলি বললে—ঠিক আছে, একবার তাকে ডেকে দিন!

লোকটি বললে—কী দরকার তাই আগে বলুন—

এমন সময় হঠাৎ ও-পাশ থেকে কে একজন বললে—এ কী? পর্মিলি?

পর্মিলি মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সুরেন।

বললে—তোমার খোঁজেই তো এসেছিলাম। সুব্রত চিঠি দিয়েছে—কী ব্যাপার তোমার, তুমি তো আর গেলে না আমাদের বাড়ি—

পর্মিলির যেন তখনও সন্দেহ হচ্ছিল।

বললে—আমি ভাবছিলাম এ-বাড়িটা চিনতে পারবো কিনা। সেই কতদিন আগে এসেছিলুম।

সুরেন এমনিতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। একে কালীকান্তবাবু সব দেখছে সব শুনছে, তার ওপর পর্মিলি এসে গেছে, এখন তাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাবে না কী করবে বুঝতে পারলে না।

বললে—তুমি কি আমাদের এখানেই এসেছিলে?

পর্মিলি বললে—তোমাদের এখানে আসবো না তো কোথায় আসবো? চলো, আমার সঙ্গে চলো।

সুরেন যেন বেঁচে গেল প্রস্তাবটা শুনে। জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

পর্মিলি বললে—তোমার এখন কোনও কাজ নেই তো?

সুরেন বললে—কাজ আর তেমন কী থাকবে!

কালীকান্ত বিশ্বাস এতক্ষণে সাহস পেয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে। সে যেন বুঝতে চেষ্টা করছিল এ মেয়েটা কে? সুরেনের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক।

বললে—এই যে ভায়া, কী খবর? ইনি কে?

পর্মিলিও একই সঙ্গে সুরেনকে জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে?

সুরেন বললে—ইনি এ-বাড়ির জামাই—

—জামাই!

কথাটা শুনে যেন চমকে উঠলো পর্মিলি। আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলে লোকটার দিকে। তারপর যা বোঝবার বুঝে নিলে। আর তারপর বললে—চলো, বেশিক্ষণ ধরে রাখবো না—

সুরেন গিয়ে গাড়িতে উঠলো। জনার্দন স্টার্ট দিতেই গাড়িটা আবার ঘুরে গিয়ে পড়লো বড় রাস্তায়। জীবন যখন অনেক পথ পরিক্রমা করে অনেক দূরে এগিয়ে যায়, তখন বোধহয় পেছন ফিরে একবার দেখতে ভালো লাগে।

গাড়িটা তখন ট্রাম-রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলেছে। সুরেন বললে—সুব্রত কী লিখেছে?

পর্মিলি বললে—এই নাও না, পড়ে দেখ—

বলে ব্যাগ থেকে বার করে দিলে চিঠিটা। সুব্রতর হাতের লেখা চিঠি। লিখেছে তার দিদিকে। নিজের কথা লিখেছে, আমেরিকার মানুষের কথাও লিখেছে। পৃথিবীর সমস্যার কথাও লিখেছে। আর শেষকালে লিখেছে সুরেনের কথা। সে তোর কাছে আসে কিনা। কোথায় কত দূরে আনন্দের মধ্যে রয়েছে সে, তবু কলকাতার মাধব কুণ্ডু লেনের একটা গরীব ছেলের কথা মনে রেখেছে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—এই-ই প্রথম চিঠি দিলে নাকি সুব্রত?

পর্মিলি বললে—না, প্রথম কী করে হবে? আগে অনেক চিঠি দিয়েছে, তখন নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন আবহাওয়ায় ডুবে ছিল, এখন বোধহয় একটু হালকা হয়েছে, তাই এখানকার কথা মনে পড়েছে—

সুরেন বললে—আমি ভাবতে পারিনি তুমি এতদিন পরে আবার আমাদের বাড়ি আসবে—

পর্মিলি বললে—কিন্তু তোমারই তো যাওয়ার কথা ছিল আমাদের বাড়িতে—

সুরেন বললে—আমাদের বাড়িতে যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেল ইতিমধ্যে—

—কী কাণ্ড?

সুরেন বললে—সেই সুখদা বলে যে মেয়েটার কথা বলেছিলুম, সে এসে গেছে—

—সে এসে গেছে মানে?

সুরেন বললে—যে লোকটা তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেও এসে গেছে। ওই যে গেটের কাছে যে-লোকটার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে, ওই লোকটাই সেই লোকটা—

—তাই নাকি? আমি খানিকটা আন্দাজ করেছিলুম। ও লোকটাও তোমাদের বাড়িতে এসে জুটেছে নাকি?

সুরেন বললে—ওরা সস্ত্রীক এসে জুটেছে এখন। মা-মণি ওদের দু'জনকেই বাড়িতে রেখেছে, যেতে দেয়নি।

পর্মিলি বললে—তাহলে এখন থেকে ওরা তোমাদের বাড়িতেই থাকবে নাকি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে বললে—সেই জন্যেই খুব ভাবনায় আছি। বোধহয় ও-বাড়িতে আর আমার থাকাও চলবে না। আমার মামাও বোধহয় আর ওখানে থাকতে পারবে না। চাকরি চলে যাবে। অথচ মামার ধারণা ছিল বাড়ির মালিকের সমস্ত সম্পত্তি আমার হাতে চলে আসবে—

পর্মিলি বললে—কেন? ওরা কি বাড়ি থেকে নড়বে না?

সুরেন বললে—মা-মণি ওদের যেতে দেবে না। যতদিন বাঁচবে ততদিন বাড়িতে রেখে দেবে আর তারপর বোধহয় সব সম্পত্তি ওদেরই নামে উইল করে দিয়ে যাবে—

পর্মিলি বললে—কিন্তু ও-মেয়েটা তো মা-মণির নিজের মেয়ে নয়?

সুরেন বললে—আর ও-লোকটাও লম্পট। একটা পয়সা উপায় করবার ক্ষমতা নেই, খালি বসে বসে মা-মণির পয়সায় খাবে। এতদিন ওই সুখদাকে বিয়ে করার জন্যে যে-ক'টা টাকা পেয়েছিল সে-টাকাগুলো ফুরিয়ে যাবার পরই এখানে এসে উঠেছে। এখন ওই কালীকান্ত বিশ্বাস কথায় কথায় মামার ওপর হুকুম চালায়—। আমাকেও কথা শোনায় খুব। তাই তো বললুম খুবই অশান্তিতে কাটছে—

পর্মিলি বললে—তাহলে কী করবে ভাবছো?

সুরেন হাসলো। বললে—তোমাকে আর আমার ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমার নিজের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নেই।

পর্মিলি বললে—আমার ভাবনা? আমার আবার ভাবনা কী? আমার কোনও ভাবনাই নেই—

সুরেন বললে—ভাবনা ছাড়া কি মানুষ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই তোমার ভাবনা আছে, তুমি মুখে বলো না আমার মত, এই যা তফাত আমাদের মধ্যে—

তারপর একটু থেমে বললে—আমার একটা বদ স্বভাব আছে, আমি সকলকে আমার মনের কথা অকপটে বলে ফেলি, আমার দুঃখের কথা সবাই জেনে যায়—

পর্মিলি বললে—আমার কিছু দুঃখকষ্ট থাকলে নিশ্চয়ই তুমি জানতে—

সুরেন বললে—তা থাকলেও আমাকে তুমি বলতে যাবে কেন? আমি তো তোমাদের দলের লোক নই, তোমাদের স্তরের লোকও নই—আমি বাপ-মা মরা গেরস্থ বাড়ির ছেলে। চিরকাল পরের অন্নদাস হয়েই কেটে গেল—

পর্মিলি বললে—বলে যাও, বলে যাও—

সুরেন বললে—তুমি রসিকতা করছো, কিন্তু আমি নিজের মনে মনেই ভাবি, কেন তুমি এত কষ্ট করে আমাদের বাড়ি আসো, কী তোমার স্বার্থ। আমি তোমাদের সংগে মেশবারও যোগ্য নই—

পর্মিলি বললে—তাহলে ধরে নাও আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।

সুরেন বললে—ঠাট্টা কোর না সারা জীবন, জন্ম থেকে শুরু করে সারা জীবন লোকের ঠাট্টা আর অবহেলা শুনতে শুনতেই কেটেছে, এখন আর কারো ঠাট্টা ভালো লাগে না। শুধু সুব্রত ছিল একজন যে আমাকে ঠিক বুঝতে পেরেছিল। তা সেও তো এখন এখানে নেই—

পর্মিলি বললে—সেই সুব্রত চিঠি লিখেছে বলেই তো তোমার কাছে এসেছি—

সুরেন বললে—তা আমি জানি, তা না হলে তুমি এত জায়গা থাকতে আমার এখানেই বা এলে কেন? তোমার তো আর যাবার জায়গার অভাব নেই—তোমার কত ক্লাব আছে—

তারপর হঠাৎ বললে—কোথায় যাচ্ছি আমরা?

পর্মিলি বললে—তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি না, তোমার কোনও ভয় নেই—আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে—

—তোমাদের বাড়িতে?

পর্মিলি বললে—কেন, যেতে নেই?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ? ব্যাপার কী?

পর্মিলি বললে—হঠাৎ বটে! আজকে একজন আসছে আমাদের বাড়িতে, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।

সুরেন বললে—সে কে?

পর্মিলি বললে—আমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। সেইসব কথাই হবে আজকে—

সুরেন চমকে উঠলো। বললে—তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে?

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ—

সুরেন বললে—কিন্তু আমি সেখানে থেকে কী করবো? তোমাদের দু'জনের বিয়ে হবে, তার মধ্যে আমি কী কাজে লাগবো?

পর্মিলি বললে—তুমি বলবে পাত্রটি কেমন!

সুরেন বললে—সে কী কথা! আমার কথায় তুমি বিয়ে করবে? আমি যদি বলি পাত্রটি খারাপ তো তাহলে তুমি বিয়ে ভেঙে দেবে?

পর্মিলি বললে—দেবো!

সুরেন বাধা দিয়ে উঠলো। বললে—না না, আমি সে দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমাকে মাপ করো তুমি। বিয়ের মধ্যে কারো থাকাই উচিত নয়। আর তা ছাড়া আমিই বা তোমার কে বলো না যে, আমার কথা তুমি শুনতে যাবে!

পর্মিলি বললে—না তবু তুমি না বলে দিলে আমি বিয়ে করবো না।

সুরেন বললে—আমি কি লোক চিনতে পারবো?

পর্মিলি বললে—পারবে, পারবে। তোমার মতন ছেলেরাই লোক চিনতে পারে। আসলে সমস্ত জিনিসটাই আমার কাছে গোলমেলে মনে হচ্ছে। কী করবো কিছু ঠিক করতে পারছি না। কার কাছেই বা আর পরামর্শ নেবো।

—কিন্তু তোমার বাবা?

পর্মিলি বললে—বাবা তার নিজের ইচ্ছে আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চায় না। তাছাড়া বাবার অত সময়ও নেই ভাববার। বাবার নিজেরও অনেক ভাববার বিষয় আছে। তাই নিয়ে ভেবে ভেবেই বাবা অস্থির। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা কখনও মাথা ঘামায়নি।

সুরেন বললে—কিন্তু আমার যে ভয় করছে—

পর্মিলি বললে—কিছু মনে কোর না, তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়িতে নিয়ে এলুম বলে নিজেরই খারাপ লাগছে; তাছাড়া আমি জানি তুমি কোনও খারাপ পরামর্শ দেবে না।

সুরেন বললে—কিন্তু আমি ভাবছি এত লোক থাকতে তুমি বেছে বেছে

আমাকেই বা পছন্দ করলে কেন?

পর্মিলি বললে—কেন তোমাকে পছন্দ করেছি তা বাড়িতে গিয়ে বলবো—তারপর জনার্দনকে বললে—জনার্দন, বাড়ি চলো—বাঁদিকে—

জনার্দন কৈলাস বোস স্ট্রীটের মধ্যে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিলে।

তখনও জানতো না সুরেন যে, মানুষের সংসারে জীবনের কোনও ধরা-বাঁধা কানুন নেই। কানুন যদি কিছু থাকে তো সে বে-কানুনের কানুন। এক থেকে শূন্য পর্যন্ত যে অঙ্ক সে-অঙ্ক মানুষের তৈরি অঙ্ক। কিন্তু মানুষ তো নিজের ভাগ্য-বিধাতা নয়।

ইস্কুলে এক সঙ্গে পড়া তার ক্লাসেরই একটা ছেলে একবার পরীক্ষায় ফেল করেছিল। কী কান্না তার। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। বাপ-মা মারা যাওয়াতেও এত কাঁদেনি সে! সেই নিতাই!

তার কান্না দেখে সুরেনেরও সেদিন ভয় হয়ে গিয়েছিল। তবে কি এর কোনও প্রতিকার নেই? মানুষের দুঃখ-দুর্দশার জন্যে কি মানুষই দায়ী নয়? যদি দায়ী না হয় তো দায়ী কে? কে যে দায়ী সে-প্রশ্নের উত্তর সুরেন সারা জীবন ধরে খুঁজছে। উপনিষদের ঋষির খোঁজা নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খোঁজাও নয়। আর আর দশ-পঁচিশজন বিদ্বান-বুদ্ধিমানের খোঁজাও হয়ত নয়। সহজ-সরল সংসারী মানুষের সেই খোঁজা। চারপাশের মানুষের মধ্যেই দেবতাকে খোঁজা। যে-মানুষ দেবতা নয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের তেজে যে-মানুষ দেবত্ব লাভ করেছে তার কাছে সন্ধান নেওয়া।

কিন্তু তেমন মানুষ কোথায়?

যখন ছোট ছিল সে তখন থেকে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িটা দেখে এসেছে। দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়েছে। মা-মণির দুঃখ যেমন বুঝতে চেষ্টা করেছে, তেমনি মামা ভূপতি ভাদুড়ীর যন্ত্রণাটাও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে। ঠিক তেমনি করে আবার সুখদার পাগলামিটারও একটা মানে করতে চেয়েছে। জানতে চেয়েছে কোথায় কিসের দুঃখ ছিল বুড়োবাবুর। শুনতে চেয়েছে পর্মিলির কথা। কালীকান্ত বিশ্বাসের কথা। সুব্রতর কথা। দেবেশের কথা, পূর্ণবাবুদের কথা। পৃথিবীর তাবৎ মানুষের কথা।

আর ঠিক সেই কারণেই যেদিন পর্মিলি তাকে নিজে এসে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললো, সেদিন অনিচ্ছে যতখানি ছিল, আবার ঠিক ইচ্ছেও ছিল ততখানি। ঠিক সেই সাজানো-গোছানো বাড়ি। সেই আগেকার মতন। যখন সুব্রতর সঙ্গে আসতো। কিন্তু আগে পর্মিলির ঘরে কখনও আসেনি।

পর্মিলি বললে—বোস—

বলে কোথায় বাইরের দিকে চলে গেল। হয়ত খাবারের বন্দোবস্ত করতে গেল।

সুরেন বসলো একটা চেয়ারে। পর্মিলির পড়ার টেবিল-চেয়ার, পড়ার বই-এর চেয়ে সাজ-গোজের সরঞ্জামই বেশি। এটা পর্মিলির পড়ার ঘর। কেমন একটা নতুন ধরনের গন্ধ ভাসছে সারা ঘরময়। বেশ মিষ্টি-মিষ্টি, আবার বেশ ঝাঁজ ঝাঁজ। পর্মিলির কাছে এলে বরাবর এই গন্ধটাই বেরোয়।

হঠাৎ পর্মিলি ভেতরে ঢুকলো। ঢুকেই একেবারে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লো। বললে—তোমার চায়ের কথা বলে এলাম রঘুকে—

সুরেন বললে—সে ভদ্রলোক কখন আসবেন?

পর্মিলি হাসলো। বললে—ভদ্রলোকই বটে, একেবারে বনেদী ভদ্রলোক—

সুরেন কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে?

পর্মিলি বললে—আসলে ভদ্রলোকই নয় সে।

আরো অবাক হয়ে গেল সুরেন। বললে—সেকী, ভদ্রলোক নয়?

পর্মিলি বললে—সে একজন পোয়েট। পোয়েট কখনও ভদ্রলোক হয় না।

সুরেন বললে—আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না কিছু। সেকস্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওরাও তো কবি, কিন্তু তুমি কি ওদের ভদ্রলোক বলতে চাও না?

পর্মিলি বললে—সে তো ফেমাস হওয়ার পর। ফেমাস হওয়ার পর তো সবাই ভদ্রলোক। যতক্ষণ না মানুষের টাকা কিংবা নাম হয়, ততক্ষণ কেউ কি তাদের ভদ্রলোক বলে? ততক্ষণ তো সবাই ছোটলোক।

—তাহলে তুমি কেন তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?

পর্মিলি বললে—আমি তো টাকাকে বিয়ে করছি না, নামকেও বিয়ে করছি না। আমি বিয়ে করছি একজন পুরুষ-মানুষকে।

—তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কী করে?

পর্মিলি বললে—এমনি রোজ যখন কলেজ যেতুম সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো, আমার দিকে চেয়ে দেখতো।

—তারপর?

—তারপর একদিন আমার সঙ্গে এসে কথা বললে। আমিও কথা বললুম। আমার ভালো লাগলো কথা বলতে। তারপর রোজ দেখা হতে লাগলো, রোজ কথা হতে লাগলো।

সুরেন বললে—তারপর!

পর্মিলি বললে—তারপর, সে বললে সে কবিতা লেখে।

—আর কী করে? কোনও চাকরি-টাকরি?

পর্মিলি বললে—পাকিস্তান থেকে এসেছিল, এসে কাজ-টাজ কিছু পায় না, একটা রেস্টুরেণ্টে কাজ করতো, এখন সে-কাজটাও গেছে। এখন একবারে ফ্রি: তবু পোয়েট, পোয়েট্রি লেখে আর ঘুরে বেড়ায় কাজের চেষ্টায়—

সুরেন বললে—কিন্তু তোমার বাবা? তোমার বাবা কি এ-বিয়েতে মত দেবে?

পর্মিলি বললে—পাগল হয়েছ? বাবারা কখনও এ-সব বিয়েতে মত দেয়? কোনও বাবাই দেয় না।

সুরেন বললে—তাহলে কেন এ-বিয়ে করতে যাচ্ছ?

পর্মিলি বললে—বিয়ে তো করছি না, করবো কি না সেই কথাই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। তুমি ভাল করে বিচার করে দেখ, ছেলেটা কেমন! আমার নিজের তো ভালো লাগছে।

সুরেন কেমন যেন ভাবনায় পড়লো। বললে—তুমি আমাকে খুব মুশকিলে ফেললে কিন্তু। বিয়ে করার পর খাওয়া-পরার কথা আসে। তুমি যে-রকম বড়-লোকের মেয়ে তাতে তোমার খরচ চালাবার মত ক্ষমতা তার আছে কিনা সেটা দেখতে হবে আগে। তারপর লেখাপড়া জানে কিনা, তাও দেখা দরকার। তারপর

আছে স্বাস্থ্য। সুখদার জন্যে যখন পাত্র দেখা হচ্ছিল তখন মা-মণি বার বার স্বাস্থ্যর কথা বলতো—

পর্মিলি বললে—সেই জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি—

সুরেন বললে—বা রে, আমি কি অতশত বুঝবো? আর আমার কথা তুমি শুনবেই বা কেন? আমার নিজেরই বা কী অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া আমার নিজেরই তো এখনও বিয়ে হয়নি।

পর্মিলি বললে—কিন্তু সে যে আমাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে গেছে—

সুরেন বললে—তোমাকে বিয়ে করার জন্যে কেই বা না পাগল হবে বলো। তার তো কিছু দোষ নেই।

—কেন? আমি কী একেবারে পরী?

সুরেন বললে—তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। রূপসী তোমাকে বলা যায়। রাস্তার লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেও দেখবে, তারা আমার কথাতেই সায় দেবে। তার ওপর তুমি শুধু রূপসী নও, তোমার বাবার অনেক টাকা। রূপের সঙ্গে টাকার যোগাযোগ রয়েছে, এতে কার না লোভ হবে বলো।

—তোমারও লোভ হয়?

কথাটা বলতেই সুরেনের সমস্ত শরীরটা সিরসির করে উঠলো।

পর্মিলি আবার বললে—কী হলো, তুমি চুপ করে রইলে যে? কথা বলো, উত্তর দাও—

প্রথমটায় সুরেন মাথা তুলতে পারলো না। মুখ লুকিয়ে তার ঘর থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করলো। পর্মিলি তার মুখখানা ধরে উঁচু করে দিয়ে বললে—হলো কী তোমার? তুমি দেখছি লজ্জায় একেবারে গলে গেলে?

সুরেন নিজের হাত দিয়ে পর্মিলির হাতখানা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে—ছিঃ।

পর্মিলি কিন্তু সরে গেল না। তেমনি আবার মুখখানা তুলে ধরলো। বললে—দেখি দেখি, আমার দিকে চাও আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ—

হঠাৎ রঘু চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

তাতেও কিন্তু পর্মিলির সঙ্কোচ নেই। পর্মিলি সেই অবস্থাতেই বললে—রঘু, বাবা যদি আসে তো আমাকে খবর দিয়ে যাবি, জানিস—

যেন কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে রঘু চা রেখে দিয়ে আবার ঘরের বাইরে চলে গেল। সুরেনের মনে হচ্ছিল সে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। এমন অবস্থার মধ্যে আগে কখনও পড়েনি সে।

সুরেন অনেক কষ্টে বলে উঠলো—আমাকে ছাড়ো, ছেড়ে দাও—কেন এমন করছ?

পর্মিলি সুরেনকে ছেড়ে দিয়ে হাসতে লাগলো খিলখিল করে।

বললে—খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম তো!

সুরেন বললে—আমি এবার বাড়ি যাই—

পর্মিলি কাছে এসে হাতটা ধরে ফেললে। বললে—সে কী! যে-কাজের জন্যে তোমাকে আনা সে-কাজ শেষ হবার আগেই চলে যাবে?

সুরেন রেগে গেল। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। বললে—আমি তোমার কাছে এমন কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে নিয়ে এমন করে ঠাট্টা করতে পারলে? তোমাদের টাকা আছে বলে কি আমাদের সঙ্গে তোমরা

একেবারে গরু-ছাগলের মত ব্যবহার করবে? আমরা কি মানুষ নই? আমাদের মন বলে কি কোনও বস্তু নেই? যত বাজে কথা বলে আমাকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে এমন করে অপমান করতে তোমার বাধলো না?

বলে আর দেরি না করে সোজা ঘর থেকে সুরেন বেরিয়ে আসছিল। পেছন থেকে খিল খিল করে হাসির আওয়াজ আসতেই সুরেন পেছন ফিরে দেখলে, পাশের ঘর থেকে আর একজন বেরিয়ে এসেছে। একজন অচেনা পুরুষ-মানুষ।

তাকে দেখে চমকে উঠলো সুরেন। এতক্ষণ কি ভদ্রলোক সব শুনেছে নাকি!

পর্মিলি তাড়াতাড়ি সামনে এসেই সুরেনের একটা হাত ধরে টানতে-টানতে আবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

বললে—রাগ কোর না, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, এই হচ্ছে প্রজেশ—আর এই হচ্ছে আমাদের সুরেন। পুরো নাম সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—

ভদ্রলোক নমস্কার করলো।

সুরেনও নমস্কার করলো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ভদ্রলোকের দিকে।

পর্মিলি বললে—হাঁ করে দেখছো কী? প্রজেশকে দেখাবার জন্যেই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম। এখন কথা বলো।

প্রজেশ বললে—বসুন!

তবু সুরেন বসতে পারলে না। সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময় মনে হচ্ছিল তার কাছে। এতক্ষণ পর্মিলির সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে নিছক রসিকতা! কিন্তু রসিকতাই যদি হয় তাহলে কত মর্মান্তিক সে রসিকতা।

পর্মিলি প্রজেশের দিকে চেয়ে বললে—কী রকম, যা বলেছিলুম সত্যি না? তবে তুমি যে আমাকে বড় সন্দেহ করতে?

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—বোস বোস, এখন তো আর তোমার ভয় নেই। কী ভীতু ছেলে রে বাবা! আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে, তোমার সঙ্গে আমি প্রেম করবো। তুমি ভেবেছিলে কি শুনি? তুমি ভেবেছিলে ঘরে ডেকে এনে তোমাকে আমি রেপ্ করবো—

প্রজেশ ধমকে উঠলো—ছিঃ, পর্মিলি—

পর্মিলি বললে—তুমিই তো আমাকে সন্দেহ করেছিলে প্রজেশ। এখন তো তুমি প্রমাণ পেলে সুরেন কি টাইপের ছেলে!

সুরেন হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল পর্মিলির দিকে। বললে—বলো কী, আমাকে প্রজেশবাবু সন্দেহ করেছিলেন?

পর্মিলি বললে—খুব স্ট্রেন্জ লাগছে তো? আমারও খুব স্ট্রেন্জ লেগেছিল প্রজেশের কথা। সেই জন্যেই তো বলি সব পুরুষই স্ট্রেন্জ! তোমার কথা প্রজেশকে খুব বলতুম কিনা, তাই প্রজেশ ভেবেছিল আমি বুঝি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি—

সুরেন প্রজেশের দিকে চেয়ে বললে—আমাকে দেখে কি আপনার তাই মনে হয়? আমি তো কল্পনাই করতে পারি না কোনও মেয়ে আমাকে ভালবাসতে পারে!

প্রজেশ বললে—আরে আপনিও যেমন, এখনও আপনি পর্মিলিকে চিনলেন না?

সুরেন বললে—সত্যিই আপনাদের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি

না। আজ হঠাৎ পর্মিলি আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। প্রথমে সুব্রতর কথা বললে। তারপরে এখানে আসবার পথে হঠাৎ নিজের বিয়ের কথা বললে। বিশ্বাস করুন, আপনাদের এ-সব ব্যাপারের আমি কিছুই জানতুম না—

পর্মিলি প্রজেশের দিকে চেয়ে বললে—এখন দেখলে তো সুরেন কী-রকম সিম্‌পল্‌ ছেলে, ঠিক তোমার উল্টো—

তারপর হঠাৎ সুরেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী-রকম দেখলে প্রজেশকে, ওকে বিয়ে করতে পারি?

সুরেন এবার শেষবারের মত দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললে—আর কত ঠাট্টা করবে আমাকে নিয়ে? আমিও মানুষ, আমিও ভালো লাগা-না লাগা বুঝতে পারি, চাবুক মারলে আমার পিঠেও লাগে—

বলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনে তখনও হাসির খিলখিল আওয়াজ আসছে। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এল। তারপর বাগান, তারপর গেট, আর তারপরেই রাস্তা।

প্রজেশ বললে—ছেলেটা সিম্‌পল্‌ নয়, সিমপল্‌টন্‌—! এর আশা তো বড় কম নয়। তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল?

পর্মিলি বললে—আর বলো কেন! তোমাকে তাই তো এনে দেখালাম। অবশ্য ওরও দোষ নেই। ভেবেছিল আমিও বুঝি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছি।

প্রজেশ বললে—ও কি সুব্রতর ফ্রেন্ড? বেছে বেছে সুব্রতটা এমন নীরেট সব ছেলেদের বাড়িতে নিয়ে আসেই বা কেন?

পর্মিলি বললে—যাক গে, চলো কোনো সিনেমায় যাই—

তারপর সেইখান থেকেই ডাকলে—রঘু!

রঘু আসতেই পর্মিলি বললে—জনার্দনকে বল আমার গাড়ি বার করতে, সিনেমায় যাবো—

কৈলাস বসু স্ট্রীটের মত মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতেও কেমন যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল। আগে ম্যানেজার ভূপতি ভাদুড়ীই ছিল সব কিছু। কিন্তু সুখদা ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছু বদলে গিয়েছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কালীকান্তর চা চাই। বিড়ি চাই।

সকালবেলা উঠেই কালীকান্তর মুখ থেকে গালাগালি বেরোতে শুরু করে। বলে—হারামজাদা শুয়ার, উল্লুক কা বাচ্চা—

ধনঞ্জয় জড়সড় হয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে—আমাকে ডাকছিলেন জামাইবাবু?

কালীকান্ত বলে—তা ডাকবো না? দুপুর হয়ে গেল, এখনও চা এল না, চা কই? আমার বিড়ি কই? তুমি জানো না ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে আমার চা বিড়ি লাগে? চা-বিড়ি না খেলে আমার পাইখানা হয় না?

ধনঞ্জয় লজ্জায় আধমরা হয়ে যায়। সংসারের নানান ঝামেলার মধ্যে মনে থাকে না জামাইবাবুকে চা-বিড়ি দেওয়া হয়েছে কিনা। কালীকান্তর কতকগুলো নিয়ম আছে। সে নিয়মের আর নড়চড় হতে নেই। মা-মণির কড়া হুকুম

দেওয়া আছে, ঘুম থেকে ওঠবার আগে জামাইবাবুর বিছানার পাশে গিয়ে গরম চা আর বিড়ি দিয়ে আসতে হবে।

প্রথম দিন চায়ের সঙ্গে সিগারেট দিয়ে এসেছিল ধনঞ্জয়। ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠেছে কালীকান্ত। চিৎকার করে ডাকলে—এ্যাই ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—

ধনঞ্জয় এসে দাঁড়াল সামনে। কী যে অপরাধ তার বুঝতে পারলে না।

কালীকান্ত বললে—এ কী করেছিস? সিগারেট কেন?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে মা-মণি বলেছে—

কালীকান্ত ধম্‌কে উঠলো। বললে—সকালবেলা আমি সিগারেট খাই কখনও? আমি খাই সিগারেট? বল্‌, আমি খাই?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে, মা-মণি যে বলেছে—

কালীকান্ত তখন ধনঞ্জয়কে এই মারে তো সেই মারে। বললে—মা-মণি বললে আর তুমি দিয়ে গেলে? মা-মণি যদি আমাকে বিষ দিতে বলে তো আমাকে তুমি বিষ খেতে দেবে? বলো, বিষ খেতে দেবে?

ধনঞ্জয় বললে—আজ্ঞে, তা কি আমি দিতে পারি?

কালীকান্ত বললে—তা সকালবেলা সিগারেট দেওয়াও যা বিষ দেওয়াও তাই। এই সিগারেট না দিয়ে এক ডেলা বিষ দিলে পারতে!

ধনঞ্জয় চুপ করে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে আর কোনও কথা নেই তখন।

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ, এবার থেকে মনে রাখো সকাল আটটায় চা আর বিড়ি, বেলা এগারোটায় চা আর সিগারেট। আর দুপুর একটায় ভাত। আর বেলা তিনটেয় আবার চা আর সিগারেট—আর রাত্তিরে খেয়ে ওঠার পর শুধু দুটো বিড়ি।

কালীকান্তর এই ছিল খাওয়ার প্রোগ্রাম।

মা-মণি বলতো—তা দে না বাবা, জামাইবাবু যা চায় তাই দে না। তোদের দিতে কী? তোদের নিজের পকেটের পয়সা তো খরচ হচ্ছে না—

সুখদাকে ডেকে মা-মণি বলেছিল—হ্যাঁ রে সুখদা, জামাই বুঝি একটু রগচটা মানুষ?

সুখদার কথাটা ভালো লাগেনি। বলেছিল—তা তোমার যদি আমাদের এ-বাড়িতে রাখতে ইচ্ছে না হয় তো মুখ ফুটে তাই বলে দাও না, আমরা চলে যাই—

মা-মণি বলেছিল—ওমা, আমি তাই বলেছি নাকি? আমি তোদের কখন চলে যেতে বললুম!

সুখদা বললে—ঘুরিয়ে বললে কি বুঝতে পারবো না ভেবেছ? আমার কি মাথায় বুদ্ধি বলে কিছু নেই?

এরপরে আর মা-মণি কিছু বলেনি সুখদাকে। মা-মণির কেবল মনে হতো শক্ত কথা বললে যদি আবার সুখদা চলে যায়! তাহলে কী নিয়ে থাকবে মা-মণি! এই সংসার, এই এত সম্পত্তি সব যে ছারখার হয়ে যাবে। শিবশম্ভু চৌধুরীর এই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি যে খাঁ খাঁ করবে। তখন কাকে নিয়ে এই সংসার চলবে!

রাত্তিরবেলা খাবার ঘরে গিয়েও কালীকান্তর সেই তম্বি।

বাইরে থেকেই হাঁকে—ঠাকুর—

ঠাকুরের বিরুদ্ধেও কালীকান্তর অনেক অভিযোগ। ভাল রান্না করে না

ঠাকুরটা। রোজ রোজ অভিযোগ শুনে সুখদাও মা-মণিকে বলেছে—মা-মণি, তোমার জামাই-এর খাওয়া পছন্দ হচ্ছে না।

মা-মণি জিজ্ঞেস করেছে—কেন? ও তো ভালই রাঁধে—

সুখদা বলেছে—ছাই রাঁধে, তোমার জামাই বলে এবার থেকে হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসবে। ঘড়া-ঘড়া তেল-ঘি দিলেই কি রান্না হয়!

মা-মণি বলেছে—তা জমাই কী খাবে তা ঠাকুরকে গিয়ে বললেই হয়। কী-কী খেতে পছন্দ করে তা আগে থেকে বললে সেই রকম বাজার করবে ভূপতি—

সুখদা বলেছে—ভূপতির কথা আর বোল না তুমি। ভূপতির নাম শুনলে আমার গা জ্বালা করে। ওই ভূপতিটাই তো যত নষ্টের গোড়া—

—কেন?

মা-মণি আবার বললে—যেদিন যা খেতে ইচ্ছে হয় বললেই সেই রকম বাজার করবে ভূপতি। এই তো সেদিন বললে মাংস খাবে, মাংস এল। আমি তো আর বাজারে যেতে পারি না!

কিন্তু বাজারেও কেউ যাবে না এক ভূপতি ছাড়া, আবার আগে থেকে কিছু বলবেও না কালীকান্ত। মাঝখান থেকে হেনস্থা যত সব ঠাকুরের। তারই বিপদ সবচেয়ে বেশি! জামাইবাবু রন্নাবাড়িতে খেতে এলেই তার মাথায় বজ্রাঘাত। খেতে বসে হাজারটা বায়নাক্কা কালীকান্তর।

এক-একদিন পা দিয়ে থালা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে—খাবো না আমি, খাবো না—

ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপে।

বলে—আজ্ঞে, কী হলো তাই বলুন, আমি অন্যায়টা কী করেছি তাই বলুন।

—অন্যায় করোনি? এ কি পাইকিরি খাওয়ানো পেয়েছ? এখনও ডাল দিয়ে খাওয়া হলো না, এর মধ্যে চচ্চাড়ি দিয়ে গেলে? একের পর এক দেবে তো! যাও খাবো না আমি—

বলে সত্যিই এক-একদিন উঠে পড়ে। উঠে পড়ে একেবারে কলঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে ফেলে। তারপর সোজা নিজের ঘরে চলে যায়।

তখন ঠাকুরেরই মাথাব্যথা। সে জামাইবাবুর পেছন-পেছন দৌড়য়। বলে—জামাইবাবু, মাপ করুন, আমার দোষ হয়ে গেছে, মাপ করে দিন এবারকার মত—

কালীকান্ত যত এগিয়ে যায় ঠাকুরও তত পেছন-পেছন ছোটে।

বলে—মাপ করে দিন হুজুর—এবারকার মত মাপ করে দিন, আর কোনও দিন গাফিলতি হবে না।

রেগে যায় কালীকান্ত। খুব রেগে যায়। বলে—তুমি কী বলে ডালের সংগে চচ্চাড়ি দিলে? দেখছো আমি ভাজা দিয়ে খাচ্ছি—

ঠাকুর বলে—বলছি তো আমার দোষ হয়ে গেছে—

কালীকান্ত বলে—ও দোষ অমন হলেই হলো? ডালের সংগে কেউ চচ্চাড়ি খায়?

ঠাকুর তখন আর উপায় না পেয়ে কালীকান্তর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। বলে—আমাকে মাপ করুন জামাইবাবু, আমার দোষ হয়ে গেছে—

কালীকান্ত পা টেনে নেয়। বলে—ছাড়ো পা, পা ছাড়ো—

টানতে গিয়ে ঠাকুরের গায়েও লাগে। এই পা-টানা আর পা-ধরার মজা দেখতে উঠোনে লোক জড়ো হয়ে যায়। কালীকান্ত তাদের ধমকায়। বলে—

তোরা কী দেখছিস রে? তোরা কী দেখতে এসেছিস? ভাগ এখান থেকে, ভাগ—

জামাইবাবুর তাড়া খেয়ে তারা যে-যার পথ দেখে। কিন্তু একেবারে চলে যায় না। আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সবই দেখে। ঠাকুরের চাকরি যাওয়ার মত ঘটনা চোখে দেখতে পারলে মজা পাওয়া যায়।

তারপর যখন ঠাকুর কিছুতেই পা ছাড়বে না তখন চেঁচিয়ে ওঠে কালীকান্ত। হাঁকে—ম্যানেজার, অ-ম্যানেজার—ম্যানেজার—

উঠোনের ও-প্রান্তে ভূপতি ভাদুড়ী তখন একমনে হিসেবের খাতা-পত্র দেখছিল। ডাকাডাকি শুনে এল। এসে কাণ্ড দেখে অবাক। বললে—কী হলো?

কালীকান্ত ভূপতি ভাদুড়ীকে দেখে বললে—এই দেখ শালা ঠাকুরের কাণ্ড দেখ—বেটা এখনও পরিবেশন করতে শেখেনি, অথচ ঠাকুরগিরি করছে—একে ছাড়িয়ে দিতে হবে ম্যানেজার—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ও করেছে কী?

কালীকান্ত বললে—ওকেই জিজ্ঞেস করো না তুমি ম্যানেজার। বেটার বড় বাড় হয়েছে। ও কত টাকা মাইনে পায় বলো তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আচ্ছা, ও কী করেছে তাই বলো না বাবাজী!

কালীকান্ত বললে—কী বললে? আমার কথা বিশ্বাস করছো না তুমি? আমি কি মিছে কথা বলেছি বলতে চাও?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে-কথা আমি কখন বললাম? আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছি, ও কী করেছে!

—ও একই কথা হলো। আমি নিজে যখন বলছি ও দোষ করেছে, তখন তার ওপর তুমি কথা বলছো? এই আমার হুকুম, ওকে চাকরি থেকে ছাড়াতে হবে। ওর মাইনেপত্তোর সব মিটিয়ে দাও তুমি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা বাবাজী, তুমি যা বলছো তা ঠিকই, কিন্তু গরীব লোক ও, ওর কথাটাও তো একবার ভাবতে হবে। বহুকাল ধরে কর্তামশাই-এর আমল থেকে কাজ করে আসছে, এখন হুট্ করে কি ছাড়িয়ে দেওয়া চলে—

কালীকান্ত বললে—চলে না মানে? আমি বলছি আমার হুকুম, তবু বলছো চাকরি ছাড়ানো চলবে না? তুমি হুকুম করবার কে শুনি? তুমি হুকুম করবার কে? আমি মালিক না তুমি মালিক? বলো, কে মালিক?

ভূপতি ভাদুড়ী খানিকক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে রইল।

কালীকান্ত গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো। বললে—বলো, কে মালিক?

ঠাকুর ততক্ষণে জামাইবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠেছে—বাবু, আমাকে বাঁচান বাবু, আমি ধনে-প্রাণে মারা যাবো—

কালীকান্ত এক লাথি মারলে ঠাকুরকে। লাথি খেয়ে ঠাকুর ছিটকে গিয়ে পড়লো উঠোনের নর্দমার দিকে।

কালীকান্ত হেসে উঠলো। বললে—দেখেছ ম্যানেজার, শালা মচকাবে তবু ভাঙবে না। বুঝলে, তোমার সব ক'টা স্টাফ বদমাইস একটাও মানুষ নেই। যেমন হয়েছে ঠাকুর, তেমনি হয়েছে ধনঞ্জয়টা। বেটা সেদিন সকালবেলা চা এনেছে, সঙ্গে বিড়ি দেয়নি। আমি পই-পই বলে দিয়েছি, মা-মণিও পই-পই করে বলেছে; ও জানে যে ঘুম থেকে উঠে চা-বিড়ি না খেলে আমার পাইখানা হয় না, তবু বিড়ি দেয়নি। এদের লাথি মেরে দূর করে তাড়িয়ে দিলে তবে আমার মনের

রাগ মেটে, জানলে ম্যানেজার!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আহা গরীব লোক, পরের বাড়ি খেটে খায়, ওদের ছেড়ে দাও বাবাজী তুমি, আর অমন করবে না—

—আর করবে না মানে? জানো তুমি ও কী করেছে?

ঠাকুর তখনও জামাইবাবুর পা জড়িয়ে ধরে পড়ে ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী তখন ঠাকুরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে—কী ঠাকুর, কী করেছিলে তুমি?

ঠাকুর বললে—আজ্ঞে ম্যানেজারবাবু, ডালের সঙ্গে ভাজা দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। আর কখনও অমন হবে না—

—এ্যাই, বাজে কথা। তা নয়, তুই চচ্চড়ি দিয়েছিলি। এ কি পাইকারী খাওয়া পেয়েছিস তুই আমার? আমি কি এ বাড়ির কেউ না?

তারপর ভূপতির দিকে ফিরে বললে—ম্যানেজার, তুমি ওকে ডিসচার্জ করে দাও, এখনি ডিসচার্জ করে দাও—দেখুক ও বেটা আমার কত ক্ষমতা—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ছেড়ে দাও বাবাজী, গরীব লোক ভুল করে ফেলেছে, আর কখনও অমন করবে না—

কালীকান্ত বললে—গরীব লোক? ভুল করে ফেলেছে? কই, তোমার বেলায় তো কই ভুল হয় না? তোমার পেয়ারের ভাগ্নের বেলায় তো ভুল হয় না। যত ভুল আমার বেলায়? আমি কেউ নই? আমি বুঝি এ-বাড়ির ফালতু লোক?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আরে, না না; মানুষের ভুল হয় না?

—না, ভুল হয় না।

বলে কালীকান্ত চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—রোজ রোজ ভুল হবে? একদিন ভুল হতে পারে, দু'দিন ভুল হতে পারে, তাবলে রোজ? আমি ওকে পইপই করে বলে দিয়েছি যে পাইকারী খাওয়া আমি খাই না আর যে-খায় সে খাক—তবু ইচ্ছে করে বেটা আমাকে জ্বালাবে—

এমনি করেই হয়ত চলতো আরো অনেকক্ষণ।

কিন্তু ওপর থেকে ধনঞ্জয় দৌড়ে এসেছে। এসেই ভূপতি ভাদুড়ীকে বললে—ম্যানেজারবাবু, মা-মণি আপনাকে ডাকছে—

ভূপতির রাগ হয়ে গেল। সেই যেদিন থেকে কালীকান্তটা এসেছে সেইদিন থেকেই এমনি। কালীকান্ত যা কিছু করবে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে ভূপতি ভাদুড়ীকে। এ যেন জ্বালা হয়েছে ভূপতি ভাদুড়ীর।

ভূপতি তাড়াতাড়ি অন্দর-মহলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

সুখদা এ-বাড়িতে ফিরে আসবার পর থেকেই একটা-না-একটা জিনিস নিয়ে এমনি খিটিমিটি বেধে যেত।

মা-মণি বলতো—হ্যাঁ রে, জামাই-এর কি কষ্ট হচ্ছে এখানে থাকতে?

সুখদা বলতো—কষ্ট হবে না? এখানে কেউ কি আমাদের ভালো চায়?

মা-মণি অবাক হয়ে গালে হাত দিত।

বলতো—ওমা, কী বলিস তুই? তোকে কে কী বলেছে যে তুই ওই কথা বলছিস? তোকে আমি খেতে-পরতে দিচ্ছি নে!

সুখদা বলতো—তুমি থামো তো, খেতে-পরতে তো মানুষ কুকুর-বেড়ালকেও দেয়, খেতে-পরতে দেওয়াটাই কি সব হলো?

মা-মণি বলতো—কেন রে, খুলে বল তো কী হয়েছে?

সুখদা বলতো—কী আবার হবে, তোমার গলার কাঁটা হয়ে আছি। তোমার ঝি-চাকররাও তাই বুঝে নিয়েছে যে এ-বাড়ির সকলের গলার কাঁটা আমি। নইলে অমন করে তোমার জামাইকে হেনস্থা করে?

—আমার জামাইকে হেনস্থা করে? কে হেনস্থা করে শুনি? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? কে সে? নাম কর তুই?

সুখদা বলতো—কে আবার? কার নাম করবো? সবাই—

মা-মণি বলতো—আমি আজ ভূপতিকে বলে সবাইকে বরখাস্ত করে দিচ্ছি। দরকার নেই মা আমার চাকর-বাকর পুষে। সুখের চেয়ে আমার সোয়াস্তি ভালো—

সুখদা বলতো—তাদের দোষ দিচ্ছ কেন? তাদের কীসের দোষ? দোষ আমার কপালের—

বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু মা-মণি ছাড়বার পাত্রী নয়। জনে জনে সকলকে ডাকতো।

বলতো—দেখ, সুখদা আমার মেয়ে। মেয়ে-জামাই থাকলে যেমন ব্যাভার পায়, তেমনি ব্যাভার করবি তোরা। খবরদার বলছি, কেউ যেন মেয়ে-জামাইকে অপগেরাহ্যি না করে, এই বলে রাখছি—

তাছাড়া প্রথম দিনই ভূপতি ভাদুড়ীকে মা-মণি বলে দিয়েছিল—শোন ভূপতি, সুখদা আমার মেয়ে, আর কালীকান্ত আমার জামাই, মেয়ে-জামাই-এর আদর-যত্নের যেন ত্রুটি না হয়। বিড়ি সিগারেটের নেশা আছে জামাই এর, ঠিক মত জোগাড় দিও, বুঝলে? আমাকে যেন বলতে না হয়—

সেইদিন থেকেই ভূপতি ভাদুড়ীর ওপর উৎপাত শুরু হয়েছিল। সেই থেকেই ধনঞ্জয় ঠাকুর, অর্জুন দুখমোচন মুড়োবাবু, সকলের ওপর উৎপাত শুরু হয়েছিল। সেইদিন থেকেই বোঝা গিয়েছিল কালীকান্ত আর যাই হোক, সোজা মানুষ নয়।

কিন্তু সুখদা'র কাছে কালীকান্ত আবার অন্য মানুষ।

রাত্রে শুতে এলেই সুখদা খেঁকিয়ে উঠতো।

তখন খুব মিষ্টি গলায় কালীকান্ত বলতো—কী গো, ঘুমুলে নাকি?

কোনও উত্তর না পেয়ে কালীকান্ত আবার ডাকতো। বলতো—ওগো শুনছো—

সুখদা ওপাশ ফিরে শুয়ে বলতো—কী?

কালীকান্ত বলতো—মা-মণিকে বলেছিলে?

সুখদা বলতো—কী কথা বলবো?

কালীকান্ত বলতো—তুমি সব কথা বড় ভুলে যাও—সেই যে সেই টাকার কথা! হাজার পাঁচেক টাকা আমার দরকার ছিল—

সুখদা ঘুম-চোখে শুধু বলতো—না, টাকা হবে না—

—হবে না মানে?

সুখদা বলতো—হবে না মানে হবে না—

কালীকান্ত বলতো—তাহলে তো বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। আমি যে বাজারে দেনা করে বসে আছি ওদিকে

সুখদা বলতো—তুমি দেনা করে আছ তো আমি কী জানি! দেনা শোধ করতে না পারলে তুমি [illegible]। আমার কী? আমাকে এখন বিরক্ত কোর

না। আমার ঘুম পাচ্ছে—

—লক্ষ্মীটি, সোনামণি আমার—

বলে কালীকান্ত বউ-এর গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতো। আদর করবার ভান করতো।

কালীকান্তর হাতখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে সুখদা বলতো—যাও, এখন রস থাক, ঘর-জামাইয়ের অত রস ভালো নয়—

—তুমি রাগ করছো?

সুখদা বলতো—হ্যাঁ হ্যাঁ রাগ করছি। রাগের অপরাধটা কী শুনি? তোমার লজ্জা করে না গায়ে হাত দিতে? আমি তোমার কেনা বাঁদী নাকি? তোমার বিড়ি-সিগারেট তোমার টাকা-কড়ি, তোমার জামা-কাপড় আদায় করে দিতে পারবো না। যদি মুরোদ থাকে তো নিজে গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার করতে পারো না? পরের বাড়ি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খেতে লজ্জা করে না?

কালীকান্ত বলতো—সেই জন্যই তো টাকাটা চাইছি। তোমার মা-মণির কাছে দশটা হাজার টাকা কিছু না, কিন্তু আমার বড় উপকার হতো গো—

সুখদা বলতো—তোমার উপকার করে আমার কী লাভ? তুমি যাও না তোমার নরেশ দত্তর কাছে—

—আরে তার কথা আর বোল না!

বলে কালীকান্ত নরেশ দত্তকেই গালাগালি দিতো।

বলতো—শালা এক নম্বরের হারামজাদা। তোমাকে আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে ম্যানেজারের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে -

সুখদা বলতো—সে-সব পুরোন কাসুন্দি এখন থাক, তুমি ঘুমোও—

কালীকান্ত বলতো—আরে ঘুম এলে তো ঘুমোব। ঘুম যে আসে না। টাকার জন্যে ঘুম-টুম সব গায়েব হয়ে গেছে। মাইরি, লক্ষ্মীটি টাকাটা জোগাড় করে দেবে না?

বলে আবার সুখদার গায়ে হাত দিতে গেছে কালীকান্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে সুখদা কালীকান্তর গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে কালীকান্ত চুপ হয়ে গেছে বউএর চড় খেয়ে। খানিকক্ষণ আর কোনও কথা নেই। বোধহয় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করতো।

এমনি করে কয়েক মাস চলছিল। হঠাৎ সেদিন মাঝ রাত্রে হৈ হৈ করে শব্দ উঠেছে চারিদিক থেকে।

সুরেন তার ঘরখানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। চারিদিকের অশান্তি, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, সব মিলিয়ে ক'দিন থেকেই বড় দুশ্চিন্তায় কাটছিল তার। এ-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, এটা ভূপতি ভাদুড়ীও ঠিক করে ফেলেছিল। সুখদা আর কালীকান্ত আসার পর থেকে মান-সম্মান বজায় রেখে আর তার কাজ করা চলছিল না। অথচ এ-বাড়ি ছেড়ে গেলে কোথায় যে গিয়ে উঠবে তারও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ একটা সত্য সুরেন বুঝে নিয়েছিল যে, যেখানে শহর যত বড়, মানুষ সেখানে তত নিষ্ঠুর। এ-শহরে কেউ কারো নয়। ইঁট-কাঠ ঘেরা কলকাতা যেন নিষ্ঠুরতার কঙ্কাল হয়ে সারাদিন সুরেনের চোখের সামনে মুখটা হাঁ করে থাকতো। কিন্তু সেদিন সেই রাত্রে হঠাৎ লোক-জনের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যেতেই সে দৌড়ে ঘরের বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। চারিদিক থেকে তখন চিৎকার উঠেছে—আগুন—আগুন—

সুরেন চেয়ে দেখলে যে-ঘরটাতে সুখদা আর কালীকান্ত শুতো সেইখান

থেকেই গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে—

সত্যিই সেদিন আগুনই লেগেছিল মাধব কুণ্ডু লেনের সেই বাড়িতে।

এমন আগুন বাঙলাদেশে অনেক বাড়িতেই লেগেছে। এ-এমন কিছু নতুন কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেঠ-শীল-মল্লিক-লাহাদের বংশে এমনি করেই আগুন লেগেছিল একদিন। সে-আগুনে তখনকার দিনে নতুন করে জন্ম নিচ্ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। নতুন করে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন বাঙলাদেশ। নতুন করে জন্ম নিয়েছিল রামমোহন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ।

কিন্তু এবার অন্য রকম।

কালীকান্ত বিশ্বাসরাই বুঝি এ যুগের কালাপাহাড়।

কালাপাহাড় হয়েই কালীকান্ত বিশ্বাস এসে ঢুকেছিল একদিন এই মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরী-বাড়িতে। কথায়-কথায় ছিল তার হুকুম ছিল তার প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা। সে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল অনাহূতের মত। হয়ত অন্যমনস্কের মত বিছানায় শুয়ে-শুয়েই বিড়ি ধরিয়েছিল। যেমন রোজ ধরায়। ঘুম ভাঙার পর আর ঘুমের আগেই ছিল তার বিড়ি খাওয়ার রোগ। আর সেই বিড়ির আগুন কীভাবে বুঝি পড়ে গিয়েছিল বিছানার ওপর। আর সেই থেকেই যত বিপত্তি।

সুখদা ঘুমোচ্ছিল অঘোরে।

কালীকান্ত অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নেশা-ভাঙ করা মানুষ, একবার নেশার ঘোর এলে তখন আর রুখতে পারতো না।

হঠাৎ যেন গায়ে গরম লাগলো সুখদার। আর তার ঠিক একটুখানি পরেই জেগে উঠেছে। জেগে উঠেই দেখলে চারিদিকে শুধু ধোঁয়া। ধোঁয়ার গন্ধে নাক বুজে আসছে। আর তারপরেই খেয়াল হলো যে আগুন লেগেছে বিছানায়।

সঙ্গে সঙ্গে সে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তখন চিৎকার করতে শুরু করেছে—আগুন—আগুন—

সে চিৎকার সুরেনের কানেও গিয়েছিল। শুধু সুরেন নয়, মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির সবাই ভয় পেয়েছিল সে-শব্দ শুনে। দৌড়ে এসেছিল দুখমোচন, অর্জুন জমাদার, বুড়োবাবু—সবাই।

সুরেন যখন উঠোনে এসে দাঁড়ালো তখন বেশ ভিড় হয়েছে সেখানে।

সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়েছিল। তাকেই জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—জামাইবাবু পুড়ে গেছে—

পুড়ে গেছে শুনে ভয় পেয়ে গেল সুরেন। বললে—আগুন লাগলো কী করে?

ঠাকুর বললে—কী জানি বাবু, জামাইবাবু বোধহয় বিড়ি খেয়েছিল বিছানায় শুয়ে শুয়ে—

সুরেন আর কী বলবে? সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই চারদিকে হাঁ করে দেখতে লাগলো। মা-মণির কথাও মনে পড়লো। মা-মণি এখন কী করছে!

ততক্ষণে ভূপতি ভাদুড়ীও উঠে পড়েছে। ভূপতি ভাদুড়ী তখন চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কাকে যেন লক্ষ্য করে বলছে—ওরে, ফায়ার ব্রিগেডকে ডাক—ওরে, কে আছিস—

—মামা!

সুরেন গিয়ে কাছে দাঁড়ালো। বললে—মা-মণিকে ভেতরে গিয়ে ডেকে আনবো?

মামা যেন সে-কথা শুনতে পেলে না। নিজেই দৌড়ে গেল কোনদিকে। কোথায় গেলে ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকা যায় তাও জানে না সে। সে-এক অস্বাভাবিক অবস্থা চারদিকে। ততক্ষণে পাড়ার লোক দৌড়ে ছুটে আসছে এদিকে।

সুরেন একবার নিজের বুদ্ধিতেই ভেতরে যাবার চেষ্টা করলে। বিরাট বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়েও একবার থমকে দাঁড়ালো।

বুড়োবাবু অথর্ব শরীরটা নিয়ে দৌড়ে এসেছে।

—ভাগ্নেবাবু আগুন লেগেছে—

সুরেন বললে—বুড়োবাবু, আপনি কেন এসেছেন? আপনি বুড়োমানুষ, পড়ে যাবেন. সরে যান—

বুড়োবাবু হাঁপাচ্ছিল। বললে—কিন্তু মা-মণি যে ভেতরে—

সুরেন বললে—আমি যাচ্ছি, আপনি থাকুন—

বুড়োবাবু বললে—না, আমি যাবো ভাগ্নেবাবু, আমি ভেতরে যাবো—

কিন্তু ততক্ষণে ওপর থেকে তরলার গলা শোনা গেল। তরলা তখন চেঁচাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে নিচেয় নামছে। সঙ্গে আরো কয়েকজন।

সুরেনের নাকে তখন ধোঁয়ার গন্ধ লাগছে। চোখ জ্বালা করছে। নিচের উঠোনে লোকজনের চেঁচামেচি! আর সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুরেন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

চিৎকার করে ডাকলে—মা-মণি!

চিৎকারটা যেন চারদিকের গোলমালে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

তারপর প্রাণপণ শক্তিতে আবার চিৎকার করে ডাকলে—মা-মণি!

হঠাৎ কানে এল বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে ফায়ার-ব্রিগেডের। ঢং-ঢং আওয়াজ। প্রথমে ক্ষীণ আওয়াজ, পরে আরো স্পষ্ট হলো। তারপরে আওয়াজটা আরো কানের কাছে এসে হাজির হলো।

সুরেনের গলা তখন যেন বন্ধ হয়ে আসছে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠলো—মা-মণি মা-মণি—

মা-মণির গলাও যেন শোনা গেল।—কে? সুরেন!

তারপরে আর কিছু মনে নেই। তারপরে আর কী ঘটেছিল তাও আর জানে না। যখন জ্ঞান হলো তখন দিনের আলো হয়ে গেছে চারদিকে। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেছে তা তখন তার জানা নেই। শুধু চারদিকে চেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—মা-মণি কোথায়?

মা-মণি কাছেই ছিল। বললে—এই যে আমি—

সুরেন বললে—মা-মণি, তোমার লাগেনি তো কিছু?

মা-মণি বললে—আমার কিছু হয়নি—তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো বাবা—

সুরেন বললে—আগুন লাগলো কী করে মা-মণি?

মা-মণি বললে—ও-সব তোমায় এখন কিছু ভাবতে হবে না বাবা—তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো—

সুরেন ঘুমোবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘুমোবার চেষ্টা করলেও ঘুম এল না কিছুতেই। কেবল মাথার মধ্যে যেন ফায়ার ব্রিগেডের ঢং-ঢং শব্দ ঘুরতে লাগলো। মনে হলো যেন সমস্ত বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

ফায়ার-ব্রিগেড এসে পড়তেই যেন জিনিসটা সেদিন চুপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপ হলেই কি সব কিছুকে চুপ করানো যায়?

একদিন কালীকান্ত এল সুরেনের ঘরে। বললে—কী হে, কেমন আছ?

সুরেন বললে—আপনি কেমন আছেন?

কালীকান্ত বললে—আমি দিব্যি আছি।

—কিন্তু বিছানায় শুয়ে আর বিড়ি খাবেন না আপনি, ওটা বড় বদ জিনিস। দেখুন তো কী সর্বনাশ হতো!

কালীকান্ত বললে—আরে পাকাবাড়ি ওম্নি পুড়লেই হলো? ইঁট কি পোড়ে?

সুরেন বললে—সত্যি, বিড়ি খাওয়া আপনি ছেড়ে দিন—

—কী বলছ হে তুমি? বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দেবো? এবার থেকে ভাবছি শোবার সময় একটা ছাইদান নিয়ে শোব। পাশে ছাই ঝাড়তুম কিনা। আগুনটা একেবারে বিছানায় লেগে গিয়েছিল তাই, নইলে ছোটবেলা থেকেই বিড়ি খেয়ে আসছি কখনও এমন হয়নি ভায়া—

তারপরে যেন হঠাৎ বড় আত্মীয় হয়ে উঠলো।

বললে—একটা কথা তোমাকে বলবো-বলবো ভাবছি ভায়া, তুমি কিছু মনে কোর না—

সুরেন বললে—বলুন—

কালীকান্ত ক'দিনের মধ্যেই যেন বদলিয়ে গিয়েছিল। ভায়া, মা-মণির কত টাকা আছে বলতে পারো? ছ'লাখ টাকা হবে সব মিলিয়ে?

সুরেন হতবাক্ হয়ে গেল কালীকান্তর কথা শুনে।

কালীকান্ত আবার বলতে লাগলো—জানো ভায়া, জীবনে অনেক কষ্ট করেছি অনেক দিন না খেয়ে কাটিয়েছি, এখন দু'দিন একটু আরাম করে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে কাটাচ্ছি। কিন্তু হাত-খরচের টাকা পাচ্ছি না ভায়া, বড় টানাটানি চলেছে—

তারপর সুরেনের দিকে আরো কাছ ঘেষে এসে বললে—দুটো টাকা দিতে পারো ভায়া?

সুরেন বললে—টাকা? টাকা তো আমার কাছে নেই—

—টাকা নেই কি হে? সোমত্ত ছেলে, টাকা না হলে চালাও কী করে?

সুরেন বললে—মামা দেয়।

—কত টাকা দেয়?

সুরেন বললে—আমার যেমন দরকার হয় তেমনি চেয়ে নিই।

কালীকান্ত বললে—তাহলে এক কাজ করো না, দুটো টাকা চেয়ে নিয়ে এসো না এখন! বলো গিয়ে যে গেঞ্জি কিনতে হবে।

সুরেন বললে—গেঞ্জি তো আমার আছে—

কালীকান্ত বললে—আছে সে তো তুমি জান আর আমি জানি, তোমার মামা তো আর তা জানে না!

সুরেন বললে—কিন্তু যদি মামা দেখতে চায়?

কালীকান্ত বললে—তাহলে তোমার পুরোন গেঞ্জিটা দেখিয়ে দেবে। আর ইচ্ছে থাকলে কী না করা যায়। ইচ্ছেটাই হলো আসল। তোমাকে ভায়া একটু ইচ্ছেটা করতে হবে। বড় টাকার টানাটানি চলছে আমার—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আপনার টাকার এত কিসের দরকার?

কালীকান্ত বললে—টাকার দরকার থাকবে না? তুমি বলছ কী হে? টাকার দরকার কার না আছে? কোটিপতিরও টাকার দরকার, ভিখিরিরও টাকার দরকার—

সুরেন বললে—তা আপনি তো নিজেই মা-মণিকে গিয়ে বলতে পারেন—

কালীকান্ত বললে—তা তো পারি কিন্তু কেন বলবো? মা-মণির সব টাকাই তো একদিন আমার হবে, ছ'লাখই হোক আর ছত্রিশ লাখ টাকাই হোক, সব তো আমারই। তাহলে আর এখন টাকা চেয়ে হাতে গন্ধ করি কেন মিছি-মিছি—

সুরেন বললে -তাহলে সুখদাকে বলুন, আপনার বউকে—

কালীকান্ত বললে- ওরে বাবা, বউ আমার ওপর খুব খেপে আছে ভাই। বড় নাচার হয়েছে। আর বাগে আনতে পারছি না—

—কেন?

কালীকান্ত বললে- ওই আগুন লাগবার পর থেকেই আমার ওপর চটে আছে। আর বিড়ি সাপ্লাই করছে না। কেবল বলে বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দাও। তা এতদিনের নেশা এক-কথায় ছাড়া যায়?

সুরেন বললে—বিড়িটা ছেড়ে দিলেই পাবেন।

কালীকান্ত বললে—তা তো বলবেই হে নিজে নেশা করো না ব'লেই অমন কথা বলতে পারলে। সুখদাকে তো তাই বলি। বলি নেশা তো করলে না, নেশার মজাটাও বুঝলে না, নেশার ল্যাঠাটাও বুঝলে না-

তারপর একটু থেমে বললে—যাক্ গে, মরুক গে দুনিয়ায় যার যা খুশী করুক গে, আমি বাবা নেশা ছাড়ছি নে। সে তুমি যা ই বলো আর তাই-ই বলো, এখন দুটো টাকা কী করে পাই তাই বাতলে দাও দিকিনি। তোমার মামাটা হলো গিয়ে পাজির পা-ঝাড়া—

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। কোথা থেকে হঠাৎ ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো সুখদা। সুখদাকে দেখে যেন কেঁচোর মত হয়ে গেছে কালীকান্ত।

সুখদা এসেই কালীকান্তর কান ধরলো। বললে এখানে কী করছো তুমি? এখানে?

বলে এক থাপ্পড় মারলো কালীকান্তর গালে।

বললে—হারামজাদা কোথাকার সারা রাত জ্বালিয়ে আবার এখেনে এসে আড্ডা মারা হচ্ছে। চলো এখেন থেকে, চলো—

কালীকান্তর তখন অন্য চেহারা। বললে—আরে মারছ কেন, আমি কী করলাম? আমি তো গপ্পো করছি বসে বসে—

—আর গপ্পো করবার জায়গা পেলে না? চাকর-বাকরদের সঙ্গে তোমার গপ্পো? তুমি বাড়ির মালিক আর তুমি কিনা চাকর-ঠাকুরদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছ? ওরা তোমার ইয়ার?

সুরেন ততক্ষণে হতবাক্ হয়ে সব দেখছিল। তার দিকে চেয়ে সুখদা বললে -খবরদার বলছি, আর কখনও যদি মালিকদের সঙ্গে ইয়ার্কি দাও তো এ-বাড়িতে তোমার বাস উঠিয়ে দেবো—

বলে কালীকান্তকে নিয়ে সোজা ঘরের বাইরের উঠোন মাড়িয়ে একেবারে অন্দর-মহলে ঢুকে গেল।

সেদিন থেকেই সুরেনের দুর্ভাবনাটা শুরু হয়েছিল। দুর্ভাবনাটা নিজেকে নিয়ে। এ-ঘটনার পর মামা যেখানে হোক নিজের একটা ব্যবস্থা করে নেবে। কিন্তু সে নিজে? এরপর সে কোথায় আশ্রয় নেবে?

সুরেনের মনে হলো কলকাতার এই মানুষের মহাসমুদ্রে সে যেন একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। কোথাও কারো কাছে যেন তার আর যাবার জায়গা নেই। সুব্রত ছিল একজন সে চলে গেছে। আর পর্মিলি? তার কাছে সুরেন ঠাট্টার আর উপহাসের পাত্র।

আর মামা?

ভূপতি ভাদুড়ী তো নিজের ভাগ্নেকে অস্ত্র করেই নিজের প্রতিপত্তিটা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল!

তাহলে?

তাহলে এ-পৃথিবীতে কি কেউই তার আপন কেউই তার নিজের বলতে নেই? তাহলে কেন সে জন্মেছিল? কেন সে গ্রাম ছেড়ে এখানে এই ঐশ্বর্য-বিলাসের মধ্যে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে এসে হাজির হয়েছিল! কেন সুব্রত তাকে বন্ধুর মত ভালোবেসেছিল? কেন মা-মণি তাকে মায়ের অনুপস্থিতি ভুলিয়ে দিয়েছিল?

পরের দিন সকাল থেকেই আর বাড়ির ভেতরে থাকতে ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল বাড়িটাই যেন একটা কাঁটা। এ-বাড়ির ভাত মুখে দিতেও যেন ইচ্ছে করছে না। এই সময়ে যদি কলকাতা শহরটাই ছেড়ে চলে যাওয়া যেতো তাহলে হয়ত ভালো হতো। যে-কোনও জায়গায়, যে কোনও দেশে, যে কোনও জনপদে। যেখানে কেউ তাকে ভালোবাসবে না, কেউ তাকে তাচ্ছিল্যও করবে না। সংসারে নির্বিবাদে নিরিবিলিতে সে শুধু নিঃশ্বাস ছেড়ে আর নিঃশ্বাস টেনে একটু বেঁচে থাকবে।

মামা বোধহয় দেখতে পেয়েছিল। বললে—কোথায় বেরোচ্ছিস? এত সকালে?

সুরেন বললে—কোথাও না—

—কোথাও না, মানে? একটা কোনও জায়গায় যাবি তো? কোন্ জায়গা সেটা?

সুরেন বললে—এমনি একটু বেরোচ্ছি।

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—কাজ-কর্ম কিছু নেই অমনি বেরোচ্ছিস? মামার ঘাড়ের ওপর বসে বসে বেশ খাচ্ছিস আর ঘুরে বেড়াচ্ছিস? হ্যাঁ রে, তোর কী একটু লজ্জাও করে না রে?

সুরেন মুখ নীচু করে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আয়, আমার সঙ্গে আয় কোথাও যেতে হবে না—

ভূপতি ভাদুড়ী তাকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে তার নিজের দফতরে

নিয়ে গিয়ে ঢুকলো। ভেতরে ঢুকে নিজে তক্তপোষটার ওপর বসলো। তারপর বললে—বোস্ এখেনে আয়েস করে—

কোনও উপায় না পেয়ে সুরেনকে বসতে হলো।

গলাটা ভূপতি ভাদুড়ী একটু নীচু করলো। বললে—তোর ঘরে কালকে কে এসেছিল?

সুরেন বললে—ওই কালীকান্তবাবু, সুখদার বর—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোকে কী বলছিল?

সুরেন বললে—কিছু না, এমনি আমার কাছে বিড়ি চাইছিল। আমি বললাম আমি বিড়ি খাই না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ও-সব বাজে কথা। কাজের কথা কী বললে, তাই বল?

সুরেন বুঝতে পারলে না কাকে বলে কাজের কথা। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

বললে—কালীকান্তবাবু টাকা ধার চাইছিল আমার কাছে—

—টাকা?

যেন চমকে উঠলো ভূপতি ভাদুড়ী। বললে—তুই টাকা দিলি নাকি?

সুরেন বললে—না, টাকা আমি কোত্থেকে পাবো? আমি বললাম তোমার কাছে চেয়ে দিতে পারি—

ভূপতি ভাদুড়ী সাবধান করে দিলে। বললে—খুব হুঁশিয়ার, নেশাখোর মানুষ, টাকা যেন কখ্খনো দিয়ে বসিসনি। আর টাকা তুই দিবিই বা কোত্থেকে। কত টাকা চাইছিল? একশো?

সুরেন বললে—না, দু' টাকা!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মোটে দু' টাকা? তা দুটো টাকাই বা কম কীসে? মা-মণির অত টাকা রয়েছে তার মালিক তো একদিন ওই বেটাই হবে, তাহলে তোকে কেন জ্বালাতন করে? তুই কী বললি?

সুরেন বললে—আমি কিছু বলিনি, সুখদা এসে উল্‌টে আমায় শাসিয়ে গেল—

সবই জানতো ভূপতি ভাদুড়ী। তবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিল। জানতে চাইছিল আর কী কী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু যখন দেখলে আর কিছু ঘটেনি তখন নিশ্চিন্ত হলো।

বললে—যা এখন—

সুরেন উঠে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল। কেন যে মামা ডেকেছিল তাকে, আবার কেনই বা তাকে যেতে বললে তাও বুঝতে পারছিল না। বাড়ির ভেতরে টাকা নিয়ে যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তা যে কোন্‌দিকে মোড় ফিরবে তা কেউই বুঝতে পারছিল না।

সুরেন গেট পেরিয়ে এবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

পেছন থেকে বাহাদুর সিং বললে—সেলাম হুজুর—

এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো সুরেনের। সুরেন ফিরে এসে বাহাদুর সিং-এর কাছে দাঁড়ালো।

বললে—আচ্ছা বাহাদুর সিং, তুমি আমাকে সেলাম কর কেন? কীসের জন্যে? আমি তো এ-বাড়ির মালিক নই। আমাকে আর সেলাম কোর না তুমি। আমিও তোমার মতন সাধারণ মানুষ একজন, বুঝলে?

বাহাদুর সিং কী বুঝলো কে জানে। ভয়ে ভয়ে আবার সেলাম করলে।

বললে—সেলাম হুজুর—

সুরেন বললে- ছি ছি, ও-রকম কোর না। আমি এ-বাড়ির কেউ নই। আমি বেকার, আমি গরীব, আমি পরের অন্নদাস, মা-মণির গলগ্রহ, বুঝলে কিছু? তোমার সেলাম নিলে আমার পাপ হবে! এতদিন কিছু বলিনি, কিন্তু আজ বলছি, আমাকে আর সেলাম কোর না তুমি—বুঝলে?

বলে সুরেন আর সেখানে দাঁড়ালো না। আবার যেমন বাইরের দিকে যাচ্ছিল তেমনি চলতে লাগলো।

বাহাদুর বোধহয় তখনও কিছু বুঝলে না। শুধু অবাক বিস্ময়ে ভাগ্নে-বাবুর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে! আর তাজ্জব হয়ে গেল ভাগ্নেবাবুর কথাগুলো শুনে।

ওদিকে ততক্ষণে বেশ নাটক জমে উঠেছে মা-মণির ঘরের ভেতরে। কালী-কান্ত সোজা দাঁড়িয়ে আছে, আর বিছানার ওপর বসে আছে মা-মণি—

পাশ থেকে সুখদা কালীকান্তকে বললে—বলো, তোমার কী বলবার আছে, বলো মা মণির কাছে

মা-মণিও কালীকান্তকে বললে—বলো না বাবা, কী বলবে বলো? ভয় কীসের? আমি বকবো না। কাউকে কিছু বলবো না।

কালীকান্ত বললে—আপনি মা-কালীর দিব্যি গালুন, কাউকে বলবেন না?

মা-মণি বললে—ছি বাবা, ঠাকুর-দেবতার নামে কি দিব্যি গালতে আছে? তুমি তো আমার অবুঝ বাবা নও, তুমি তো সব বোঝ—

কালীকান্ত বললে- এতদিন আমি বলিনি আপনাকে, কিন্তু এখন আর না বলে পারছি না। আপনি আপনার ম্যানেজারটাকে তাড়ান। ও-বেটাই যত নষ্টের গোড়া—

মা-মণি বললে—কী বলছো বাবা তুমি! ভূপতি যে অনেক দিনের লোক, সেই আমার বাবার আমলের—ওকে আমি তাড়াবো কী করে? কেন, তোমাকে কি কিছু বলেছে নাকি?

কালীকান্ত বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো। বললে—আমাকে? ম্যানেজার আমাকে কিছু বলবে? আমাকে বলবার সাহস ম্যানেজারের আছে? আমি অমন দশটা ম্যানেজারকে বগলে পুরে রাখতে পারি, তা জানেন? এখনও এই কালীকান্ত বিশ্বাসের সে ক্ষমতা আছে—

মা-মণি বললে—তোমার যদি কিছু ক্ষতি না করে থাকে তো ভূপতি থাক না এ বাড়িতে! আমার এস্টেটের কাজ-কর্ম সব কে দেখবে? আর তাছাড়া এই বুড়ো বয়েসে ও কোথায়ই বা যাবে? ওর তো কেউ নেই—

কালীকান্ত বললে—সে-জন্যে আপনি ভাববেন না মা-মণি, ও অনেক টাকা কামিয়ে নিয়েছে—

মা-মণি বললে—ছি, বাবা, অমন কথা বলতে নেই, বুড়ো-মানুষের নামে যা-তা বলতে নেই!

সুখদা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার কালীকান্তকে বললে—এবার

তুমি সেই কথাটা বলো—

কালীকান্ত বুঝতে পারলে না প্রথমে। বললে—কোন্ কথাটা?

সুখদা মনে করিয়ে দিলে। বললে—সেই যে সেই ঘরে আগুন লাগাবার কথাটা?

এবার যেন মনে পড়ে গেল কালীকান্তর। কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ, ভাল কথা, সেদিন যে ঘরে আগুন লেগেছিল আমার বিছানায়, সবাই বললে আমার বিড়ির আগুন থেকে লেগেছে। কিন্তু আসলে কী হয়েছিল জানেন মা-মণি, আসলে তা ওরই কান্ড!

—ওর কান্ড মানে?

কালীকান্ত বললে—ওই ম্যানেজার বেটার কান্ড! আমাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল, তা জানেন?

মা-মণি তো অবাক। বললে—সে কী? আমাদের ভূপতি? ভূপতি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল?

সত্যিই যেন মা-মণির বিশ্বাস হচ্ছিল না। আবার বললে—তুমি সত্যি বলছো বাবা? আমার তো বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হচ্ছে না।

এবার সুখদা কথায় যোগ দিলে। বললে, তোমার তো বিশ্বাস হবেই না মা-মণি। সেই জন্যেই তো বলছিলাম যে, তুমি তোমার ভূপতিকে নিয়ে থাকো, আমাদের বিদেয় দাও—আমাদের কেন আটকে রেখেছ এ-বাড়িতে—

কালীকান্তও সেই সুরে সুর মিলিয়ে বললে—সত্যিই তো মা-মণি, আপনি আমাদের কেন এখানে আটকে রেখেছেন? আমাদের ছেড়ে দিলেই পারেন। আমরা গরীব লোক, আমাদের শাক-পাতা যা জুটবে দু'জনে তাই-ই খাবো, পোলাও-কালিয়া নাই বা খেলাম। ও-সব আমাদের মত মানুষের কপালে সইবে না—

মা-মণি বললে—কিন্তু সে-কথা থাক, আগে বলো ভূপতি কী করে আমার বাড়িতে আগুন লাগালো? ওর কীসের জ্বালা আমার ওপর?

সুখদা বললে—তোমার ওপর জ্বালা কেন হবে মা-মণি জ্বালাটা আমাদের ওপর, আমরা যে ওর বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। বেশ চুপি-চুপি দু'পয়সা কামাচ্ছিল, আমরা আসার পর তা বন্ধ হয়েছে—

মা-মণি বললে—ও-কথা তো অনেকবার শুনেছি, এখন আগুন লাগিয়েছিল কী করে তাই বল্ শুনি—। তোরা তো দরজায় খিল বন্ধ করে ঘুমোচ্ছিলি, সেখানে ও আগুন দিলেই বা কি করে?

কালীকান্তকে লক্ষ্য করেই মা-মণি কথাটা জিজ্ঞেস করলে। কিন্তু কালীকান্ত সোজাসুজি সে-কথার উত্তর না দিয়ে সুখদার দিকে চেয়ে বললে—বলো না কী করে আগুন লাগালে বেটা, বলো—

সুখদা বললে—আমি কেন বলতে যাবো। যে আগুন লাগিয়েছে সে-ই বলবে। তাকে ডেকে পাঠানো হোক, আমরা তো মিথ্যে বলছি না যে ম্যানেজারের আড়ালে ভাঙচি দেবো—

মা-মণি বললে—আহা, বল্ না, তুই বল্ না। তোর মুখ থেকেই না হয় ব্যাপারটা শুনি। আমি কি তোদের অবিশ্বেস করবো? তোরা কেন আমাকে এত পর-পর ভাবিস! এত করেও আমি তোদের মন পেলাম না রে। আমার হয়েছে জ্বালা। আমি বুড়ো মানুষ, আমি একলা কত দিকে দেখি!

কালীকান্ত বললে—তা বললে শুনবো কেন মা-মণি! আমরা আপনার কে

যে, আমাদের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন। আসলে তো আমরা পরই—

মা-মণির চোখ দিয়ে তখন প্রায় জল ঝরবার উপক্রম।

বললে—আর পারিনে বাপু তোদের জ্বালায়—

তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—ওরে অ মা তরলা, কোথা গেলি, একবার ধনঞ্জয়কে বল তো ভূপতিকে ডেকে আনবে—

তারপর কালীকান্তকে বললে—তুমি চলে যেও না বাবা, তোমাদের সামনেই আমি কথাটা তুলবো, যদি কথাটা সত্যি হয় তো আমি আজই ভূপতিকে বরখাস্ত করে দেবো—

তারপর আবার ডাকলে—অ তরলা, অ বাদামী, কোথা গেলি মা সব, ধনঞ্জয়কে একবার ডাক না—

ভূপতি ভাদুড়ী জানতো যে একদিন-না-একদিন তাকে সব কিছুর জন্যে জবাবদিহি করতে হবেই। তার জন্যে সে তৈরিই ছিল। শিবশম্ভু চৌধুরীর আমল থেকে হাতে-কলমে ভূপতি ভাদুড়ীই সব কিছু করে আসছে। কোথা থেকে এত টাকা আসছে, কাকে কত দিতে হয়, কোন্ সম্পত্তি কোথা থেকে কেনা, কোন্ সম্পত্তির কী দাম, এ-সব ভূপতি ভাদুড়ীর মত কেউই জানে না। জানবার উপায়ও ছিল না। জানতে চেষ্টাও কেউ করেনি।

কিন্তু কালীকান্ত বিশ্বাস এ-বাড়িতে আসবার পর থেকেই ভূপতি ভাদুড়ীর টনক নড়ে উঠেছিল। ভূপতি ভাদুড়ী বুঝতে পেরেছিল যে তাকে এখান থেকে একদিন সরে পড়তেই হবে। আর বেশিদিন তার এখানে থাকা চলবে না।

তবু শেষ চেষ্টা করতে তার দোষ কী! এত লাখ টাকার সম্পত্তি এমনি করে খোয়া একেবারে গেলেই হলো?

সুরেনকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী কিছুক্ষণ খাতাপত্র নিয়ে চুপ করে বসে রইল। আগের দিন কালীকান্তর ঘরে আগুন লেগে গিয়েছিল। তারপর কালীকান্ত তার একটা বিহিত করতে চাইবেই। মা-মণির কাছেও সে-প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই উঠবে।

ভূপতি ভাদুড়ীর চোখের সামনে হিসেবের অঙ্কগুলো যেন সেপাইদের মত সঙ্গীন খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠলো। যেন সবাই মিলে তাকে আক্রমণ করতে আসছে। যেন বলতে চাইছে—আর আমরা গরমিল সহ্য করবো না। এত গর-হিসেব বরদাস্ত করবো না। তুমি সরে যাও, চলে যাও আমাদের সামনে থেকে—

ভূপতি ভাদুড়ীর ভয় হয়ে গেল দেখে। এতদিনের গরহিসেব। একটা নয়, দুটো নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গরহিসেব।

ভূপতি ভাদুড়ী দুম্ করে খাতাটা বন্ধ করে দিলে। যত সব চোর-জোচ্চর জুটেছে বাড়িতে। এবার থেকে শক্ত হতে হবে ভূপতি ভাদুড়ীকে, সাবধান হতে হবে।

তারপর তক্তপোষ থেকে উঠলো। উঠে জামাটা গায়ে দিলে। তারপর ছাতাটা নিলে। নিয়ে কাছারি-ঘর বন্ধ করে বেরোল।

বাহাদুর সিং নিয়ম-মাফিক গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বোধহয় একটা সেলামও করলে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না ভূপতি ভাদুড়ী, হন্ হন্ করে রাস্তায় নেমে সোজা চলতে লাগলো।

তারপর আর কোনও দিকে না তাকিয়ে একেবারে শোভাবাজারের দিকে চলতে লাগলো। এই সময়েই নরেশ দত্ত সাধারণতঃ বাড়িতে থাকে। এই দুপুর

বারোটা পর্যন্ত। বারোটার আগে নেশার ঘুম ভাঙে না নরেশ দত্তর।

সাধারণতঃ নরেশ দত্তর বাড়িতে কখনও যায়নি ভূপতি ভাদুড়ী, সেই একবার ছাড়া। তারপর থেকে নরেশ দত্তই বরাবর এসেছে ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে।

ভাঙা বাড়িটার সামনে গিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী ডাকলে—নরেশ, নরেশ আছ!

এককালে বাড়িটা দত্তদেরই ছিল। কিন্তু দত্তদের সব সম্পত্তি নিলেমে ওঠার পরই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তখন নরেশ দত্তর বয়েস কম। ফুর্তির মেজাজ। রেসের মাঠেই নরেশ দত্ত নিজের যৌবনটা নিয়ে জুয়া খেলেছিল। কখন যে সব বেহাত হয়ে গিয়েছিল তারও খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হলো তখন তার যৌবন চলে গিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে। চোখে চালশে ধরেছে, গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে।

ঠিক সেই সময়েই চৌধুরী বাড়ীর ভূপতি ভাদুড়ী একদিন এসে হাজির হয়েছিল। সে কতকাল আগেকার কথা।

ভূপতি ভাদুড়ী বলেছিল—তোমরা তো বনেদী বংশের লোক হে, একটা ভালো দেখে পাত্তোর দিতে পারো?

নরেশ দত্ত বললে—পাত্তোর আমি কোথায় পাবো ম্যানেজার, যদি আমাকে দিয়ে হয় তো দেখ—

ভূপতি বলেছিল—তোমাকে দিয়ে হলে তো চুকে যেত ল্যাঠা, তোমাকে দিয়ে যে হবে না, তুমি যে বুড়ো হয়ে গেছ হে—

কথাটা মনে লেগেছিল নরেশ দত্তর। ঘোড়ার নেশায় বিয়ে-থা করা হয়নি বলে বোধহয় একটু অনুশোচনাও হয়েছিল মনে মনে।

বলেছিল—বুড়ো হইনি হে ম্যানেজার, তুমি ভুল করছো এখনও বিয়ে করলে দশটা ছেলের বাপ হতে পারি, এই বুড়ো হাড়ে এখনও সে-ক্ষমতা আছে নরেশ দত্তর—

ভূপতি হেসেছিল। সে তাচ্ছিল্যের হাসি। বলেছিল—না হে, তোমাকে দিয়ে হবে না। জোয়ান ছেলে চাই, আমাদের পাত্রীর খুব আঁটসাঁট গড়ন—

নরেশ বলেছিল—তা আঁটসাঁট গড়ন তো ভালোই, আমিও তো ঢিলেঢালা নই ম্যানেজার, আমাকেই একবার চানস্ দিয়ে দেখ না—

শেষকালে রেগে গিয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ী।

বলেছিল—কী বাজে কথা বলছো? এসেছি একটা জরুরী কাজে, খামোকা কিছু টাকা উপায় করতে পারতে। তা যখন শুনবে না, তখন যাই, অন্য কোথাও ধান্ধা দেখি গে যাই—

এতক্ষণে যেন নরেশ দত্তর টনক নড়লো। টাকার গন্ধে টনক নড়বার মত লোকই বটে নরেশ দত্ত। ভূপতি ভাদুড়ী লোক চিনতে ভুল করেনি। ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছিয়ে ছিল।

নরেশ দত্ত বললে—টাকার ব্যাপার, তা আগে বলোনি কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি বলতে আর দিলে কই? কেবল তো গতরের জোর দেখাচ্ছ। একটা ভালো মতন যদি পাত্তোর খুঁজে দিতে পারো তো কিছু টাকা মবলগ পেয়ে যাবে—

নরেশ দত্ত এবার শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে বসলো। বললে—কত টাকা দেবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এই ধরো হাজারখানেক—

হাজারের নাম শুনে নরেশ দত্ত একেবারে সোজা উঠে দাঁড়ালো। বললে—মাইরি বলছো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার সঙ্গে কি আমার ইয়ার্কি'র সম্পর্ক?

তবু যেন বিশ্বাস হলো না নরেশ দত্তর। বললে—মা-কালীর দিব্যি বলো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি দেখছি আমাকে আর না-রাগিয়ে ছাড়বে না। বলি, অতই যদি সন্দেহ হয় আমাকে তো দরকার নেই তোমার, আমি অন্য রাস্তা দেখি—

শেষকালে ম্যানেজারের দুটো হাত জড়িয়ে ধরলে নরেশ দত্ত। হাজার টাকার মক্কেলকে অত সহজে হাত ছাড়া করতে সে রাজী নয়। হাত ধরে তক্তপোষের ওপর জোর করে বসালো ভূপতি ভাদুড়ীকে। বসিয়ে সবিস্তারে সব শুনলে। এমন একটা পাত্র চাই যে লুকিয়ে-চুরিয়ে পাত্রীকে নিয়ে লোপাট হয়ে যাবে। আর কখনও মুখ দেখাবে না এখানে। তার জন্যে তাকে হাজার দু'য়েক টাকা দেবে! তারপরে সে মেয়েকে খুনই করে ফেলুক আর গুণ্ডার হাতে বেচেই দিক। তা নিয়ে ভূপতি ভাদুড়ীর কিছু মাথাব্যথা নেই। মোটকথা, আর কলকাতায় ফিরে আসতে পারবে না।

—কিন্তু তোমার পাত্রী নিজেই যদি পাত্তোরকে ছেড়ে ফিরে আসে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে পথ তাকেই বন্ধ করতে হবে।

নরেশ দত্ত বললে—সে-পথ কী করে সে বন্ধ করবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন, পাত্রীকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে যাক। আমি খরচা-পাতি সব দেবো। সেখানে গিয়ে না-হয় মুসলমান হয়ে যাক, কে বাধা দিচ্ছে।

—টাকা?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তার জন্যে যত টাকা লাগে আমি দেবো। টাকায় কী না হয়?

এ-সব সেই আগেকার কথা। তখন পাকাপাকি সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল নরেশ দত্ত। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে চেয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ী। কালীকান্ত বিশ্বাস সেই নরেশ দত্তেরই আবিষ্কার। এক গেলাসে কতদিন একসঙ্গে চুমুক দিয়েছে। একসঙ্গে পাশাপাশি বসে এক টিকিটে শেয়ারে রেস খেলেছে। সেই কালীকান্ত।

কিন্তু সেই কালীকান্ত যে এমন করে কথা খেলাপ করবে তা কে জানতো?

নরেশ দত্ত সমস্ত কথা শুনলো মন দিয়ে।

বললে—তা এবার আমায় কত টাকা দেবে ম্যানেজার?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আবার টাকা? আবার তোমায় টাকা দেবো কেন? বরং আগে আমার কাছ থেকে যে-টাকা নিয়েছ, সেইটে ফেরত দাও, কথার খেলাপি করেছ টাকাও খেলাপ হয়ে গেল—

—তা হয় না ম্যানেজার। এতদিন আইন-আদালত করছো আর এটা জানো না? এটা আবার পেনাল-কোডের অন্য সেক্‌শান্ হয়ে গেল। উকীলকে জিজ্ঞেস করতে হবে—

ভূপতি ভাদুড়ী দেখলে মাথা গরম করলে কাজ হবে না নরেশ দত্তর কাছে। বললে—তুমি রাগ করছো কেন হে, আরো কিছু বরং নাও, নিয়ে ওকে বিদেয় করো মাধব কুণ্ডু লেন থেকে, ও পাপ বিদেয় হোক—

—কত দেবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কত তুমি চাও, তাই বলো?

নরেশ দত্তর এক মুহূর্ত দেরি হলো না ভাবতে। বললে—আগাম কত দেবে আগে বলো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমিই বলো কত নেবে?

তারপর একটু থেমে বললে—এতবড় হারামজাদা তোমার ওই কালীকান্ত, যে নিজে বিড়ি খেয়ে বিছানায় আগুন ধরালে আর বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি তার ঘরে আগুন দিয়ে দিয়েছি তাকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে!

নরেশ দত্ত বললে—ও শালা হারামীর বাচ্ছা। ওর কথায় কান দিও না। ওকে আমি এক মিনিটে জব্দ করে দিচ্ছি। কিছু টাকা ফেল, দেখি আমি কী করতে পারি—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু ওই ছুঁড়িটাকে নিয়ে ভাগতে হবে, ওকে ফেলে রেখে গেলে চলবে না তা কিন্তু বলে রাখছি—

—ভাগবে। ও শালা পুঁটলি-পাঁটলা যা আছে সব নিয়ে ভাগবে। তার আগে তুমি কত আগাম দেবে, তাই বলো না!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কথা খেলাপ হবে না তো?

নরেশ দত্ত বললে—কথার খেলাপ হলে তুমি আমার নামে চারশো বিশের সেকশানে মামলা কোর—

ভূপতি ভাদুড়ী আরো নরম হলো এবার! বললে—তুমি তো আমার আপন লোক হে, তোমার নামে আমি মামলা করতে পারি? আমি কি সেই রকম লোক? এ্যাদ্দিন আমার সঙ্গে কারবার করে তুমি এটা বুঝলে না?

নরেশ দত্ত সে-কথার ধার দিয়ে না গিয়ে বললে—তোমাদের চৌধুরী-এস্টেটের মোট দাম কত ম্যানেজার? ছ'লাখ হবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বিরক্ত হয়ে গেল। বললে—খাতাপত্তোর না দেখে আমি কি তা টপ করে বলতে পারি?

নরেশ দত্ত বললে—তাহলে খাতাপত্তোর দেখেই না হয় বলো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে দেখতে তো আবার দেরি হয়ে যাবে। আমার যে বড় জরুরী। আমি যে আর ও-বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারছি নে হে।

নরেশ দত্ত বললে—তাহলে লাখখানেক দিও—

ভূপতি ভাদুড়ী তক্তপোষের ওপর বসে ছিল, কথাটা শুনে টলে পড়ে যাবার মত অবস্থা হলো। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়েছে। বললে—তুমি পাগল হলে নাকি হে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি ডাক্তার দেখাও, ডাক্তার দেখাও—

নরেশ দত্ত তখন ম্যানেজারের কাণ্ড দেখে মিটমিটি হাসছে। বললে—টাকার কথা বললেই তোমার মাথাটা ঘুরে ওঠে ম্যানেজার। মাথা তোমারই খারাপ হয়েছে, আমি নেশাখোর মানুষ, আমার মাথা ঠিক আছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হোক, আমার মাথাই খারাপ হোক, তাহলে আমি এখন উঠি—

—কেন? উঠবে কেন? কালীকান্তকে তাহলে ভাগাবার দরকার নেই?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি যখন সাহায্য করবে না, তখন আমি অন্য চেষ্টা করে দেখি—

নরেশ দত্ত যখন দেখলে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন বললে—তা

হাজার দশেক টাকা দেবে তো? আমার পাঁচ আর কালীকান্তর পাঁচ—

ভূপতির তখন শিরে সংক্রান্তি! বললে—তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক ওটা চারে-চারে আট করে নাও—

—আগাম কত পাবো?

—দুই।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার বললে—আজই রাত্তিরে গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো, কপালে গচ্চা আছে, কে খণ্ডাবে ভায়া। কিন্তু ওই কথা রইল, ওই ছুঁড়িকে নিয়ে বিদেয় নিতে হবে, অন্ততঃ ছ' মাসের জন্যে, তার মধ্যে যা করবার আমি করে নেব—

—তাহলে এখন একটা টাকা দিয়ে যাও, মুখপাতটা হয়ে যাক।

ভূপতি ভাদুড়ী পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বার করে নরেশ দত্তর দিকে ছুঁড়ে দিলে। সেই টাকাটা নিয়েই নরেশ দত্ত একটা তুড়ি মারলে। বউনিটা মন্দ হয়নি। দিনটা যাবে ভালো। তারপর লম্বা একটা হাই তুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললে।

ধনঞ্জয় যখন ম্যানেজারের ঘরে এল, তখন দেখলে দরজায় তালা-চাবি ঝুলছে।

সামনের গেটে বাহাদুর সিং-এর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—বাহাদুর, ম্যানেজারবাবু কাঁহা?

বাহাদুর বললে—নিকাল গয়া।

—কখন নিকাল গিয়া?

বাহাদুর সিং বললে, আভি, আভি—

ধনঞ্জয় আর কিছু বললে না। যেমন এসেছিল তেমনিই আবার ফিরে অন্দর-মহলে চলে গেল মা-মণিকে বলতে।

ওদিকে সুরেনও খানিকক্ষণ ঘুরে আবার বাড়ির দিকে ফিরছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরতে তার ইচ্ছে করছিল না। কী-ই বা হবে বাড়ি গিয়ে। ও বাড়ি থেকে তো দু'দিন বাদেই চলে যেতে হবে। আবার নতুন কোনও আশ্রয় খুঁজতে হবে কোথাও।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে—সুরেন!

পেছন ফিরে সুরেন অবাক হয়ে গেল। দেবেশ! সেই দেবেশ! একেবারে আমূল বদলে গেছে। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, মুখে দু'দিনের না-কামানো দাড়ি। গায়ে খয়েরি হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি, পরনে সাদা পাজামা। কিন্তু মুখে সেই আগেকার মত সতেজ হাসি।

বললে—কী রে, কী করছিস আজকাল?

সুরেন বললে—কিছুই না—

দেবেশ বললে—এখন কোন্‌দিকে যাচ্ছিস?

সুরেন হঠাৎ বললে—ভাই, একটা থাকবার জায়গা জোগাড় করে দিতে পারিস?

দেবেশ তো অবাক। সে একদিন এই সুরেনের সঙ্গে পড়েছে, এই সুরেনের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে। তখন ছোট ছিল। তারপর এক সঙ্গে স্কুল ছেড়েছে।

তারপরে আর লেখাপড়া করেনি সে। কিন্তু লেখাপড়া করেনি বলে তার কোনও দুঃখ নেই। সে ভালো করেই জেনেছে, এ-যুগে লেখাপড়া করে পাস করার চেয়ে, লেখাপড়া না-করার মধ্যেই লাভ বেশি। এ নিয়ে কতদিন ঝগড়া করেছে তর্ক করেছে সুরেনের সঙ্গে। তারপর দেবেশ তার নিজের পথে গেছে, আর সুরেন তার নিজের পথে।

এখন এতদিন পরে সুরেনকে দেখে, সুরেনের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল।

বললে—তুই তো পুঁজিপতি রে, তোর আবার থাকবার জায়গার অভাব কেন হলো?

সুরেন বললে—পুঁজিপতি মানে?

দেবেশ বললে—পুঁজিপতি জানিস না? পুঁজিপতিরাই তো এ-যুগে পরম গুরু। সেকালে ছিল পতি পরম গুরু, একালে পুঁজিপতিই পরম গুরু। মাধব কুণ্ডু লেনের অত বড় বাড়ি তোদের, তোদের ভয় কী!

সুরেন বললে—কিন্তু আমি কবে পুঁজিপতি হলুম? আমি কি মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ির মালিক?

দেবেশ বললে—মালিক না হোস্ মালিকের পেয়ারের লোক। বাড়ির মালিক তো মেয়েমানুষ। সে তো তোকে ছেলের মত ভালোবাসে! তার তো কেউ নেই, তার সম্পত্তি-টম্পত্তি তো সব তুইই মেরে দিবি।

সুরেন বললে—এ-সব কথা তোকে কে বললে?

—আবার কে বলবে, তুই-ই বলেছিস।

সুরেন বললে—না রে সব মিথ্যে কথা। আমি কখনও ও-বাড়ি নিয়ে নেবার মতলব করিনি। আমার যদি সে ইচ্ছে থাকতো তাহলে আজ অন্যরকম হতো। আমি কিছুই চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম মা-মণির ভালো হোক। মা-মণির কেউ নেই বলে আমার খালি দুঃখ হতো। বাড়িতে চাকর-ঝি-বুড়োবাবু, সকলের ভালোর জন্যেই আমি কেবল চেষ্টা করেছি। বুড়োবাবু বলে একজন বুড়ো চাকর আছে, তাকে একটা নতুন গামছাও কেউ কিনে দেয় না। আমার মামাকে আমি তার জন্যেও কত বলেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। আমাকেই শুধু বাড়ি থেকে চলে আসতে হচ্ছে—

দেবেশ হাসতে লাগলো।

বললে—আরে, পুঁজিপতিদের তো ওইটেই নিয়ম। ওরা তাদের নিজেদের দরকারের সময় তোর পা চাটবে, আবার দরকার ফুরিয়ে গেলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে—

সুরেন কী বলবে কিছু বুঝতে পারলে না।

দেবেশ তার কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলে। বললে—দুঃখু করিস নে রে, সংসারের এই-ই নিয়ম! এ-সব আমি অনেকদিন থেকে দেখে আসছি। ছোটবেলা থেকেই বুঝেছি যে, আমাদের এই সমাজে সততা-ফততার কোন দাম নেই। মিষ্টি কথার কোনও মূল্য নেই। পুঁজিপতিরা তাদের দরকারে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলবে। কিন্তু পেছন থেকে ছুরি মারতেও তারা পেছ-পা হবে না তেমন হলে—

সুরেন বললে—আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়—

দেবেশ বললে—তোর কাছে একটা টাকা আছে?

—টাকা! সুরেন পকেটে হাত দিয়ে দেখলে। একটা আধুলি পড়ে আছে পকেটের এক কোণে।

দেবেশ বললে—চল্, আট আনাতেই হবে—

বলে টানতে টানতে পাশের দোকানে গিয়ে ঢুকলো। ঢুকে হাঁকলে—দেখি দুটো সিগারেট—

সুরেন বললে—আমি চা খাবো না ভাই, সিগারেটও খাবো না—

—খা খা, খেলে তোর ক্যারেকটার নষ্ট হবে না। বড় বড় লোকরা সবাই চা-সিগারেট খায়।

সুরেন বললে—সে-জন্যে নয়, নেশা হয়ে গেলে তখন চালাবো কী করে? মামার ঘাড়ে বসে তো খাচ্ছি এখনও! একটা পয়সাও নিজে রোজগার করতে পারি না- -

দেবেশ বললে—তাহলে আমাদের পার্টির মেম্বার হয়ে যা, চল্লিশ টাকা করে মাসোহারা আর দু'বেলা খাওয়া পাবি।

—কী কাজ করতে হবে?

দেবেশ বললে—পার্টির কাজ।

—পার্টির কী-কী কাজ?

দেবেশ বললে—সে-সব আমি তোকে শিখিয়ে দেবো। তার জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

—কিন্তু থাকা?

দেবেশ বললে—আমরা এক সঙ্গে এক-বাড়িতে সবাই থাকি—

—খরচা কে দেয়!

দেবেশ বললে—পার্টি!

তবুও সুরেনের কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলে—পার্টি কোথা থেকে টাকা পায়?

দেবেশ বললে—চাঁদা—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—অনেক টাকা চাঁদা ওঠে বুঝি?

দেবেশ বললে—মোটামুটি অনেক টাকা ওঠে। যে-সব ফ্যাক্টরি আছে দেশে, তাদের লেবার ইউনিয়নগুলো থেকে চাঁদা আসে। অনেক মেম্বার আমাদের পার্টির। কেউ হোল্-টাইম, কেউ পার্ট-টাইম। চল্ তোকে দেখিয়ে আনি—

—কিন্তু আমাকে কী কাজ করতে হবে?

দেবেশ বললে—সে-সব তোকে আমি শিখিয়ে দেবো। কিন্তু সে-কাজ তুই পারবি কিনা তাই আমি ভাবছি। দরকার হলে জেলে যেতেও হতে পারে। পুলিশের গুলী খেতে হতে পারে, তোর নামে মামলা হতে পারে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে হতে পারে. .

সুরেন বললে—ওসব কেন করতে হবে?

দেবেশ বললে—দেশ তো স্বাধীন হয়নি রে এখনও। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষ যে-স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল এ-স্বাধীনতা তো সে স্বাধীনতা নয় রে। ইংরেজ-শালারা গেছে, কিন্তু এখানকার পুঁজিপতিরা? ইংরেজ-শালাদের জায়গায় এখন পুঁজিপতি-শালারা এসে জুটেছে। ওদের হটাতে হবে। ওদের না হটালে কীসের স্বাধীনতা?

—কী করে হটাবি?

দেবেশ বললে—পূর্ণবাবু বলে দিয়েছে যেমন করে ইংরেজ-শালাদের হটিয়েছি তেমনি করে এ-শালাদেরও হটাবো। দরকার হলে বোমা মারবো, গুলী করবো। সহজে কি কেউ হটে রে? একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে এরা, এখন কি ভোট দিয়ে

আর এদের হটানো যাবে?

সুরেন কিছু বুঝতে পারছিল না। এ-সব কথা আগেও শুনেছে দেবেশের কাছে। সে অনেককাল আগের কথা। তখন দু'জনেই ছোট ছিল। তারপর কত কী ঘটনা ঘটে গেল। পুণ্যশ্লোকবাবু মন্ত্রী হলো। সুব্রত-পমিলিদের অবস্থা আরো ভালো হলো। তারপর সুব্রতও একদিন আমেরিকায় চলে গেল। আর তারপর সুরেন বি-এ পাস করে চুপচাপ বসে রইল বাড়িতে। শেষকালে একদিন সুখদা কালীকান্তকে নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হলো। তার মধ্যে দেবেশের কথা ভাবতে সময় পায়নি সে। নিজের সমস্যা নিয়েই বিব্রত ছিল সে এতদিন। এখন দেবেশের কথায় বুঝতে পারলে, এর জন্যে দায়ী অন্য কেউ নয়, দায়ী শুধু বড়লোকেরা, পুঁজিপতিরা।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলে না। যদি মা-মণি গরীব হয়ে যায়, মা-মণির বাড়িগুলো, মা-মণির টাকা-কড়ি যদি কেউ বোমা মেরে নষ্ট করে বা কেড়ে নেয় তো গরীবদের ভালো হবে কী করে? আর মা-মণিই বা খাবে কী? মা-মণিই বা অত বড় সংসার চালাবে কী করে?

দেবেশ বললে—অত মায়া-মমতা করিসনি, অত দয়া-দাক্ষিণ্য ভাল নয়। ও-সব বড়লোকদের জন্যে।

—তার মানে?

দেবেশ বললে—হ্যাঁ রে, যা বলছি সব সত্যি! ছোটবেলায় আমরা পড়ে এসেছি 'সদা সত্য কথা বলিবে'। ও সমস্ত কিছুই মিথ্যে কথা। বড়লোকরা সত্যি কথা বলবে। তাদের সত্যি কথা বলা পোষায়। আমরা কীসের ভয়ে সত্যি কথা বলবো? নরকের ভয়ে? আরে, নরকের মধ্যেই তো আমরা বাস করছি। এর চেয়ে নরক আমাদের কাছে আর কত খারাপ হবে?

এ-সব কথা সুরেনের কাছে একেবারে নতুন। দেবেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো সে। কথাগুলোর অকাট্য যুক্তি। জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলছিস ভাই তুই?

দেবেশ হেসে উঠলো হো-হো করে। বললে—সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি! আমার বাবা সারাদিন বড়বাজারে দালালি করে যা রোজগার করে, সুব্রতদের ড্রাইভার সারাদিন গাড়ি চালিয়ে তার ডবল রোজগার করে। আর সুব্রতর বাবা পুণ্যশ্লোকবাবুর কথা ছেড়েই দে, আমাদের পার্টি যখন পাওয়ারে আসবে, তখন ও'র নাম বদলে পাপশ্লোকবাবু করে দেবো, দেখবি—

—কেন?

দেবেশ বললে—সারাজীবন যে কেবল পাপ করবে তার নাম কিনা পুণ্যশ্লোক!

তারপর একটু থেমে বললে—যাক্‌গে, আয়, ভেতরে আয়—

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—এ কোথায় রে?

দেবেশ বললে—এই তো আমাদের পার্টি অফিস—

—কিন্তু সেই বাড়িটা? সেই যে ধর্মতলা স্ট্রীটে সেই অফিসটায় গিয়েছিলাম?

দেবেশ বললে—সে তো এক যুগ আগের কথা রে। সে-পার্টি এখন আর আমাদের নেই, এখন দল ভাঙাভাঙি হয়ে গেছে—আমরা এখন নতুন পার্টি—পূর্ণবাবু আমাদের পার্টির লীডার—

—পূর্ণবাবু? আমাদের সেই বাংলার টীচার পূর্ণবাবু?

দেবেশ বললে—পূর্ণবাবুই তো এবার ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে পুণ্যশ্লোক-

বাবুর বিরুদ্ধে—

—তাহলে? ইস্কুলের চাকরি থাকবে কী করে?

দেবেশ বললে, দূর, পূর্ণবাবু তো আর ইস্কুলে চাকরি করে না—আর দেরি করিসনি—চলে আয়—

সুরেন বললে—আজকে থাক না ভাই, এখনও আমার খাওয়া হয়নি, অন্য একদিন বরঞ্চ আসবো। আজকে ঠাকুর হয়ত আমার ভাত নিয়ে বসে থাকবে। ঝি এসে বাসন মেজে চলে যাবে, তখন মামার কাছে বকুনি খেতে হবে—

দেবেশ সুরেনের হাতটা চেপে ধরে ফেললে। তারপর তাকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে চললো। বললে—এতদূর এসেছিস, চলে আয়, এখন আমাদের ইলেকশানের কাজ শুরু হয়ে গেছে—

বলে ভেতরে পার্টি অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

পাথুরেঘাটার দত্ত-বাড়ির বংশাবতংস নরেশ দত্ত সোজা লোক নয়। যখন টাকা ছিল তখন টাকার ফোয়ারা উড়িয়েছে। কলকাতার বড় বড় রেইস্-আদমি-দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাপ্তেনি করেছে। রেসের মাঠে বাজি ধরেছে। মেয়ে-মানুষ নিয়ে রাস-লীলা করেছে। নিজের ঘোড়া ছিল। ঘোড়ার লেজে পঞ্চাশ-টাকা-ভরির আতর মাখিয়েছে। সে-সব বাপ-কাকা-ঠাকুর্দাদের আমলের। তার-পর যখন সর্বস্বান্ত হয়েছে তখনও তেমনি। যে-ক'টা টাকা উঞ্ছবৃত্তি করে পেয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে তা ফুঁ দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। ভূপতি ভাদুড়ী যে-ক'টা টাকা দিয়েছিল তা খতম করতে একদিনও লাগেনি। তারপর বার বার মাধব কুণ্ডু লেনে গিয়ে ভূপতি ভাদুড়ীকে বিরক্ত করেছে, খোসামোদ করেছে। দুটো টাকার জন্যে ভূপতি ভাদুড়ীর এমন কি পায়েও ধরেছে।

এতদিন পরে আবার টাকার মওকা আসাতে একটু যেন বুকে বল পেলে নরেশ দত্ত। বিকেলবেলাই বেরিয়ে পড়লো পুরোন পাড়ার দিকে। কতকালের পুরোন পাড়া। এককালে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যখন নরেশ দত্ত এ-পাড়ায় আসতো তখন সোরগোল পড়ে যেত। পাড়ার মেয়েমানুষরা সবাই চুল বেঁধে পাট-ভাঙা শাড়ি পরে তাড়াতাড়ি সেজেগুজে নিত। দত্তবাড়ির কাপ্তেন এসেছে। পাড়ায় ধুমধাম শুরু হয়ে যেত। কপালে থাকলে সেই এক রাতেই কেউ-কেউ একটা হীরের নেকলেস পেয়ে যেত, কেউ বা একখানা বাড়ি। কারো মুখের গজল গান শুনে নরেশ দত্ত তখনি তাকে খুশী হয়ে বাড়ি দিয়ে দিয়েছে। সে-সব দিনে মেয়েরা ঘরে অন্য লোক থাকলে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে ক্যাপ্তেন দত্তকে ঘরে এনে বসিয়েছে, তাকে তোয়াজ করেছে।

কিন্তু চিরকাল তো কারো দিন সমান যায় না। যখন টাকা ফুরিয়ে এল তখন সেই নরেশ দত্তকেই কত মেয়ে ঘাড়ে ধরে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। পাড়ার রাস্তার পাশে কারো বাড়ির রোয়াকে শুয়েই রাত ভোর হয়ে গেছে তার। নরেশ দত্তর কিন্তু তাতে কিছু আসে যায়নি। নরেশ দত্তর মনে কোনও ধিক্কার নেই বলেই, কোনও দিন ও-সব গায়ে মাখেনি। টাকা যখন ছিল, তখনও যেমন, টাকা যখন চলে গেল তখনও তেমনি। টাকার ওপর কোনও দিনই মায়া করেনি নরেশ দত্ত, টাকাও তাই কোনও দিন নরেশ দত্তর ওপর মায়া করেনি। এই

এখানেই প্রথম কালীকান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হয় নরেশ দত্তর।

নরেশ দত্ত গিয়ে চিৎকার করে ডাকলে—ফটকে—

ফটকে মানে ফটিক হালদার। ফটিক হালদার সেকালের পুরোন দালাল। নামজাদা দালাল ও-পাড়ার, আগে ফটিকই নরেশ দত্তর হাত ধরে মেয়েমানুষের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে আসতো। বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে দিত। তামাক সেজে দিত জর্দা-পান এনে দিত। ফটিক হালদারই নরেশ দত্তর মেজাজের ঠিক-ঠিকানা জানতো। ফটিক হালদার থাকলে নরেশ দত্তব কোনও অসুবিধে হতো না। তাই বরাবর ও-পাড়ায় গেলে ফটিক হালদারেরই হামেশা ডাক পড়তো—

নরেশ দত্ত আবার ডাকলে—ফটকে—

পাশের একটা দোকানের সামনে কয়েকজন গুলতানি করছিল। ডাক শুনে মুখ ফেরালো। দেখলে একজন বুড়োমানুষ পাড়ায় এসেছে। তেমন গ্রাহ্য করলে না কেউ। একজন বোধহয় চিনতে পারলে। সে পুরনো জমানার লোক। বললে—আরে, ছোট দত্ত এসেছে রে—

ছোট দত্ত বললেই তখনকার দিনের দালালরা বুঝতে পারতো নরেশ দত্তকে।

সে সামনে এগিয়ে এল। সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে—হুজুর ছোট দত্তমশাই না?

নরেশ দত্ত বিরক্ত হলো—হ্যাঁ, কিন্তু সে ফটকে শালা কই? এত ডাকছি শালা সাড়া দিচ্ছে না কেন?

দালালটা বললে—ফটিক হালদার তো মরে গেছে হুজুর—কী দরকার বলুন না!

—মরে গেছে?

তড়াক করে যেন মাথায় গিয়ে লাগলো কথাটা। যেন প্রথম মনে পড়লো মৃত্যু বলে একটা জিনিস আছে দুনিয়ায়। এতদিন মনেই পড়েনি কথাটা।

—কীসে মরলো?

—আজ্ঞে তা জানি না ছোট কত্তামশাই।

নরেশ দত্ত বললে—বেটা বেঁচেছে। এককালে অনেক খেয়েছে আমার। যাবার সময় একবার দেখা করেও গেল না।

ঠিক দীর্ঘনিঃশ্বাস নয় যেন একটুখানি সহানুভূতির ঢেকুর বেরোল গলা দিয়ে। তারপর সামলে নিয়ে বললে—যাক্‌গে, তা তার বদলী কে কাজ চালাচ্ছে এ-পাড়ায়?

দালালটা বললে—কেন হুজুর, আমি তো আছি, আমার নাম নজর—আমাকে হুকুম করুন কী করতে হবে!

—নজর? না নেক-নজর? বেশ নামটা তো তোর? হিন্দু না মোছলমান?

—আজ্ঞে হিন্দু। নজর ঘোষ।

নরেশ দত্ত নজর ঘোষের পিঠ চাপড়ে দিলে। তারিফের চাপড়।

বললে—বেশ বেশ, হুইস্কি এনে দিতে পারবি?

—কেন পারবো না হুজুর। ফটিক হালদারের চেয়েও ভালো তরিবত্‌ জানি। বলুন না কত নম্বর ঘরে যাবেন? কোন মেয়েমানুষ?

নরেশ দত্ত বললে—আরে মেয়েমানুষ-ফেয়েমানুষ নয়, হুইস্কি আনতে পারবি? একেবারে খাঁটি মাল? কিং অব্‌ কিংস্‌?

নজর বললে—আজকে যে ড্রাই-ডে হুজুর। বিলিতি মিলবে না, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এনে দিতে পারি—

নরেশ দত্ত বললে—দূর হারামজাদা, তবে তুই কীসের দালাল? ফটিক থাকলে এখুনি আকাশ ফুঁড়ে বিলিতি মাল এনে দিত!

—দেখছি চেষ্টা করে হুজুর কিন্তু অনেক টাকা দাম লাগবে!

নরেশ দত্ত বললে—দামের জন্যে ভাবছিস কেন? দাম কি আমি দিতে পারি না?

বলে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করলে। বললে—ক'টা দরকার?

লজ্জায় পড়ে গেল নজর ঘোষ। আগে ভাবেনি নরেশ দত্তর কাছে এত টাকা আছে। মরা কাপ্তেনদের সাধারণতঃ তেমন খাতির করে না দালালরা। একদিন যারা লাখ-লাখ টাকা উড়িয়ে গেছে এ-পাড়ায় এসে, তারাই আবার একদিন এখানে এসে ঝাঁটা-লাথি খেয়ে ফিরে যায়। এ-পাড়ার এই-ই নিয়ম। শুধু এ-পাড়া কেন, সারা দুনিয়াই আজ বুঝি এ-পাড়ার মত হয়ে গেছে। সব জায়গাতেই আজ সেই নিয়ম। টাকা না থাকলে আর কারোর কাছেই খাতির পাবার উপায় নেই।

ততক্ষণে নজর ঘোষ একটা বোতল এনে দিয়েছে। বললে—নিন হুজুর—।

—কত দাম?

—আড়াই শো টাকা—

নরেশ দত্ত তিনটে একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললে—নে, পঞ্চাশ টাকা তোর খয়রাতি দিয়ে দিলাম—নে—

নজর ঘোষ টাকাটা নিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—বসবেন নাকি হুজুর! ভালো নিরিবিলি ঘর আছে—বাহারি মেয়েমানুষ—

নরেশ দত্ত বুড়ো হয়ে গিয়েছে। মেয়েমানুষের ওপর আর লোভ নেই। শুধু বললে—হ্যাঁ রে, ছোটবাবু আর এখানে আসে?

—ছোটবাবু? কোন ছোটবাবু? খেলত্ ঘোষের বড় বেটা?

—দূর! কালীকান্ত রে, কালীকান্ত! কালীকান্ত বিশ্বাস—

কালীকান্তও এ-পাড়ার পুরোন পাপী! এখানেই নরেশ দত্তর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর মারামারি হয়ে গিয়েছিল দুজনে। তারপর মাতালের ঝগড়া যেমন সহজে হয়, তেমনি সহজে আবার ভাবও হয়। একই বোতলের মদ শেষকালে এক গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিয়েছে, আবার একই মেয়েমানুষের ঘরে দুজনে আড্ডা জমিয়েছে। তখন নরেশ দত্তরও বয়েস কম ছিল, কালীকান্তর তো আরো কম। সেই সময়েই একদিন নরেশ দত্ত প্রথম প্রস্তাবটা দেয়। বড় গূঢ় প্রস্তাব।

কালীকান্ত তো ব্যাপারটা শুনেই অবাক। নেশার ঘোরে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—বলছো কী বড়দা? বিয়ে? বিয়ে করবো আমি?

নরেশ দত্ত বলেছিল—কেন? বিয়ে শুনে চমকে উঠলি কেন? বিয়ে কেউ করে না? তোর বাবা বিয়ে করেনি? তোর ঠাকুর্দা বিয়ে করেনি? সব শালাই তো বিয়ে করে। তোর ঠাকুর্দা বিয়ে না করলে তোর বাবা জন্মাতো, না তুই জন্মাতিস।

—তাহলে তুমি বিয়ে করনি কেন বড়দা?

নরেশ দত্ত বললে—আমার কথা ছেড়ে দে তুই, আমি কি শালা মানুষ? মানুষ হলে কি আমি মাগীর বাড়ি পড়ে থাকি?

কালীকান্ত বললে—তা আমিও তো বড়দা মানুষ নই, আমিও তো মাগীর বাড়ি পড়ে থাকি, আমাকে কে মেয়ে দেবে?

নরেশ দত্ত বললে—আমি মেয়ে জোগাড় করে দেবো—

—কিন্তু তাকে আমি খাওয়াব কি? কলা খাওয়াবো?

নরেশ দত্ত বললে—খাওয়াবার ভার আমি নিলুম, সে-ভার আমার ওপর ছেড়ে দে। তুই বিয়ে করবি কি না তাই বল্!

—আর বিয়ের খরচা?

—সেও আমি দেবো!

—মেয়ে কেমন?

নরেশ দত্ত বললে—দূর শালা, আবার জিজ্ঞেস করছিস মেয়ে কেমন? আমি তোর বড়দা না? আমি কি তোর গলায় কাণা মেয়ে ঝুলিয়ে দেবো? আমার পয়সায় মাল খেতে পারছিস আর আমার ওপর বিশ্বাস করতে পারছিস না!

কালীকান্ত তখন গম্ভীর হবার চেষ্টা করলে।

বললে—সত্যি বলছো মাইরি বড়দা? সত্যি বলছো বিয়ে করতে?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে? বিয়েও করবি টাকাও পাবি—

কালীকান্ত সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে—তার মানে?

—তার মানে সারা-জীবনের মত তোর ভাবনা থাকবে না। এত টাকা পাবি যে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে কাটাবি!

কালীকান্ত বললে—ঘরজামাই নাকি?

—দূর, ঘরজামাই কোনও ভদ্দরলোকে হয়? যারা হারামজাদা তারাই দুনিয়ায় ঘরজামাই হয়। —তবে শোন্—

বলে আর এক গেলাস চোঁ চোঁ করে মুখে ঢেলে দিলে। তারপর বললে—বউ নিয়ে ভেগে যেতে হবে—

—ভেগে যেতে হবে মানে?

নরেশ দত্ত বললে—বড়লোকের বাড়ির মেয়ে, তাকে নিয়ে লুকিয়ে পালাবি।

—তুমি বলছো কী বড়দা? বিয়ে করবো লুকিয়ে-লুকিয়ে? কেন, আমি কোন্ শালার কী করেছি!

নরেশ দত্ত সরে বসলো। বললে—তাহলে করিসনি। বিয়ে করিসনি। কোন্ শালা তোকে বিয়ে করতে সেধেছে? তাহলে টাকাও পাবি না!

কালীকান্তর তখন মাথা বিগড়ে গেছে। বললে—না বড়দা, তুমি বলো ব্যাপারটা কী? খুলে বলো! আমি কিছু বুঝতে পারছি না—

নরেশ দত্ত বললে—আমি যা বলবো তা করবি বল—কথা দে আগে—

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ কথা দিচ্ছি, করবো—

—আমি যা বলবো তাই-ই করবি?

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ বড়দা, তুমি যা বলবে তাই করবো!

—তবে শোন্। মস্ত বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। স্বাস্থ্য ভালো। মেয়ের কেউ নেই। যাদের বাড়িতে আছে তাদেরও কোনও ওয়ারিসান নেই। সেই মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে ফড়েপুকুরের এক পাত্তোরের সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই তোকে কাজ হাসিল করতে হবে। মেয়েটাকে বাড়ির বার করতে হবে।

—তারপর?

—তারপর ছুঁড়িটার ভাগ্য আর তোর হাতযশ!

—তার মানে?

নরেশ দত্ত বললে—তারপর তোর বরাত। বাড়ির মালিক ষাট-সত্তর বছরের

এক বুড়ি। সে মরলে সব সম্পত্তি তোর।

কালীকান্ত বললে—কত টাকার সম্পত্তি?

নরেশ দত্ত বললে—সাত লাখ টাকার হতে পারে, আবার দশ লাখ টাকারও হতে পারে।

—সব আমি একলা পাবো?

নরেশ দত্ত বললে—তুই পাবি না তো আর কে পাবে? বুড়ির তো আর কেউ নেই!

—বুড়ি যদি না মরে?

নরেশ দত্ত হো-হো করে হেসে উঠলো! বললে—দুনিয়ায় কেউ কি চিরকাল বাঁচতে এসেছে। খুব বেশি যদি বাঁচে তো আর পাঁচ বছর—

কালীকান্ত কথাটা শুনে যেন কী ভাবলে। তারপর বেশ করে ভেবে নিয়ে বললে—কিন্তু বিয়ে কোথায় হবে?

—যে-চুলোয় হোক, তাতে তোর কী? কালীঘাটের মন্দিরে হতে পারে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে হতে পারে। চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে হতে পারে। সে-সব আমার ওপর ছেড়ে দে। আমি সব ফয়সালা করে দেবো।

—তারপর? মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যাবো? পালিয়ে কোথায় যাবো? যদি পুলিশ লেলিয়ে দেয়?

নরেশ দত্ত বললে—পুলিশের ভয় করিসনি, পুলিশের ভার আমার ওপর ছেড়ে দে, আমাকে যদি বড়দা বলে ভক্তি করিস তো অত ভাবিসনে তুই, আমি আছি কী করতে—

কালীকান্ত বললে—কিন্তু একটা কথা দাদা, বুড়ি যদ্দিন না মরে যায় ততদিন কী খাবো?

ততদিন খাওয়াব মত টাকা দেবো তোকে।

—কত টাকা দেবে? দুজনের খাওয়া-থাকা খরচা আছে তো!

নরেশ দত্ত বললে—পাঁচ হাজার, দশ হাজার, যা বলবি তাই দেবো!

—কিন্তু আর একটা কথা বলে কালীকান্ত একটু থামলো।

নরেশ দত্ত বললে—কী বলবি খুলে বল্ না তুই—

—বলছি, মেয়েটা যদি পালিয়ে যায়!

নরেশ দত্ত রেগে গেল। বললে—এতদিন মেয়েমানুষ নিয়ে কারবার করছিস্ তোর হাত থেকে মেয়েমানুষ পালাবে? মেযেমানুষ হচ্ছে কুকুরের জাত, একবার পোষ মেনে গেলে তখন তার হাত থেকে পালাতে তোরই জান্ বেরিয়ে যাবে। তখন তুই ছাড়তে গেলেও সে ছাড়তে চাইবে না। তারপর যদি একটা ছেলে-মেয়ে কিছু হয়ে যায় তো পোয়া বারো—

কালীকান্ত কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললে—ঠিক আছে বড়দা তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য। আমারও টাকার টানাটানি চলছিল বহুদিন ধরে—

সেই কথাই সেদিন হয়েছিল। তারপরের ইতিহাস সোজা। একটা ট্যাক্সি-ওয়ালার সঙ্গে ফুরনের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। বেচারা নিরীহ ট্যাক্সি-ড্রাইভার।

ধনঞ্জয় গিযে তরলাকে খবর দিলে। তরলা আবার গিয়ে খবর দিলে সুখদাকে।

সুখদা জিজ্ঞেস করলে—কে ডাকছে আমাকে?

তরলা বললে—ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজারবাবু কেন ডাকছে তাকে তা সুখদা বুঝতে পারেনি। এমন ডাকেও না কখনও ভূপতি ভাদুড়ী। আসলে ভূপতি ভাদুড়ীও চালাক-চতুর লোক। সে তখন আশেপাশেও কোথাও নেই! তবু সুখদা কিছু সন্দেহ করেনি। সিঁড়ি দিয়ে সোজা নিচেয় নেমে এসেছে। ততক্ষণে উঠোনে ট্যাক্সির ভেতর থেকে কে একজন মহিলা নেমে এল।

সুখদা তাকে চিনতে পারলে না। বললে—কে তুমি?

মহিলাটি বললে—আপনাকে নিতে এসেছি দিদিমণি—

—কোথায় নিয়ে যাবে? কে তুমি?

ম্যানেজারবাবু পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তোমাকে খবর দিতে বললে। এক্ষুনি একবার চলুন—

খাস সোনাগাছির খানদানি মেয়েমানুষ। ছলাকলায় কিছু কমতি নেই। এমন অভিনয় করলে যে হাবভাব দেখে বোঝবার উপায় নেই।

—আপনার ভয় কিসের, আমরা তো আছি, একবার দেখে এখুনি আবার চলে আসবেন। তারপরে মা-মণিকে যা বলবার বলবেন।

কথাটা যুক্তিসংগত বলেই মনে হলো। আর কিছু না ভেবে উঠে পড়লো ট্যাক্সিতে, আর তারপর চললো সোজা সড়ক ধরে। যখন মানুষ অধঃপাতে নামে তখন এমনি করে সোজা সড়ক ধরেই নামে। সোজা-সড়ক আর ঢালু-সড়ক। ঢালু পথে গড় গড় করে গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে যায়। তখন জানতেও পারে না, বুঝতেও পারে না কোন দিকে কোন পথে—উঁচুদিকে না নিচুদিকে চলেছে—

বিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝখানে এসে সুখদার সংগে সংগেই শুরু হলো এই বাঙলা দেশের অধঃপাত। অধঃপাত আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু তখনও জানতে পারেনি কেউ। দেশ-সেবার নামে সবাই তখন নেতা সেজে মাথায় বসে আছে। তারা যা বলছে আমরা শুনছি। কিন্তু যখন তাদের সব কারসাজি ধরা পড়লো তখন নজরে পড়লো মাধব কুণ্ডু লেন থেকে সুখদা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। বিংশ শতাব্দীর প্রাণ-লক্ষ্মীকে নিয়ে কালীকান্ত বিশ্বাস তখন উধাও—

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। অনেকদিন আগেই এই দুর্যোগ ঘটে গেছে। তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরী বাড়িটার ইতিহাসে। সুরেনের জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আজ এতদিন পরে আবার নরেশ দত্ত এসে পুরোন ইতিহাসের পাতাই আবার নতুন করে ওল্টাতে শুরু করেছে।

বোতলটা ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

নরেশ দত্ত বললে—এবার চল্ আমার সংগে।

—কোথায় হুজুর!

নরেশ দত্ত বললে—কোথায় আবার, মাধব কুণ্ডু লেনে।

—কিছু পাবো-টাবো তো হুজুর? বড় গরীব লোক হুজুর!

—পাবি, পাবি চল্। বিনা পয়সায় কিছু কাজ হয় নাকি দুনিয়ায় যে পাবি কিনা জিজ্ঞেস করছিস?

নজর ঘোষও চললো সংগে সংগে!

তারপর মাধব কুণ্ডু লেনে ঢোকবার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো নরেশ দত্ত। বললে—আমি আর যাবো না, এবার তুই যা—

নজর বললে—গিয়ে কী বলবো?

নরেশ দত্ত বললে—গিয়ে দারোয়ানকে বলবি জামাইবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলবো। বেটা খুব জাঁদরেল দারোয়ান, ভয় পাসনি যেন। বলবি কালীকান্ত বিশ্বাস হলো ও-বাড়ির জামাইবাবু, তার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাস্—

নজর ঘোষ বললে—তারপর?

নরেশ দত্ত বললে—তারপর কালীকান্ত এলে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসবি, বলবি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে—

নজর ঘোষ ছোটবাবুকে রেখে মাধব কুণ্ডু লেনের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

যখন দেবেশের পার্টি-অফিস থেকে সুরেন বেরোল তখন বেশ বিকেল হয়ে গেছে। কিছু খাওয়া-দাওয়া নেই। পার্টির লোকদের জন্যে যা রান্না-বান্না হয়েছিল তা সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সুরেন চেয়ে-চেয়ে দেখেছিল তাদের খাওয়া।

দেবেশ বলেছিল—তুইও আমাদের সঙ্গে বসে যা না—

সুরেন বলেছিল—না ভাই, আমার তো বাড়িতে ভাত তৈরিই রয়েছে, তুই কেন মিছিমিছি ভাবছিস—

দেবেশ বলেছিল—আমাদের খাওয়া কিন্তু এইরকম, এই শাক-চচ্চড়ি আর রুটি, মাঝে-মাঝে ভাত কিংবা ডাল জোটে, তাও রোজ-রোজ নয়—

সুরেনের বাড়িতেই কি রোজ ভাত জোটে! রুটি খেয়ে-খেয়েই তো সপ্তাহের অর্ধেক দিন চলে। ভাত যে কত মিষ্টি তা এতদিন পরে সুরেন জানতে পেরেছে। আগে খেতে বসে কত ভাত ফেলে দিয়েছে সে। কত ভাত আগে নষ্ট করেছে। কিন্তু এখন আর সে-সব দিন নেই। কেউ ভাত পায় না।

সুরেন বলেছিল—আমার বিশেষ কষ্ট হয় না ভাই, কিন্তু কষ্ট হয় অন্য লোকদের। বুড়োবাবুরই বেশী কষ্ট হয়।

—কে? বুড়োবাবু কে?

সুরেন বলেছিল—সে একজন আছে আমাদের বাড়িতে—বহু পুরোন আমলের লোক, এখন বুড়ো হয়ে গেছে—

দেবেশ বলেছিল—এখন আর হয়েছে কী? এরপরে যে-যুগ আসছে সে আরো ভয়ানক, জানিস, আমরা যখন পাওয়ারে আসবো, তখন বসে বসে বাড়ি-ভাড়ার আয়ে খাওয়া উঠে যাবে। তখন যে খাটবে না সে খেতে পাবে না—

—কিন্তু যারা বুড়ো? তারাও খেতে পাবে না?

দেবেশ বলেছিল—তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা থাকবে স্টেট থেকে। সে-যুগ এল বলে—

ততক্ষণে দেবেশদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দেবেশ বললে—তা হলে কী করবি, তুই আমাদের পার্টির মেম্বার হবি? মেম্বার হলে কিন্তু আমাদের পার্টির কাজ করতে হবে—

—কী কাজ?

—সব রকম কাজ। মীটিং করতে হবে। লেকচার দিতে হবে। গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে চাষী মজুরদের সঙ্গে মিশে তাদের সঙ্গে ভাব করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, কারা এতদিন তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে, তাদের

ক্ষেপিয়ে দিতে হবে তাদের ন্যায্য পাওনা-গন্ডা বুঝে নেওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে। সে-সব কিছু ভাবতে হবে না তোকে, আমি সব বুঝিয়ে দেবো—

তারপর একটু থেমে বললে—কবে আসছিস তাহলে?

সুরেন বললে—এই কাল-পরশুই চলে আসবো—

—তাহলে আমি কী করে জানতে পারবো?

সুরেন বললে—তোকে ভোরবেলাই খবর দিয়ে যাবো এসে—

—ঠিক আসবি তো?

সুরেন বললে—নিশ্চয়ই আসবো। আসবার আগে শুধু একটু বলে আসতে হবে তো! মামাকে বলতে হবে, মা-মণিকে বলতে হবে।

—কিন্তু তারা কি তোকে আসতে দেবে? তারা যদি না ছাড়ে?

সুরেন বললে—এখন আর কেউ আটকাবে না, এখন ছেড়ে দেবে। এখন সবাই খুব বিব্রত হয়ে আছে। খুব ঝঞ্ঝাট চলছে বাড়িতে—

—কেন?

সুরেন বললে—সে অনেক কান্ড! এক ঘর-জামাই আছে মা-মণির, সে তো একদিন বিড়ি খেয়ে বাড়িতে আগুনই লাগিয়ে দিয়েছিল।

—কী রকম?

সুরেন বললে—আরে সেই জন্যেই তো ও-বাড়ি থেকে চলে আসতে চাইছি। ওখানে আর থাকতে পারা যাচ্ছে না। রোজ একটা না একটা ঝামেলা বেঁধেই আছে। সেই সুখদা বলে মেয়েটা আর তার বরটা আমাকে আব মামাকে তাড়াবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। আমাদের মোটে দেখতে পারে না। সে ভাবে, মা-মণি মারা গেলে তার সম্পত্তিগুলো বুঝি আমি হাতিয়ে নেবার মতলবে আছি—

দেবেশ বললে—তা আজকাল ঘর-জামাই কেউ রাখে? তোর মা-মণি আজকের দিনে ঘর-জামাই রাখতেই বা গেল কেন? ঘর-জামাই কখনও ভাল হয়?

সুরেন বললে—সে-সব খুলে না বললে তুই বুঝবি না। একদিন যখন কেউ বাড়িতে ছিল না, তখন ওই মেয়েটাকে নিয়ে লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল। এখন এতদিন পরে আবার দুজনে টাকার লোভে ফিরে এসেছে। মা-মণির তো কেউ নেই, তা মা-মণিও তাদের বাড়িতে জামাই-আদরে রেখে দিয়েছে ছাড়তে চাইছে না—

দেবেশ বললে—তা ভালোই হয়েছে, ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তুই থাকিস নি, তুই আমাদের এখানেই চলে আয়—এখানে যদ্দিন তুই পার্টির কাজ করবি, তদ্দিন কেউ তোকে তাড়াবে না—শেষকালে পার্টির লীডারও হয়ে যেতে পারিস, বলা যায় না কিছু। আসল কথা হলো লেকচার দেওয়া। লেকচারটা যদি রপ্ত করতে পারিস তো হয়ে গেল। লেকচার দিতে পারাটাই সব—

সুরেন বললে—তাহলে আসি ভাই—

রাস্তার বাইরে এসে দাঁড়াল সুরেন। পেছন ফিরে বাড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখলে সে! বাইরে থেকে সাদাসিধে ছোট একটা বাড়ি। কোনও বৈশিষ্ট্য কোথাও নেই। অথচ এই বাড়ির ভেতর থেকেই একদিন বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ লীডার জন্মাবে, এ-কথা যেন ভাবাও যায় না।

সুরেন তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিলে। সমস্ত কলকাতাটা যেন তার চোখের সামনে মরুভূমির মত নির্জীব নিরস মনে হলো। যেন মনে হলো এখানকার মানুষের জীবনের যত কামনা-বাসনা সব কিছু শুষে নিয়ে কলকাতা

নিষ্প্রাণ পাথরে পরিণত হয়েছে। এ-কলকাতার যেন ধর্মই এই। কাউকে মুক্তি দেবে না, কাউকে শান্তি দেবে না, কাউকে আশ্রয়ও দেবে না। কিংবা আশ্রয় দিয়েও তাকে নিরাশ্রয় করে দেবার জন্যে মনে মনে মতলব আঁটছে।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই মোড়টার কাছে এসে দাঁড়ালো! সেই শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। সেই ফেরিওয়ালাটা তখন ক্যালেণ্ডার সাজিয়ে রাখছে। এক-একটা করে ক্যালেণ্ডারগুলো রেলিঙের গায়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

সুরেন দাঁড়িয়ে পড়লো। যেগুলো বাহারে ক্যালেণ্ডার সেগুলো সামনে সাজাচ্ছে। একটা মেয়ের রঙিন ছবি। পাতলা-কাপড় পরা একটা মেয়ে প্রায় ন্যাংটো। একটা টিয়াপাখীকে আদর করছে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। তার পাশেই গোঁফ-দাঁড়িওয়ালা শিবাজীর ছবি। তার বাঁ পাশে ঘোড়ায় চড়া নেতাজীর ছবি। তারপরে একটা ফুলে ভর্তি ফুলদানির ছবি, তারপরে একটা ফিল্ম-স্টারের— হয়ত বোম্বাই-ছবির ফিল্ম-স্টার।

লোকটা ছবি সাজাতে সাজাতেই সুরেনের দিকে একবার মুখ ফেরালে।

সুরেন চোখ সরিয়ে নিলে। কিন্তু লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো— কিছু নেবেন নাকি স্যার?

কিছু নেবে না সে-কথাটা বলতে লজ্জা হলো সুরেনের। জিজ্ঞেস করলে— কত করে দাম?

—কোন্‌টা নেবেন কোন্‌টা, বলুন না?

কোন্‌টা কিনবে সুরেন বুঝতে পারলে না। যেটা কিনতে ইচ্ছে করছিল সেটার উল্লেখ করতে লজ্জা হতে লাগলো।

দোকানী চালাক লোক। বুঝে ফেললে হয়ত। বুঝে মেয়েমানুষের ছবিটা পাকিয়ে গোল করে সুরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—দিন, বউনির সময়, আট আনা দিয়ে দিন—

সুরেনের হাতে লোকটা ক্যালেণ্ডারটা গুঁজে দিলে। সুরেন 'না' বলতে পারলে না। বললে—কিন্তু আমার কাছে তো অত পয়সা নেই—

—কত আছে?

সুরেন বললে—ছ' আনা—

সুরেনের বুকটা তখন ঢিপ-ঢিপ করছে। থর-থর করে কাঁপছে। লোকটা বললে—ঠিক আছে, বউনির সময় ছ' আনাই দিয়ে দিন। আট আনায় কেনা। দু' আনা লোকসানে দিয়ে দিলুম—

ছ' আনায় যে ছবিটা দিয়ে দেবে তা সুরেন ভাবতে পারেনি। পকেট থেকে ছ' আনা পয়সা দিয়ে সুরেন হন্ হন্ করে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলো। ভয় হতে লাগলো যদি দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ দেখে ফেলে। মনে হলো এমন এক অপরাধ করেছে সে যা দেখতে পেলে লোকে তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করবে!

—সুরেন, এই সুরেন, এই...

সুরেনের মনে হলো পেছন থেকে কে যেন তাকে ডাকছে, কিন্তু কে তাকে ডাকবে! এতবড় কলকাতা সহরে কেই বা তাকে চিনবে। কিন্তু যদি সত্যিই কোনও চেনা ছেলে হয়। যদি তার কোনও কলেজের ফ্রেন্ড হয়! যদি জিজ্ঞেস করে—হাতে তোর এটা কী রে? যদি দেখতে চায়? মেয়েমানুষের ছবি দেখে কী ভাববে সে!

পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল সুরেন। তখনও বুকটা কাঁপছে।

হাতের ক্যালেন্ডারটা ঘামে ভিজে গেছে। ইচ্ছে হলো ক্যালেন্ডারটা রাস্তার কোনও ডাস্ট্‌বিনের ভেতরে ফেলে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাতেও তো বিপদ আছে। তাতেও তো কেউ দেখে ফেলতে পারে। কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারে—কী ফেলছেন মশাই ওখানে?

মাধব কুণ্ডু লেনের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল সুরেন। সারাদিন খাওয়া হয়নি। শরীরটা কেমন দুর্বল দুর্বল লাগছে। ঠাকুর হয়ত ভাতটা ফেলে দিয়েছে। এত বেলা পর্যন্ত কি আর খাবার রেখে দেবে সে? সে খেলে কি না-খেলে তা নিয়ে এ-বাড়ির কারো মাথাব্যথা নেই।

—সেলাম হুজুর!

সেই বাহাদুর সিং। বাহাদুর সিং সেই সকালবেলার মতই একভাবে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। সুরেন বললে—সেলাম বাহাদুর—

বলে কোনও দিকে না চেয়ে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিলে। তারপর আলো জ্বাললে। আর তারপর ক্যালেন্ডারটা আস্তে আস্তে খুলে দেখতে লাগলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। ভালো করে আলোর তলায় মেলে ধরে দেখতে লাগলো। কত বয়েস হবে মেয়েটার। মেয়েদের বয়েস ধরা বড় শক্ত। বয়েসে সুখদার চেয়ে হয়ত কিছু বড়ই হবে, কিংবা কিছু কম। কিন্তু মুখটা সুখদার চেয়ে আরো অনেক নরম, আরো অনেক মিষ্টি। গালের ওপর অনেকটা লাল রং চড়িয়েছে। ঠোঁটের ওপর লিপস্টিক, কানে হীরের দুল...

সুরেনের মনে হলো যেন মাথাটা খুব ধরেছে তার। সারা দিন খাওয়া হয়নি। বিছানা থেকে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। সুরেনের মনে হলো ঘরের ভেতরে সে যেন আর একলা নয়, সঙ্গে যেন আর একজন রয়েছে। সে আর সেই ক্যালেন্ডারের মেয়েমানুষটা। মেয়েমানুষটা অন্ধকারের মধ্যেই যেন হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলো। যেন কথা বলতে শুরু করলে। যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। সুরেন তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। মনে হলো যেন চেনা মুখ। যেন পর্মিলিই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে চেয়ে। পর্মিলি গালে লাল রং মেখেছে। খুব নরম গাল, নরম মুখ, খুব মিষ্টি চাউনি। ঠোঁটের ওপর লিপস্টিক, কানে হীরের দুল—

—সুরেন, ও সুরেন, সুরেন—

হঠাৎ যেন আবার সংবিৎ ফিরে এল সুরেনের। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠলো। আলোটা জ্বাললে। তারপর ক্যালেন্ডারটা গোল করে পাকিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলে। তারপর সাড়া দিলে।

বললে—কে?

কালীকান্ত বিশ্বাস রোজকার মত সন্ধ্যেবেলা ঘুম থেকে উঠে বোতল নিয়ে বসেছিল। নিজের [illegible]নার ভেতরে বসে বসে বোতল থেকে ঢেলে খেলে কেউ দেখতে [illegible]। ওটা অভ্যেস। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে ওটা আর

ছাড়া যায় না।

প্রথম প্রথম সুখদা মানা করেছিল।

বলতো—কেন আবার খাচ্ছো? মা-মণি জানতে পারলে কী হবে বলো তো? আমি কিন্তু তখন ঠেকাতে পারবো না।

কালীকান্ত বলতো—তুমি যেন আবার বলে দিও না সত্যি সত্যি—

সুখদা বলতো—আর কিছুদিন সবুর করো না, তখন মা-মণিও থাকবে না, কেউ বলবারও থাকবে না, তখন যত ইচ্ছে খেও—

কালীকান্ত বলতো—আরে, তখন তো পোয়া বারো। তখন কি আর এই রকম দিশি মাল খাবো ভেবেছ! তখন খাঁটি বিলিতি খাবো—

সুখদা বলতো—শেষকালে কোনদিন ওই সব খেয়ে লিভারটা পচিয়ে ফেলবে দেখছি—

কালীকান্ত বলতো—আরে রাখো, লিভার অমনি পচলেই হলো। আমি কি খালি পেটে মাল খাচ্ছি? সঙ্গে মাংস খাচ্ছি কী করতে?

সুখদা বলতো—কেন, আর কিছুদিন সবুর করতে পারো না? আর কিছু-দিন সবুর করলে কী হয়?

কালীকান্ত হাসতো। হাসতে হাসতেই বলতো—আরে জোয়ান বয়েসটাই যদি উপোস করে কাটালুম তো বুড়ো বয়েসে খেয়ে কী করবো? তখন তো দীক্ষা নেবার বয়েস গো—

সুখদা সব দিন কাছে থাকতো না। বরফ-সোডার ব্যবস্থা করে দিয়েই চলে যেত। ঘরের চারদিকে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে দিয়ে কালীকান্ত ভেতরে বসে-বসে মদ গিলতো। একলা একলা খেতে খেতে মতলব ভাঁজতো কেমন করে ম্যানেজারকে তাড়ানো যায়। ম্যানেজার-বেটা এ-বাড়ি থেকে না চলে গেলে যেন শান্তি পেত না কালীকান্ত। কালীকান্ত বলতো—লুকিয়ে লুকিয়ে মাল খেয়ে কখনও প্রাণে সুখ হয়? এ যেন সেই চুরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের বউ-এর পাশে শোওয়া। মাল খাবো, দুটো মুখ-খিস্তী করবো, তবে না নেশা—

সেদিন সন্ধ্যেবেলাও অমনি দরজা বন্ধ করে মদ খাচ্ছিল কালীকান্ত। হঠাৎ যেন বাইরে থেকে কে কড়া নাড়তে লাগলো।

কালীকান্ত চিৎকার করে উঠলো—কে?

—আমি ধনঞ্জয়, জামাইবাবু। একবার দরজাটা খুলুন, আপনাকে একজন ডাকতে এসেছে—

—কে ডাকছে আমাকে এ সময়ে?

আসলে নজর ঘোষেরই ভুল হয়েছিল প্রথম। বাহাদুর সিং সোজা ভাগ্নে-বাবুর ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল নজর ঘোষকে।

নজর ঘোষও বুঝতে পারেনি। জানতো না কোন ঘরে থাকে কালীকান্ত-বাবু। গিয়ে ধাক্কা দিলে সুরেনের ঘরে। সুরেন তখন ক্যালেণ্ডারটা নিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে ছিল। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই জিজ্ঞেস করলে—কে?

কিন্তু দরজা খুলে নজর ঘোষকে চিনতে পারলে না। একেবারে অচেনা মুখ।

বললে—কাকে চান আপনি?

নজর ঘোষ বললে—কালীকান্তবাবুকে ডাকতে এসেছি, কালীকান্ত বিশ্বাস—

—জামাইবাবু? তিনি তো ভেতরে থাকেন। তারপর ধনঞ্জয়কে ডেকে বলে

দিলে কালীকান্তবাবুকে ডাকতে।

বললে—জামাইবাবুকে বল একজন লোক তাকে ডাকতে এসেছে—

ধনঞ্জয় সেই কথা অনুযায়ীই ডেকে নিয়ে এল জামাইবাবুকে। নেশার ঝোঁক তখন সবে একটু জমতে শুরু হয়েছে।

বললে—কে বাবা তুমি?

উঠোনের অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছিল না।

নজর ঘোষ বললে—আমাকে চিনতে পারছেন না ছোটবাবু, আমি নজর, নজর ঘোষ—

—আরে, সোনাগাছির নজর? তুই এখানে? এই অসময়ে?

নজর করজোড়ে নিবেদন করলে—আজ্ঞে, ছোট হুজুর একবার আপনাকে ডাকতে পাঠালেন—

—ছোট হুজুর? ছোট হুজুর কে?

—আজ্ঞে পাথুরেঘাটার নরেশ দত্তবাবু।

—বড়দা? কোথায় বড়দা?

—আজ্ঞে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, মাধব কুণ্ডু লেনের মোড়ে—

—তাই নাকি, চল্, চল্—

বলে নজর ঘোষের সঙ্গে সেই অবস্থাতেই বেরোল। সুরেন সেখানে দাঁড়িয়েই দেখলে আগে আগে নজর ঘোষ চলেছে, আর পেছন-পেছন টলতে টলতে জামাইবাবু কালীকান্ত বিশ্বাস—

নরেশ দত্ত মাধব কুণ্ডু লেনের মধ্যে ঠায় তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল। টাকার গরজ বড় গরজ। অন্ধকারে লোকজন যাতায়াত করছে আশপাশ দিয়ে। নরেশ দত্ত আশেপাশে চেয়ে দেখছিল কেউ চিনতে পারে কিনা। বড় মুশকিলে পড়েছিল নরেশ দত্ত। নেশাব পর এমন উদ্বেগ কারো ভালো লাগে? তখন একটু ফুর্তির মেজাজ হয়। দুটো গাল-গল্প করলে নেশাটা জমে ভালো, তা নয়, কোথায় কোন হারামজাদার পেছনে-পেছনে ঘোরা। যা পছন্দ করে না নরেশ দত্ত তাই-ই হয়েছে।

কিন্তু, ওই যে টাকা! টাকার গরজ বড় গরজ। ভূপতি ভাদুড়ী এখন বেকায়দায় পড়েছে বলেই আবার তার দারস্থ হয়েছে।

—বড়দা!

হাতে যেন স্বর্গ পেলে নরেশ দত্ত। চেনা গলার আওয়াজ।

বললে—কী রে, কেমন আছিস্ তুই?

কালীকান্ত বললে—তুমি যেমন রেখেছ তেমনি আছি। তুমিই তো বলেছিলে বুড়ি মরবে। কিন্তু বুড়ির তো মরবার নাম নেই বড়দা—

—চুপ কর।

নজর ঘোষ পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। নরেশ দত্ত বললে—চল নিরিবিলি একটা জায়গায় যেতে হবে, ক'টা কথা আছে তোর সঙ্গে—

কালীকান্ত বললে—কিন্তু আমি যে বড়দা জামা গায়ে দিয়ে আসিনি। জামাটা তাহলে গায়ে দিয়ে আসি—

নরেশ দত্ত বললে—চল্ চল্, চেনা বামুনের আবার পৈতে। চলে আয়—

কালীকান্ত বুঝতে পারলে না কথাটা, বললে—কোথায়?

—তুই আয় না। সব বলবো তোকে!

বলে হাত ধরে নরেশ দত্ত টানতে লাগলো। টানতে টানতে নিয়ে একেবারে পাথুরেঘাটায় নিজের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

নজর ঘোষ পেছনে পেছনে আসছিল, এতক্ষণে বললে—ছোট হুজুর—

—আরে তুই এখনও আছিস?

বলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ছুঁড়ে দিলে তার দিকে। তারপর আর কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে অন্ধকার উঠোনের মধ্যে পা বাড়ালে।

পাথুরেঘাটার দত্তদের এককালে ভালো অবস্থা ছিল। দত্তবাড়ির অনেক শাখা-প্রশাখা। একখানা বাড়িকে ভেঙেচুরে অনেক সরিক অনেক সরিকানা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। নরেশ দত্তর পূর্বপুরুষদেরই কোনও সরিকের সঙ্গে শম্ভু চৌধুরীর মেয়ে লাবণ্যময়ীর বিয়ে হয়েছিল। সে কথা নরেশ দত্তও শুনেছে। কিন্তু সে-বিয়ে যখন হয়েছিল, তখন নরেশ দত্ত বয়েসে ছোট। কিছুই মনে নেই তার, কিন্তু সে যে কোন্ সরিকের সঙ্গে তাও জানে না। কারণ মূল বংশের ডাল-পালা কোথায় কত দূরে গিয়ে ঠেকেছে তা দেখা বা জানা সম্ভব নয় কারোর পক্ষে। কলকাতার আদি পত্তনের সময় থেকে শুরু হয়ে সে-বংশ এখন নিস্তেজ নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে' তাই বাড়ির মধ্যে না আছে শ্রী না আছে সমৃদ্ধি। সরিকে-সরিকে সেই যে কবে থেকে মামলাগুলো শুরু হয়েছে তার জের লোয়ারকোর্ট থেকে শুরু করে হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত তারা হাত বাড়িয়েছে। সেই বংশের বংশাবতংস নরেশ দত্ত। কিন্তু দুরবস্থার চরমে এসে পৌঁছিয়েছে তখন।

নিজের ঘরের তালাটা খুলে নরেশ দত্ত বললে—দাঁড়া, আগে হারিকেনটা জ্বালি—

ভেতরে একটা ভেপসা গন্ধ বেরোচ্ছিল। নরেশ দত্ত কোথা থেকে একটা হারিকেন জ্বেলে নিয়ে এল। বললে—আয়, ধুলোটা ঝেড়ে নিয়ে চেয়ারটায় বোস—

কালীকান্ত বসলো। নরেশ দত্ত নিজেও বসলো। তারপর বললে—বড় জরুরী কাজে তোকে ডেকেছি রে—কিছু পাওনা হবে তোর—

কালীকান্ত বললে—কত পাওনা হবে?

নরেশ দত্ত বললে—এই ধর হাজার কয়েক টাকা।

কালীকান্ত বললে—কী করতে হবে আমাকে?

নরেশ দত্ত বললে—সোজা কাজ। এমন কিছু শক্ত নয়। মাগীটাকে নিয়ে আবার বাইরে চলে যেতে হবে।

—মাগীটাকে মানে? বউকে? সুখদাকে?

—হ্যাঁ। যেমন করে সেবার নিয়ে গিয়েছিলি তেমনি করে।

কালীকান্ত কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপরে বললে—নগদে দেবে তো? না সেবারের মত এক-হাজার টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে পরে আবার দেবে! আমার কিন্তু নগদ পাঁচ হাজার টাকা চাই এবার।

—কিন্তু কথা দিচ্ছিস আর ফিরে আসবি না?

কালীকান্ত বললে- পাঁচ হাজার দেবে তো?

—বলছি তো দেবো, তবে তুই তার আগে কথা দে আর কখনও আসবিনে। একেবারে বুড়ি মরে গেলে তবে আসবি। তখন বুড়ির সব সম্পত্তি তুই পাবি

কালীকান্ত বললে—কথা দিচ্ছি বুড়ি মরার আগে ফিরে আসবো না—

—যদি তোর বউ না যেতে চায়?

কালীকান্ত বললে—আমি যেমন করে হোক তাকে নিয়ে যাবো, কিন্তু টাকাটা কবে দেবে?

নরেশ দত্ত বললে—কিন্তু টাকা হাতিয়ে নিয়ে তুই যদি না যাস্, তখন?

—তাহলে আমায় কিছু দাও এখন? এই ধরো হাজারখানেক—

নরেশ দত্ত পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলে। তারপর এক তোড়া কড়কড়ে নোট বার করলে। করে কালীকান্তকে দিলে। বললে—গুণে দ্যাখ তুই, কত আছে—

ছোঁ মেরে নোটগুলো নিয়ে কালীকান্ত গুণতে লাগলো। গুণে বললে—এ তো মাত্তোর দু'শো—

নরেশ দত্ত বললে—এখন আর নেই, এখন ওই দু'শোই নে। পরে বাকিটা দেবো। আগে কাজ হাসিল করে দ্যাখা—

তাতে কালীকান্তর আপত্তি নেই! দু'শো দু'শোই সই। দু'শো টাকাই বা কে দেয়। সবটাই তো উপরি পাওনা। মুফোত পেলে একটা পয়সা নিয়ে নিতেও কালীকান্তর আপত্তি নেই। ভালো করে টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে কালীকান্ত উঠে দাঁড়ালো। বললে—তোমার এত গরজ কেন বলো তো বড়বাবু? আমাকে যে এই টাকাটা দিলে এতে তোমার কী ফয়দা?

—আমার?

নরেশ দত্ত উত্তরটা ভাবতে একটু সময় নিলে। তারপর হাসলো। বললে—পাপ আমি সইতে পারি না রে! তুই কথার খেলাপ করে পাপ করেছিস তার খেসারত দিচ্ছি আমি। বয়েস তো হচ্ছে আমার, বয়েস হলে তুইও পরকালের কথা ভেবে সব পাপের খেসারত দিবি। আগে তোর আমার মত বয়েস হোক—

কথাটা এমনভাবে বললে নরেশ দত্ত যেন বিশ্বাস হলো কালীকান্তর।

নরেশ দত্ত বললে—বিশ্বাস হলো না তো রে? তা এখন তোর বিশ্বাস হবেও না। আগে আমারও বিশ্বাস হতো না রে। এখন যত বয়েস বাড়ছে ততই পরকালের কথা ভাবছি! ভাবছি নিজেরই বা কী ক্ষতি করেছি, আর পরেরই বা কী ক্ষতি করেছি—। আমিই তো মেয়েটাকে ফুস্‌লে নিয়ে যেতে তোকে এক দিন ফুস-মন্তর দিয়েছিলুম। সব পাপ তো আমাকেই বর্তাবে। তোর পাপের জন্যে তো আমিই ভুগবো! তাই আজকে এই করে প্রায়শ্চিত্ত করে যাচ্ছি—

কালীকান্ত বললে—ঠিক আছে—

নরেশ দত্ত বললে—তাহলে তুই কথা দিয়ে গেলি যে মেয়েটাকে আবার বার করে নিয়ে যাবি?

কালীকান্ত যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—কথা দিয়ে গেলাম বড়দা—

—কবে নাগাদ নিয়ে যাবি?

—এই ধরো কাল কি পরশু—

—ঠিক যাবি তো?

—টাকার জন্যে আমি সব পারি বড়দা। টাকা তুমি দেবে তো ঠিক?

নরেশ দত্ত বললে—কথার খেলাপ করে আমি কি নরকে যাবো বলতে চাস?

এর ওপর আর কথা চলে না। কালীকান্ত ট্যাঁকের টাকাটা স্পর্শ করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারপর সোজা একেবারে হন্ হন্ করে গিয়ে হাজির হলো পাঁচুকালী সাহার দোকানে। দোকান তখন বন্ধ হয়-হয়। সদর-দরজাটা কিন্তু তখনও খোলা ছিল। দৌড়ে ভেতরে ঢুকেই হাতটা বাড়িয়ে দিলে। দুটো খুচরো টাকা আঙুলে তুলে ধরে বললে—একটা পাঁইট দেখি—

একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিতে সুরেন যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। ক'দিন ধরেই খারাপ লাগছিল এ-বাড়ির সব কিছু। একদিন যেমন ভালো লেগেছিল এই মাধব কুণ্ডু লেনটা, তেমনি আবার খারাপ লাগতে শুরু করেছিল এ-বাড়ির সকলকে। এক-একবার ভাবতো সুরেন যে, হয়ত তার নিজের কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই বলেই এমন লাগছে। কিন্তু কী করেই বা স্বাধীন হওয়া যায়। একটা কিছু চাকরি পেলেও সে এখান থেকে দূরে সরে গিয়ে বাঁচতো। কিন্তু কে চাকরি দেবে? কার সঙ্গেই বা তার জানাশোনা আছে। তার তো কেউ নেই। মামাও তার চাকরির জন্যে চেষ্টা করবে না। মামা বলতো—চাকরি করে তোব কী হবে? তোর কি টাকার অভাব?

এর জবাবে সুরেন কী বলবে বুঝতে পারতো না। একটু থেমে বলতো—চাকরি না করলে যে খারাপ লাগছে—

মামা বলতো—খারাপ লাগলে আমার কাজগুলো দেখ্ না, আমার কাজ তো আমি একলা করতে পারছি না। তুই তো একটু দেখতে পারিস—আমার তো বয়েস হচ্ছে—

অথচ মামার কাজ করতে যে তার ভাল লাগে না তা মুখ ফুটে বলতেও পারতো না সুরেন। মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতো কেবল, তার-পর আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে পালিয়ে বাঁচতো। সেখানে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে নিজের অতীত জীবনটা পরিক্রমা করতো। কেন সে এমন হলো! কেন সে এমন এক সংসারে জন্মালো যেখানে তাকে আপন মনে করার কেউ নেই। যদি জন্মালোই তবে কেন এমন করে নিঃসঙ্গ হলো সে? মনে হতো সেই আগেকার মত যদি আবার মা-মণি তাকে ডাকতো তাহলে হয়ত ভালো হতো! সুখদা আসার পর থেকে মা-মণি আর আগেকার মত তাকে ডাকে না।

সেদিন হঠাৎ উঠোনের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে সুরেন দেখলে, সেই নরেশ দত্ত বসে আছে মামার দফতরে। কী রকম সন্দেহ হলো। নরেশ দত্ত তো! ঠিক সেই রকম গোঁফ জোড়া!

মামা ডাকলে—কোথায় যাচ্ছিস এই অবেলায়?

সুরেন একটু থমকে দাঁড়ালো। বললে—কোথাও না—

—কোথাও না মানে? রাস্তার দিকে যাচ্ছিস আর বলছিস, কোথাও না? এদিকে আয়—

সুরেন আস্তে আস্তে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো। ভূপতি ভাদুড়ী বললে—খেয়েছিস?

সুরেন বললে—এসে খাবো—

—এসে খাবো মানে? তোর জন্যে ঠাকুর-চাকর সব বসে থাকবে নাকি? কোন্ জরুরী রাজকার্যে যাচ্ছো যে খেয়ে নিয়ে যেতে পারো না? এবার থেকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি কারোর ভাত ঢাকা দিয়ে রাখা চলবে না।

হঠাৎ নরেশ দত্ত বলে উঠলো—ইটি কে ম্যানেজার?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমার ভাগ্নে, দেখ না, বাড়ি নয় তো যেন হোটেল হয়েছে। যে যখন পারছে খাচ্ছে, যখন ইচ্ছে বেরোচ্ছে, কোনও নিয়ম-কানুন

নেই। এবার মা-মণি বলেছে এ-সব বেআইনী কাজ চলবে না।

নরেশ দত্ত বললে—আমাদের বংশটা দেখ না ম্যানেজার, এই রকম বেনিয়ম করে করেই গেল! চোখের সামনেই চলে গেল! না না, কড়া আইন করে দেবে সব। সবাইকে সে-আইন মানতে হবে। যে আইন মানবে না তাকে বাড়ি থেকে হুট্-আউট্ করে দেবে -

সুরেন এতক্ষণে কথা বললে! বললে—একটা কথা বলছিলাম—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আবার কী কথা? টাকা! টাকা হবে না—আমার টাকা নেই—

সুরেন বললে—না, তা নয়—

—তবে? তবে কী?

সুরেন বললে—আমি এ-বাড়ি থেকে চলে যাব ভাবছি—

—চলে যাবি? এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি? বলছিস কী তুই? কোথায় যাবি! কোন্ চুলোয় যাবি?

সুরেন বললে—আমার এক বন্ধুর কাছে—

—বন্ধু? তোর আবার বন্ধু কে? কলেজের বন্ধু? না পাড়ার বন্ধু?

—আমার স্কুলের বন্ধু!

এবার তেড়ে-মেড়ে ভূপতি উঠে দাঁড়ালো। বললে—এই সব বদ মতলব তোমার হয়েছে? সুখে থাকতে তোমায় ভূতে কিলোয়? তুমি বাড়ি ছেড়ে বন্ধুর বাড়িতে উঠবে আর আমার বদনাম দেবে? কেন, আমি তোমায় খেতে দিই না? পরতে দিই না? আমি তোমার নিজের মামা হয়ে পর হয়ে গেলাম আর তোমার কোথাকার ইস্কুলের বন্ধু আপনজন হলো? বেরোও এখান থেকে—

বলে ভূপতি ভাদুড়ী তেড়ে এল সুরেনের দিকে। কিন্তু নরেশ দত্ত দাঁড়িয়ে উঠে থামিয়ে দিলে!

বললে—করছো কী ম্যানেজার, ভাগ্নেটাকে মারবে নাকি?

ভূপতি ভাদুড়ী তখন রেগে গেছে। বললে—তুমি ছাড়ো নরেশ, আমি রেগে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাতে পারি—আমার মুখের ওপর ও কিনা বললে ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? ও ভেবেছে কী?

—আরে যেতে দাও, ছোট ছেলে বলে ফেলেছে ক্ষমা-ঘেন্না করে নাও—

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—কেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কেন? এখেনে কীসের অসুবিধে? কেউ কিছু বলেছে?

সুরেন বললে—না—

নরেশ দত্ত বললে—তাহলে? রাগ হয়েছে? কারো ওপর রাগ হয়েছে?

সুরেন আবার বললে—না—

—তাহলে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—দেখলে তো আজকালকার ছেলেদের মতিগতি? এদের জন্যই তো দেশের এত দুর্গতি! সাধে কি আর বাঙলাদেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে? এত আরাম এখানে, বিনা-পয়সায় খাওয়া থাকা মিলছে, তবু কপালে সইছে না। কেন, খুলে বল্ দিকিনি—হঠাৎ এ মতলব তোকে কে দিলে? তার নাম কী? কোথায় থাকে সে? কী করে?

সুরেন চুপ করে রইল। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না তার।

নরেশ দত্ত বললে—বলো, মামার কথার জবাব দাও, তার নাম কী? কোথায় থাকে সে? কী করে? এখানে অসুবিধেটা তোমার কী?

সুরেন বললে—পরের বাড়িতে আমার বসে বসে খেতে ভাল লাগে না—

—তা বসে বসে খেতে কে তোকে বলেছে? তুই কি বসে বসে খাচ্ছিস? তুই কাজ করছিস না? তুইও তো উকীলের বাড়িতে গিয়ে কাগজ-পত্তোর দিয়ে আসিস—

হঠাৎ বাহাদুর সিং ঘরে ঢুকলো। বললে—এক আদমী ভাগ্নেবাবুকে ডাকতে এসেছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কে সে? কোথায় আছে? এখেনে ডেকে আন্—এই সব বন্ধুরাই হয়েছে যত নষ্টের গোড়া—

বাহাদুর সিং সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিয়ে এসেছে। দেবেশ! দেবেশ কিন্তু এত লোক আশা করেনি। চারদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল!

সুরেন বললে—আমার ইস্কুলের বন্ধু।

—কী নাম খোকা তোমার?

দেবেশ বললে—দেবেশ—

ইতিমধ্যে কালীকান্ত হট্-হট্ করে ঘরে ঢুকে পড়েছে। বললে—ছোটবাবু, আমায় ডাকছিলে?

নরেশ দত্ত উঠে দাঁড়ালো। বললে—হ্যাঁ রে! এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠিস তুই!

তারপর ঘরের বাইরে চলে এল। কালীকান্তও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল বাইরে। আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি নরেশ দত্ত জিজ্ঞেস করলে—কী রে, সেদিন টাকা নিয়ে এলি, তারপর তোর তো আর দেখাই নেই। কবে যাচ্ছিস?

কালীকান্ত বললে—আর দুটো দিন সবুর করো ছোটবাবু, একটা বাড়ি পাচ্ছি না—

—বাড়ি পাচ্ছিস না তো আমাকে বলিলিনি কেন? নে, আরও একশো টাকা নে -

বলে পকেট থেকে আর একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিলে কালী-কান্তর দিকে। কালীকান্ত নোটখানা ছোঁ মেরে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে ফেললে। তারপর বললে—আর দুটো দিন সময় দাও বড়দা, আমি দু'দিনের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলবো—

নরেশ দত্ত বললে—কিন্তু আর তো বেশিদিন দেরি করা চলবে না তোর। তোকে একটা দিন-ক্ষণ-তারিখ দিতে হবে। টাকা খেইছিস, এখন খেসারত দিতে হবে না?

কালীকান্ত বললে—আর একটা দিন বড়দা, আর একটা দিন সবুর করতে দাও, আর একটা দিনের মধ্যে যেমন করে হোক আমি বৌকে বাড়ির বার করবোই—

—তা যদি বেরোতে না চায় তখন কী করবি?

কালীকান্ত বললে—মাগীকে পিটিয়ে বার করবো।

—খবরদার বলছি, অমন কাজটি করিসনি। পিটোতে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে। তখন সবাই তোকেই পিটিয়ে বার করবে। তার চেয়ে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বার করে নিয়ে যাবি—

কালীকান্ত বললে—মেয়েমানুষ কি ভুজুং-ভাজুং শোনবার লোক, তুমিই বলো?

—দূর শালা, আমি মেয়েমানুষের কী জানি, আমি কি বিয়ে করেছি?

কালীকান্ত হাসলো। বললে—তুমি হাসালে বড়দা, বিয়ে না করলে কি মেয়েমানুষকে চেনা যায় না? তুমি কি আমার চেয়ে মেয়েমানুষ কম করেছ কিছু?

—সে তো ভাড়াটে মেয়েমানুষ রে। তোর কি ভাড়াটে মাগ? ওসব কথা ছাড়, যদি টাকা চাস তো মাগকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতেই হবে তোকে। তা নইলে যদ্দিন বুড়ি না মরে তদ্দিন মাগের কাছে হাত পাততে হবে—

কালীকান্ত বললে—না বড়দা, আজকে সন্ধ্যেবেলাই আমি একটা বাসা খুঁজতে বেরোব—

কালীকান্ত চলে যাবার পর নরেশ দত্ত আবার গিয়ে ঢুকলো ভূপতি ভাদুড়ীর দফ্‌তরে—

ততক্ষণে সুরেন চলে গেছে। একলা ভূপতি ভাদুড়ী নরেশ দত্তর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অনেক দিনকার অনেক প্ল্যান প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। বড় দুর্ভাবনায় কাটছিল ভূপতি ভাদুড়ীর ক'টা মাস। একটা কাঁটা তুলতে গিয়ে আরো একটা কাঁটা বিঁধে গেল। এবার যদি কোনও রকমে পার পাওয়া যায় তো রাতারাতি একটা উইল বানিয়ে নিতে হবে। আর তারপর যা-হয় হোক। তখন দুগ্‌গা বলে একেবারে ঝুলে পড়বে ভূপতি ভাদুড়ী। তখন পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে তুড়ি মেরে ঘুম দেবে। আর নাকে দড়ি দিয়ে হুকুম তামিল করতে হবে না তাকে। সামনে শিখণ্ডী থাকবে ভাগ্নেটা, আর তার হাত দিয়ে তামাক খাবে ভূপতি ভাদুড়ী।

—তাহলে উঠি ম্যানেজার।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে সব পাকা হয়ে গেছে তো?

নরেশ দত্ত বললে—হ্যাঁ, একেবারে গাছ-পাকা। এখন আর দড়কচা পড়বে না। এখন কেটে খাওয়ার যা বাকি। আমি সাফ-সাফ বলে দিয়েছি, যদি আরো টাকার মুখ দেখতে চাস তো এখান থেকে ভেগে যা—

—ঠিক আছে। দেখি তোমার কদ্দুর কেরামতি!

বলে ভূপতি ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালো। তারও তখন অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

মানুষের জীবনটাই বুঝি এমনি! সোজা পথে চলতে চলতে হঠাৎ বুঝি কখন বাঁকের মুখে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। তখন সমস্যা হয় কোন্ দিকে যাবো। কোন্ দিকে গেলে শেষের গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছুবো। আর পথই কি একটা? পথের যেমন সীমা-সংখ্যা নেই গন্তব্যস্থানেরও কি সীমা-পরিসীমা আছে?

সুরেন সেই কবে একদিন কোন্ এক গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। তখন ভেবেছিল কোনও ক্রমে একবার কলকাতায় এসে পৌঁছুতে পারলেই চরম মোক্ষ মিলে যাবে। শেষে সেই কলকাতাতেও সে এল, আশ্রয়ও সে এখানে পেলে, কিন্তু কীসের বিনিময়ে? কোন মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সে শেষ গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছোল?

শেষের আগে যেমন শুরু আছে, শেষের পরেও তো তেমনি আছে অশেষ। মানুষের জীবনের গন্তব্য-স্থল তো অশেষ। সেই অশেষের দিকে যাত্রা করতে-করতেই তো অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার সঞ্চয় জমে ওঠে। তখন মন বলে, যা কিছু দেখলুম, যা কিছু উপভোগ করলুম তাতে আর আমার আসক্তি নেই। এবার অনুগ্রহ করে আমাকে মুক্তি দাও।

সেদিনও সেই মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে থাকবার সময়ও সুরেনের সেই কথাই মনে হয়েছিল। একদিন ওই বাড়িরই একটা ঘরে আগুন লেগে গিয়েছিল কালীকান্তর বিড়ি খাওয়ার ছাই পড়ে। তখন দোষ পড়েছিল ম্যানেজার ভূপতি ভাদুড়ীর ওপর। যেন কালীকান্তর অপরাধের জন্যে ম্যানেজারই দায়ী। আবার নতুন করে আর একবার আগুন লাগলো। কিন্তু এবার কাকে দায়ী করবে কালীকান্ত?

মনে আছে, সেবার মা-মণি সত্যিই রেগে গিয়েছিল ভূপতি ভাদুড়ীর ওপর।

মা-মণি বলেছিল—তুমি কোথায় থাকো ভূপতি, তোমাকে ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না—

ভূপতি ভাদুড়ী বলেছিল—আজ্ঞে, মা-মণি, আমি তো দফতরেই থাকি—

—তাহলে পরশু সন্ধ্যেবেলা তোমাকে পাওয়া গেল না কেন? ধনঞ্জয়কে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠালুম আমি। কালীকান্ত বলছিল ওর ঘরে নাকি তুমিই আগুন লাগিয়ে দিয়েছ?

ভূপতি ভাদুড়ী চমকে উঠলো।

—আমি? আমি আগুন লাগাবো বাবাজীর ঘরে? কেন? আমার কী দায়? আমি চাকরি করি, মাইনে পাই—চুকে গেল ল্যাঠা, আমি কারো ঘরে আগুন লাগাতে কেন যাবো মা-মণি?

—তাহলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে পরশু সন্ধ্যেবেলা?

—আজ্ঞে উকীলবাবুর বাড়িতে সেই উইলের ব্যাপারে!

—সেই উইলের কী হলো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সেই কথা বলতেই তো আমি গিয়েছিলাম সেখানে। গিয়ে দেখি কিছুই করেননি।

—কিছুই করেননি মানে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কী আর বলবো মা-মণি! এতকাল তো কোর্ট-ঘর করে আসছি, উকীলদের আর কিছুই বদলালো না। আমি তাঁকে বলে এলাম—একটা উইল করতে যদি এত দেরি হয় তো মানুষ যে কবে মরে ভূত হয়ে যাবে। যা আমার মুখে এল তাই-ই বলে এলাম।

—তা যাক্ গে। উইল এখনও করেননি ভালোই হয়েছে—

—কেন?

মা-মণি বললে—আমি ভেবে দেখলাম ওই সুখদার নামেই সব উইল করে রেখে দিয়ে যাবো। আমারও তো শরীর খারাপ, বয়েসও হচ্ছে, আমি কবে আছি কবে নেই, যাবার আগে সব বন্দোবস্ত পাকা করে রেখে যাওয়া ভালো—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—খুব ভালো মা-মণি, খুব ভালো। যা বিবেচনা করেছেন, খুবই ভালো বিবেচনা। সুখদা তো আর পর নয়—

মা-মণি বললে—সুখদা ছাড়া আমার আপন বলতে আর কে-ই বা আছে—

—তা তো বটেই মা-মণি! আর কালীকান্ত বাবাজী?

মা-মণি বললে—সুখদাকে দিলেই জামাই-বাবাজীকে দেওয়া হবে। কালী-

কান্তও তো আমার পর নয়। একটু নেশা-ভাঙ করে বটে, কিন্তু কী করবে বেচারি, একবার নেশা করে ফেলেছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে উকীলবাবুকে আমি সেই কথাই গিয়ে বলবো—

—হ্যাঁ, তাই-ই বলো। দেখ, তোমার ভাগ্নেকেও আমি বঞ্চিত করবো না। নারকেলডাঙার বাড়িটা ওর নামে লিখে দেবো'খন না হয়—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওকে আর কেন দিচ্ছেন আপনি? ওর এখন কম বয়েস, এখন সামনে ওর অনেক ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, ওর কথা কিছু ভাবতে হবে না—

—না, তা কি হয়? সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না! আমি এক-রকম ঠিকই করে ফেলেছি।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—দিচ্ছেন দিন, আপনি দেবেন তাতে আমার কী বলবার আছে!

—সুরেন কোথায় এখন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে কখন কোথায় থাকে তার পাত্তাই নেই—

—লেখাপড়া কেমন করছে এখন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—লেখাপড়া? তবে আর আমার দুঃখু কীসের? ও যদি মানুষ হতো তো আমার কীসের ভাবনা? বি-এ পাস করে বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজছে আর রাস্তায়-রাস্তায় ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে—

—আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে? কেন? আর পড়াচ্ছ না কেন? এম. এ-টাও পড়াও—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ও বলছে আর পড়বে না—

—কেন, পড়বে না কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না পড়ুক, একটা যদি চাকরি-বাকরিও জুটিয়ে নিতে পারতো তো আমি একটু ছুটি পেতাম, আমার হাতে আর টাকা-পয়সা নেই—

মা-মণি রেগে গেল। বললে—তোমার টাকা-পয়সা নেই বলে ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে? আমি খরচা দেবো ওর লেখাপড়ার, তুমি ওকে আমার কাছে ডেকে দাও—

এ-সব ঘটনা সেই আগুন লাগার ঘটনার পরেই। তারপর একদিন সুরেনকে ডেকে ভূপতি ভাদুড়ী মা-মণির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী বলেছিল—যদি মা-মণি তোকে টাকা দিতে চায় তুই যেন 'না' বলিসনে, জানিস?

সুরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আমাকে টাকা দেবে? কেন? কীসের জন্যে?

—তা বড়লোক মানুষ, টাকা যদি দেয়ই তো তাতে ক্ষতি কী?

এরপর আর কিছু বলেনি সুরেন। সোজা একেবারে চলে গিয়েছিল তেতলায়। দোতলাতেই কালীকান্তর ঘর। কালীকান্ত দেখতে পেয়েই ডেকেছে—কে হে? কে যাচ্ছ ওপরে?

সুরেন থমকে দাঁড়ালো। বললে—আমি—

—ও তুমি? তা ওপরে কোথায় যাচ্ছ?

সুরেন বললে—মা-মণির কাছে—

—মা-মণির কাছে? কেন? বলা-নেই-কওয়া-নেই ওম্‌নি মা-মণির কাছে হুট্-হুট্ করে গেলেই হলো? বুড়োমানুষকে বিরক্ত করতে কেন যাচ্ছ শুনি? কীসের ফন্দি আঁটছ?

সুরেন বললে—মা-মণি আমায় ডেকেছে—

—ডেকেছে? তোমাকে? কেন? তুমি কীসের অমন লবাব-পুত্তুর যে এত লোক থাকতে তোমাকে ডেকেছে?

সুরেন বললে—তা জানি না—

—খবরদার বলছি, যখন-তখন ওপরে যাবে না। যাও, নিচেয় নেমে যাও।

সুরেন বললে—কিন্তু মা-মণি আমাকে ডেকেছে যে—

কালীকান্ত বললে—সেই সোজা উত্তরটাই দাও না, কেন ডেকেছে?

সুরেন বললে—কেন ডেকেছে তা তো আমি জানি না, আমি মা-মণির কাছে গেলে জানতে পারবো—

পাশেই বোধহয় সুখদা ছিল। এতক্ষণে সে সামনে এল। বললে—লুকিয়ে লুকিয়ে যে ওপরে যাচ্ছ, তুমি ভেবেছ আমরা কেউ দেখতে পাবো না, না?

সুরেন এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

কালীকান্ত বললে—আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, নিচেয় নেমে যাও—

সুরেন বললে—আমি মা-মণির কাছে যাবো—

সুখদা বললে—না, মা-মণির কাছে আর শখ করে যেতে হবে না—

সুরেন আর থাকতে পারলে না। বললে—এ-বাড়ির মালিক তুমি না মা-মণি? আমি কার কথা শুনবো?

সুখদা বললে—আমি মালিক, আমার কথা শুনতে হবে—

সুরেন বললে—কিন্তু সবাই জানে মা-মণিই এ-বাড়ির মালিক। তুমি যখন মালিক হবে তখন হবে, এখন মা-মণির হুকুম আমি শুনবো। মা-মণি আমায় ডেকেছে, মা-মণির কথা শুনে তারপর নিচেয় চলে যাবো—

—তবে রে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—বলে কালীকান্ত ঘর থেকে তেড়ে এসে সুরেনের গলাটা টিপে ধরেছে। যন্ত্রণায় সুরেনের মুখ দিয়ে একটা তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে।

—কে? ওরে কে কাকে মারছে ওখানে? কী হলো?

বলতে বলতে মা-মণি ওপর থেকে দেখতে পেয়েছে সব। কালীকান্ত তখনও সুরেনের গলাটা চেপে ধরে রয়েছে। মা-মণি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে নেমে এসে কালীকান্তর হাতটা চেপে ধরেছে।

বললে—করছো কী তুমি? ওকে মারছো কেন? ও কী করেছে? ওকে ছেড়ে দাও—

কালীকান্ত হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—দেখুন না মা-মণি, আমায় গালাগালি দিচ্ছে—

—গালাগালি? তোমাকে গালাগালি দিয়েছে সুরেন? কেন?

মা-মণি সুরেনের দিকে চাইলে—তুমি গালাগালি দিয়েছ কালীকান্তকে?

সুরেন বললে—তুমি কালীকান্তবাবুকেই জিজ্ঞেস করো না—

মা-মণি কালীকান্তর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে—সুরেন তোমায় গালাগালি দিয়েছে?

কালীকান্ত বললে—এই সুখদাকেই জিজ্ঞেস করুন না, গালাগালি না দিলে

কি আমি শুধু-শুধু ওর গায়ে হাত দিতে যাবো?

—কি গালাগালি দিয়েছে?

কালীকান্ত বললে—কী আর বলবে, ছোটলোকেরা যা-গালাগাল দেয় তাই দিয়েছে। শালা-বান্‌চোত বলেছে—

—সে কী? সুরেন? সুরেনের মুখ দিয়ে ওই সব কথা বেরিয়েছে?

সুখদা বললে—তা তো তুমি বিশ্বাস করবেই না। তবু যদি আমি নিজের কানে না শুনতুম—

মা-মণি আর থাকতে পারলে না। বললে—দ্যাখ্ সুখদা, আমি সব বিশ্বাস করতে পারি, চন্দ্র-সূর্য উঠছে না তাও আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সুরেন কখনও গালাগালি দিতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করবো না।

কালীকান্ত বলে উঠলো—আপনি যে আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না মা-মণি, সে আমরা জানি। আপনি আমাদের দেখতেও পারেন না, তাও জানি। আমরা যে আপনার চক্ষুশূল—

—কী বললে? কী বললে তুমি?

কালীকান্ত থামলো না। বলতে লাগলো—আপনি তো আমার কথা কিছুই বিশ্বাস করেন না। ভূপতি ভাদুড়ী আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে, সেও আমার দোষ হয়ে গেল। তার ভাগ্নেটা আমায় যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিলে তাও আমার দোষ। নিজের লোকের চেয়ে পরই আপন হয়ে গেল। আজ যদি বাড়িতে চুরি হয়ে যায় তো তাতেও আমার ঘাড়েই দোষ পড়বে—

মা-মণি বললে—দেখ কালীকান্ত, কে আপন কে পর তা আর তোমায় শেখাতে হবে না—

কালীকান্ত বলে উঠলো—আমরা পর না হলে আপনি ভূপতি ভাদুড়ীর ভাগ্নেটাকে কেন অমন করে লাই দিচ্ছেন তা কি আমরা জানি না ভেবেছেন?

—কী জানো তোমরা, শুনি?

কালীকান্ত বললে—তলে তলে তো সব সম্পত্তি ওই ছোড়াটার নামেই লিখে দিচ্ছেন—

—সম্পত্তি? আমার সম্পত্তির কথা বলছো?

কালীকান্ত বললে—সম্পত্তির কথা বলবো না তো কীসের কথা বলবো? আপনার সম্পত্তি না থাকলে কেউ আপনাকে পুছতো, না কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার কাছে যেতো?

মা-মণি বললে—তবে বুঝি আমার সম্পত্তির ওপরেই তোমার লোভ কালীকান্ত? আমাব চেয়ে বুঝি আমার সম্পত্তিই তোমার কাছে বড় হলো?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—ঠিক আছে, যদি সম্পত্তিই তোমাদের কাছে অত বড় হয় তো এ-বাড়িতে পড়ে আছ কেন, চলে যেতে পার না?

সুখদা চিৎকার করে উঠলো। বললে—এত বড় কথা তুমি বললে মা-মণি?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ, বললুম—

—কিন্তু যেদিন আমি চলে যেতে চেয়েছিলুম, সেদিন কেন তবে বারণ করেছিলে?

মা-মণি বললে—বারণ করে আমি ভুল করেছিলুম। আমার ঘাট হয়েছিল—

—সত্যিই বলছো?

মা-মণি বললে—তুই কি কানেও কালা হয়ে গেলি নাকি?

তারপর সুরেনেব দিকে ফিরে বললে—আয় সুরেন, ওপরে আয়—

বলে সুরেনকে নিয়ে মা-মণি তরতর করে ওপরে উঠে গেল।

কিন্তু সে-ঘটনার জের সেইখানেই শেষ হলো না। যে-সংঘাত শুরু হয়েছিল কয়েকদিন আগে থেকে তার চূড়ান্ত পরিণতি যেন সেই দিনই প্রথম হলো। সুরেনও ভাবতে পারেনি অমন করে এমন একটা বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি হবে তাকে উপলক্ষ করে। ভাবলে হয়ত অমন করে আসতোই না সে ভেতরে। অমন করে সমস্ত অপরাধের কেন্দ্র হয়ে সে এ-বাড়িতে থাকতেও চাইতো না। কিন্তু যা অবধারিত তা থেকে মুক্তি পাবে এমন মানুষ কে আর জন্মেছে সংসারে।

ঘরের ভেতরে বসে সুরেন বললে—এ তুমি কী করলে মা-মণি?

মা-মণি তখনও যেন রাগে ফুলছে। বললে—যা করেছি বেশ করেছি, বেশ করেছি, সবাই মিলে কি আমাকে পাগল করে তুলতে চায়? সবাই কি আমার টাকাটাকেই চাইবে, কেউ আমার ভালো-মন্দ দেখবে না?

সুরেন বললে—তোমার পায়ে পড়ছি মা-মণি, তুমি ওদের যেতে দিও না—

মা-মণি বললে—ওরা যাবে কোথায় শুনি? কোন চুলোয় ওরা যাবে? যাবার ক্ষমতা থাকলে তবে তো যাবে! যাক্ না দেখি কোথায় যায়?

সুরেন বললে—কিন্তু ওরা চলে গেলে দোষ তো তোমার হবে না, দোষ হবে আমার—

মা-মণি বললে—দোষ দিলে তো বয়ে গেল, ওদের আমি একটা পয়সাও দেবো না আমার সম্পত্তির। চিরকাল আমাকে এমনি করে জ্বালিয়ে এসেছে, এখন আবার একটা লম্পটকে বিয়ে করে নিয়ে এসে আমার ঘাড়ে চড়ে বসতে চায়। আমি জানি না ওদের কীসের ওপর লোভ?

হঠাৎ ধনঞ্জয় এল। বললে—মা-মণি, দিদিমণিরা চলে যাচ্ছে—

—চলে যাচ্ছে? কোথায়?

মা-মণি যেন অবাক হয়ে গেল।

ধনঞ্জয় বললে—গাড়ি এসেছে একটা, তাইতে জামাইবাবু উঠছে—

মা-মণি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—তুই যা—

ধনঞ্জয় তবু গেল না। বললে—ম্যানেজারবাবু আপনাকে খবর দিতে বললে—

মা-মণি ধমকের সুরে বলে উঠলো—তোকে বলছি তুই চলে যা, তবু দাঁড়িয়ে আছিস? যা বলছি—

ধনঞ্জয় আর দাঁড়ালো না। সোজা নিচেয় চলে গেল। নিচেয় তখন রীতিমত হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলেছে কালীকান্ত। কালীকান্ত সোজা কথার লোক। সত্যিই একটা ট্যাক্সি ডেকে এনেছে সে। মালপত্র তার নেইও কিছু, নেয়ওনি কিছু। বাড়ির লোকজন চাকর-বাকর সবাই এসে দাঁড়িয়েছে আশেপাশে।

কালীকান্ত হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলো—ঠাকুর—

ঠাকুর কাছে সরে এল। বললে—এই যে জামাইবাবু—

—কোথায় থাকো তুমি শুনি? আমি তো চললুম, এবার কষে আরাম করে গাঁজা খাও—

ঠাকুর তো অবাক। বললে—আমি তো গাঁজা খাই না জামাইবাবু।

কালীকান্ত বললে—তুমি গাঁজা খাও কি খাও না তা আমার জানতে বাকি

নেই। তা যাক্‌গে, এখন তো আর দেখবার কেউ রইল না, এখন কষে গাঁজায় দম দাও—

তারপর হঠাৎ ম্যানেজার ভূপতি ভাদুড়ীর দিকে নজর পড়লো। ভূপতি ভাদুড়ীও দেখতে এসেছিল কান্ড। কালীকান্ত বললে—ম্যানেজার, তোমারও মজা—খুব লুটেপুটে খাও, আমি আর দেখতে আসবো না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুমি কেন চলে যাচ্ছ বাবাজী? না গেলে হতো না?

কালীকান্ত বললে—তুমি আর যাবার সময় ন্যাকামি কোর না ম্যানেজার, ন্যাকামি আমার ভাল্লাগে না মাইরি। তুমি কি চাও আমি চিরকাল ঘর-জামাই হয়ে থাকবো?

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। বললে—কই গো, কোথায় গেলে তুমি?

তারপর ধনঞ্জয়কে সামনে দেখে বললে—কী রে, তোর দিদিমণি কোথায়?

সুখদা তখন ওপরে গিয়ে ডাকছে—মা-মণি—

সুরেন বসে ছিল। বললে—মা-মণি, তোমায় সুখদা ডাকছে—

মা-মণি বললে—ডাকুক গে—ও মরুক—

—মা-মণি!

মা-মণি বললে—দরজাটা বন্ধ করে দে তো সুরেন—

সুখদা দরজার বাইরে থেকে আবার ডাকলে—মা-মণি, আমি সুখদা—

সুরেন কী করবে বুঝতে পারলে না। মা-মণি তখন মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। সুখদাও আর ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

সুরেন আবার সাহস করে বলে উঠলো—মা-মণি, সুখদা ডাকছে—

এতক্ষণে তরলা ঘরে ঢুকলো। তরলা এসে বললে—মা মণি, সুখদা দিদি-মণি ডাকছে—

মা-মণির যেন এতক্ষণে হুঁশ হলো। বললে—ডাকছে বলে কি আমি নাচবো?

তরলা আর কী বলবে! আস্তে আস্তে আবার বাইরে চলে গেল। সুখদা বোধহয় শেষবারের মত আবার ডাকতে চেষ্টা করলে—মা-মণি—

মা-মণি এবার ধমক দিয়ে উঠলো। সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—চুপ করে বসে কী শুনছিস, দরজাটায় খিল দিতে পারছিস না?

এরপর সুখদা বোধহয় আর সেখানে দাঁড়ালো না। তার চলে যাওয়ার শব্দটা সুরেনের কানে এল। আর সুরেন তখনও তার নিজের জায়গায় স্থাণুর মত চুপ করে বসে রইল।

সুরেন যখন মা-মণির ঘর থেকে নিচেয় নেমে এল তখন সমস্ত নিঝুম। অন্যদিন তবু ঝি-চাকরদের কলরব এপাশে-ওপাশে শোনা যায়। কিন্তু সেদিন সব কিছু চুপচাপ। কোথাকার কোন বাড়ির মেয়ে সুখদা এ-বাড়িতে এসে একদিন বড় হয়েছিল। তারপর আবার একদিন পালিয়েও গিয়েছিল, তারপর অনেক-দিন পরে আবার এ বাড়িতে ফিরে এসে একাকারও হয়ে গিয়েছিল। সে আর নেই, সে আর কোনওদিন আসবেও না। তার জন্যে কারো কোনও দুঃখ, অভাব-বোধ কিছুই নেই। তবু যেন সবাই বিমর্ষ হয়ে গেছে। সুরেনেরও মনে হলো তার জন্যেই যেন এমন বিপর্যয়টা ঘটলো।

কিন্তু মা-মণি কেন এমন করে সুখদাকে বকতে গেল! সে তো মা-মণিকে কিছু বলেনি। বলেছে সুরেনকে।

সুরেন মা-মণিকে বলেছিল—তুমি সুখদার ডাকে সাড়া কেন দিলে না মা-মণি?

মা-মণির চোখ ফেটে তখন জল বেরোচ্ছে। বললে—ওর কথা থাক। তুই তোর কথা বল্—

সুরেন বললে—এখনও হয়ত ওরা চলে যায়নি, আমি ওদের গিয়ে ডেকে নিয়ে আসবো মা-মণি?

মা-মণি বললে—না—

এও সুরেনের জীবনে এক অকারণে বিড়ম্বনা। হয়ত কালীকান্ত আর সুখদা তাকেই দোষ দিচ্ছে। হয়ত ভাবছে, সুরেনের জন্যেই তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হলো। কিন্তু সুখদা জানতেও পারলে না যে এর মধ্যেও কত কূট ষড়যন্ত্র তার দুর্ভেদ্য জাল বিস্তার করেছে।

নিজের ঘরের মধ্যে বসে-বসে সুরেন আকাশ-পাতাল তোলপাড় করতে লাগলো। নিজেকেও তার বড় অপরাধী মনে হতে লাগলো। এ-বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি কর্মচারীব সঙ্গে সে নিজেকে তুলনা করে দেখতে লাগলো। মনে পড়লো বুড়োবাবুর কথা। মনে পড়লো অর্জুনের কথা। সেই অর্জুন। একদিন তার সঙ্গে বল খেলেছিল বলে মা-মণি বকেছিল। মনে পড়লো তরলার কথা। সেই বেনামী একটা চিঠি এনে দিয়েছিল তার হাতে। আর মনে পড়লো সুখদার কথাও।

হঠাৎ মনে পড়লো ক্যালেণ্ডারটার কথা। বিছানার তলায় সে লুকিয়ে রেখেছিল সেটাকে। মনে পড়তেই সেটাকে আবার বিছানার তলা থেকে বার করবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু তাব আগেই দরজায় একটা টোকা পড়লো।

সুরেন চমকে উঠলো—কে?

কেউ উত্তর দেয় না।

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—কে দরজা ঠেলছে?

—খোকা!

হঠাৎ সুরেন লাফিয়ে উঠেছে। বুড়োবাবু!

আবার বাইরে থেকে ডাক এল—খোকা—

দরজাটা খুলে দিয়ে সুরেন দেখলে সামনেই বুড়োবাবু দাঁড়িয়ে আছে। পরনে সেই গামছা। উস্কোখুস্কো পাকা চুল। যেন হাঁফাচ্ছে।

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—বুড়োবাবু, তুমি? এসো, ভেতরে এসো—

বুড়োবাবু তখনও হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতেই ভেতরে এল। এসে বসলো তক্তপোষের ওপর, বললে—চারদিকে এত গোলমাল হচ্ছে কেন খোকা?

সুরেন আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—কই, গোলমাল তো হচ্ছে না—

বুড়োবাবু বললে—ওই তো গোলমাল হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না? সবাই বুঝি মাইনে বাড়াতে চাইছে?

সুরেন বললে—কই, না তো, কেউ তো মাইনে বাড়াতে চাইছে না।

বুড়োবাবু বললে—না, তুমি জানো না, সবাই চাইছে মাইনে বাড়াতে। তোমার মা-মণির সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, হয়!

বুড়োবাবু বললে—তাহলে মা-মণিকে একটা কথা বলবে? বলবে মা-মণি যেন কষ্ট না পান। আমার আর গামছার দরকার নেই। আমি একখানা গামছাতেই বছর চালিয়ে নিতে পারবো। সবাই বলছিল দিনকাল খুব খারাপ। এ-সময়ে মাইনে মা-মণি কী করে বাড়ায় তাই বলো? মা-মণি একলা মানুষ, সব দিকে কী করে দেখো বলো?

সুরেন বললে—তুমি কেমন আছ বুড়োবাবু? আমি অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি—

বুড়োবাবু বাধা দিলে। বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার মা-মণির কথা বলো। ও মানুষটার দুঃখুটা তোমরা কেউ বুঝছো না—

সুরেন বললে—আমি তো বুঝি বুড়োবাবু—

বুড়োবাবু বললে—বুঝলেই ভালো, জানো তো তোমার মা-মণির কেউ নেই।

সুরেন বললে—সেই জন্যেই তো আমি মা-মণির কাছে যাই মাঝে মাঝে। কিন্তু আমিও আর বেশিদিন এখানে থাকবো না বুড়োবাবু, আমি একদিন চলে যাবো—

—কেন, চলে যাবে কেন?

সুরেন বললে—এখানে আর কদ্দিন বসে বসে অন্ন ধ্বংস করবো? এ তো আমার নিজের বাড়ি নয়। এখানে এমন করে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা করে—

বুড়োবাবু বললে—কেন, তোমায় কেউ কিছু বলেছে নাকি?

সুরেন বললে—না-ই বা বললে, কিন্তু আমারও তো বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। এখানে থাকতে আমার বিবেকে বাধছে।

বুড়োবাবু বললে—না, না খোকাবাবু, তুমি যেও না। তোমার দুটো হাত ধরে বলছি তুমি চলে যেও না। তুমি চলে গেলে তোমার মা মণির বড় কষ্ট হবে। যদ্দিন মা-মণি বেঁচে আছে, তদ্দিন অন্ততঃ তুমি এখানেই থাকো, বুঝলে?

সুরেনের কেমন যেন কৌতূহল হলো। বললে—কিন্তু তোমার কেন এত টান বুড়োবাবু, তুমি তো এখানে মাইনেও পাও না, কিছুই না। বছরে একটার বেশি গামছাও মা-মণি দেয় না তোমাকে—

বুড়োবাবু বললে—তা না দিক, আজকাল দিনকাল কী-রকম খারাপ পড়েছে, সেইটে দেখ? কোত্থেকে দেবে? মা-মণি যদি চোখ বোঁজে তো কে দেখবে এ-সব, বলো? আর তা ছাড়া, আমি বুড়োমানুষ, আমি আজ আছি কাল নেই, আমার নিজের কথা না-ভাবাই ভালো। আমি মরে গেলেই তো সবাই হাঁফ ছাড়ে—বলতে বলতে বুড়োবাবু কেমন যেন করতে লাগলো। মনে হলো যেন এখুনি দম আটকে আসবে বুড়োবাবুর।

সুরেন বললে—বুড়োবাবু তুমি হাঁফাচ্ছো, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও—

বুড়োবাবু বললে—তাহলে, তুমি মা-মণিকে ওই কথা বলবে তো?

সুরেন বললে—কী কথা?

বুড়োবাবু বললে—ওই যে বললুম কারোর মাইনে বাড়াতে হবে না। আমারও গামছার দরকার নেই। সুখদা ছিল সে-ও চলে গেল, এখন তুমি যেন আবার চলে যেও না, তাহলে তোমার মা-মণিকে দেখবার আর কেউ থাকবে না—

সুরেন বললে—ঠিক আছে, তুমি এখন ওঠো, চলো তোমায় তোমার ঘরে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—

কিন্তু বুড়োবাবুকে ধরে ওঠাতে গিয়েই বুড়োবাবু ধপাস করে মেঝের

ওপর পড়ে গেল। আর যন্ত্রণায় একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠেছে বুড়োবাবু।

সেই আর্তনাদের সঙ্গে-সঙ্গে সুরেনের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সুরেন চারদিকে চেয়ে দেখলে। কোথায় বুড়োবাবু? কেউ তো তার ঘরে নেই। এতক্ষণ তবে স্বপ্ন দেখছিল সে!

সুরেন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সমস্ত শরীরটা তার ঘামে ভিজে গেছে! কী অদ্ভুত স্বপ্ন! কী বিচিত্র ঘটনা! এমন স্বপ্নও কেউ দেখে!

সুরেন ঘর ছেড়ে বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। বাড়িটা তখনও নিঝুম। সুখদা চলে যাবার পর থেকেই সেই যে নিঝুম হয়ে আছে তা আর ভাঙেনি। সবাই যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ মনে পড়লো সত্যিই বুড়োবাবুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। কেমন আছে দেখা উচিত। সুরেন আস্তে আস্তে উঠোন পেরিয়ে বুড়োবাবুর ঘরের দিকে চলতে লাগলো।

খানিক দূর গিয়ে আবার ফিরে এল। কোথায়ই বা যাবে সে। কার কাছেই বা যাবে? বুড়োবাবু কি একটা মানুষ! কাদের সঙ্গে কথা বলবে সে? এ-বাড়ির সবাই-ই তো খাওয়া-পরার সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নিয়ে বেঁচে আছে। একটু ভাল খেতে পেলে খুশী, আবার ভালো না-খেতে পেলেই অখুশী। এ সবাই। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না তালিকা থেকে। ওই কালীকান্ত বিশ্বাস, সুখদা, অর্জুন, দুখমোচন, ঠাকুর, তরলা, বাদামী, ধনঞ্জয় সবাই।

—অ খোকা!

সুরেন পেছন ফিরলো। এবার সত্যি সত্যিই বুড়োবাবু। বুড়োবাবুর চোখ দুটো যেন ভারি-ভারি দেখাচ্ছে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আমাকে তুমি কিছু বলবে?

বুড়োবাবু কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—তোমাকে বলবো না তো আর কাকে বলবো খোকাবাবু, ঠাকুর আমাকে আজ পেট ভরে ভাত দেয়নি।

সুরেন ভাল করে চেয়ে দেখলে বুড়োবাবুর মুখের দিকে। শুধু সেই একই সমস্যা, একই অভিযোগ।

বললে—ঠাকুর তোমাকে ভাত দেয়নি তো আমি কী করবো?

বুড়োবাবু বললে—তোমাকে বলবো না তো আমি কাকে বলবো ভাগ্নেবাবু, আমার আর কে আছে বলবার?

সুরেন বললে—আচ্ছা বুড়োবাবু, জীবনে খাওয়া ছাড়া তোমার কি আর কিছু নেই? জীবনে কি খাওয়াটাই সব?

বুড়োবাবু কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। বললে—তুমি কী বলছো বুঝতে পারছি না—

সুরেন বললে—বলছি যে খাওয়াটাই কি পৃথিবীতে সব? খেতেই কি তুমি পৃথিবীতে এসেছ?

বুড়োবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সুরেনের হাত দুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো।

বললে—তুমি ঠিক বলেছ খোকাবাবু, তুমি ঠিকই বলেছ। যখন বয়েস ছিল তখন খাওয়ার কথা ভাবতুম না। তখন কেবল ফুর্তি করে বেড়িয়েছি। এখন বয়েস হয়েছে, আমার মতন যখন তোমার বয়েস হবে, তখন দেখবে খাওয়াটাই সব, আর কিছুই নেই—

সুরেন আবার বুড়োবাবুকে ভালো করে দেখতে লাগলো। বুঝতে পারলে

বুড়োবাবুর দুঃখটা কোথায়। এই বুড়োমানুষটারও যে একদিন জীবন ছিল, যৌবন ছিল তা যেন সুরেনের মনে ছিল না।

একটু সামলে নিয়ে বললে—কিছু মনে কোর না বুড়োবাবু, আমার কথায় তুমি রাগ কোর না—

বুড়োবাবু বিগলিত হয়ে গেল। বললে—রাগ করলে কি আমাদের চলে খোকাবাবু? কার ওপর রাগ করবো? কে আমার আছে বলো না যে তার ওপর রাগ করবো?

সুরেন বললে—জানো বুড়োবাবু, আমি একটু আগেই তোমাকে স্বপ্ন দেখছিলুম।

—আমাকে? আমাকে স্বপ্ন দেখছিলে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, মনটা খুব খারাপ ছিল. একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হলো যেন তুমি আমার ঘরের মধ্যে এলে। এসে আমার বিছানায় বসলে। তারপর মা-মণির কথা জিজ্ঞেস করলে।

—মা-মণির কথা? আমি জিজ্ঞেস করলুম?

বুড়োবাবু হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলে।

বললে—আমি ভাবি খোকাবাবু, তোমার মা-মণির কথা আমিও ভাবি. কিন্তু আমি ভাবলে তোমার মা-মণির কীসের লাভ? আমার ভাবনা তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না, সবাই আমাকে তাই দূর-দূর করে, ম্যানেজারবাবু একটা গামছাও দেয় না. গেঞ্জি তো দূরের কথা—

সুরেন বললে—তোমার মতন আমিও মা-মণির কথা ভাবি, তা জানো বুড়োবাবু?

বুড়োবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে—তুমি আর আমি? তোমার সঙ্গে আমার তুলনা?

সুরেন বললে—তুলনা করছি না। মা-মণির অনেক টাকাকড়ি আছে তো! কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয় মা-মণির কিছু নেই। তোমার যা আছে তাও মা-মণির নেই। আমার যা আছে তাও মা-মণির নেই। এ-বাড়ির সকলের যা আছে মা-মণির সে-সব কিছুই নেই—

বুড়োবাবু এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে সব শুনছিল। এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। দু'হাত দিয়ে সুরেনকে জড়িয়ে ধরলে। বললে—তোমার ভাল হবে বাবা, তুমি দেখে নিও, তোমার নিশ্চয় ভালো হবে, এই তোমাকে আমি বলে রাখলুম—

বলে মাথায় হাত দিয়ে বুড়োবাবু আশীর্বাদ করতে লাগলো আর কাঁদতে লাগলো।

সেদিন আবার দেবেশদের পার্টি অফিসের উদ্দেশ্যে সুরেন বেরিয়েছিল। কোথাও কোনও কাজ ছিল না। কোনও কাজ করতে ইচ্ছেও করছিল না তার। আর কী কাজই বা তার আছে। কলকাতা সহর তার নিজের গতিতেই আপন মনে চলছিল। এই গরম, এই ঠান্ডা। এখানে মীটিং, সেখানে সিনেমার লাইন। কখনও সব সচল, আবার কখনও হরতাল।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেই হঠাৎ কোথা থেকে হুড়মুড় করে কারা দৌড়ে আসে। বলে—পালান—পালান—

খানিক পরে আবার ট্রাম-বাস সব চলতে শুরু করে। একদিকে গানের জলসায় মাইকের বিলাস, অন্যদিকে শ্মশানের হরিধ্বনির আর্তনাদ। এ-কলকাতাকে এই ক'বছরেই চিনে ফেলেছিল সুরেন। সুরেন বুঝে নিয়েছিল শান্তি চাইলে এখানে তা পাওয়া যাবে না। কলকাতায় যেমন শান্তি পাওয়া যাবে না, মাধব কুন্ডু লেনের বাড়িটিতেও তেমনি শান্তি পাওয়া যাবে না। তাহলে একটা চাকরি নিলে বোধহয় সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে সে একটা ছোট ঘর ভাড়া করবে। দোতলা-বাড়ির ওপর তলায় একটা কামরা।

কিন্তু তারও তো অনেক সমস্যা। বাড়ি কোথায় ভাড়া পাবে সে! দেড়শো টাকার কমে কি একখানা ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে?

তার চেয়ে দেবেশদের পার্টির অফিসটাই বা মন্দ কী! খাওয়া-থাকা সম্বন্ধে তো নিশ্চিন্ত থাকবে সে! কিন্তু তারপর? তারপর জেলে ধরে নিয়ে গেলে? জেলের মধ্যে কয়েদীদের সঙ্গে কী করে কাটাবে সে?

দেবেশ বলেছিল—আরে, জেলে যেতেই তো আমরা চাই। জেলে গেলেই তো আমাদের পোয়া বারো—

সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—কেন?

দেবেশ বলেছিল—দেখছিস না পুণ্যশ্লোকবাবুর কী কোয়ালিফিকেশান? জেলে গিয়েছিল বলেই তো আজ মিনিস্টার হয়েছে—যতগুলো মিনিস্টার দেখছিস সব জেল-ফেরতা। জেলে না গেলে আর কারোর কোনও ভরসা নেই—

—কিন্তু জেলে তোকে নেবে কেন?

দেবেশ বলেছিল—জেলে যাতে নেয় সেই চেষ্টাই তো করছি—! জেলে গিয়ে আরাম কী কম? ফার্স্ট ক্লাস প্রিজনার যদি হতে পারি তো দু'দিনে চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে আসবো—

—তারপর?

—তারপর চেষ্টা করবো যাতে আবার জেলে যেতে পারি।

সুরেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—বা রে, সারাজীবন কেবল জেলেই যাবি! তাহলে উন্নতি করবি কবে?

দেবেশ হেসে উঠেছিল। বলেছিল—বা রে মাঝখানে পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর একবার করে ইলেকশান হবে না? সেই ইলেকশানে যদি আমাদের পার্টি এক-বার মেজরিটি পেয়ে যায়, তখন? তখন সব যে সুদে-আসলে উসুল করে নেব—

দেবেশরা দেবেশদের মতই ভাবে, কিন্তু সুরেন তো দেবেশ নয়। তবু যখন কোথাও কোনও আশ্রয়ের ভরসার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার ওপরেই মন নির্ভর করতে চায়।

সেই পুরোন বাড়িটা!

আস্তে আস্তে দেবেশ ভেতরে ঢুকলো। বাড়িটা পুরোন ভাঙা। মান্ধাতার আমলের বাড়ি, তার ওপর পুরোন একগাদা ভাড়াটে। নিচেয় সেই ছুতোরদের বাক্স-তৈরির কারখানা। পাশেই একটা ময়লা-কাগজের গুদাম। তার পাশ দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। ভাঙা রেলিং। ধরে ধরে ওপরে উঠতে হয়। ওপরে উঠে দেবেশদের অফিসের ভেতরে একজনের সঙ্গে দেখা হলো। নিশ্চয়ই পার্টির লোক কেউ।

—দেবেশ আছে?

—কে আপনি?

সুরেন বললে—আমি দেবেশের ক্লাস-ফ্রেন্ড—

লোকটা বললে—এখন দেবেশ নেই—

সুরেন ফিরে আসছিল। আবার কী মনে পড়লো। ফিরে দাঁড়ালো, বললে—কখন এখানে আসবে?

লোকটা বললে—সন্ধ্যেবেলা, সন্ধ্যে সাতটার পর—

এবার ফিরে আসা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই। সমস্ত কলকাতার জনবহুল অঞ্চলের মধ্যে সুরেনের নিজেকে বড় একলা মনে হলো। মনে হলো কেউ তার নেই। এই কেউ না-থাকার দুঃখটা তাকে সারাজীবনই কেবল জ্বালিয়েছে। যখন সুব্রত ছিল সব সময়ে তখনও মনে হতো তার কেউ নেই। কে থাকলে যে সব থাকা হয় তাই-ই সুরেন কোনও দিন জানতে পারেনি। অথচ কলকাতায় কি লোকের অভাব! সিনেমা-হাউসের সামনে গিয়ে লাইন দাও না। অনেক সঙ্গী পেয়ে যাবে। ময়দানে যাও, দেখবে কোনও-না-কোনও পার্টির মিটিং হচ্ছে। হয় সি-পি-আই, নয়তো পি-এস-পি, নয়তো জনসঙ্ঘ, আর নয় তো কংগ্রেস। আর শুধু কি কেবল মাঠে? ফুটপাথে ফুটপাথে মিটিং চলে কলকাতায়। লাল শালুতে সাদা অক্ষরে পার্টির নাম লেখা বড় বড় করে। আর ঠিক তার নিচেয় একটা খালি কাঠের বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় গড়গড় করে লেকচার দিয়ে চলেছে। সুরেনও মাঝে মাঝে শুনেছে সে বক্তৃতা। কিন্তু কেন যেন নিজেকে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি।

হাঁটতে হাঁটতে সে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেল। কলকাতার মত বড় সহরে ঘুরে বেড়াবার জায়গার অভাব নেই। শ্যামবাজার থেকে বৌবাজার, বৌবাজার থেকে ডালহৌসি। আর ডালহৌসি মানেই অফিস-পাড়া। এ-পাড়ায় কোনও দিন আসতে হবে তা তার কোনও দিন জানা ছিল না।

বহুদিন আগে এ-পাড়ারই একটা অফিসে সুরেন দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। এতদিন পরে মনে পড়লো হঠাৎ। কোন্ অফিস তা মনে ছিল না। রাস্তা দিয়ে সাইন বোর্ডগুলো দেখতে দেখতে চলছিল। নানারকম কোম্পানি, নানারকমের বাড়ি। হঠাৎ একটি অফিসের সামনে আসতেই নামটা চেনা-চেনা মনে হলো। হ্যারিংটন এ্যান্ড ফিসার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড! সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে সুরেন ওপরে উঠলো। অফিসের সদরে একটা দারোয়ান বসে ছিল। ভেতরে কাচের দেয়ালের আড়ালে একটা মেয়ে টেলিফোন নিয়ে কাজ করছিল। প্রথমে ভেতরে যাবে কি যাবে না মনে হতে লাগলো। কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই বা দোষ কী? দরখাস্ত একখানা করেছিল সে তারই না-হয় খবর নিতে এসেছে বলবে।

—কোথায় যাবেন বাবু?

সুরেন বললে—এই অফিসে—

দারোয়ানটা দরজাটা টেনে ধরে বললে—যাইয়ে—

সুরেন ভেতরে ঢুকলো। বেশ ঠান্ডা আবহাওয়া ভেতরে। এয়ার-কন্ডিশন করা সাজানো ঘর। অনেকগুলো সোফা সেট রয়েছে। ফাঁকা একবারে। কেউ নেই। শুধু মেয়েটা টেলিফোন নিয়ে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। একবার টেলি-ফোনটা ছাড়ছে তো সঙ্গে সঙ্গে আবার টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠছে। এক মিনিট চেয়ে দেখবারও ফুরসত নেই। কীরকম যেন অদ্ভূত পোষাক। পেটের আর কোমরের প্রায় সবটা অংশ বার করা। দাঁড়িয়ে দেখতেও লজ্জা করে।

এবার মেয়েটা চাইলে সুরেনের দিকে।—ইয়েস, হুম্ ডু ইউ ওয়ান্ট?

সুরেন বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, আপনি বলতে পারেন, চাকরির ব্যাপারে কথা বলবার জন্যে আমি কার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—চাকরি? সারভিস্। ড্যাম্ ইট্—ইয়েস?

আবার টেলিফোন তুলে ধরলো মেয়েটা। সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—আপনি বসুন—

সুরেন বুঝতে পারলে না এত কী কাজ, এত কী কথা! আর ও-রকম জামা-কাপড়ই বা পড়েছে কেন মেয়েটা। ঠোঁটে, গালে, চুলে সব জায়গায় রং মেখেছে! শাড়িটা বার বার কাঁধ থেকে খসে পড়ছে। গলার আওয়াজটাও যেন গানের সুরের মত। কথা বলছে না, যেন গান গাইছে।

অনেকক্ষণ পরে মেয়েটার বুঝি একটু ফুরসত হলো। একটা স্লিপ্ এগিয়ে দিলে। বললে—আপনার নাম, এ্যাড্রেস লিখুন এতে—

সুরেন নিজের নাম-ঠিকানা লিখলে কাগজটাতে। মেয়েটা কাকে কী টেলি-ফোন করলে কে জানে। একটা চাপরাশি এল। তার হাতে কাগজটা দিতেই সে সেটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুরেন আবার নিজের জায়গাটায় বসে রইল। ওদিকে মেয়েটাও আবার টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সুরেনের মনে হলো মেয়েটার যেন বড় বেশি ব্যস্ততা। যেন সে টেলিফোন না ধরলে সমস্ত পৃথিবী উল্টে যাবে।

খানিক পরে দারোয়ানটা ফিরে এসে সুরেনকে বললে—আইয়ে—

বলে চলতে লাগলো ভেতরের দিকে। সুরেনও চলতে লাগলো পেছন-পেছন। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে বুঝতে পারলে না। ভেতরে আরো ঠাণ্ডা। সার সার সব লোকেরা চেয়ারে বসে বসে অফিসের কাজ করছে। তাকেও কি এখানে বসে এমনি করে কাজ করতে হবে নাকি?

একটা জায়গায় এসে চাপরাশিটা থামলো। তারপর একটা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে যেতে বললে।

সুরেন ভেতরে ঢুকেই দেখলে একজন সার্ট-টাই পরা ভদ্রলোক টেবিলের উল্টোদিক থেকে তার দিকে চেয়ে আছে!

—ইয়েস? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

সুরেন দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর বললে—আমি একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম এ অফিসে—

—চাকরি? কবে?

সুরেনের তারিখ মনে ছিল না। বললে—প্রায় একমাস আগে। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আমি এ্যাপ্লাই করেছিলাম—

ভদ্রলোকও খুব ব্যস্ত মানুষ। অনেক কাজের মানুষ। সামনে অনেক কাগজপত্র, অনেক ফাইল পড়ে আছে।

বললেন—আপনি বসুন—

এ যেন সেই মেঘ না চাইতেই জল। টেলিফোন আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলছেন, আবার রেখে দিচ্ছেন রিসিভারটা। অফিসের লোকজন আসছে। স্মার্ট চেহারা, সবাই বেশ সম্মান দিয়ে কথা বলছে। খুব বড় পোস্ট নিশ্চয়ই। এ কার কাছে নিয়ে এল তাকে। অফিসের বড়বাবু, না সুপারিনটেনডেণ্ট, না সেক্রেটারি!

সুরেন অনেকক্ষণ বসে রইল। ভদ্রলোকের কথা বলবার ফুরসতই নেই।

হঠাৎ তারই ফাঁকে একবার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নামটা কী?

সুরেন বললে—সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—

—কী কোয়ালিফিকেশান?

সুরেন বললে—আমি বি-এ পাস করেছি—

—কবে? কোন সালে?

—গেল বছরে।

ভদ্রলোক কী ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন?

সুরেন বললে—ম্যাট্রিক নয়, হায়ায় সেকেন্ডারি। ওরিয়েন্টাল এ্যাকাডেমি—

—আগে কখনও চাকরি করেছেন?

সুরেন বললে—না—

চাকরি যদি না দেবে তো এত কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন ভদ্রলোক, কে জানে!

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই সুরেন বললে—আমার সেই এ্যাপ্লিকেশনে আমি কিন্তু এই সব কথাই লিখেছিলুম।

ইতিমধ্যে কে একজন ঘরে ঢুকলো। জীবনে এই প্রথম চাকরির দরখাস্ত করা। চাকরি যে কী জিনিস তাও জানা নেই। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে মামা জানতে পারলে খুব রাগারাগি করবে। চাকরি করবার দরকারটা তার কীসের। ছ'সাত লাখ টাকার সম্পত্তি। সেই সব দেখাশোনা করলেই হেসে-খেলে তিন-চার পুরুষ চলে যাবে। সারা কলকাতায় যখন সবাই চাকরি-চাকরি করে অস্থির তখন সুরেনের তো সে-সমস্যা নেই। শুধু মামার কথা শুনলেই চলে যায়। যে-সুখদা ছিল পথের বাধা সে তো চলে গেল। কালীকান্তটা গোলমাল করতো, তা সেও নেই। মামা তাকেও তাড়িয়ে ছেড়েছে। এখন তো মামারই সম্পূর্ণ রাজত্ব।

ছিল এক দেবেশ। কিন্তু সেখানে গেলেও জেল-খাটার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। জেলে গেলে অবশ্য আর চাকরি করতে হয় না। যখন দেবেশদের পার্টি ক্ষমতা পাবে তখন মিনিস্টার হওয়ার সুযোগটাও রইল। কিন্তু জেলে কী করে কাটাবে সুরেন? সেখানেও তো সেই পার্টি। পার্টির কথা না শুনলে তো পার্টিও তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেবে।

সুরেন ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বড় কাজের মানুষ ভদ্রলোক। সমস্তক্ষণই কাজ! একটু মুখ তোলবার সময় নেই। উসখুস করতে লাগলো সুরেন।

হঠাৎ এক সময়ে বললে—আপনি ব্যস্ত, আমি পরে আসবো'খন—

ভদ্রলোক চোখ তুলে অবাক হয়ে বললেন—আপনি তো আচ্ছা লোক. গরজ তো আপনারই. আর আপনিই উঠে চলে যাচ্ছেন—

সুরেন বললে—না, আপনি ব্যস্ত আছেন কিনা, তাই। আমি বরং অন্য একদিন আসবো—

ভদ্রলোক বললেন—আপনার তাহলে তেমন চাকরির দরকার নেই, না? আমার কাছে যারা চাকরির জন্যে আসে তারা কিন্তু আপনার মত উঠে যেতে চায় না—

সুরেন বললে—আমার মনে হচ্ছে আপনাদের বোধহয় লোক নেওয়া হয়ে গেছে—আর ভেকেন্সি নেই—

ভদ্রলোক বললেন—না—

সুরেন বললে—তাহলে মিছিমিছি আপনার সময় নষ্ট করছি আমি—আমি

উঠি—

ভদ্রলোক বললেন—না, আপনি বসুন—আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে। আপনি সুব্রত রায় বলে কোনও ছেলের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তেন?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। বললে—তাকে আপনি চিনলেন কী করে? সে আপনার কে হয়?

ভদ্রলোক হাসলেন এবার। বললেন—আমার কেউ হয় না।

সুরেন বললে—সে তো এখনও আমেরিকায় আছে!

ভদ্রলোক বললেন—আপনি আর ওদের বাড়িতে যান না?

সুরেন বললে—না, এখন আর কার জন্যেই বা যাবো। সুব্রত না থাকলে কেন যাবো?

—কিন্তু তার বোন তো আছে! পর্মিলি!

সুরেন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। ভদ্রলোকের চেহারাটা ভালো করে দেখতে লাগলো। যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে খুব। অথচ বুঝতে পারছে না ঠিক। তাড়াতাড়ি দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। বললে—আমি যাই।

ভদ্রলোক উঠে এসে সুরেনের রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন।

বললেন—আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না?

সুরেন কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। থর থর করে কাঁপতে লাগলো সে। কেন সে এখানে আসতে গেল? এতক্ষণে বোঝা গেল কেন ভদ্রলোক তাকে এত খাতির করে বসিয়ে গল্প করেছেন।

ভদ্রলোক বললেন—সত্যি চিনতে পারছেন না? আমার নাম প্রজেশ সেন—

সুরেনের পিঠে যেন কেউ চাবুক মারলো। কিংবা চাবুক মারলেও যেন এত আঘাত লাগতো না তার পিঠে। কেনই বা সে এত জায়গা থাকতে এখানে আসতে গিয়েছিল। তার তো খাবার ভাবনা নেই, উপার্জন করার প্রয়োজনও নেই তার। সে তো মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে আরামেই আছে। কেউ তো সেখান থেকে তাকে চলে যেতে বলেনি। বরং মা-মণি তো তাকে সব সম্পত্তি লিখে দিতেই প্রস্তুত!

প্রজেশ সেন কিন্তু নাছোড়বান্দা।

বললে—আপনাকে বসতেই হবে—তবে আমি আপনাকে ছাড়বো—

সুরেন একটু অবাক হয়ে গেল। সে কী এমন মহাপুরুষ ব্যক্তি যে তাকে আপ্যায়ন করে না বসালে প্রজেশ সেনের মহা লোকসান হয়ে যাবে!

বললে—দেখুন, আমি প্রার্থী, আপনি হচ্ছেন এত লোকের অন্নদাতা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে আপনার এত পীড়াপীড়ি কেন?

প্রজেশ সেন বললে—কেন? কারণ পর্মিলির সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে, ইউ নো হার—

সুরেন বললে—সেইটেই কি আমার চরম কোয়ালিফিকেশান্?

প্রজেশ সেন বললে—আমার কাছে তো তাই বটে!

সুরেন বললে—আমাকে সেদিন অমন করে আপনার সামনে অপমান করতে যার বাধলো না, তার সঙ্গে পরিচয় থাকাটাই তো অপমানের।

প্রজেশ সেন বললে—কিন্তু পর্মিলিকে যারা চেনে তারা তো জানে পর্মিলি ওই রকমই। পর্মিলি তো আমাকেও কতবার ওই রকম অপমান করেছে, কিন্তু তাতে তো আমি কিছু মনে করিনি!

সুরেন বললে—আপনি বড়লোক, আপনার কথা আলাদা, আপনার তুলনায়

আমি তো পথের ভিখিরি। আপনার সঙ্গে আমার তুলনা করছেন কেন?

প্রজেশ সেন বললে—কিন্তু পমিলির কাছে আমরা দু'জনেই তো সমান—

সুরেন বললে—কী যে বলেন।

প্রজেশ সেন বললে—সে কী! আপনি এতদিন পমিলির সঙ্গে মিশছেন, আর এটা জানেন না? পমিলি মানুষকে কুকুর-বেড়ালের মত মনে করে!

সুরেন বললে—তা হতে পারে! আমি আর পমিলির সঙ্গে কতটুকু মিশেছি। বড় জোর দু'দিন কি চারদিন! আমার বন্ধু সুব্রতর বাড়িতে যেতাম, তখন থেকেই দেখে আসছি। কিন্তু সুব্রত আমেরিকায় চলে যাবার পর ওদের বাড়িতে আর যাইনি—

প্রজেশ সেন বললে—কিন্তু সেদিন? সেদিন কেন গিয়েছিলেন?

সুরেন বললে—সেদিন তো পমিলি আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল—

হঠাৎ আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। একবার টেলিফোনের কাজ শেষ হয় তো আবার কেউ অফিসের কাজ নিয়ে ঘরে ঢোকে। সত্যিই সুরেন বুঝতে পারলে প্রজেশ সেন এ-অফিসের একজন অপরিহার্য অফিসার। প্রজেশ সেন না থাকলে এ-অফিস বোধহয় অচল হয়ে যাবে।

একসময়ে প্রজেশ সেন মুখ তুলে বললে—একটু বসুন আপনি, আমিও এখনি উঠবো—

সুরেন বললে—কিন্তু আমার জন্যে আপনি কেন আপনার কাজের ক্ষতি করবেন?

প্রজেশ সেন বললে—আপনার একটা চাকরিরও তো দরকার?

সুরেন বললে—না।

—না মানে?

সুরেন বললে—না মানে, না।

—আপনার চাকরির দরকার নেই? তাহলে এখানে এ্যাপ্লিকেশান করেছিলেন কেন?

সুরেন বললে—তখন দরকার ছিল, এখন কিন্তু আর দরকার নেই। আমি এখন উঠি।

প্রজেশ সেন অফিসের কাগজ-পত্রে সই করতে করতে বললে—না আপনি বসুন, আমিও আপনার সঙ্গে উঠবো।

বলে ফাইল-পত্র পাশে সরিয়ে রাখলো। তারপর টেলিফোনে কাকে যেন বললে যে, সে অফিস ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে। যদি কেউ তাকে ডাকে তো যেন বলে দেয় মিস্টার সেন ইজ্ নট্ ইন্—

তারপর টেলিফোনের রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে সুরেনকে বললে—চলুন—

দেয়ালে একটা হ্যাঙারে কোটটা ঝোলানো ছিল, সেটা খুলে নিয়ে গায়ে চড়িয়ে দিলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় গিয়ে নামলো। সুরেনও পেছন-পেছন চলছিল। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতেই কোথা থেকে একটা ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে। প্রজেশ সেন বললে—উঠুন—

সুরেন গিয়ে ভেতরে উঠে বসলো।

—এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

প্রজেশ সেন বলছিল—চলুন না, গেলেই দেখতে পাবেন!

গাড়ির ড্রাইভারটাকে কিছু বলতে হচ্ছিল না। তার যেন মুখস্থ পথ। সে প্রতিদিন সাহেবকে অফিসে নিয়ে আসে বাঁধা পথ ধরে আবার বাঁধা পথ ধরেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সুরেনের মনে হলো যেন সে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করে তার অভিষ্ট সিদ্ধির সন্ধানে চলেছে। কিন্তু কে বলে দেবে তার অভিষ্ট-সিদ্ধি কোন্ পথে? কিংবা তার অভিষ্টকেই কি সে নিজে চেনে? ছোট বেলা থেকে বড় হওয়ার মধ্যে কোন্ অভিষ্টকে সামনে আদর্শ করে সে চলেছে? একটা চাকরি পাওয়া? বিয়ে করা? সংসার আর বাড়ি-গাড়ি-সন্তান? কোনটা মানুষের অভিষ্ট হওয়া উচিত,' তাই-ই কি সে কখনও ভেবেছে? ভেবেছে কি যারা সব কিছু পেয়েছে তাদের সব অভিষ্ট পাওয়া হয়ে গিয়েছে?

এই যে বিরাট একটা গাড়ি করে সে চলেছে, এই গাড়িতে করে চলাই কি তার পরমার্থ? এমনি করে সুব্রতও তো কতদিন তাকে গাড়ি করে কলকাতার রাস্তায় ঘুরিয়েছে। তারপর কোথায় গেল সুব্রত? আর তা ছাড়া সুব্রত যেখানেই যাক, তাতে সুরেনের নিজের কতটা অভিষ্ট লাভ হয়েছে?

চারদিকের বড়-বড় বাড়ি, রাস্তায় বিরাট বিরাট বাস সাদা-সাদা ট্রাম, লোক-জন-ভিখিরী সকলের মধ্যে সে একলা। সে সহরের এই সবকিছু ঐশ্বর্য, সব-কিছু অভিশাপের অংশীদার। এর ঐশ্বর্যের অংশীদার এর অভিসম্পাতেরও অংশীদার। কিন্তু তবু কেন নিজেকে তার এত দরিদ্র মনে হয়! কেন এই সব-কিছুর সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না?

হঠাৎ আবার সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

প্রজেশ সেন বললে—ধরুন কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না; এমনি বেড়াতে ভাল লাগছে না? এই দেখুন না কত লোক, কত বাড়ি, কত বাস, কত ট্রাম, কত লোকজন...

সুরেন বললে—ওসব আমি অনেক দেখেছি রোজই তো দেখি—

প্রজেশ সেন বললে—তবু আর একবার দেখুন না—

সুরেন বললে—আমাকে এসব দেখিয়ে আপনার কী লাভ বলুন তো?

প্রজেশ সেন বললে—নিজে তো রোজই দেখি, কাউকে দেখাতে আরো ভালো লাগে। যে কোন আনন্দ ভাগ করে ভোগ করতে আরো ভালো লাগে নাকি?

সুরেন বললে—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার কিছু মতলব আছে—

প্রজেশ সেন হেসে বললে—কী মতলব আছে মনে হয়?

সুরেন বললে—মতলব না থাকলে আমার মত ছেলেকে নিয়ে ঘুরছেন কেন? আপনার মত লোকের তো সঙ্গীর অভাব নেই—বন্ধুরও অভাব নেই—

প্রজেশ সেন বললে—আপনি নিজেকে এত ছোট মনে করেন কেন?

সুরেন বললে—আমি নিজে যা তাই-ই আমি মনে করি। নিজের সম্বন্ধে আমার কোনও কম্‌প্লেক্স নেই।

প্রজেশ সেন বললে—সেই জন্যেই বোধহয় আপনাকে পমিলির এত পছন্দ

সুরেন বললে—আপনি দেখছি আমাকে অবাক করলেন মিস্টার সেন। সে হলো একজন মিনিস্টারের মেয়ে আর আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীল নগণ্য এক মানুষ। ভোটারস্ লিস্টে এখনও আমার নামই ওঠেনি—

গাড়িটা এবার এক মোড় নিলে। এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায় গিয়ে পড়লো। প্রজেশ সেনকে কিছু বলতে হলো না। ড্রাইভার যেন একেবারে মুখস্থ করা রাস্তা দিয়ে ঠিকঠাক গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেবে। সাহেবের গন্তব্যস্থল

তার জানা।

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যিই কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো?

প্রজেশ সেন বললে—এমন জায়গায় নিয়ে যাবো না যেখানে আপনার অসম্মান হবে।

সুরেন বললে—কিন্তু এ যে একেবারে অভিজাত পাড়া—

প্রজেশ সেন বললে—অভিজাত পাড়ায় আসতে আপনার আপত্তি নাকি?

সুরেন বললে—এখানে নিয়ে আসবেন জানলে অন্য জামা-কাপড় পরে আসতুম!

প্রজেশ সেন বললে—তবে যে বললেন আপনার কোনও কম্‌প্লেক্স নেই?

সুরেন বললে—আমার নিজের জন্যে নয়, এমন কোনও সমাজে যেতে চাই না যেখানে পোষাকটাই সব। যারা পোযাক দেখেই মানুষকে বিচার করে—

ততক্ষণে গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে গেছে একটা বাড়ির সামনে। আলোর লেখা পড়ে বোঝা গেল একটা রেস্টুরেন্ট সেটা।

এখানে কেন?

প্রজেশ সেন গাড়ি থেকে নেমে বললে—চলে আসুন না!

সুরেন নামলো। তারপর প্রজেশ সেনের পেছন-পেছন ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। ঠান্ডা আবহাওয়া ভেতরে। এয়ার-কনডিশান করা বাড়ি। টিম্‌টিম্ আলো জ্বলছে। অনেক লোক ভর্তি। সবাই যেন নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দে কথা বলছে। এত আস্তে কথা বলছে যেন মনে হচ্ছে শব্দ হচ্ছে না কিছু। সকলের সব কথাবার্তাকে ডুবিয়ে দিয়ে কোথায় অন্ধকারের আড়ালে মিহি বাজনা বাজাচ্ছে এক সঙ্গে অনেকগুলো যন্ত্র। অন্ধকারে হোঁচট খাওয়ার মত সরু রাস্তা। মিষ্টি রান্নার গন্ধ চারদিকে।

প্রজেশ সেন সামনে যেতে যেতে বললে—সাবধানে আসবেন—

সাবধানেই আসছিল সুরেন। তবু আরো সাবধানে আসতে লাগলো সুরেন। চলতে চলতে একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে দোতলায় উঠলো প্রজেশ। সুরেনও পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। তারপর এক জায়গায় আসতেই একজন বেয়ারা এসে সেলাম করলে প্রজেশ সেনকে। তারপর একটা পর্দা-ঢাকা কামরা দেখিয়ে দিলো।

পর্দার ভেতরে ঢোকবার আগে প্রজেশ সেন বললে—আসুন, ভেতরে আসুন—

সুরেন ভেতরে ঢুকেই হতবাক্ হয়ে গেছে।

—এ কী? তুমি?

প্রজেশ সেন বললে—আমিই নিয়ে এলাম ওঁকে। আমার অফিসে মিস্টার সান্ন্যাল এসেছিলেন। তুমি তো খুঁজছিলে ওঁকে। ভাবলাম্ এই-ই অপারচুনিটি—

সুরেন তখনও হতবাক্ হয়ে দেখছে পর্মিলিকে। সামনে তার গ্লাস। এমন সময় এখানে যে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে এ যেন কল্পনাই করতে পারেনি সে।

পর্মিলি হঠাং বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস—

প্রজেশ সেন আগেই বসে পড়েছিল। বললে—তাই তো, দাঁড়িয়ে আছেন কেন মিস্টার সান্ন্যাল বসুন!

সুরেন বসলো! কিন্তু তার মনে হলো সে যেন আগুনের কুণ্ডের মধ্যে বসে পড়লো। এ কোথায় এলো সে। কেন এল সে এখানে? ভাগ্য তাকে কেন এমন

অবস্থায় এনে ফেললে। এখানে না এলে কি তার অভিষ্ট লাভ হতো না!

—কী খাবে বলো? হুইস্কি না রাম?

—কী হলো মিস্টার সান্ন্যাল, কথা বলছেন না যে? আপনার জন্যে হুইস্কি না রাম?

সুরেন পমিলির সামনে রাখা গ্লাসটার দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। অর্ধেক খাওয়া গ্লাস। অর্ধেকটা বোধহয় আগেই খেয়েছে পর্মিলি। সেইজন্যেই চোখ দুটো অমন ঢুলুঢুলু দেখাচ্ছে। সমস্ত মুখ চোখ লাল আগুনের মত গনগন করছে।

বেয়ারা তখনও অর্ডার নেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার সেন কী বলতেই সে সেলাম করে পর্দার বাইরে চলে গেল।

মিস্টার সেন বললে—জানো পর্মিলি, মিস্টার সান্ন্যাল এখানে আসতে ভয় পাচ্ছিলেন।

পর্মিলি জড়ানো গলায় বললে—কেন?

প্রজেশ সেন বললে—নাকি জামা-কাপড় ফরসা নয়। আমি বললাম তাতে কী আছে। যার মনে কমপ্লেক্স আছে সে-ই কেবল ওইসব ভাবে।

পর্মিলি বললে—ঠিক বলেছ প্রজেশ, সুরেনের ও-সব কমপ্লেক্স নেই। একেবারে র' প্রোডাকট্। সফিস্টিকেশনের নাম-গন্ধ নেই ওর ক্যারেকটারে!

প্রজেশ সেন বললে—ও-সব কথা থাক, ওকে কী জন্যে তুমি খুঁজছিলে তাই বলো! তুমি যে বলছিলে সুরেনের সঙ্গে অনেক দিন তোমার দেখা হয়নি!

পর্মিলি সুরেনের দিকে চাইলে। বললে—সত্যিই তো, তুমি আর তারপর আসোনি কেন? সেই যে রাগ করে আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেলে, তারপর কী হলো তোমার? এতদিন কী করছিলে?

প্রজেশ সেন বললে—আজকে আমার অফিসে এসেছিলেন চাকরির জন্যে, জানো পর্মিলি, না এলে তো দেখাই হতো না—

—কেন, চাকরি কেন?

পর্মিলি নেশার মধ্যেই যেন সচকিত হয়ে উঠলো।

বললে—চাকরি করবে তুমি? তোমাদের তো অনেক টাকা! বিরাট প্রপার্টি তোমাদের আমি শুনেছি—সে সব কোথায় গেল? শেয়ার-মার্কেটে গেল নাকি?

সুরেনের মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে—আমি এ-সব খাবো না!

বেয়ারা কখন সামনের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে গেছে কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু সুরেনের নজরে ঠিক পড়েছে।

—কেন, আপনি হুইস্কি খান না?

পর্মিলি বললে—তুমি রিফিউজ কোর না সুরেন, তাতে প্রজেশকে ইন্সাল্ট করা হয়—

সুরেন বললে—কিন্তু আমি যে মদ খাই না।

পর্মিলি বললে—না-ই বা খেলে, একদিন খেতে কী হয়েছে। আমি তো রোজ খাই—

এর উত্তর কী দেবে সুরেন! শুধু বললে—আমার ভয় করে—

—ভয় করে মানে?

সুরেন বললে—মদ খেলে নেশা হয়। আমার মামা জানতে পারলে রাগ করবে।

প্রজেশ সেন বললে হুইস্কি খেলে নেশা হয় কে বললে? এই যে এখানে এই বারে এত লোক খাচ্ছে সকলেরই কি নেশা হচ্ছে? বেশি খেলে নেশা হয়। আপনাকে বেশি খেতে কে বলছে?

সুরেন বললে -আপনারা খান না, আমি তো আপনাদের বারণ করছি না। আমি নিজে না-ই বা খেলুম।

প্রজেশ সেন বললে—একটু আগে যে তবে আপনি বললেন আপনার কোনও কমপ্লেক্স নেই?

সুরেন বললে—কিন্তু আমাদের মাধব কুণ্ডু লেনের রাস্তায় দেখেছি রোজ রাত্তিরে মাতালরা টলতে টলতে বাড়ি ফেরে—

পর্মিলি বললে—কিন্তু আমি কই টলছি, আমি তো নরম্যাল—

সুরেন বললে –তোমার কথা আলাদা—

মিস্টার সেন বললে—আর আমি? আমিও তো নরম্যাল!

এরপর আর কোনও যুক্তি নেই দেবার। সুরেন বললে—আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, আমি খাবো না।

পর্মিলি বললে—কিন্তু তুমি যখন এখানে এসেছ, তখন ইউ মাস্ট্। তোমাকে খেতেই হবে।

সুরেন বললে—আমি যদি না খাই তো তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে?

মিস্টার সেন বললে এটিকেট যদি মানতে চান তো আপনার খাওয়া উচিত। পর্মিলি যখন বলছে বিশেষ করে—

সুরেন বললে -কিন্তু আগে জানলে তো আমি এখানে আসতামই না। কেন আমাকে আপনি এখানে নিয়ে এলেন?

মিস্টার সেন বললে- পর্মিলি যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল!

-কী জন্যে? আমার সঙ্গে তোমার কীসের দরকার, পর্মিলি? আমাকে অমন করে অপমান করবার পরও তুমি আশা করেছিলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো?

মিস্টার সেন বললে- কিন্তু একটু ড্রিঙ্ক করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? পর্মিলির অনারেও তো খাওয়া যায়!

সুরেন বললে—কিন্তু যেটা অন্যায় সেটা আমি কেমন করে করবো?

পর্মিলি চিৎকার করে উঠলো—তা ড্রিঙ্ক করা কি অন্যায়? আমি এই যে ড্রিঙ্ক করছি, এ কি অন্যায় করছি বলতে চাও?

সুরেন বললে—তুমি নিজে জানো না তুমি অন্যায় করছো কিনা?

পর্মিলি চিৎকার করে উঠলো—নো, নেভার—আমি কখনও অন্যায় করিনি—

সুরেন উত্তর দিলে—তোমার বাবার সামনে বসে তুমি এই রকম মদ খেতে পারো?

পর্মিলি বললে—ইয়েস, হোয়াই নট! বাবাও ড্রিঙ্ক করে আমাদের বাড়িতেই কক্‌টেল-পার্টি হয়, হোটেলেও বাবা পার্টি দেয়। আমার বাবা তো তোমার মতন মিড্‌ল-ক্লাশ-মেণ্টালিটির মানুষ নয়।

সুরেন বললে—আমি মুক্ত কণ্ঠেই ঘোষণা করছি পর্মিলি, আমি গরীব লোকের ছেলে, আমি মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, কিন্তু সেজন্যে আমি নিজেকে ছোট মনে করিনি—

পর্মিলি বললে—নিজেকে বড় মনে করলেই বড় হওয়া যায় না।

সুরেন বললে—যতদিন তোমরা আছ ততদিন কেউই বড় হতে পারবে

না পর্মিলি। তোমরা কাউকেই মাথা তুলতে দেবে না, অন্ততঃ যতদিন তোমার বাবাদের মত মিনিস্টার আছে—

—কী বললে?

সুরেন বললে—আমি রেখে-ঢেকে কিছু বলি না।

—প্রজেশ!

প্রজেশ তখন সত্যিই ভাবনায় পড়েছে।

বললে—তুমি থামো পর্মিলি, তুমি থামো—

—কেন থামবো? তোমার কথায় থামবো? ও কি মনে করেছে আমি ড্রিঙ্ক করেছি বলে আমার মাথায় কোনও সেন্স নেই?

সুরেন বললে—তা কেন ভাববো পর্মিলি। আমি তো সে-কথা বলিনি। আমি শুধু বলেছি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার কথা। এই সমাজ-ব্যবস্থা না বদলালে আর চলবে না—

এবার পর্মিলি দাঁড়িয়ে উঠলো। দাঁড়াতে গিয়ে একটু যেন বেসামাল হলো। কাঁধ থেকে শাড়িটা খসে পড়লো একবার। তারপর সুরেনের গ্লাসটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে সামনে এল। এসে সুরেনের মুখের কাছে গ্লাসটা এগিয়ে ধরে বললে—খাও—

সুরেনের মুখের কাছাকাছি এসেছে পর্মিলির মুখ। মুখ থেকে হুইস্কির কড়া গন্ধ বেরোচ্ছে ভুর ভুর করে। সুরেন মুখটা পেছিয়ে নিলে।

পর্মিলি আবার বললে—খাও—

সুরেন বললে—তুমি আমাকে খেতে বোল না পর্মিলি—

—না খেতেই হবে!

বলে এক হাতে সুরেনের ঘাড় ধরে জোর করে মুখটা নিচু করে দিলে, আর এক হাতে গ্লাসটা নিয়ে সুরেনের ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিলে।

বললে—খাও, বলছি খাও—

সুরেনের একবার মনে হলো সে শরীরের সমস্ত তেজ নিয়ে পর্মিলিকে ঘুঁষি মেরে দূরে ঠেলে দেয়। আবার মনে হলো সে এখান থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে যায়। মদ খাওয়া কি খারাপ? কে জানে মদ খাওয়া ভালো কি মন্দ! হয়ত ভালো কিংবা হয়ত মন্দ। তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তা নিয়ে তার ভাববারই বা কী দরকার। সংসারে ভালো মন্দ অনেক রকম জিনিসই তো আছে! সব ভালো জিনিসই কি সে ভোগ করেছে? কিংবা সব মন্দ জিনিসকেই কি সে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে?

মিস্টার সেন হো হো করে তখন হাসছে।

পর্মিলির লাল রগরগে মুখখানা তখন পৈশাচিক উল্লাসে একেবারে উৎফুল্ল। গেলাসটা নিয়ে একেবারে সুরেনের মুখের ভেতর গুঁজে দেবার চেষ্টা করছে। আর সুরেন প্রাণপণ শক্তিতে দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতে পর্মিলিকে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে। একটু কথা বলবার চেষ্টা করতে গেলেই যখন মুখটা ফাঁক হয়ে যাবে, আর তখনই পর্মিলি তার গলার মধ্যে মদ ঢেলে দেবে।

মিস্টার সেন বললে—আহা, ওকে ছেড়ে দাও পর্মিলি, ছেড়ে দাও—

পর্মিলির শরীরে যেন তখন দশটা পর্মিলি ঢুকে পড়েছে—ও ভেবেছে কী? ভেবেছে ওর চরিত্র ভালো, আর আমরা সবাই ক্যারেকটারলেস্!

সুরেন বলতে গেল—না পর্মিলি, আমি তা ভাবিনি—

পর্মিলি গেলাসটা মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললে—তাহলে খাও তুমি,

খেয়ে নাও—

পর্মিলি যদি মেয়েমানুষ না হতো হয়ত সুরেন তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাইরে চলে আসতো। কিন্তু পর্মিলি তার সুযোগ নিয়ে সুরেনের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে জিতে গেল। সুরেনের মাথাটা ধরে নিচু করে দিয়ে মুখের মধ্যে ঢক্ ঢক্ করে ঢেলে দিয়েছে। সুরেনের দম বন্ধ হয়ে এল, তার মনে হলো যেন চোখের সামনে সব কিছু বন্ বন্ করে ঘুরতে শুরু করেছে। গরম ঝাঁজ লেগে নাক-মুখ-চোখ-গলা জ্বালা করছে। সুরেন আর থাকতে পারলে না। সেইখানে বসে বসেই চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে অবশ-অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। শুধু টের পেলে পাশে যেন কারা কথা বলছে। অনেক দূর থেকে কাদের কথা কানে ভেসে আসছে। আর কিছু শোনা গেল না। সুরেনের কান্না পেতে লাগলো, নেশাতে নয়, দুঃখে। পরাজয়ের দুঃখে। সে হেরে গেল। যেন কেউ তার কৌমার্য হরণ করে নিয়েছে। যেন কেউ তার কৌমার্য হরণ করে নিয়ে তাকে রাস্তার ধুলোয় পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। তার আর কিছু নেই। অহঙ্কার করবার মত তার আর কিছু নেই। সে আজ পরাভূত, পরিত্যক্ত, প্রপীড়িত।

পর্মিলি তখনও খিলখিল করে হাসছে। সুরেনের মুখের কাছে মুখটা নিয়ে এসে ভালো করে দেখতে লাগলো সে।

বললে—নেশা হয়েছে মনে হচ্ছে—

প্রজেশ বললে—অভ্যেস নেই তো, আর খাইও না—

পর্মিলি মুখটা ধরে ডাকতে লাগলো—সুরেন ও সুরেন—

সুরেন চোখ খুললো। বললে—এ্যাঁ—

পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—ঘুম পাচ্ছে?

সুরেনের চোখ ছলছল করে এল। যেন পর্মিলির গলায় মায়ের আদরের সুর। চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকালো। কিন্তু মাথা তুলতে পারলে না। বললে—আমি এখন বাড়ি যাবো কী করে!

প্রজেশ বললে—আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাবো মিস্টার সান্ন্যাল, ডোন্ট্ ওরি।

একটু সহানুভূতির সুর শুনে যেন সুরেন একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। বললে—দয়া করে আমাকে ফেলে যাবেন না মিস্টার সেন। আমার মামা বকবে!

পর্মিলি হাসতে হাসতে বললে—মামা তোমার বুঝি ড্রিঙ্ক করে না?

সুরেন বললে—মামা যদি জানতে পারে আমি মদ খেয়েছি তো আমাকে বাড়িতেই ঢুকতে দেবে না। আমার কী হবে? আমার মুখে যদি গন্ধ পায়?

পর্মিলি বললে—তাহলে এখন আমাদের বাড়িতে চলো—আমাদের ওখানেই আজ রাত্তিরটা থাকবে।

সুরেন বললে—কিন্তু তা কী করে হয়? আমার বাড়িতে যে খোঁজাখুঁজি পড়ে যাবে—কেন তুমি আমাকে মদ খাইয়ে দিলে? আমি তোমার কী ক্ষতিটা করেছি?

পর্মিলি বললে—তা মদ খাওয়া কি খারাপ?

সুরেন বললে—মদ খাওয়া যদি খারাপ না হবে তো মদ খেলে লোকে নিন্দে করে কেন? জানো না আমরা গরীব তোমাদের কাছে যা ভালো আমাদের কাছে তা খারাপ। তোমাদের কাছে যা পুণ্য আমাদের কাছে তা পাপ!

পর্মিলি হাসছিল এতক্ষণ। এবার বললে—তুমি দেখছি এখনও ছেলেমানুষ!

সুরেন বললে তা তো বলবেই. তোমাদের উপদেশ দেবার অধিকার

আছেই—

পর্মিলি মিস্টার সেনের দিকে চেয়ে বললে—দেখছো প্রজেশ কলকাতা সহরে এমন ছেলেও আছে এখনও—

প্রজেশ বললে—আর এক পেগ হুইস্কি দিতে বলি তোমাকে—

পর্মিলি বললে—ক'টা বাজলো?

প্রজেশ ঘড়ি দেখে বললে—ওন্‌লি এইট্! দুটো করে বড় আনতে দিই—

পর্মিলি বললে—দাও, কিন্তু এইটেই লাস্ট পেগ—

তারপর আবার হুইস্কি এল। আবার গেলাসে চুমুক দিতে লাগলো দু'জনে। সুরেন চোখ বুঁজে বুঁজে সমস্ত অনুভব করতে লাগলো। মনে হলো তাকে অচৈতন্য মনে করে দুজনে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সত্যিই তখন চেয়ারের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে আছে সুরেন! সমস্ত পৃথিবী তার মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু যেন তার পাশের দুজনকে সে দেখতে পাচ্ছে, তাদের অনুভব করতে পারছে।

মিস্টার সেন বললে—ও কী করছো, ও যে দেখতে পাচ্ছে—

পর্মিলি বললে—ও তো নেশার ঘোরে অজ্ঞান, দেখতে পাবে কী করে?

প্রজেশ বললে—কেন তুমি ওকে খাইয়ে দিলে বলো তো, বেচারির অভ্যেস নেই—আমারই দোষ, আমার অফিসে গিয়েছিল চাকরির জন্যে, আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলুম—

পর্মিলি বললে—ওর কথা ছেড়ে দাও। হেল্ উইথ্ হিম্, আর এক পেগ্ অর্ডার দাও প্রজেশ! বেশি নয়, অন্‌লি আর এক পেগ্। হোয়াট্‌স্ দ্য টাইম?

রাত বাড়লো। আরো দুটো গেলাসে আরো দুটো পেগ্ এল। আরো এক পেগ্ নেশা বাড়লো। আরো এক ডিগ্রী প্রেসার। বারের মধ্যে আলোগুলো যেন আরো ঝিমিয়ে এল।

—পর্মিলি!

—ইয়েস ডিয়ার!

—চলো, হাওয়ায় যাই, এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে!

পর্মিলি বললে—কোথাও হাওয়া নেই। পৃথিবীর দম আটকে আসছে তো হাওয়া কোথায় পাবে!

প্রজেশ বললে—কথাটা বলেছ ভালো, এই জন্যেই তো তোমাকে হুইস্কি খাইয়ে দিই পর্মিলি, হুইস্কি খেলেই তুমি পোয়েট হয়ে যাও। আই লাভ পোয়েট্রি—

পর্মিলি বললে—পোয়েট্রি তো এত সস্তা নয় প্রজেশ যে, হুইস্কিতে চুমুক দিলুম আর গড় গড় করে বেরিয়ে এল! পোয়েট্রি তৈরী করতে গেলে প্রোটিন চাই—

প্রজেশেরও তখন বেশ নেশা হয়েছে। চোখে রং ধরেছে। বললে—ব্র্যাভো—ব্র্যাভো—তুমি সত্যিই পোয়েট পর্মিলি—

পর্মিলি শুধরে দিয়ে বললে—পোয়েট নয় প্রজেশ পোয়েট্রেস—

তার সঙ্গে সঙ্গে কেবিন ফাটিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো দুজনে। হঠাৎ আচমকা হাসির আওয়াজে সুরেন যেন একটু চোখ চাইলে। এতক্ষণ চোখ বুঁজে সব শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু চোখ খুলতেই দেখলে প্রজেশ আর পর্মিলি দুজনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরেছে। কোণাকুণি দু'জনের চেয়ার। কখন যে চেয়ার টেনে নিয়ে প্রজেশ তার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল তার ঠিক ছিল না।

সুরেনের মনে হলো আরও বেশিক্ষণ বসে থাকলে হয়ত তাকে আরো অনেক কিছু দেখতে হবে। আরো অনেক কিছু সহ্য করতে হবে, কিন্তু উঠবে কী করে? যদি পমিলি তাকে যেতে না দেয়? যদি তার পা টলে মাতালদের মত!

হঠাৎ প্রজেশের গলা শুনতে পাওয়া গেল—ওকি, সরে বোস, সুরেন রয়েছে—

পমিলি বললে—ওকে তো ওই জন্যেই হুইস্কি খাইয়ে দিয়েছি—ও কিছু জানতে পারবে না—

প্রজেশ বললে—শুধু হুইস্কি দিলে কেন, একটু প্রোটিনও দিলে পারতে!

পমিলি টলতে টলতে বললে—প্রোটিনটা তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি প্রজেশ—

প্রজেশ বোধহয় আরো সরে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি বসলো। বললে—রেখে দিলে কী হবে, কবে আর খেতে দেবে?

পমিলি টলে পড়লো চেয়ারে। বললে—জানো তো প্রজেশ, আমাব সব পোয়েট্রি তোমাকে নিয়ে। তুমি তো আমার কাছে কখনও পোয়েট্রি চাওনি, কেবল প্রোটিন চেয়েছ। তাই ভয় হয় হয়তো একদিন তোমার পাওয়া ফুরিয়ে যাবে। আমি তোমাকে পোয়েট্রি দিতে পারবো না—

প্রজেশ বললে—এ তোমার ভুল ধারণা পমিলি। এতদিনেও কি তোমায় চিনতে পারিনি আমি, বলতে চাও?

—কিন্তু আমাকে তুমি কেন মদের নেশা ধরিয়ে দিলে প্রজেশ? আমার যে আরো খেতে ইচ্ছে করছে!

প্রজেশ পমিলির মুখখানা ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললে—এ কি, তুমি কাঁদছো?

পমিলি বললে—আরো এক পেগ্ অর্ডার দাও প্রজেশ! প্লিজ—

প্রজেশ বললে—আর নয়, ইট ইজ্ নাইন্। যাবার এবার সময় হয়েছে—

—না, আর এক পেগ, প্লিজ! প্লিজ্ প্রজেশ, অন্‌লি ওয়ান পেগ্ মোর!

প্রজেশ বললে—ছিঃ পমিলি। তুমি কি শেষকালে কেলেঙ্কারি করতে চাও—

পমিলি বললে—আমি তো তোমাকে বললাম আর ওন্‌লি ওয়ান পেগ—

—শেষকালে তুমি কি লোক হাসাবে?

—লোক? কাকে তুমি লোক বলো? লোক কারা?

প্রজেশ বললে—দেখছো না নিচের হল-এ কত লোক রয়েছে? ওরা দেখলে কি ভাববে, কি বলবে বলো তো?

পমিলি ফণা তুলে দাঁড়ালো। বললে—কে কী বলবে শুনি? আমি কি কাউকে কেয়ার করি নাকি? আই কেয়ার নো বডি? আই কেয়ার এ ড্যাম ফর দেম্। দোজ্ ব্যাসটার্ডস্—

—পমিলি, তোমার নেশা হয়ে গিয়েছে!

পমিলি দাঁড়িয়ে উঠলো এবার। বললে—নেশা! আমার নেশা হয়েছে! তুমিই তো আমার নেশা করিয়ে দিয়েছ, আবার তুমিই আমাকে দোষ দিচ্ছ? নেশা হবে না? তুমি তো আমার নেশা করাতেই চাইছিলে!

প্রজেশ বললে—আমি তোমাকে নেশা করিয়েছি, না তুমি আমাকে নেশা করা শিখিয়েছ?

—হোয়াট? আমি তোমায় নেশা করা শিখিয়েছি?

প্রজেশ বললে—চেঁচিও না।

—আলবৎ চেঁচাবো। আমি আজকে সমস্ত লোককে বলে দেবো, এই ছেলেটা আমাকে নেশা করিয়ে মজা দেখছে!

প্রজেশ পর্মিলির কাঁধটা দু'হাতে ধরে বললে—থামো, থামো, বেশি এক্সাইটেড্ হয়ো না। তুমি এত সেন্সিটিভ জানলে তোমাকে আমি বারে আনতুম না।

পর্মিলি বললে—দেখ প্রজেশ, ডোন্ট্ টেল্ লাইজ্! মিথ্যে কথা বোল না কে আমাকে বারে আসা শেখালে?

প্রজেশের পেটেও পাঁচ পেগ পড়েছে। সে বলে উঠলো—আমি তোমাকে প্রথমে বারে নিয়ে এসেছি, না তুমি? আমাকে ড্রিঙ্ক করাতে শেখালে কে?

—দেখ, পর্মিলি বলে উঠলো—তোমার সঙ্গে আমার আলাপ রাস্তায় নয় মার্কেটে নয়। আমার বাবার কাছে। তুমি চাকরি চাইতে বাবার কাছেই এসেছিলে আজ যে তুমি চার ফিগারের চাকরি করছো এ কার দয়ায়? কে তোমাকে হ্যারিংটন্ কোম্পানীর পি-আর-ও করেছে?

প্রজেশ বলে উঠলো—আমার লজ্জা করছে পর্মিলি, ইউ আর ড্রাঙ্ক—

পর্মিলি বললে—তুমি নিজে মাতাল তাই আমাকেও মাতাল বলছো! মাতাল হলে তোমাকে আমি গালাগালি দিতে পারি?

প্রজেশ বললে—নিজে তো মাতাল হয়েছই, আবার মিস্টার সান্ন্যালকেও তুমি মাতাল করে দিয়েছ—তোমার সেন্স্ থাকলে তুমি বুঝতে কত বড় অন্যায় তুমি করেছ?

—শাট্ আপ্!

প্রজেশ বললে—তুমি চুপ করো।

পর্মিলি বললে—প্রজেশ, তোমাকে আমি অনেকক্ষণ টলারেট করেছি, নো ফারদার। তুমি বিল্ পেমেন্ট করে দাও, আমি সুরেনকে নিয়ে চললুম—

বলে সুরেনের মুখের কাছে গিয়ে ডাকলে—সুরেন, সুরেন, ওঠো, বাড়ি চলো—

সুরেন চোখ তুলে চাইলে পর্মিলি[illegible] দিকে। এয়ারকণ্ডিশন করা ঘরের মধ্যে পর্মিলির সারা মুখে গলায় [illegible] ঘাম জমে উঠেছে। রাঙা করমচার মত টক্‌টক্ করছে গাল দুটো। সুরেন একদৃষ্টে চেয়ে রইল। বুঝতে পারলে না সে স্বপ্ন দেখছে না ঠিক দেখছে!

পর্মিলি আবার বললে—ওঠো, ওঠো, চলো, বাড়ি যেতে হবে না!

সুরেন ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো। এতক্ষণ যেন স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত কথা শুনেছে সে। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মিস্টার সেন। হোটেলের ওয়েটার এসে বিল দিয়ে টাকা নিয়ে গেল। মিস্টার সেন তাকে বকশিশ দিলে। ওয়েটারটা সেলাম করে চলে গেল।

সুরেন উঠে দাঁড়ালো। পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—তুমি হেঁটে রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারবে তো?

সুরেন বললে—পারবো—

পর্মিলি বললে—এসো, আমার হাত ধরো, পড়ে যেও না যেন। অন্ধকার, খুব সাবধানে আসবে—

মিস্টার সেন পেছন থেকে ডাকলে—পর্মিলি, তুমি হাত ছেড়ে দাও, আমি ওকে বাড়ি পেঁৗছে দিচ্ছি—

পর্মিলি বললে—তোমাকে আমার সম্বন্ধে ভাবতে হবে না, তুমি যাও—

মিষ্টার সেন বললে—কিন্তু পর্মিলি, প্লিজ, আমার কথা শোন, আমার ওপর রাগ কোর না। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি—

পর্মিলি বললে—আমার ভালোর কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না প্রজেশ! আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোন কনসার্ন নেই—দয়া করে তুমি আর আমাদের বাড়ি আসবে না—

মিষ্টার সেন বললে—কিন্তু কেন তুমি আমার ওপর চটছো, নেশা হয়ে গেলে দেখছি তোমার আর কোন জ্ঞান থাকে না। আমি কী করলুম?

পর্মিলি তেমনি ভাবেই বললে—তুমি আমায় ইনসাল্ট্ করেছ, এর পরেও আমার সঙ্গে তোমার কথা বলতে লজ্জা করে না?

মিষ্টার সেন কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগলো—কিন্তু তুমিই তো মিষ্টার সান্ন্যালকে মদ খাইয়ে দিলে, আমি তো বারণ করেছিলুম।

—ডোণ্ট্ টক্ রট্! কেন তুমি সুরেনকে এখানে আনলে? আমি কি ওকে এখানে আনতে বলেছিলুম?

মিষ্টার সেন বললে—কিন্তু তুমিই তো সেদিন বলছিলে মিষ্টার সান্ন্যালের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।

পর্মিলি এবার ঘুরে দাঁড়ালো। তুমি এত বড় মিথ্যেবাদী প্রজেশ, আমার নামে তুমি সব দোষ চাপিয়ে দিলে? তুমিই তো বলেছিলে ড্রিঙ্ক করলে মানুষের আসল রূপটা বেরিয়ে পড়ে, মদ খাওয়ালেই মিষ্টার সান্ন্যালের মনের কথা বেরিয়ে পড়বে—। আমি তো সেই কথা শুনেই বলেছিলাম, অনেকদিন সুরেন আসেনি। তুমি কি মনে করেছ ড্রিঙ্ক করেছি বলে আমার মেমারিও নষ্ট হয়ে গেছে!

তারপর সুরেনের দিকে ফিরে বললে—চলো, অন্ধকার, খুব সাবধান-

সত্যিই চারদিকে অন্ধকার। ভেতরে অত লোক, তবু চারদিকে টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে। কেউ কারো মুখও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না। সামনে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে পর্মিলি! পেছনে মিষ্টার সেন।

রাস্তায় বেরোতেই বাইরে সমস্ত আলোয় আলো। বাইরে এসে বাঁচলো সুরেন। একটা লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে সংবিৎ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলে।

মিষ্টার সেন বললে—মিণ্টার সান্ন্যাল, আসুন, আপনাকে আমি বাড়ি পেঁৗছিয়ে দিচ্ছি—

পর্মিলি বললে—না, তোমাকে বাড়ি পেঁৗছিয়ে দিতে হবে না, আমার গাড়ি আছে। তুমি তোমার কাজে যাও—

মিষ্টার সেন বললে—কিন্তু পর্মিলি, তোমার যে রাত হয়ে যাচ্ছে—

—যাক্, তোমাকে আমার কথা ভাবতে হবে না।

ততক্ষণে পর্মিলির ড্রাইভার গাড়ি এনে হাজির করেছে ফুটপাথের কাছে। পর্মিলি বললে—ওঠো—

হঠাৎ এমন সময় পেছন থেকে সুরেনের কাঁধে কে যেন হাত রাখলে। চম্‌কে উঠে পেছন ফিরতেই দেখলে, যেন চেনা-চেনা মুখ। তারপরেই চিনতে পারলে। কালীকান্ত! কালীকান্ত বিশ্বাস!

—কী ব্রাদার, তুমিও?

সুরেন বললে—কালীকান্তবাবু, আপনি? আপনারা কোথায় আছেন এখন? সুখদা কেমন আছে?

কালীকান্ত বিশ্বাস বিশ্রী একটা দাঁত-বার করা হাসি হাসলে! বললে—সে-

দিন একটা বিড়ি চাইলুম দিলে না ব্রাদার, আর আজকে একবারে জলপথ!

তারপর পর্মিলির মুখের দিকে চেয়ে বললে—ইনি কে?

সুরেন কী বলবে, পর্মিলির কী পরিচয় দেবে বুঝতে পারলে না। ওই রকম অবস্থায় তার সঙ্গে যে কালীকান্ত বিশ্বাসের দেখা হয়ে যাবে তাও সে কল্পনা করতে পারেনি। রাস্তায় অনেক লোক তাদের দিকে চেয়ে দেখছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পর্মিলি, আর তারও ওপাশে মিষ্টার সেন। তাদের সঙ্গে কালীকান্ত বিশ্বাসের যেন খাপ খাচ্ছে না।

সুরেন বললে—সুখদা কেমন আছে?

এটা কালীকান্তর প্রশ্নের পিঠে আর একটা প্রশ্ন! তবু কালীকান্ত কিছু মনে করলে না। বললে—তুমি ব্রাদার একদিন এসো না আমাদের ওখানে!

তারপর একটু হেসে আবার বললে—ইনি কে, বললে না তো ব্রাদার!

সুরেন বললে—ইনি আমার এক বন্ধুর বোন!

—বন্ধুর বোন? বেড়ে আরামে আছ মাইরি। আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দাও না।

সুরেনের ভয় হয়ে গেল। বললে—অন্য একদিন আলাপ করিয়ে দেবো, এখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। আমি চলি—

কালীকান্ত তবু ছাড়তে চায় না। তারও নেশা হয়েছে। হাতটা জোরে ধরে রইল।

সুরেন বললে—ছাড়ুন, আমি এখন যাবো—

কালীকান্ত আরো জোরে তার হাতখানা চেপে ধরলো, বললে—এত তাড়াতাড়ি কিসের ব্রাদার, তুমি তো এখনও বিয়ে করোনি!

এবার আর সুরেন আপত্তি শুনলে না। জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে। ছাড়িয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা। জিজ্ঞেস করলে—কালীকান্তবাবু, আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা কী বলুন তো—

কালীকান্ত বললে—আরে ঠিকানা বলে কী হবে? তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো—

আর দাঁড়ালে চলে না। পর্মিলির গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

পর্মিলি বললে—এসো, লোকটা কে? সেই লোফারটা না?

সুরেন বললে—তুমি চিনলে কি করে?

পর্মিলি বললে—আমি চিনতে পেরেছি তোমাদের বাড়ির সেই জামাইটা তো! তোমাদের বাড়িতেই তো আমি ওকে দেখেছি—

প্রজেশ সেন তার নিজের গাড়িটাতে উঠে ডাকলে—আসুন, মিষ্টার সান্ন্যাল, আমার গাড়িতে আসুন—

পর্মিলি বলে উঠলো—না, তুমি আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে আমি তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবো—

গাড়ি ছেড়ে দিলে। সুরেন চেয়ে দেখলে কালীকান্ত দুটো নেশাগ্রস্ত চোখ দিয়ে তার দিকে ড্যাব্ ড্যাব্ করে দেখছে।

জগৎ. এ এক অদ্ভুত জীবন। সুরেনের মনে হয় এ যাবৎ

পৃথিবীর সমস্ত মানুষই হয়ত তাদের নিজেদের জগৎটাকে, নিজের জীবনটাকে অদ্ভুত বলে মনে করেছে। বোধহয় পৃথিবীটা চির-নতুন বলেই এমনি মনে হয়। প্রতিদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটাকে নতুন বলে মনে হয়। ১৯৫০ সালে যে সূর্য আকাশের পূর্বদিকে একদিন উঠেছিল, আজকের সকালের সূর্যটার সঙ্গে যেন তার কিছু মিল নেই। এ বোধহয় আলাদা। আলাদা বলেই হয়ত মানুষের জীবনটা এত বিচিত্র, এত অদ্ভুত। কই, এতদিন ধরে পৃথিবী চলছে, তবে আজকের সঙ্গে কালকের তো কোনও মিল থাকে না। আজকের ঘটনাটা তো পরের দিন আর ঘটে না।

মনে আছে, পর্মিলি বলেছিল—সুরেন, প্রজেশটা একটা বোর—আই হেট হিম—

সুরেন সে-সব কথার কোনও উত্তর দেয়নি। নেশার ঝোঁকে মানুষ যে-সব কথা বলে সেটা কি আর সত্যি! ও-সব কথার কোনও উত্তর দিতে নেই।

তারপর হঠাৎ সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—তুমি ওর কাছে চাকরি চাইতে গিয়েছিলে কী বলে? ওকে তো আমার বাবা চাকরি করে দিয়েছে! তুমি আমাকে বললে না কেন যে তোমার চাকরির দরকার? তুমি চাকরি নেবে?

সুরেন বললে—চাকরির আমার তেমন দরকার নেই, কিন্তু আমি ওই বাড়িটা ছাড়তে চাই—

—কেন?

সুরেন বললে—মামার কাছে চিরকাল হাত পাততে খারাপ লাগে। একটা চাকরি পেলে তখন স্বাধীন হয়ে অন্য বাড়িতে চলে যেতে পারি—

পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—ওখানে তোমার অসুবিধেটা কী?

সুরেন বললে—ওটা আমার বাড়ি নয় বলেই আমার অসুবিধে—

—কিন্তু মামার পরে তো তুমিই ও বাড়ির ম্যানেজার হবে।

সুরেন বললে—আমি ও-বাড়ির ম্যানেজার হতে চাই না। আমি ম্যানেজারও হতে চাই না, ওই সম্পত্তিও চাই না। আমার একটা দু'শো টাকার মতন চাকরি হলেই আমি সুখী—

পর্মিলি বললে—তুমি কালকেই আমাদের বাড়িতে আসবে, আমি তোমাকে চাকরি করে দেবো—

সুরেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো—আমার জন্যে তুমি অত করবে কেন?

পর্মিলি বললে—এটা করা তো আমার পক্ষে বড় কিছু করা নয়। এ করতে আমাকে আধ মণ তেলও পোড়াতে হবে না, কাউকে খোসামোদও করতে হবে না।

সুরেন বললে—তারপরে চিরকাল আমাকে খোঁটা দেবে যে তুমি আমাকে চাকরি করে দিয়েছ।

পর্মিলি বললে—জীবনে তুমি খুব আঘাত পেয়েছ কখনও?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

পর্মিলি বললে—তোমার মত ছেলের এতখানি অহঙ্কার থাকা ভালো নয়—

সুরেন বললে—ওই অহঙ্কারটুকু না থাকলে আর কী রইল আমার? ওই-টুকুই আমাদের গরীবদের শেষ সম্বল—

পর্মিলি বললে—ওটা ত্যাগ করো—

সুরেন বললে—তুমি বড়লোক, তুমি ঠিক আমার সমস্যা বুঝবে না। বুঝবে না বলেই আমি তোমার কাছে কিছু [illegible]

পর্মিলি বললে—দেখছি বড়লোকদের সংসারে জন্মানোটাই আমার অপরাধ হয়ে গেছে!

সুরেন বললে—আমি কি সেজন্যে তোমাকে কখনও দোষ দিয়েছি? তুমি বড়লোকের মেয়ে হয়ে যে আমার সঙ্গে কথা বলো, এইটেই তো তোমার মহানুভবতা।

পর্মিলি বললে—ভেবো না বড় বড় কথা বললেই সত্যিকারের বড় হওয়া যায়। এ-সব কথা তোমার সেই কমিউনিষ্ট ফ্রেন্ড বুঝি শিখিয়েছে?

সুরেন বললে—নেশা করলেও তোমার স্মরণ-শক্তি তো ঠিক আছে দেখছি—

পর্মিলি বললে—আমার নেশা হয় না—

সুরেন বললে—নেশা না হলে প্রজেশবাবুর সঙ্গে তুমি অমন করে ঝগড়া করলে কেন?

—প্রজেশ? পর্মিলির কণ্ঠে একটা তাচ্ছিল্যের সুর ভেসে উঠলো। বললে—প্রজেশটা একটা আপস্টার্ট। ও ভেবেছে আমাকে বিয়ে করে ও জাতে উঠবে। তাই আমাকে নেশা করিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় কেবল!

সুরেন বললে—তোমার সঙ্গে প্রজেশবাবুর কী সম্পর্ক সে তোমরাই জানো, আমাকে কেন তোমরা তার মধ্যে টানো বুঝতে পারি না। আমি তো তোমাদের কেউই নই—। আর আজ আমাকে তুমি তোমার গাড়িতে তুলে নিলেই বা কেন তাও তো বুঝতে পারছি না—।

গাড়িটা কলেজ স্ট্রীট পেরিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে চলছিল। এবার সুকীয়া স্ট্রীটের কাছে আসতেই সুরেন বললে—একটা কথা রাখবে পর্মিলি?

—কী?

সুরেন বললে—আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। নামিয়ে দিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও, এটুকু রাস্তা আমি একাই যেতে পারবো।

—তুমি যাবে কী করে? হেঁটে?

সুরেন বললে—তা ছাড়া আর কী! একটু রাত করে বাড়ি ফেরাই ভালো, মুখে যদি গন্ধ-টন্ধ থাকে তো তাও উবে যাবে! মামা জানতে পারলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

জগন্নাথ তখন গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছে সুকীয়া স্ট্রীটের মোড়ে।

হঠাৎ আর একটা বিরাট গাড়ি গলির মধ্যে ঢুকতে গিয়েই থেমে গেল। তারপর গাড়িটার ভেতর থেকে পুরুষের গলার আওয়াজ এল—পর্মিলি!

গলাটার আওয়াজ সুরেনের চেনা। পুণ্যশ্লোকবাবুর গলা। ও-গলা একবার শুনলে সহজে ভোলা শক্ত!

পুণ্যশ্লোকবাবু গাড়িতে বসেই জিজ্ঞেস করলেন—তোমার এত রাত হলো? এসো, আমার গাড়িতে এসো—

তারপর যেন খেয়াল হলো—তোমার পাশে কে?

পর্মিলি গাড়ি থেকে নামলো। সুরেনও নেমে দাঁড়ালো।

পর্মিলি বাবার কাছে গিয়ে বললে—ও সুরেন!

—সুরেন কে?

সুরেনের ততক্ষণে চমক ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ফেলেছে।

থাক থাক —বলে খদ্দরের ধুতির কোঁচাটা সরিয়ে দিলেন পায়ের ওপর

পর্মিলি বললে—সুব্রতর বন্ধু!

—সুব্রতর বন্ধু! ওরিয়েণ্টাল সেমিনারের স্টুডেণ্ট্?

সুরেন বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছে ততক্ষণে। মুখের গন্ধ যদি পুণ্যশ্লোকবাবুর নাকে যায় তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। বললে—হ্যাঁ—

পর্মিলি বললে—তুমি ওকে একটা চাকরি করে দাও বাবা। চাকরির জন্যে ও আমার কাছে এসেছিল, তাই আমি ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমাদের সেক্রেটারিয়েটে কোনও ভেকেন্সি নেই?

পুণ্যশ্লোকবাবু খদ্দরের পাঞ্জাবি-ধুতিটা সামলে নিয়ে বললেন—সে-সব কথা কি এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে হয়?

পর্মিলি বললে—না বাবা, তোমাকে কথা দিতেই হবে। তুমি প্রজেশকে চাকরি করে দিয়েছ। আর সুরেনকে করে দেবে না? প্রজেশ একটা আপস্টার্ট, ও চাকরি চাইতে গিয়েছিল প্রজেশের কাছে, সে হটিয়ে দিয়েছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এখন রাত হয়ে গেছে। এখন কি এখানে দাঁড়িয়ে ও-সব কথা হয়? কালকে সকালে না হয় আসুক আমার কাছে, তখন আমি শুনবো সব কথা।

পর্মিলি বলল—বা রে, সকালবেলা কি তোমার সময় হবে? তখন তোমার কত কাজ।

সুরেন হঠাৎ বললে—আমি বরং কালকেই আসবো—সেই ভালো—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ, কালকেই তুমি এসো—

পর্মিলি বললে—তাহলে কালকে এসো ঠিক কিন্তু—

তারপরে যেন হঠাৎ খেয়াল হলো—তুমি বাড়ি যাবে কী করে?

সুরেন বললে—সে আমি ঠিক যাবো'খন।

পর্মিলি বললে—তাহলে জগন্নাথ তোমাকে পৌঁছিয়ে দিক।

বলে জগন্নাথকে বললে সুরেনকে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে। পুণ্যশ্লোকবাবুর সঙ্গে পর্মিলি চলে গেল।

জগন্নাথ যখন মাধব কুণ্ডু লেনের ভেতরে গাড়িটা মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে গেল তখনও বুঝতে পারেনি। তখনও বুঝতে পারেনি যে, বাড়িতে একটা এত বড় কাণ্ড ঘটে গেছে। সেই কখন সকালবেলা বেরিয়েছিল, তখন এ-গলিটার অন্য চেহারা। গিয়েছিল দেবেশের খোঁজে। দেবেশকে পার্টি অফিসে পেলে আর এত কাণ্ড ঘটতো না। দেবেশকে পেলে না বলেই গেল প্রজেশ সেনের অফিসে। আর তারপর পর্মিলির সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

হঠাৎ চৌধুরী-বাড়িটার সামনে লোকজন, গাড়ি আর আলোগুলো জ্বলতে দেখেই সুরেন কেমন অবাক হয়ে গেল। এত রাত্রে কী হলো? এত আলো কেন? গাড়ি করে কে এল!

বললে—জগন্নাথ, থামাও, আমি নামবো—

জগন্নাথ গাড়ি থামাতেই সুরেন তাড়াতাড়ি নামলো। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগলো বাড়িটার দিকে। এতক্ষণ যে মাথাটার মধ্যে নেশার ঘোর চলছিল, তা যেন সেই মুহূর্তেই কেটে গেল।

বাড়ির গেটের সামনে বাহাদুর সিং দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেনকে দেখেই বাহাদুর সিং সেলাম করলে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—বাহাদুর. কী হয়েছে?

বাহাদুর সিং বললে—মা-মণির বেমার হয়েছে ভাগ্নাবাবু—

—বেমার? জ্বর?

বাহাদুর সিং বললে—হ্যাঁ, ডাগ্‌দারবাবু এসেছেন, ম্যানেজারবাবু ডাগ্‌দার ডেকে এনেছেন!

সুরেন পেছন ফিরে দেখলে গাড়িটা সত্যিই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওইটেই বোধহয় ডাক্তারবাবুর গাড়ি। তাড়াতাড়ি উঠোনের মধ্যে ঢুকলো সে। এতক্ষণ যে-ভয় করছিল সে তার সবটুকু যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। তবু যদি মুখে গন্ধ থাকে! যদি এখন মা-মণির কাছে গেলে কেউ টের পায়!

উঠোনের সবগুলো আলো তখনও জ্বলছে. ওপাশ থেকে হঠাৎ কে যেন ডাকলে—খোকা, অ খোকা—

অন্ধ মানুষ বুড়োবাবুর গলা। কেমন করে যেন পায়ের আওয়াজ শুনেই চিনতে পেরেছে। যারা দেখতে পায় না, তারা বুঝি কানে শুনতে পায় বেশি। বুড়োবাবু হাতড়াতে হাতড়াতে সামনের দিকেই এগিয়ে আসছিল।

চাকর নাকররাও যেন মা-মণির অসুখের খবর পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। মা-মণির যদি একটা কিছু হয়, তাহলে তো সমস্ত-কিছুই উল্টেপাল্টে যাবে।

সুরেন এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বুড়োবাবুর গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো।

বললে—বুড়োবাবু এত রাত্তিরে তুমি জেগে আছ?

বুড়োবাবু জিজ্ঞেস করলে—খোকা, তোমার মা-মণির অসুখ হয়েছে শুনছি!

সুরেন বললে—আমিও তাই শুনছি. বাহাদুর সিং বললে—

বুড়োবাবু বললে—তা মা-মণির অসুখ আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? তুমি একবার ওপরে দেখতে গেলে না? আমি তো কখন থেকে ছটফট করছি, অনেকবার তোমাকে খুঁজে গেছি। তুমি ছিলে না—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—মা-মণির কী হয়েছে তুমি কিছু শুনেছ?

বুড়োবাবু বললে—আমাকে কেউ কিছু বলছে না। ম্যানেজারবাবুর কাছে জানতে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে তো মারতে এল।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন, মামা তোমাকে মারতে এসেছিল কেন?

বুড়োবাবু বললে—আমাকে বললে—তুমি আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না, যাও।—আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি, যেন আমি এ-বাড়ির কেউ না। যেন মা-মণির অসুখ হলে আমার ভাবনা হয় না!

বুড়োবাবুর মুখের চেহারাটা দেখে মায়া হলো সুরেনের। যে-লোকটাকে মা-মণি একটা নতুন গামছা দিয়ে কৃতার্থ করে না. সেই মা-মণির জন্যে বুড়োবাবুর এই উদ্বেগ দেখে বড় ভালো লাগলো সুরেনের। বললে—মিছিমিছি তুমি কেন ভাবছো বুড়োবাবু. অসুখ মানুষের হয় না? অসুখ হয়েছে, তারপর আবার সেরেও যাবে, ডাক্তার তো দেখতে এসেছে—

বুড়োবাবু তবু যেন নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। বললে—কখনও তো অসুখ হয় না তোমার মা-মণির, আজ পর্যন্ত কখনও তো অসুখ হতে দেখিনি—

সুরেন বললে—তুমি তোমার ঘরে শোওগে যাও—মা-মণি কেমন থাকে আমি তোমায় কাল খবর দেবো—

বুড়োবাবু কী করবে বুঝতে পারলে না। বললে—আমি তাহলে ঘুমোতে যাবো?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, যাও-না—

—কিন্তু ঘুম কি হবে আমার? আমার যে রাতে এমনিতেই ঘুম আসে না। এক কাজ করো না খোকা, তুমি একবার ওপরে গিয়ে দেখে এসো না। তুমি একবার দেখে এসে যদি বলো মা-মণি ভালো আছে, তাহলে ঘুমোতে যাই—

সুরেন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

বুড়োবাবু হঠাৎ অসহায়ের মত সুরেনের হাত দু'খানা ধরে ফেললে। বললে—লক্ষ্মীটি, ভাই আমার, তুমি একবার ওপরে গিয়ে দেখে এসো, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—

সুরেন বললে—তা তোমার যদি অতই দেখবার ইচ্ছে তো তুমি আমার সঙ্গে চলো না, দু'জনে মিলে গিয়েই দেখে আসি। চলো—

—ওরে বাবা—বলে বুড়োবাবু যেন ভয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল।

বললে—আমি যাবো না—

সুরেন বললে—কেন, যাবে না কেন? গেলে কী হয়েছে?

বুড়োবাবু বললে—না বাবা, আমাকে যেতে বোল না। আমি কাছে গেলে তোমার মা-মণির অসুখ বেড়ে যাবে! তুমি বরং একলাই যাও, আমি নিচেয় দাঁড়িয়ে আছি—

হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে ডাক্তার নেমে এল। পেছনে ভূপতি ভাদুড়ী। আব তার পেছনে ধনঞ্জয়। মামা যেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই নামছিল।

সুরেন এগিয়ে গেল। কী বলছে ডাক্তার, তাই শোনবার আশায় কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তাহলে সারবে তো ডাক্তারবাবু?

ভূপতি ভাদুড়ী দুটো কথা জিজ্ঞেস করে তো একটা কথার জবাব দেয় ডাক্তার। শেষকালে বোধহয় ডাক্তার বিরক্ত হয়ে গেল।

বললে—আরে বয়েস তো হয়েছে, বয়েস হলে মানুষ ভুগবে না?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তো ভুগবে কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন ডাক্তারবাবু, এখন যদি একটা বিপদ-আপদ কিছু হয়, তখন সব যে যাবে, এতগুলো লোক বাড়িতে—

ডাক্তারদের বোধহয় মায়া-দয়া কিছু নেই। অন্ততঃ সুরেনের তাই-ই মনে হলো। ডাক্তাররা একজন মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে কী করে! সুরেন ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। সুরেনের মনে হলো ডাক্তারবাবু যেন মা-মণির অসুখের কথা ভাবছেই না!

সুরেন সামনে এগিয়ে যেতেই ডাক্তারবাবু তার নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

মনে আছে, সেদিন ডাক্তার চলে যাবার পর সমস্ত বাড়িটা যেন নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। একটা মানুষ, সেই একটা মানুষের অসুখের ব্যাপারে যে সমস্ত বাড়িতে এমন কাণ্ড হবে, তা যেন কেউ আগে কল্পনা করতে পারেনি। উঠোনের আলোগুলো যেন নিভে এসেছিল এক নিমেষেই। ঠাকুর খাবার জন্যে ডাকতে এসেছিল, তবু যেন—যেতে ইচ্ছে হয়নি।

মামা রেগে গিয়েছিল—কোথায় থাকিস রে তুই সারাদিন? কী রাজকার্য

করছিস শুনি? আমি তোকে সকাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এদিকে বাড়িতে অসুখ, ডাক্তার ডাকবার একটা লোক পাইনে—

সুরেন জিজ্ঞেস করেছিল—মা-মণির কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু কী বললে?

যেমন করে বুড়োবাবু সুরেনকে প্রশ্ন করেছিল, তেমনি করে সুরেনও প্রশ্ন করেছিল মামাকে। অথচ কাকে প্রশ্ন করলে যে ঠিক উত্তরটা পাওয়া যাবে তাও তার জানা ছিল না। যে বিধাতা সমস্ত মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেই হয়ত সঠিক উত্তর একটা পেত সুরেন। কিন্তু কোথায় গেলে সে সাক্ষাৎ মেলে, কে বলে দেবে?

খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল মা-মণির কথা। যদি মা-মণি আর না বাঁচে! যদি মা-মণি হঠাৎ মারা যায়। তাহলে কী হবে?

ঠাকুর বললে—আজ যে মোটে খেলেন না ভাগ্নেবাবু, ক্ষিধে নেই?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো অনেক দিনের লোক, অনেক দিন কাজ করছো এ-বাড়িতে, না?

ঠাকুর বললে—হ্যাঁ, কেন ভাগ্নেবাবু?

—আচ্ছা, এর আগে মা-মণির কখনও এমন অসুখ করেছে?

শুধু ঠাকুর নয়, অর্জুন, দুখমোচন, ধনঞ্জয়, তরলা কেউই মা-মণির এমন অসুখ করতে দেখেনি। সবাই যেন কেমন সব চুপচাপ। কেমন সব নিস্পৃহ। খাওয়ার পর আস্তে আস্তে উঠোনের কোণের কল-ঘরে হাত ধুয়ে এল। ওদিকটায় দুখমোচনদের ঘর, তারও ওপাশে বুড়োবাবুর থাকবার জায়গা। সেখান থেকে আবার নিজের ঘরের দিকে এসে দাঁড়ালো সে। একবার চেয়ে দেখলে ওপরের দিকে। তারপর আবার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

হঠাৎ দেখলে গেট দিয়ে ধনঞ্জয় আসছে। হাতে ওষুধের প্যাকেট।

সুরেন তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে গেল। বললে—ধনঞ্জয়, মা-মণি কেমন আছে?

ধনঞ্জয় বললে—এখনও তো মা-মণির জ্ঞান ফেরেনি, এই আমি ওষুধ নিয়ে আসছি—

সুরেন বললে—আমি একটু তোমার সঙ্গে ওপরে যাব? মা-মণিকে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে—

ধনঞ্জয় বললে—তা চলুন না আমার সঙ্গে—আসুন—

সুরেন ধনঞ্জয়ের পেছন পেছন চলতে লাগলো সিঁড়ির দিকে। যেতে যেতে বললে—দেখ ধনঞ্জয়, যত বড় লোকই হোক, অসুখের সময় কিন্তু সব মানুষই সমান।

ধনঞ্জয় এত বড় বড় কথা হয়ত ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে—তা তো বটেই—

—অথচ দেখ, তোমার আমার আর মা-মণির মধ্যে তো কত তফাত! কত বড়লোক মা-মণি, কিন্তু অসুখ হলে? অসুখ হলে সবাই এক! ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে দু'জনেই ওপরে তেতলায় উঠে এসেছে। তেতলাটা তখন অন্য-দিনের মত নয়, যেন অন্য দিনের চেয়ে বেশী নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। আগে যখন সুখদা ছিল, তখন তবু হৈ-চৈ করতো সে। কিন্তু সে চলে যাবার পর সব ধীর-স্থির। বাদামী বুড়ি থুথুড়ী হয়ে গেছে। সে ভালো করে চোখে দেখতে পায় না এখন। সন্ধ্যের পর সে অকেজো হয়ে যায়। তখ সে বসে বসে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিংবা বড়জোর পিদিমের সলতে পাকায়। আর তরলা?

তরলাই বলতে গেলে মা-মণির আসল ভরসা। তরলাই মা-মণির কাছে থাকে। সে-ই তখন মা-মণির গা-হাত-পা টিপে দেয়।

—কে?

গলাটা ভূপতি ভাদুড়ীর। তরলা ভেতরে মা-মণির মাথার কাছে বসে ছিল। আর ভূপতি ভাদুড়ী ঘরের বাইরে পায়চারি করছিল। ভূপতি ভাদুড়ীরও ঝঞ্ঝাটের একশেষ। তারও তো বয়েস হয়েছে। আগেকার মত খাটতে পারে না। বাড়ির ভাড়া আদায় করে আনা থেকে শুরু করে মামলা-মোকদ্দমার নথি-পত্র নিয়ে উকীল বাড়ি যাওয়া, সবই তাকে করতে হয়। তার ওপর আছে রোজ সকালে চাকর নিয়ে বাজারে যাওয়া। এতগুলো মানুষের খাওয়া-পরার হিসেব রাখা। এতগুলো মানুষকে বশে রাখা। এ কি সহজ কাজ?

—ধনঞ্জয়? ওষুধ এনেছিস?

তারপর সুরেনের দিকে নজর পড়তেই আবার বলে উঠলো—তুই? তুই কী করতে এখানে এসেছিস? কোথায় থাকিস সারাদিন? কী রাজকার্য করছিস শুনি? অথচ আমি তোকে চারদিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এদিকে বাড়িতে অসুখ, ডাক্তার ডাকবার একজন লোক পাইনে—

ধনঞ্জয়ের হাত থেকে ওষুধের প্যাকেট নিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী ঘরের ভেতরে ঢুকলো।

মা-মণির কানে বোধহয় কথাগুলি গিয়েছিল। ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে? সুরেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আপনি চুপ করে থাকুন মা-মণি! ওষুধ নিয়ে এসেছে ধনঞ্জয়, একটু খেতে হবে, আমি ঢালছি—

ওষুধের শিশির ছিপি খুলে ভূপতি ভাদুড়ী একটা কাপে ঢালতে লাগলো। তারপর এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিলে কুঁজো থেকে।

—একটু হাঁ করুন মা-মণি।

যেন অনেক কষ্টে মা-মণি হাঁ করলো। তারপর ওষুধটুকু খেয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর ভূপতি ভাদুড়ী তরলাকে বললে—তুমি ততক্ষণ মাথায় বরফ দাও, আমি এখনি আসছি—

বলে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে বললে—কী রে, তুই এখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, আমার সঙ্গে আয়—

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বাড়িতে অসুখ আর এই সময় তুই উধাও? কোনও আক্কেল যদি তোর থাকে! এই সময়ে আমি একলা কোন্ দিকটা দেখি! ছ'লাখ টাকার সম্পত্তিটা যে নয়-ছয় হয়ে যাবে সে-কথা একবার ভাবছিস না তুই? তোকে কি সব আমি শিখিয়ে দেবো? বি-এ পাস করেও তোর ঘটে এতটুকু বুদ্ধি-সুদ্ধি হলো না?

তারপর ভূপতি ভাদুড়ী তার নিজের দফতরের দরজার তালা খুলে ভেতরে গিয়ে বসলো। পাখার সুইচটা চালিয়ে দিয়ে যেন এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ছাড়লো। সুরেনও গিয়ে তক্তপোষের ওপর বসলো।

ভূপতি ভাদুড়ী বাক্স থেকে এক তাড়া কাগজপত্র বার করলে। তারপর চোখ তুলতেই বোধহয় দেখতে পেলে দরজাটা খোলা।

—কী সব্বোনাশ, তোর কোনও আক্কেল-গম্যি নেই, দরজাটা হাট করে খুলে রেখেছিস, যদি কেউ দেখতে পেত!

বলেই রেগে নিজেই আবার উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর

ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দিলে।

সুরেন বুঝতে পারছিল না এত সাবধানতা কিসের জন্যে। কী এমন গোপন কাজকর্ম আছে তার সঙ্গে!

ততক্ষণে ভূপতি ভাদুড়ী আবার এসে উঠে বসেছে তক্তপোষে। বসে দলিল-পত্র নিয়ে খুলে দেখছে এক-একটা করে। একটা কাগজ দেখিয়ে বললে—শোন্, এই কাগজটা নিয়ে তুই কাল উকীলবাবুর বাড়ি যাবি, বুঝলি? জরুরী কাগজ, এর কোন কপি নেই—

সুরেন বললে—কিসের কাগজ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিসের আবার, উইলের। মা-মণি যে উইল করবে তারই কাগজ—

সুরেন বললে—কালই যেতে হবে?

—কাল না তো কি পরশু? দেখছিস মা-মণির মরো মরো অসুখ! কবে টেঁশে যাবে বুড়ি, তখন সবাই এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ছ'লাখ টাকার সম্পত্তি একেবারে নয়-ছয় হয়ে যাবে!

সুরেন বললে—আমি উকীলবাবুকে গিয়ে কী বলবো?

—কী আবার বলবি, বলবি মা-মণির অসুখ, আপনি একবার আসুন। আরে, আমি তো নিজেই যেতুম, কিন্তু একলা কোন্ দিকটা দেখি—

সুরেন তবু যেন কিন্তু কিন্তু করতে লাগলো।

ভূপতি ভাদুড়ী বুঝতে পারলে। বললে—আরে সব সম্পত্তি তো তুই ই পাবি, আমার আর কী! আমার তো তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আমার এখন গঙ্গামুখো পা। তোর ভালোর জন্যই তো এ-সব করছি—

বলে কাগজটা খুলে ভালো করে দেখাতে লাগলো।

বললে—এই দ্যাখ, এখানে মা-মণি নিজের হাতে সব লিখে দিয়েছে। পাঁচ-খানা বাড়ি, চব্বিশ কাঠা খালি জমি, আর ব্যাঙ্কের নগদ টাকা-গহনাপত্র সমস্ত তোর নামে—

সুরেন নিস্পৃহের মতন সেদিকে চেয়ে রইল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এখন বিশ্বাস হলো তো?

সুরেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কী রে, উত্তর দিচ্ছিসনে কেন? বিশ্বাস হলো না বুঝি?

সুরেন বললে—না, বিশ্বাস হয়েছে—

ভূপতি ভাদুড়ী যেন খুশী হলো। বললে—এর জন্যে কম মেহনত করতে হয়েছে আমাকে! কোথায় উকীল, কোথায় কোর্ট-কাছারি হাঁটাহাঁটি অনেক করেছি—

হঠাৎ যেন ভূপতি ভাদুড়ীর কী মনে হলো। বললে—হ্যাঁরে, তোর গা দিয়ে কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে রে?

সুরেন ভয়ে চমকে উঠলো।

বললে—কিসের গন্ধ?

—হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়েছিস নাকি?

সুরেন বললে—না তো—

—তাহলে?

হঠাৎ দরজায় বাইরে টোকা পড়লো। বাইরে থেকে ধনঞ্জয় ডাকলে—

ম্যানেজারবাবু, আমি ধনঞ্জয়।

—এই রে, বোধহয় বুড়ি টে'শেছে—বলে ভূপতি ভাদুড়ী উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে।

ধনঞ্জয় শুকনো মুখে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা খুলতেই বললে—মা-মণির জ্বরটা বোধহয় খুব বেড়েছে ম্যানেজারবাবু, আপনি একবার আসুন—

—জ্বর এখন কত?

ধনঞ্জয় বললে—তা জানিনে, তরলা বড় ভয় পেয়ে গেছে, আপনাকে ডাকতে বলে দিলে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ঠিক আছে, তুই যা, আমি যাচ্ছি এখুনি—

ধনঞ্জয় আর দাঁড়াল না সেখানে। সোজা উঠোন দিয়ে ওপরে চলে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী সুরেনকে বললে—দেখলি তো, আমি বলেছিলুম আর দেরী নয়, বেশিদিন বাঁচবে না বুড়ি। এখন হলো তো? এখন যদি সেই মাগীটা আবার এসে হাজির হয় তো সব নষ্ট করে দেবে?

তারপর বললে—তুই বোস, যাসনে, আমি আসছি—

শুধু যে পাঁচখানা বাড়ি তাই-ই নয়, চব্বিশ কাঠা জমি আর সঙ্গে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা, গয়না-গাঁটি মিলিয়ে কত টাকা হবে কে জানে! হয়ত অনেক টাকাই। হরনাথবাবু মস্ত উকিল। দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করে চুল পাকিয়েছেন। মাধব কুণ্ডু লেনের চৌধুরী বাড়ির পুরানো কাগজপত্র পড়ে পড়ে সব মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর।

বলেছিলেন—ঠিক আছে, কাগজপত্র সব আমার কাছে রেখে যাও, আমি যা করবার করছি—

তারপর চেয়ে দেখেছিলেন সুরেনের দিকে।

জিজ্ঞেস করেছিলেন—তোমারই নাম সুরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল?

সুরেন বলেছিল—হ্যাঁ—

—তুমি লাবণ্যময়ী দাসীর কে?

সুরেন তেমনি করেই জবাব দিয়েছিল—আমি কেউ না। চৌধুরী এস্টেটের ম্যানেজারবাবু ভূপতি ভাদুড়ী মশাই আমার মামা!

—তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন তারা কোথায়?

সুরেন বলেছিল—আমার কেউ নেই। আমি মাধব কুণ্ডু লেনেই থাকি।

উকিল মানুষ। ওইটুকুতেই বোধহয় সব বুঝে নিয়েছিলেন। কোথাকার কে সামান্য একটা ছেলে এতগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল তাতেও বোধহয় খানিকটা হিংসে হয়েছিল। ঠিক হিংসে না হলেও ওই রকম একটা কিছু। নিজের চোখের সামনে দিয়ে অত টাকা একটা বেওয়ারিশ ছেলে বেফয়দা পেয়ে যাবে এটা উকিল হলেও মনে লাগে বৈকি!

হরনাথবাবুর মুখের ভঙ্গিটা সুরেনের ভালো লাগেনি। মা-মণি তাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছে তাতে কার কী? মা-মণি মারা যাওয়ার পর কেউ-না-কেউ সে-টাকা পেতই। হয় সুখদা পেত, নয়তো কালীকান্ত পেত। টাকা তো কখনও এমনি পড়ে থাকবে না। কেউ-না-কেউ তার মালিক হবেই। সুরেন পেলে কেন

সকলের হিংসে হবে!

সত্যিই মা-মণির অসুখ হওয়ার পর থেকেই যেন সবাই অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে আরম্ভ করেছে সুরেনকে। সবাই জেনে গেছে। সবাই জেনে গেছে যে বাড়ির ভবিষ্যত মালিক সুরেন।

ঠাকুরও আগের চেয়ে একটু বেশি খাতির করে। আগে চাকরদের দিয়ে খেতে ডেকে পাঠাতো! আজকাল নিজেই ডাকতে আসে। আজকাল নিজেই এসে ডাকে। মিষ্টি কথায় অনুরোধ করে ডেকে নিয়ে যায়। নিজের কাঠের পিঁড়ি খানা পেতে পরিষ্কার করে বসতে দেয়। তারপর বার বার পীড়াপীড়ি করে ভাল-ভাল জিনিস খাওয়ায়।

বলে—খান ভাগ্নেবাবু, না খেলে শরীর টিকবে কেন?

সুরেন বুঝতে পারে এত খাতিরের মানে। বুঝতে পারে সবাই তাকে যেন অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। এমন কি দুখমোচন, অর্জুন তারাও আগেকার চেয়ে বেশি সমীহ করে কথা বলে। বুড়োবাবুর অবস্থাটাই বড় বেশি করুণ। বুড়ো-বাবুর শরীরটা যেন আরো ভেঙে পড়েছে।

বুড়োবাবু বলে—তার চেয়ে আমার অসুখ হলো না কেন খোকাবাবু, আমি কেন মরি না!

সুরেন সান্ত্বনা দেয় বুড়োবাবুকে। বলে—তুমি কেন অত ভাবছো বুড়ো-বাবু, অসুখ কি কারো হয় না? অসুখ হয়েছে মা-মণির, আবার সেরে যাবে। ডাক্তার তো দেখছে—

বুড়োবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে—ডাক্তার কী বলছে? সেরে যাবে তো?

সুরেন বুড়োবাবুর মুখের দিকে চায়। বলে—সেরে তো যাবে নিশ্চয়ই।

—না সারলে কী হবে? সব ছারখার হয়ে যাবে খোকাবাবু! কেউ তো দেখবার নেই। এত সম্পত্তির কী হবে?

সুরেন বলে—মা-মণি তো সব সম্পত্তি আমাকে দিয়ে যাচ্ছে, তুমি শোনোনি?

—তোমাকে?

যেন আকাশ থেকে পড়ে বুড়োবাবু। বলে—সব তোমাকে দিয়ে যাচ্ছে?

সুরেন বলে—হ্যাঁ, উইল করে দিয়েছে—

বুড়োবাবু হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সুরেনকে। দুর্বল দুটো হাতে যতটা শক্তি আছে সব দিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরে। চোখ দুটো থেকে দর-দর করে জল গড়িয়ে পড়ে।

বলে—বড় খুশী হলাম খোকাবাবু, আমাদেব কাউকে তাড়িয়ে দিও না তুমি বাবা, আমাকে শুধু দু'খানা গামছা দিও, একখানা গামছাতে আমি কুলোতে পারিনে, বড় ছিঁড়ে যায়—

—আমি তোমাকে ধুতি কিনে দেবো, তখন বুড়োবাবু তোমাকে আর গামছা পরে থাকতে হবে না। তোমাকে ধুতি দেবো, গেঞ্জি দেবো, দু'খানা গামছা দেবো তুমি কিছু ভেবো না—

বুড়োবাবুর তখনও যেন ভয় যায় না। বলে—তুমি তো দেবে, কিন্তু তোমার মামা? তোমার মামাটাই যে আসল। তোমার মামা যে আমাকে মোটে দেখতে পারে না—

বুড়োবাবুকে অনেক কষ্টে বোঝায় সুরেন, অনেক করে মিষ্টি কথা বলে সান্ত্বনা দেয়। তবু যেন বুড়োবাবুর দুঃখ ঘোচে না।

বার বার বলে—কিন্তু তোমার মা-মণি মারা গেলে যে আমার কষ্ট হবে খুব বাবা, আমি কী করে থাকবো?

সুরেন বলে—আমি তো আছি, তোমার কিছু ভাবনা নেই—

বলে বটে সুরেন, কিন্তু মনটা বোঝে না। উকিলবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পথে এই কথাগুলোই বার বার মনে পড়েছিল। আশেপাশের কলকাতা সহরটার দিকে চেয়ে দেখে সুরেনের মনে হচ্ছিল এরা তো সবাই বেশ আছে। বেশ তো সবাই অফিসে যাচ্ছে, বাজার করছে, সিনেমা দেখছে। এদের মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না এদের কোনও যন্ত্রণা আছে, এদের কোনও সমস্যা আছে। এই সকালবেলা যেমন, বিকেল বেলাও তেমনি। একটা গানের জলসা হলে কী ভিড় হয়, ফুটবল খেলা যেদিন থাকে, সেদিন বাসে-ট্রামে আর জায়গা পাওয়া যায় না পা দেবার।

হাতীবাগানের বাজারের কাছে এসে গিয়েছিল সুরেন। গ্রে-স্ট্রীটের পূব-দিকে ফুটপাথের ওপর উঠতেই একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। সামনের দিক থেকে একজন মহিলা আসছিল সুরেনকে দেখেই একেবারে আচমকা ঘোমটা টেনে দিলে।

একটি মুহূর্ত! কিন্তু একটা মুহূর্তের মধ্যে সুরেনের আপাদমস্তক শিউরে উঠলো!

সুখদা না!

সুখদাও বোধহয় দেখেছিল তাকে। সুরেনকে দেখে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু সুরেন দেখে ফেলেছে ততক্ষণে।

ডাকলে—সুখদা!

সুখদার মাথায় ঘোমটা। মাথার ঘোমটাটা আরও টেনে দিলে সে। কিন্তু হাতে বাজারের থলি। থলির ভেতরে পুঁইশাক, কুমড়োর ফালি উঁকি মারছে।

সুরেন তবু আবার ডাকলে—সুখদা—

সুখদা আরো জোরে জোরে পূবদিকে চলতে লাগল। সুরেনের কেমন সন্দেহ হলো। ও সুখদা না হয়ে যায় না। শেষকালে এই দুর্দশা হয়েছে! নিজেই নিজের বাজার করতে বেরিয়েছে। সুরেনও পেছন পেছন চলতে লাগলো। কালীকান্ত তাকে এখানে এনে এত নীচে নামাবে এ তো সুরেন কল্পনাও করতে পারেনি।

বেলা বেশ বেড়েছে। উকিলের বাড়ি থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। ভুবনাথবাবুর বাড়ি থেকে ফেরবার এইটেই সোজা রাস্তা। গ্রে-স্ট্রীট দিয়ে কর্ণ-ওয়ালিশ স্ট্রীটে পড়ে সোজা উত্তরদিকের রাস্তা। এত দেরি করে বাজার করেছে, তারপর কখন রান্না করবে, আর কখন খাবে! এমনও হতে পারে যে কালীকান্ত কিছুই করে না। হয়ত সুখদাকেই পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে পেট চালাতে হয়। সকালবেলা অন্য লোকের বাড়ি কাজ করার পর এত বেলায় এখন সময় পেয়েছে। এখন রান্না করবে খাবে, তারপর একটু বিশ্রাম করে আবার বাসন মাজতে বেরোবে পরের বাড়ি।

সুরেন যত জোরে যাচ্ছে, সুখদাও তত জোরে জোরে আগে চলেছে।

তবে কি সুখদা তাকে দেখতে পেয়েছে? তাকে দেখেই লজ্জায় পড়েছে। তাই আর ধরা দিতে চাইছে না। কিন্তু এতেই কি লজ্জা বাঁচবে সুখদার? এতেই কি সুখদা তার ইজ্জৎ বাঁচাতে পারবে? যে মেয়ে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে পায়ের ওপর পা তুলে হুকুম করতো তরলাকে, আজ সেই মেয়েই ভাগ্যের ফেরে

ঝি-গিরি করতে রাস্তায় বেরিয়েছে, এও সুরেনকে চোখে দেখতে হলো।

কিন্তু কেন এমন হলো?

সুরেন নিজের মনেই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, এ কেমন করে হয়!

ছোটবেলা থেকেই মানুষের রহস্য দেখতে দেখতে কেমন অবাক হয়ে গেছে সুরেন। পৃথিবীর এ কী নিয়ম! কোনও নিয়ম না থাকাটাই কি সংসারের নিয়ম নাকি? সংসারের বাঁধা সড়কে চলতে চলতে হঠাৎ অজানিত ভাবে কখন যে কেমন করে বিপর্যয় আসবে, তা কি কেউ আগে থেকে জানতে পারবে না? অথচ আগে থেকে জানতে পারলে কত সুবিধে হতো। কত সাবধান হতে পারতো লোকে এই আকাশ, এই পৃথিবী, এই মানুষ—কোথাও তো সেই রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

একবার মনে হলো কেনই বা সে সুখদার পেছনে পেছনে যাচ্ছে। কিসের স্বার্থ তার। সুখদা তো তাকে বরাবর মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিতে চেয়েছে। মা-মণি তো সমস্ত সম্পত্তি থেকে সুখদাকে বঞ্চিত করতেই চেয়েছে। সুখদা যে চলে গেছে সুরেনের পক্ষে সে তো ভালোই হয়েছে। কেউ আর তার ভাগীদার রইল না। সে একাই পাঁচখানা বাড়ি, চব্বিশ কাঠা ফাঁকা জমি আর ব্যাঙ্কের টাকা আর হীরে, মুক্তো, সোনার গয়নার একমাত্র মালিক হয়ে রইল। এই তো বেশ! কেন সে আবার সুখদাকে তার ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে যাচ্ছে?

কে একজন লোক সামনে দিয়ে আসছিল, সুখদাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো তারপর হেসে কী যেন কথা বলতে গেল। লোকটার চেহারা দেখলেও ঘেন্না হয় সুখদাকে কী যেন বললে। কিন্তু সুখদা সেদিকে কান না দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

লোকটা কাছে আসতেই সুরেন আরো ভালো করে তাকালো তার দিকে। লোকটাও যেন কী সন্দেহ করেছে। সুরেনের দিকে সেও চেয়ে দেখলে একবার তাকিয়ে আবার যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগল।

সুরেনের প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা তাকে কিছু বলবে।

কিন্তু না, নিতান্ত সাধারণ গুন্ডা ধরনের লোক। সত্যিই ঘেন্না করে লোকটাকে দেখলে!

—একটা বিড়ি দাও তো হে!

চমকে উঠেছে সুরেন। তার কাছে কি বিড়ি চাইছে নাকি। কিন্তু না, পেছনে ফিরে দেখলে লোকটা বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানদারকে কথাটা বললে।

এদিকে সুখদা ততক্ষণে হন্ হন্ করে আরো দূরে এগিয়ে গেছে। বাঁ-দিকের ফুটপাথটা থেকে রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের ফুটপাথে গিয়ে উঠে চলতে লাগলো। এত দূরে থাকে সুখদা? এত দূর থেকে কি সুখদা বাজার করতে আসে?

একবার মনে হলো কী হবে সুখদার পেছনে পেছনে গিয়ে। কী লাভ হবে তার! সুখদা তো তার কেউ না।

—কী সুরেনবাবু, আপনি এদিকে?

সুরেন পাশ ফিরে চেয়ে দেখলে। চেনা-চেনা মনে হলো ভদ্রলোককে, কোথায় যেন দেখেছে! তারপর মনে পড়লো। স্যাকরা। মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে গয়না গড়াবার কাজে যেত মামার কাছে।

—এদিকে কোথায়?

সুরেন বললে—উকিলবাবুর বাড়ি—আপনি?

ভদ্রলোক বললে—আরে, আমার তো এইদিকেই দোকান। আপনার মামার কাছে হেঁটে হেঁটে হয়রান, সেই পাওনা টাকা তো এখনও পেলাম না।

—কীসের টাকা?

ভদ্রলোক বললে—সেই যে সেই বাড়িতে বিয়ে হবে বলে কুড়ি ভরির গহনা গড়িয়ে দিলুম, এখনও তো টাকা শোধ হলো না। সে বিয়ে হলো না বলে কি টাকাও বাকি পড়ে থাকবে?

সুরেন বললে—বাড়িতে মা-মণির খুব অসুখ চলছে এখন—

—অসুখ?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, সেই ডাক্তার ওষুধ আর উকিল-টুকিল নিয়েই মামা খুব ব্যস্ত। কত টাকা আপনার বাকি?

ভদ্রলোক বললে—দেড় শো টাকা এখনও পড়ে রয়েছে মশাই, আমিও আব কাজের চাপে যেতে পারি না। বার বার আর কত ঘুরবো!

সুরেন বললে—আচ্ছা আমি মামাকে বলবো এখন। আমি এখন চলি, আমার একটু কাজ আছে এদিকে—

ভদ্রলোক বললে—বলে দেবেন, বিনোদবাবু তাগাদা করছিলেন—

—বলবো—বলে সুরেন এগিয়ে যেতে লাগলো। ভাগ্যিস দেখতে পায়নি। দেখতে পেলেও বুঝতে পারেনি ঠিক। যে সুখদার গয়না তৈরির টাকা এখনও শোধ হয়নি, সেই সুখদাই যে আগে আগে চলেছে, তা বুঝতে পারেনি বিনোদ-বাবু। পারলে কী করতো কে জানে!

—চলি তাহলে, আমি একটু ব্যস্ত আছি—

বলে সুরেন হন্ হন্ করে এগিয়ে চলতে লাগলো। ততক্ষণে সুখদা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ঠিক কোনদিকে গেছে বুঝতে পারলে না। তবে কি কোনও গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ডানদিকে কয়েকটা গলি বেরিয়ে গেছে। বেশ রোদ উঠেছে চন্-চন্ করে! গিজ-গিজ করছে লোক চারদিকে। সুরেন এদিক-ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলো। কোথায় হারিয়ে গেল সুখদা? কোনদিকে গেল সে?

পাশের একটা গলির ভেতর ঢুকে সোজা যতদূর দেখা-যায় তাকিয়ে দেখতে লাগলো। কই, কোথাও তো নেই। তবে কোনও বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো?

সে গলি থেকে বেরিয়ে পাশের আর একটা গলির মধ্যেও ঢুকলো। সে গলিটাব দুদিকে কেবল বস্তি। কলকাতা সহরের মধ্যে এমন বস্তি ভাবা যায় না। ছাড়া-ছাড়া দু'একটা পাকা-বাড়িও আছে এদিক-ওদিক। সুরেন ভিড়ের ফাঁক দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখতে লাগলো। মনে হলো যেন দেখা গেল সুখদাকে। সুখদা যেন বাজাবের থলিটা নিয়ে একটা বস্তিঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

হন্ হন্ করে সুরেন বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

কয়েকটা চালা-ঘর। মাটির দেওয়াল। শান বাঁধানো রোয়াক, কয়েকটা ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে সেখানে খেলা করছে। সুরেনকে তারা লক্ষ্যও করলে না। দু'চারজন লোক ভেতর থেকে আসছে বেরোচ্ছে। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো দাঁড়িয়ে থাকতে। ভাবলে, কাউকে একবার জিজ্ঞেস করবে এ-বাড়িতে সুখদা বলে কেউ থাকে কি না। কিন্তু বড় লজ্জা করতে লাগলো।

—মিস্টার সান্ন্যাল!

হঠাৎ পিঠে একটা ধাক্কা লাগতেই সুরেন চেয়ে দেখলে। প্রজেশ সেন।

প্রজেশ সেন যতটা না অবাক হয়েছে, তার চেয়ে বেশী অবাক হয়ে গেছে সুরেন। এ সময়ে এখানে কেন প্রজেশ সেন? বেশ স্যুট, টাই, ট্রাউজার পরা চেহারা। অফিস যাবার পোষাক।

সুরেনের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি।

প্রজেশ সেন বললে—এদিকে কী মনে করে? এ বাড়ীতে কী?

সুরেন বললে—এই এমনি—

—এই এমনি মানে?

সুরেন বললে—আপনি এখানে কেন?

প্রজেশ সেন হাসতে লাগলো—ওই তো আমার বাড়ি—

দূরের একটা হাল-ফ্যাশানের দোতলা বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

—আপনি এখানে থাকেন বুঝি? আমি তো জানতাম না।

প্রজেশ সেন বললে—নতুন বাড়ী করেছি এই দু'বছর হলো।

সুরেন বললে—এখন কোথায় যাচ্ছেন?

প্রজেশ সেন বললে—অফিসে—

—আপনার গাড়ি?

প্রজেশ সেন বললে—গাড়িটা গলির মধ্যে আর ঢোকাইনি, সকালবেলা অফিসে গিয়েছিলাম, এখন এসে লাঞ্চ খেয়ে গেলাম।

সুরেন কথাটা ঘুরিয়ে নিলে। বললে—চলুন, আমিও বাড়ি যাবো—

বলে আবার বড় রাস্তার দিকে চলতে লাগলো।—সেদিন আপনি কী মনে করেছিলেন জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তার আগে জীবনে কখনও ড্রিঙ্ক করিনি—

প্রজেশ সেন একটা সিগারেট ধরালো। বললে—তা আমি বিশ্বাস করেছি—

সুরেন বললে—আসলে পমিলিরই দোষ পমিলি সেদিন আমাকে জোর করে ড্রিঙ্ক করিয়ে দিলে—

প্রজেশ সেন বললে—না, দোষ তারও নয়, দোষ আমারই, আমারই উচিত হয়নি ওখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়া—

সুরেন বললে—সত্যিই, কেন আপনি আমাকে নিয়ে গেলেন?

প্রজেশ সেন বললে—আমি ভাবতে পারিনি যে পমিলি ওই রকম ব্যবহার করবে। আর তাছাড়া, ও যে সেদিন ও-রকম মাতলামি করবে তাও বুঝতে পারিনি। তা পমিলিই কি আপনাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলে?

সুরেন বললে—না, সুকীয়া স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত গিয়েই পুণ্যশ্লোক-বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। পুণ্যশ্লোকবাবুকে চেনেন তো?

প্রজেশ সেন বললে—খুব চিনি। পুণ্যশ্লোকবাবুকে কে না চেনে!

সুরেন বললে—তিনি পমিলিকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেলেন, আর জগন্নাথ আমাকে গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিলে—

—আপনার গায়ে গন্ধ কেউ টের পায়নি তো?

সুরেন বললে—হয়ত টের পেত, কিন্তু হঠাৎ বাড়িতে গিয়ে দেখি, আমি যে-বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির মা-মণির খুব অসুখ, ডাক্তার এসেছে তখন, বাড়ি সুদ্ধু তখন সবাই খুব ব্যস্ত—

—যাক্, গন্ধ পেলে হয়ত খুব মুশকিল হতো।

সুরেন বললে—হ্যাঁ, মামা জানতে পারলে খুব বকাবকি করতো। বোধহয় নাকে একটু গন্ধ গিয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করেছিল আমার গা দিয়ে হোমিও-প্যাথিক ওষুধের গন্ধ বেরোচ্ছে কেন—

—তাই নাকি? হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গন্ধ?

বলে হো-হো করে হেসে উঠলো প্রজেশ।

সুরেন বললে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও নিয়ে আর বেশী দূর গড়ায়নি। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার মোড়ে। প্রজেশ সেন গাড়িটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছেন আপনাদের মা-মণি?

সুরেন বললে—এখনও সেই রকম। ডাক্তার দেখছেন। ওষুধও চলছে। ইন্‌জেকশান চলেছে—এখন তাই নিয়েই আমার মামা খুব ব্যস্ত। আমাকে উকিল এ্যাটর্নীর বাড়িতে যেতে হচ্ছে, আর আমাকেও খাটাচ্ছে—

—এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?

সুরেন বললে—আমি উকিলবাবুর বাড়ি থেকেই তো আসছিলাম—

প্রজেশ সেন বললে—উকিলের বাড়ি কোথায়?

সুরেন বললে—গ্রে স্ট্রীট—

প্রজেশ সেন বললে—গ্রে স্ট্রীটে তো এখানে বেশ্যাবাড়ির সামনে কী কর-ছিলেন?

—বেশ্যাবাড়ি?

সুরেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—বলছেন কী আপনি? বেশ্যাবাড়ি?

প্রজেশ সেন ততক্ষণে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েছে। বললে—রাত্তিরবেলা একবার এখানে এসে দেখবেন বেশ্যাবাড়ি কথাটা ঠিক বলেছি কি না। আমি সস্তা দামে জমি পেয়েছিলুম তাই বাড়িটা করেছি—

তারপর গাড়িটা ছাড়বার আগে বললে—আর একদিন আসবেন, কেমন, গুড বাই—

বলে গাড়িটা ধোঁয়া ছেড়ে চালিয়ে দিলে। আর সুরেন সেইখানে পাথরের মত চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বেশ্যাবাড়ি! সুখদা তবে কি...

মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ, বুকের ভেতরেও যেন সেই অসহ্য ঝাঁজ এসে লাগলো। মনে হলো কে যেন তার সমস্ত অন্তঃকরণটাই মুচড়ে দুমড়ে গুঁড়িয়ে ফেলছে। খানিকক্ষণের জন্যে তার সমস্ত সংবিৎ হারিয়ে গেল। বেশ্যাবাড়ি! সুখদা কি তাহলে এতদূরে এত নিচে নেমেছে!

সুরেন আর দাঁড়াতে পারলে না।

আবার গলিটার ভেতরে ঢুকলো। সুখদাকে এত নিচের নামতে দেওয়া হবে না। সে গিয়ে দেখা করবে সুখদার সঙ্গে। বেশ্যাবাড়িই হোক আর নরকই হোক, সে সেখানে যাবেই। যদি দেখা করতে না চায় তো জোর করে তার সঙ্গে দেখা করবে। তাড়িয়ে দিলে ঝগড়া করবে। তবু ওখান থেকে সুখদাকে সে মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে এনে তুলবে।

সুরেন হন্ হন্ করে আবার বস্তি বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তখনও শান বাঁধানো রোয়াকের ওপর খেলা করছে। একজন বুড়ি মতন মেয়েমানুষ ভেতর থেকে বাইরের দিকে আসছিল।

সুরেন তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বলতে পারেন, সুখদা এই বাড়িতে থাকে?

দিন-দুপুরে এমন করে কেউ এ-বাড়িতে এ-প্রশ্ন করে না। এ-পাড়ার এ নিয়ম নয়। তাই মহিলাটি একটু অবাক হয়ে গেল।

বললে—সুখদা? হ্যাঁ, থাকে—

তারপর সেখানে দাঁড়িয়েই মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে ডাকলে—সুখদা, ওলো ও সুখদা, তোরে কে ডাকে, দ্যাখ্—

ভেতর থেকে আর একজন মেয়ের গলার আওয়াজ এল—যাই মাসি—

বলে যে মেয়েটা এসে সামনে দাঁড়ালো তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সুরেন। এ তো সুখদা নয়!

সুরেনের মনে হলো বোধহয় নাম ভুল শুনেছে।

বললে—আমি সুখদাকে খুঁজছিলাম।

মাসি বললে—তা এরই নাম তো সুখদা গো! কী লো, তোর নামই তো সুখদা রে?

মেয়েটা খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। বোধহয় সংসারের কাজ-কর্ম করছিল সে। কাজ করতে করতেই উঠে এসেছে। হাতে তখনও হলুদের দাগ, ছেঁড়া শায়া, উস্কোখুস্কো খোঁপা, সারা শরীরে রাত জাগার চিহ্ন।

সুরেন বললে—আপনি না। অন্য একজনকে দেখেছি আমি—

—কাকে তুমি দেখেছ বাছা কে জানে, আমার বাড়িতে তো অনেক মেয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। সুখদা তো এরই নাম, আর কোনও সুখদা নেই—

সুরেন বললে—কিন্তু এখনই একজন যে বাজার করে নিয়ে এল—

—বাজার করে নিয়ে এল?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, হাতীবাগান বাজার থেকে বাজার করে এনে এই এখুনি ঢুকলো।

মাসি বললে—তুমি একটু দাঁড়াও, আমি দেখছি বাছা।

বলে ভেতরে ঢুকে গেল। সুখদা নামে মেয়েটাও মুচকি হেসে পেছন পেছন ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরেনের লজ্জা করছিল এখানে এইভাবে দিনের আলোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে। এরা কী ভাবছে কে জানে! হয়ত ভাবছে এ-বাড়ির কোনও মেয়েকে রাস্তায় দেখে তার পছন্দ হয়ে গেছে! তাই তাকে অনুসরণ করে পেছন-পেছন এসেছে।

খানিক পরেই মাসি একটা মেয়েকে নিয়ে এল সঙ্গে করে। বললে—এই যে এই-ই এখন বাজার করে নিয়ে এসেছে। একে চিনতে পারছো?

মেয়েটা তখন মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে।

মাসি বললে—কাপড় সরা না মা মুখ থেকে, দেখবে কী করে!

মেয়েটা মুখের কাপড় সরালো, কিন্তু হাসি চাপতে পারলে না। হাসি চাপতে গিয়ে একটা টোল পড়ে গেল গালে।

মাসি বললে—এর নাম তো বাছা কালী!

কালী! সুরেন নাম শুনে অবাক হয়ে গেল। কালী ঠাকুর দেবতার নাম হয় কিন্তু মেয়েমানুষের নাম আব্বার কালী হয় নাকি! হয়ত গায়ের রঙ কালো বলে বাপ-মা ওই নাম রেখেছে!

মাসি আবার বললে—বাজারের রাস্তায় তুমি তো একেই দেখেছ?

সুরেন কী বলবে বুঝতে পারলে না। পেছন থেকে দেখা, হয়ত তারই ভুল

হয়েছে। হয়ত এই মেয়েটাকে দেখেই সুখদা বলে ভুল করেছে।

--ঘরে বসবে এখন?

সুরেন ভয়ে যেন দু'পা পিছিয়ে এল। বললে—না না, এ অন্য লোক। আমি ভুল দেখেছিলাম—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। ভূত দেখার মত সেখান থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা গ্রে স্ট্রীটের প্রশস্ত রাস্তার মধ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আশ্চর্য, এমন ভুলও হয়! এমন করে সুখদার খোঁজে যে ওই বস্তির মধ্যে যেতে পারে—এ তার কী অধঃপতন! সুখদা তার কে যে, তাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে! যদি ধরা যাক সুখদার সঙ্গেই তার দেখা হতো, কী করতো সে! কী বলতো তাকে? কেন তবে সুখদার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তার এত আগ্রহ? সে কেমন করে কল্পনা করতে পারলে যে সুখদা শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে বাজার করছে, শেষ পর্যন্ত নোংরা বস্তির নর্দমায় এসে নিজের জীবনের খেয়া লাগিয়েছে? বড় জোর হয়ত সুরেন জিজ্ঞেস করতো—কেমন আছ তাই দেখতে এলাম—

সুখদা বলতো—তুমি তো সব সম্পত্তির মালিক হয়েছ, এখন আর আমার সঙ্গে তোমার কীসের দরকার?

সুরেন বলতো—আমি কি সম্পত্তির জন্যেই ও-বাড়িতে ছিলাম?

সুখদা হয়ত বলতো—তুমি না চাও, তোমার মামা তো তাই-ই চাইতো?

সুরেন বলতো—আমার মামার অপরাধে তুমি আমাকে অপরাধী করবে?

সুখদা বলতো—তা তোমার মামা আর তুমি কি আলাদা?

—আলাদা নই?

সুখদা হয়ত বলতো—না, আলাদা নও, যদি আলাদা হতে তো কবে তুমি ও-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। পাস করে চাকরি করতে। অন্ততঃ চাকরির জন্যে চেষ্টাও করতে!

সুরেন বলতো—তুমি তো বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করলে বলতুম চাকরির জন্যে আমি অনেক চেষ্টা করছি—

—ছাই চেষ্টা করছো! আমি কিছু জানি না মনে করো?

—তুমি কী জানো?

সুখদা হয়ত বলতো—তুমি মদ খাও তাও আমি জেনেছি। সে টাকা কোত্থেকে আসে শুনি?

ভাবতেই সুরেনের কান দুটো গরম হয়ে উঠলো। একে মাথার ওপর রোদ, তার ওপর সুখদার চিন্তায় যেন সমস্ত শরীরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই সুখদা সব শুনেছে। কালীকান্তবাবুর কাছে সবই শুনেছে। কালীকান্ত নিজে নেশাখোর মানুষ, হয়ত সুরেনের নেশা করার কাহিনীটাও বাড়ীতে এসে শুনিয়েছে।

হঠাৎ পেছন থেকে মোটরের একটা তীব্র হর্ণের শব্দ শুনে চমকে উঠেছে সুরেন। আর একটু হলেই অন্যমনস্ক অবস্থায় গাড়ি চাপা পড়ে যেত সে।

পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভার চিৎকার করে গালাগালি দিয়ে গেল।

—কালা নাকি? হর্ণের আওয়াজ শুনতে পান না? এক্ষুনি যে গাড়ীর চাকার তলায় পড়ে পিলে ফেটে যেত—

সুরেনের মুখ দিয়ে কোনও উত্তর বেরোল না। সে রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে এসে উঠলো।

পুণ্যশ্লোকবাবু চিরকাল একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন চালিয়ে এসেছেন। সে আকাঙ্ক্ষাটা হলো একদিন তিনি গণ্যমান্য হবেন। হয়ে সকলের মাথায় উঠে বসে থাকবেন। পয়সা চিরদিনই ছিল। সেটা পৈতৃক পয়সা। পয়সার লোভ একদিন-না-একদিন মানুষের মেটে। কিন্তু যারা সত্যিকারের বড় হতে চায় তারা ক্ষমতা চায়। পয়সার লোভের চেয়ে ক্ষমতার লোভ আরো বেশি মারাত্মক। সেই ক্ষমতা তিনি তখন পেয়েছেন। ক্ষমতা পেলেই মনে হয় আরো ক্ষমতা কী করে আসবে! একটার পর একটা ক্ষমতা। এমন ক্ষমতা চাই যা পেলে লোকে আমার পায়ের কাছে বসে ধরনা দেবে। বলবে—আপনি দেবতা, আপনি আমার হর্তা-কর্তা-বিধাতা—

তা সেই ক্ষমতাই পেয়েছেন পুণ্যশ্লোকবাবু!

আর সেই ক্ষমতার ময়ূর-সিংহাসনে বসেই তিনি প্রতিদিন ক্ষমতা জাহির করেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ক্ষমতা পুরোন আমলের মত চিরস্থায়ী নয়। এ ক্ষমতার মেয়াদ পাঁচ বছরের। সেই পাঁচ বছর পরে সে-ক্ষমতা বজায় থাকবে কিনা তাও ভাবতে হয়। আর সেই জন্যেই দু'-চার-দশজনকে ক্ষমতার ছিঁটে-ফোঁটা বিলোতে হয়।

প্রজেশ সেন এমনি এক মানুষ। বহুদিন আগে পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছে এসেছিল আরো অসংখ্যের মধ্যে একজন হয়ে। পুণ্যশ্লোকবাবুর প্রথম ভোটের সময় অমানুষিকভাবে খেটেছিল সে। ভোট হয়ে যাবার পর যার যা পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে চলেও গিয়েছিল। কেউ পেয়েছিল টাকা, কেউ পেয়েছিল সামনে বসবার অধিকার, কেউ পেয়েছিল মুখের হাসি। সেবার দু' হাতে টাকা বিলিয়ে-ছিলেন তিনি। এক-একটা ভোটে বহু টাকা খরচ হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম পঞ্চাশ-হাজার, ষাট-হাজারে খরচ কুলিয়ে যেত। তারপরের বছর একটু বাড়লো। বেড়ে হলো প্রায় এক লাখের কাছাকাছি।

কিন্তু প্রজেশ কিছুই চায়নি কোনও দিন।

প্রজেশের হাত দিয়েই হাজার-হাজার টাকা ভোটের সময় খরচ হয়েছে। মিথ্যে ভোটের জন্যে সোনাগাছি থেকে যখন মেয়েমানুষ ভাড়া করে আনতে হয়েছে, তখন তাদের মাথা পিছু দশ টাকা করে দিতে হয়েছে। এ-সব খরচের কোনও হিসেব থাকে না কোথাও। কেউ হিসেব চায়ও না। সবাই জানে ওর হিসেব নিতে নেই। তাহলে আর পরের বারে কেউ ভলান্টিয়ারি করবে না।

কিন্তু প্রজেশ প্রতিবারই এসে হিসেব দিয়ে গেছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করেছেন—এ কীসের টাকা?

প্রজেশ বলেছে—কালকের নাম্বার টেন ওয়ার্ডের খরচার অ্যাকাউণ্ট—

—নাম্বার টেনের কী হয়েছিল?

—ওখানকার বস্তির লোকদের পার-হেড পাঁচ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পুণ্যশ্লোকবাবু টাকাটা গুণলেন। বললেন—ও—

প্রজেশ বললে—লোক কম ছিল বলে টাকাটাও বেঁচে গেল!

পুণ্যশ্লোকবাবু টাকাগুলো প্রজেশের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন—

এগুলো তোমার কাছেই রাখো, আরো তো খরচ আছে—

প্রজেশ নেয়নি সে-টাকা। বলেছে—দরকার থাকলে কালকেই আবার নেব, এখন আপনার কাছেই রেখে দিন—

সাধারণতঃ এমন এ্যাসিস্টেণ্ট বড় একটা পাওয়া যায় না। টাকা নিয়ে হিসেব দেয় এমন ভলাণ্টিয়ার এর আগে জীবনে দেখেননি পুণ্যশ্লোকবাবু। টাকা যারা যে-বাবদ নেয়, তারা সেই বাবদেই নেয়, বাকিটা আর কখনও ফেরত দেবার নাম করে না। তিনিও তার আর হিসেব চান না।

কিন্তু প্রথম ব্যতিক্রম হয়েছিল প্রজেশ সেন। আর ব্যতিক্রম বলেই সে পুণ্য-শ্লোকবাবুর অত প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিল। তারপর যা হয়, কাজে-কর্মে প্রজেশেরই ডাক পড়তো পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছে। নতুন একটা পোস্ট খালি হলেই পুণ্যশ্লোকবাবুর প্রজেশের কথা মনে পড়তো।

বলতেন—তুমি কী করো প্রজেশ?

প্রজেশ সেন বলতো—আমি আর কী করবো পুণ্যদা, ভ্যারেণ্ডা ভাজি—

হাসতেন পুণ্যশ্লোকবাবু। বলতেন—ভ্যারেণ্ডা ভাজি মানে?

প্রজেশ বলতো—কাজকর্ম পেলে তো করবো!

—কাজ-কর্ম করবে না কণ্ট্রাকটারি করবে?

—কণ্ট্রাকটারি মানে?

—ধরো কংগ্রেসের তো অনেক কনফারেন্স-টনফারেন্স হয়, সেখানে হাজার হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। ধরো টিউব-ওয়েলের কণ্ট্রাক্ট কিংবা প্যাণ্ডেলের কণ্ট্রাক্ট, ওতে অনেক টাকা লাভ থাকে—

প্রজেশ বলতো—আমি আপনার কাছে কিছু চাই না, শুধু আপনার সেবা করতে দিন—

এক চালেই কাজ হলো কিন্তু। পুণ্যশ্লোকবাবু তখন থেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করলেন পুরোপুরি। তখন থেকেই তাঁর বাড়িতে প্রজেশ সেনের অবাধ গতিবিধি। বাড়িতে কোনও পার্টি দেবেন পুণ্যশ্লোকবাবু, কে তার যোগাড়-যন্তর করবে? প্রজেশ সেন। প্রজেশ সেন না হলে পুণ্যশ্লোকবাবুর এক দণ্ড চলে না। শুধু পুণ্যশ্লোকবাবু নয়, পুণ্যশ্লোকবাবুর মেয়েরও চলে না।

সেই সূত্রেই পর্মিলি বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল প্রজেশ সেনের। সত্যিই তখন ভালো ছেলে ছিল প্রজেশ সেন। প্রথম দিকে প্রজেশ এখানে এসেছিল দেশের কাজ করতে। পুণ্যদার কাজ করা মানেই দেশের কাজ করা। পুণ্যদাকে যদি কেউ সভা-সমিতিতে নেমন্তন্ন করতে চাইতো তো প্রজেশ সেনকে ধরলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে যেত। বলতে গেলে আগে প্রজেশ সেন ছিল এক কথায় পুণ্যশ্লোকবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি। প্রজেশ সেনের কাছে পুণ্যশ্লোকবাবুর এ্যাপয়েণ্টমেণ্টের খাতা থাকতো। সে জানতো কবে কোথায় কোন মিটিং-এ সভাপতিত্ব করতে হবে পুণ্যদাকে।

আর শুধু কি তাই?

পুণ্যশ্লোকবাবু বলতেন—পর্মিলির দিকটাও তুমি একটু দেখো প্রজেশ, আমি তো সব সময়ে বাড়িতে থাকতে পারছি না—পর্মিলি রয়েছে, সুব্রত রয়েছে, ওরা দু'জনেই তো ছোট—

সত্যিই তখন পর্মিলি আর সুব্রত দু'জনেই ছোট। বাড়িতে মা নেই, চাকর-ঝি'র রাজত্ব। একবার ছ' সপ্তাহের জন্যে পুণ্যশ্লোকবাবু গেলেন কণ্টিনেণ্টে।

মিনিষ্টার হিসেবে এমন সব কন্ফারেন্সে যেতে হয়। ছ' সপ্তাহ। কম দিন নয়।

যাবার আগে প্রজেশকে বললেন—তোমাকে সব ভার দিয়ে গেলুম প্রজেশ, ওদের দেখো তুমি—

প্রজেশ বললে—আপনি কিছু ভাববেন না পুণ্যদা, আমার ওপর ভার ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি রোজই আসবো, ওদের দেখে যাবো।

—কিন্তু ওরা দু'জনে খুব ঝগড়া করে, তুমি সামলাতে পারবে তো? বাড়িতে ওদের মা নেই, বুঝতেই তো পারছো—

প্রজেশ বললে—খুব সামলাতে পারবো। আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন!

—তার চেয়ে এক কাজ করো না! তোমার তো কেউ নেই, তুমি ছ' সপ্তাহের জন্যে আমার বাড়িতে এসেই ওঠো না।

প্রজেশ বললে—আপনি যদি বলেন তো তাও করতে পারি—

—তা সেই-ই ভালো!

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হলো। আগে যাও-বা দূরত্বটুকু ছিল সেটুকুও ঘুচে গেল সেবার থেকে। প্রজেশ একেবারে ঘরের ছেলে হয়ে গেল। পুণ্যদাকে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে প্রজেশ এসে উঠলো একেবারে পুণ্যশ্লোকবাবুর সুকীয়া স্ট্রীটের বাড়িতে। প্রজেশ একাকার হয়ে গেল, একীভূত হয়ে গেল পর্মিলি আর সুব্রতদের সঙ্গে। একেবারে টেম্পোরারি গার্জেন হয়ে গেল।

পুণ্যশ্লোকবাবু যখন ফিরে এলেন, তখন দেখলেন কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেনি তাঁর সংসার পরিচালনায়। বেশ নিশ্চিন্তে নিরাপদে সব দৈনন্দিন কার্য নির্বাহ হয়ে গিয়েছে। খরচও বেশি হয়নি। প্রজেশ বেশ হিসেব করেই খরচ করেছে, খরচের একটা হিসেবও রেখেছে—

—এ-টাকাটা কীসের?

প্রজেশ বললে—আজ্ঞে এই টাকাটা বেঁচে গেল—

যারা নগদ লাভ চায় তারাই ছিঁচকে চুরি করে, কিন্তু প্রজেশ তো ছিঁচকে চোর নয়। তার উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যশ্লোকবাবুর সেবা করে দেশের সেবা করা। পুণ্যশ্লোকবাবুর ওপরে তার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সে দেখেছিল পুণ্যশ্লোকবাবু দেশের সেবায় সংসার, ছেলেমেয়ে কিছুই দেখতে সময় পাচ্ছেন না। সেই ক্ষতিটুকু সে পূরণ করে দিয়ে মানসিক আনন্দ পেত। পুণ্যশ্লোকবাবুর অত টাকা, অমন মেয়ে, অমন ছেলে, তাদের সুখ দেখে প্রজেশের মনে কখনও ঈর্ষা জাগেনি। লোভও হয়নি কখনও। কখনও মনে হয়নি এত টাকা আমার হলে ভালো হতো!

কিন্তু গোলমালটা করে দিলে পর্মিলি।

পর্মিলি তখন কন্ভেণ্টে পড়তো। পিয়ানো শিখতো মেমসাহেবের কাছে। বিলিতি সিনেমা দেখতো। এমন মেয়ের তদারকি করা যার-তার কর্ম নয়। কিন্তু সে পরীক্ষাতেও সে উতরে গেল। আর তারই ফাঁকে যে সে পর্মিলির হাতের পুতুল হয়ে গেছে তা সে টের পায়নি। একেবারে কেনা গোলাম।

পুণ্যশ্লোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ওরা ঝগড়া-টগড়া করেনি তো?

প্রজেশ বললে—করেছে, কিন্তু আমি সব সামলে নিয়েছি—

—লেখাপড়া করেছে ঠিক?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, আমি নিজে তো হাজির থাকতুম সব সময়ে—

—পর্মিলির আবার সিনেমার নেশা আছে। যার-তার সঙ্গে সিনেমায় যায়নি তো?

প্রজেশ বললে—আমি নিজে পর্মিলিকে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছি—

—তাহলে বাড়ি ফিরতে বেশি রাত করতো না ওরা?

প্রজেশ বললে—না না, তাহলে আমি ছিলাম কী করতে?

সিনেমা ফেরত যে পর্মিলি প্রজেশকে নিয়ে বার-এ যেত সে কথাটা আর বললে না প্রজেশ। বার-এ গিয়ে পর্মিলি যে প্রজেশকে ড্রিংক করতে শিখিয়েছে সেটাও বললে না। বললে না যে, পর্মিলিকে সামলাতে পাবে এমন ছেলে কলকাতা সহরে এখনও জন্মায়নি। আরো বললে না, পর্মিলি যে শুধু নিজেই ডুবেছে তা নয়, প্রজেশকেও ডুবিয়েছে।

—তা তুমি একটা চাকরি নেবে?

—চাকরি?

চাকরির কথা শুনে প্রজেশ সেন যেন একটু হকচকিয়ে গেল। যে প্রজেশ সেনকে সবাই পুণ্যশ্লোকবাবুর পি-এ বলে জানে এবং পি-এ বলে সবাই খাতিরও করে, এখন চাকরি নিলে কি তার সেই খাতির থাকবে? আর রাইটার্স বিল্ডিং-এর চাকরি আসা যেমন সহজ, যাওয়াও তো তেমনি। পুণ্যশ্লোকবাবু এখন না হয় মিনিষ্টার আছেন। কিন্তু যখন থাকবেন না? মিনিষ্টারের লোক, মিনিষ্টার চলে গেলে তো তাঁর লোককেও চলে যেতে হয়। আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপের মতন ও তো একদিনকা সুলতানের রাজত্ব।

পুণ্যশ্লোকবাবু বুঝিয়ে দিলেন। বললেন—রাইটার্স বিল্ডিং-এর চাকরি নয়, প্রাইভেট একটা ফার্মের—

প্রজেশ সেন বললে—আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন, আমি কী বলবো—

তা সেই-ই হলো প্রজেশের চাকরি। বোম্বাই-এর নতুন একটা ফার্ম কলকাতায় একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুললো। সেখানকার পাবলিক রিলেশনস্ অফিসারের পোষ্ট! তারা ওয়েষ্ট বেংগল গভর্ণমেণ্টের মোটা টাকার অর্ডার পেয়েছে পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছ থেকে। পুণ্যশ্লোকবাবুকে কৃতার্থ করে তারা নিজেরা কৃতার্থ হবে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—চাকরি করতে পারবে তো?

প্রজেশ সেন বললে—আপনি আশীর্বাদ করলে নিশ্চয়ই পারবো—

সেই তখন থেকে সেই চাকরিই করে আসছে প্রজেশ সেন। সেই চাকরিই বড় হতে হতে আরো বড় হয়েছে। কোম্পানী যত বড় হয়েছে, চাকরিতে মাইনেও তত বেড়েছে। পর্মিলির সংগে ঘনিষ্ঠতাও তত বেড়েছে। আর বেড়েছে মদ খাওয়া। ওটা সংগ দোষ। প্রথমতঃ পর্মিলি, তার পর আছে পার্টি। পার্টি তার লেগেই আছে। পাবলিসিটির লাইনে পার্টি দেবার লোকের অভাব নেই। মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দেবার মালিক বলে সবাই খাওয়াতে চায়। আর খাওয়া মানেই মদ খাওয়া। মদ না খেলে পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার হিসেবে তুমি অচল, অকেজো। যত তুমি ড্রিংক করবে তত তুমি স্মার্ট, তত তুমি এফিসিয়েণ্ট!

এমনি করে করে একটা বাড়িও করে ফেললে প্রজেশ এই কলকাতা সহরেব বুকে। তারপর একটা গাড়িও হলো। তাহলে বাকি বইল কী? বউ।

পর্মিলিকে বউ করার মত ভাগ্য আর কারোর আছে কিনা জানা নেই, কিন্তু প্রজেশ সেন বেচারি জানে তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে। তাই অফিস থেকে ফেরার সময় কখনও এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকে কোনও রেষ্টুরেণ্টে, কোনও দিন থাকে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে। মাঝে মাঝে তাই প্রজেশ সোজা

সুকীয়া স্ট্রীটেই চলে আসে।

সেদিনও প্রজেশ সেন অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা সুকীয়া স্ট্রীটের বাড়িতে এসে গাড়িটা ঢোকালো। গাড়িটা একপাশে রেখে বাগানের রাস্তা দিয়ে ভেতরের কোরিডোরে একেবারে সোজা পুণ্যশ্লোকবাবুর বৈঠকখানার দিকে গেল। পুণ্যশ্লোকবাবু থাকুন আর না থাকুন, পুণ্যশ্লোকবাবুর মুহুরী হরিলোচন-বাবু বাসর জাগিয়ে বসে থাকে। টেলিফোন এলে রিসিভারটা ধরে। চিঠিপত্র-গুলো গুছিয়ে রাখে। এইটুকুই হরিলোচনের কাজ। বুড়ো মানুষ। বাবু যখন ওকালতি করতেন, তখন থেকেই মুহুরী হয়ে আছে।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে প্রজেশ সেন অবাক হয়ে গেল।

শুধু পুণ্যশ্লোকবাবু নয়, সুরেনও সামনে বসে আছে।

এমন সময় সাধারণতঃ পুণ্যশ্লোকবাবু বাড়িতে থাকেন না। প্রজেশকে দেখেই বললেন—কে? প্রজেশ? এসো এসো—তুমি একে চেনো?

এও যেন এক যোগাযোগ। সুরেন ভাবেনি এমন করে এখানে মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

প্রজেশ বসলো। বললে—আমি চিনি একে পুণ্যদা—

—তুমি চেনো?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, আমি চিনি—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সুব্রতর বন্ধু। এও কংগ্রেস মাইনডেড্, এ একটা সমস্যায় পড়েছে বড়।

—কি সমস্যা?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সমস্যা এমন কিছুই নয়, কিন্তু ওর কাছে এক মহা সমস্যা। সেদিন রাত্রে পর্মিলির সঙ্গে এক-গাড়িতে আসছিল। পর্মিলি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তা আমিই ওকে আসতে বলেছিলুম আজকে—

তারপরই যেন লেকচার দেবার স্পৃহা জাগলো। লোক দেখলেই পুণ্যশ্লোক বাবুর মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেবার স্পৃহা জেগে ওঠে। ওটা স্বভাব। তিনি দেশের জন্যে কী কী করেছেন, অথচ দেশের জন্যে এত স্বার্থ ত্যাগ না করলে তিনি ওকালতিতে আরো নাম করতে পারতেন। আরো টাকা উপায় করতেন।

বললেন—তোমরা আজকালকার ছেলে, দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থটাই বড় করে দেখো। কিন্তু তোমরাও তো এই দেশেরই মানুষ? নিজেদের স্বার্থটাই তোমাদের কাছে এত বড় হলো? দেশটা কিছুই নয়?

প্রজেশ বললে—জানেন পুণ্যদা, আজকাল দেখেছি কংগ্রেসকে গালাগালি দেওয়া একটা ফ্যাশান হয়ে উঠেছে! যত ইয়াংম্যান সবাই এ্যাণ্টি-কংগ্রেস হয়ে উঠেছে—

পুণ্যশ্লোকবাবু হাসলেন, বেশ বিজ্ঞের হাসি। বললেন—এককালে একটা ফ্যাশান ছিল ব্রাহ্ম হওয়া। এখন কেউ আর ব্রাহ্ম হয়?

প্রজেশ বললে—ঠিক বলেছেন পুণ্যদা, এখন ব্রাহ্ম বলে আর কোনও আলাদা জাতই নেই—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি বলে রাখছি, তোমরা দেখে নেবে প্রজেশ একদিন কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও পার্টিই থাকবে না ইণ্ডিয়াতে। এই এতক্ষণ সেই কথাই বলছিলাম সুরেনকে। এরাই তো ইয়াং জেনারেশন, কংগ্রেসের হিস্ট্রিটা এদের জানা উচিত—

সুরেন বললে—আমি কিছু কিছু জানি—

—ছাই জানো! তোমরা শুধু জানো লেনিন আর কার্ল মার্কস্! কেবল তাদের কীর্তি-কলাপই তোমরা মুখস্থ করো। গোখেলের নাম শুনেছ? বলি গঙ্গাধর তিলকের নাম শুনেছ? বিপিন পালের নাম শুনেছ? শুনেছ কেবল সুভাষ বোসের নাম আর মহাত্মা গান্ধীর নাম। কিন্তু কংগ্রেসের পেছনে কত লোক কত স্বার্থ ত্যাগ করে গেছেন, তার হিসেব তোমরা রেখেছ কখনও? জানতে চেয়েছ কাদের সর্বস্ব ত্যাগের বদলে আমাদের এই স্বাধীনতা এসেছে? বলো, জানতে চেয়েছ?

সুরেন চুপ করে রইল। খানিক পরে বললে—এ-সম্বন্ধে কোনও বই আছে?

—আরে এর আবার বই কি! আমার কাছেই শুনতে পারো। আমরা সব দেখেছি সব জেনেছি, আমরা কত স্বার্থ ত্যাগ করেছি কত ভুগেছি সে-সব কথা কেই বা জানতে চাইছে, আর কে-ই বা তা নিয়ে বই লিখছে! যদি তোমরা শুনতে চাও তো আমিই তা শোনাতে পারি। সেই সব নিয়ে তুমিই একদিন বই লিখতে পাবো।

—আমি বই লিখবো?

পুণ্যশ্লোকবাবু জোর দিয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, তোমরাই তো বই লিখবে। আমি সামনে জীবন্ত ইতিহাস থাকতে তোমরা বই লিখবে না তো কে আবার বই লিখবে? আমেরিকা থেকে লোক এসে আমাদের ইতিহাস লিখে দেবে? এখন ঠিক করো তুমি কোন কাজটা করবে। যেমন চাকরি করছে সবাই, তেমনি একটা ছোটখাটো চাকরিও করতে পারো। চেষ্টা করলে তা আমি তোমাকে করে দিতেও পারি। সেটা এমন কিছু মহৎ কর্ম নয়। কিন্তু যদি কাজের কাজ করতে চাও তো আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখো।

প্রজেশ সেন বললে—এটা পুণ্যদা আপনারই করা উচিত। কারণ আপনি সব জানেন, গোড়া থেকে আপনি সব দেখেছেন—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমার সময় কোথায় বলো, আমি কাজ করবো না বই লিখবো—

প্রজেশ সেন বললে—তা বললে ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না পুণ্যদা। আজ থেকে একশো বছর পরে তখনকার লোকদের স্বার্থের কথা ভেবে আপনার এটুকু করা উচিত—

– সে আমি করাও যা, অন্য লোকের করাও তাই। বরং যদি এই সুরেনের মত কেউ লেখে তাহলে জিনিসটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। ওর বয়েস কম খাটতে পারবে। আর আমি তো রইলুমই। আমি মাঝে মাঝে ওকে হেলপ্ করবো।

প্রজেশ সেন বললে—এ তো খুব ভালো কথা পুণ্যদা। তাই ভালো, মিস্টার সান্ন্যাল আপনার গাইডেন্স্ নিয়ে লিখতে আরম্ভ করুক। আপনি ডিকটেশান দেবেন আর উনি পয়েন্টস্ লিখে নেবেন—

সুরেন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এসেছিল একটা চাকরির কথা বলতে। পুণ্যশ্লোকবাবু সেদিন তাকে আসতে বলেছিলেন। চারদিক থেকে যখন সমস্যাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাকে গ্রাস করতে আসছিল তখন এখানে আসা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু তাকে এমন অদ্ভুত প্রস্তাবের যে মুখোমুখি হতে হবে তা সে ভাবেনি। এত লোক থাকতে তাকেই বা কেন নির্বাচিন করা হলো তাও সে বুঝতে পারলে না।

ভয়ে ভয়ে বললে—কিন্তু আমি তো ও-সব কখনও করিনি। আমার তো

লেখা অভ্যেস নেই—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ওই তো তোমাদের এ-যুগের ছেলেদের দোষ সব কাজই পারবো না বলে ধরে নেওয়া। দেখে এসো তো ইংলণ্ডে গিয়ে আমেরিকায় গিয়ে, জার্মানীতে গিয়ে, জাপানে গিয়ে। তারা কত স্মার্ট, কত তাদের ইনিশিয়েটিভ। সাধে কি আর তাদের দেশ অত বড়, সাধে কি আর দু'শো বছর ধরে আমরা সাহেবদের আণ্ডারে ছিলাম!

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—এই যে প্রজেশ। প্রজেশকে দেখছ তো। আমার হাতে গড়া ছেলে। ওকে...

প্রজেশ বলে উঠলো—পুণ্যদা, আমার কথা বলবেন না আর, আমার আর কিছু হলো না। চাকরি নিয়ে আমি একটা আস্ত গাধা হয়ে গিয়েছি।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ও-কথা বলছো কেন তুমি প্রজেশ? তুমি কত কাজ করেছ তা কি কেউ জানে না। যেবার রাজাগোপালাচারীজী গভর্ণর হয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন, আমি পার্টি দিয়েছিলুম একটা, সে পার্টি কে সামলালো? তুমিই তো!

সুরেন বললে—আমি তো গ্রামের ছেলে--

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—গ্রামের ছেলেই তো আমাদের চাই হে। গ্রামের ছেলেরাই কংগ্রেসের কাজে বেশি করে লাগা চাই। সহরে আর ক'টা লোক। ইণ্ডিয়ার নাইনটি-পার্সেণ্ট লোক তো গ্রামেই থাকে। তাদের সুখ-দুঃখ আমাদের বুঝতে হবে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা আমাদের লাঘব করতে হবে। নইলে শুধু একটা মিনিষ্টার হয়ে কী লাভ? না নিজের না দেশের, কারোরই কিছু লাভ নেই।

হঠাৎ একটা গাড়ির আওয়াজ হলো পোর্টিকোর তলায়।

—আসুন, আসুন গোয়েংকাজী—আসুন!

পুণ্যশ্লোকবাবু একেবারে অভ্যর্থনায় বিগলিত হয়ে গেলেন। অবাঙালী ভদ্রলোক। কিন্তু আগাগোড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি, ধুতি। সঙ্গে আরো দু'জন ভদ্রলোক। দেখে মনে হলো তারা ভদ্রলোকের মোসাহেব। সুরেনের কেমন যেন মনে হতে লাগলো, এতক্ষণ যত কথা হচ্ছিল সব যেন শুকনো উপদেশ। এবার যেন পুণ্যশ্লোকবাবুর আপনজন ঘরে ঢুকলো।

গোয়েংকাজী একবার দেখলেন সুরেনের দিকে। তারপর সবচেয়ে মাঝ-খানের চেয়ারটায় নিজের আসন করে নিলেন। যেন তাঁর জন্মগত অধিকার সেখানেতে। এমন ভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন খুব হৃদ্যতা।

পুণ্যশ্লোকবাবু কথার মাঝখানেই হঠাৎ বলে উঠলেন—তোমরা তাহলে এখন এসো প্রজেশ—

ইঙ্গিতটা বুঝতেই সুরেন উঠে দাঁড়াল। তার কথা তখনও শেষ হয়নি। আসলে তার কথা আরম্ভই হয়নি। সেদিনকার অত আগ্রহ, অত আত্মীয়তা, কে একজন গোয়েংকা আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে-সব কর্পূরের মত উবে গেল।

প্রজেশ সুরেনের গায়ে টোকা মেরে বললে—আসুন আসুন—

অগত্যা প্রজেশের সঙ্গে সুরেন বাইরে এলে দাঁড়ালো। বাইরে এসে প্রজেশ বললে—অমন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? চলে আসতে হয় তো।

সুরেন বললে—উনি কে?

প্রজেশ বললে—সে কি, চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন না? পুণ্যদা চাই-ছিলেন না যে আমরা আর ও-ঘরে থাকি।

সুরেন বললে—কিন্তু আমাকে যে উনি আজকে আসতে বলেছিলেন। আমার তো কোনও কথাই হলো না। পর্মিলির সামনে আমাকে আসতে বলেছিলেন।

—কিন্তু কে এল সেটা তো আগে দেখবেন!

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যি উনি কে?

—নাম শুনে বুঝতে পারলেন না? আপনার দ্বারা জীবনে কিছুই হবে না। কে কী রকম লোক নাম শুনে, চেহারা দেখে বুঝে নিতে হবে, তবে তো জীবনে রাইজ করবেন। ওরা হলো বড়লোক। বড়লোক মানে হলো আমাদের পতি। পুঁজিপতি। কোটি কোটি টাকার মালিক। আপনার আমার মত দু' লক্ষ লোককে ওরা এক হাতে কিনে আবার আর এক হাতে বেচতে পারে। ওরাই তো দেশের আসল পতি। পতি পরম গুরু!

পতি পরম গুরু?

হাসি এল সুরেনের মুখে। অনেকদিন আগে মা-মণির মাথার চিরুনীতে ওই কথা ক'টা খোদাই করা ছিল। তখনও হেসেছিল সুরেন। কিন্তু এতদিন পরে প্রজেশ সেনের মুখে কথাটা শুনে আর হাসি এল না। বুঝলে, পুণ্যশ্লোকবাবুর কথায় বিশ্বাস করে সে অন্যায় করেছিল।

বললে—মিষ্টার সেন, আপনি আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন না?

—চাকরি?

প্রজেশ সেন যেন চমকে উঠলো। বললে—কেন, পুণ্যদা তো আপনাকে কাজ দিচ্ছেন আবার চাকরি কী করবেন?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আমাকে? কী কাজ দিচ্ছেন?

—ওই যে কংগ্রেসের ইতিহাস লেখা। কত বড় কাজ বলুন তো! চিরকাল ইতিহাসে আপনার নাম থাকবে! তারপরে একবার কংগ্রেসের সুনজরে পড়ে গেলে তখন আপনাকে আর পায় কে! সারাজীবন আর আপনাকে চাকরি করতে হবে না—

সুরেন বললে—কিন্তু ওঁর তো সময়ই হবে না কথা বলবার! ওঁর অত কাজ. দিন-রাতই তো ব্যস্ত। কেবল বড় বড় লোক আসছে—

প্রজেশ সেন বললে—আপনি একটু উঠে-পড়ে লাগলেই ওঁর সময় হবে। আপনার একটু চেষ্টা থাকা উচিত—

—আমি কী চেষ্টা করবো?

প্রজেশ সেন বললে—চেষ্টা অনেক রকমের আছে। এই যে আমি আজ পাবলিক রিলেশনস্ অফিসারের চাকরি পেয়েছি, দেড় হাজার টাকা মাইনে. নিজের টাকায় বাড়ি করেছি. এ সবই তো আমার চেষ্টার জন্য! আমিই কি চেষ্টা কম করেছি? সারা জীবনটা তো পুণ্যদার সেবাতেই কেটেছে। ঢুকেছি ভলান্টিয়ার হয়ে। কতবার পুলিশের লাঠি খেয়েছি, তবু দমিনি। কত হাজার হাজার টাকা তুলে দিয়েছি কংগ্রেস-ফান্ডে! একটা পয়সা কখনও সরাইনি। নিজে না খেয়ে কাটিয়েছি তবু পাবলিকের পয়সা ছুঁইনি। আর তা ছাড়া পুণ্যদার জন্যে আমি কী না করেছি! উনি তো জেল খেটেছেন. সোশ্যাল-ওয়ার্ক করে বেড়িয়েছেন. তারপর মিনিষ্টার হয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরেছেন, তখন এই সংসার-বাড়ি কে দেখেছে? ছেলেমেয়েরা ছোট ছিল, বাড়িতে স্ত্রী ছিল না, একলা আমি সব তদারক করেছি।

তারপর একটু থেমে প্রজেশ আবার বললে—জীবনে উন্নতি করতে গেলে

অনেক কিছু করতে হয়। আগে অনেক কম করতে হতো, এখন কম্পিটিশান যা বেড়েছে, এখন আরো কঠিন হয়েছে জীবন।

—কিন্তু আমি তো সব করতে প্রস্তুত। কী করতে হবে বলুন আমাকে!

প্রজেশ বললে—কেন, একটা মিটিং করতে পারেন না? পঞ্চাশজনকে ডেকে একটা মিটিং করা কী এমন শক্ত কাজ!

—মিটিং?

—হ্যাঁ মিটিং! পঞ্চাশজন ছেলেকে ডেকে আপনাদের পাড়ার পার্কে একটা মিটিং করবেন। একটা মাইক্রোফোন আর লাউড-স্পীকার ভাড়া নেবে পঁচিশ টাকা। চাঁদা করে টাকা তুলে ভাড়াটা জোগাড় করবেন। তারপর প্রেসিডেণ্ট্ করবেন পুণ্যদাকে! ব্যস্, কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল—

সুরেন অবাক হয়ে শুনতে লাগলো কথাগুলো। জীবনে উন্নতি করবার এও এক অদ্ভুত পদ্ধতি!

কিন্তু এও তো এক রকমের খোসামোদ!

বললে—কিন্তু কী নিয়ে মিটিং করবো?

—কেন, মিটিং-এর সাবজেক্টের অভাব আছে? কত সাবজেক্ট পড়ে আছে পৃথিবীতে। কলকাতার লোক একটু ভিড় ভালবাসে। ভিড় দেখবার জন্যে তারা ছটফট্ করে। যে-কোনও একটা বিষয় নিয়ে আরম্ভ করে দিলেই হলো। বাঁদর-নাচ আরম্ভ করে দিলেই হলো। বাঁদর-নাচ আরম্ভ করে দিলেও দেখবেন কলকাতার পার্কে লোকের অভাব হবে না।

সুরেন হেসে ফেলল।

প্রজেশ সেন বললে—হাসবেন না মশাই, হাসির ব্যাপার নয় এটা। আমি নিজে পার্কে পার্কে ও-রকম কত মিটিং করিয়েছি। পঁচিশ টাকার তো মাত্র মামলা। পঁচিশ টাকা খরচ করে আমি কত টাকা লাভ করছি বলুন তো।

—লাউড-স্পীকার লাগালেই লোক জড়ো হবে?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, কলকাতার লোক জড়ো হবে। আমি আপনাকে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি মিষ্টার সান্যাল। এ কলকাতার লোককে আপনি চেনেন না। এরা আজব চিজ্! আপনি এক কাজ করুন—কবি কালিদাস জয়ন্তী করুন! আর প্রেসিডেণ্ট করে দিন পুণ্যদাকে!

—কবি কালিদাস জয়ন্তী?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, কবি কালিদাস জয়ন্তী! মহাকবি কালিদাস, সেই উজ্জয়িনীর মহাকবি!

সুরেন বললে—কিন্তু আমি তো কবি কালিদাস সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

প্রজেশ বললে—আরে আমিই কি জানি কিছু ছাই? আমিও জানি না, এমনকি পুণ্যদাও জানেন না। কেউই জানে না। কিন্তু তাতে কী! আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে একটা লাগিয়ে দিন না অনুষ্ঠান করে। দেখবেন তাই নিয়েই লোকে মেতে উঠেছে। পুণ্যদাও দেখবেন কী চমৎকার লেকচার দিয়ে দেবেন কবি কালিদাসের ওপর—। তার ওপর খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে আলাপ থাকলে আর তো কথাই নেই। আলাপ আছে কিছু?

সুরেন বললে—না—

—ওই কাজটা আগে করুন। আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট না করে খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ্ করুন। তাদের একটু খাওয়ান-টাওয়ান।

—কী খাওয়াবো?

—আরে কী খাওয়াবেন তাও আমাকে বলে দিতে হবে নাকি? সেদিন যা খাওয়ালুম আপনাকে তাই-ই খাওয়াবেন।

সুরেন বললে—সত্যি আমার কিন্তু ওটা সহ্য হয় না। মাথাটা কী রকম ঝিম ঝিম করে।

প্রজেশ হাসলো। বললে—ওই ঝিম-ঝিমিনিটার জন্যেই তো খাওয়া। আমিও তো আগে খেতুম না। খেলে কেমন মাথা ঘুরতো। শেষকালে দেখলুম ওটা না খেলে কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে আর মেশাই যায় না আজকাল। জীবনে সাক্‌সেস্‌ফুল হতে...

হঠাৎ হরিলোচন মুহুরী এসে পেছন থেকে ডাকলে—প্রজেশবাবু—

পেছন ফিরে দেখলে প্রজেশ সেন। বললে—কী?

—কর্তা একবার ডাকছেন আপনাকে—জরুরী দরকার!

প্রজেশ সেনের শরীরে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল কথাটা শুনে।

বললে—চলো—

পুণ্যশ্লোকবাবু ডেকেছেন এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা যেন আর কিছু হতে পারে না। কথাটা শুনেই প্রজেশ কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা পুণ্যশ্লোকবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মিষ্টার গোয়েঙ্কা আর তার সঙ্গের দু'জন ভদ্রলোক তখনও ঘরের ভেতরে বসে আছেন।

সুরেন কী করবে বুঝতে পারলে না। খোলা বারান্দাটার ওপরই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যাবার সময় প্রজেশবাবু কিছু বলেও গেলেন না। তবে কি বাড়ির দিকেই যাবে? বাড়িতে গেলেই তো সেই আবার চিরাচরিত যন্ত্রণা। বাগানে আলোর ছায়া গিয়ে পড়েছে। সামনের দিকে চাকরদের থাকবার ঘর। আরো কোণের দিকে গেট।

হঠাৎ পার্মিলির গলা কানে এল।

—একি, তুমি কখন এলে? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

পার্মিলির পোষাকের দিকে চেয়ে সুরেন অবাক হয়ে গেল! বোধহয় কোথাও বেড়াতে বেরোচ্ছে। গা দিয়ে ভুর-ভুর করে একটা চমৎকার সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছ?

পার্মিলি বললে—তুমি কতক্ষণ এসেছ তাই বলো না?

সুরেন বললে—পুণ্যশ্লোকবাবু আসতে বলেছিলেন, তাই আজ এসে-ছিলাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো ছিলুম। এখন একজন ভদ্রলোক এলেন তাই চলে যাচ্ছিলাম—

—চাকরির কথা বলতে বুঝি? চাকরি হলো?

সুরেন বললে—না—

পার্মিলি বললে—কেন? হলো না কেন? চলো, আমি বাবাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি—

বলে সত্যিই গট্‌-গট্‌ করে একেবারে পুণ্যশ্লোকবাবুর ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। সর্বনাশ! ভয়ে দুর-দুর করে উঠলো সুরেনের বুকটা। বাবার কাছে গিয়ে কী বলবে পার্মিলি কে জানে!

সুরেন পাথরের মত সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পুণ্যশ্লোকবাবু, কাজের লোক। কিন্তু কাজের চেয়ে বোধহয় কথার লোকই বেশি। তাই কথা বলতে পেলে আর সময়ের জ্ঞান থাকে না। গোয়েঙ্কাজীর কারবারের পক্ষে পুণ্যশ্লোকবাবুর সাহায্য অনিবার্য। মাঝে মাঝে তাই তাঁকে

এখানে আসতে হয়। কাজেও আসতে হয়, অকাজেও আসতে হয়।

অনেকদিন আগে গোয়েঙ্কাজী তখন সবে নতুন কারবারে নেমেছেন, পুণ্যশ্লোকবাবু সেবার প্রথম মিনিষ্টার হলেন। গোয়েঙ্কাজী এসে প্রণাম করে গেলেন।

পুণ্যশ্লোকবাবু মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কে? কী চান আপনি?

গোয়েঙ্কাজী বলেছিলেন—কিছুই চাই না, শুধু আপনাকে প্রণাম করে গেলাম।

কিন্তু কিছুদিন পরেই জানতে পারা গেল, তিনি শুধু-শুধু আসেননি, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। উদ্দেশ্যটা আর কিছু নয়, একটা মিল খুলবেন বাঙলাদেশে, তার জন্য উদ্বোধনের দিনে পুণ্যশ্লোকবাবুকে সভাপতি হতে হবে।

সেই সভাপতিত্ব করবার দিন থেকেই যেন তাঁর আসা-যাওয়া একটু বেড়ে গেল এ-বাড়িতে। পুণ্যশ্লোকবাবুর শরীর খারাপ হলেই গোয়েঙ্কাজীর ভাবনা হয়। পুণ্যশ্লোকবাবুর জন্ম-তারিখটা কেমন করে যেন তিনি জেনে গেলেন। আর সেই তারিখটাতেই কিছু উপহার নিয়ে আশা চাই।

এ-সব পুরোন ব্যাপার। তারপর থেকে গোয়েঙ্কাজী তো এখন প্রায় ঘরের লোকই হয়ে গেছেন। এখন আসেন যখন-তখন। আগের মতন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে আসতে হয় না তাঁকে। বরং এলে পুণ্যশ্লোকবাবুই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসান।

সেদিনও তেমনি ক'টা জরুরী কথা ছিল বোধহয়। নইলে অমন করে প্রজেশকেই বা সরিয়ে দেবেন কেন?

আর সামনে ইলেকশান হচ্ছে এটা পুণ্যশ্লোকবাবুও জানতেন, গোয়েঙ্কাজীও জানতেন। ইলেকশানের সময় কত টাকার দরকার হয়, তা জানতে কারো বাকি ছিল না। সুতরাং গোয়েঙ্কাজীদের প্রয়োজন এ-সময়ে যে অপরিহার্য তা প্রজেশ সেনও জানতো। এই সময় বুঝে প্রজেশও সুরেনকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে।

কিন্তু প্রজেশ সেনকে বাদ দিয়ে পুণ্যশ্লোকবাবুর ইলেকশান-ক্যামপেন হওয়ার উপায় নেই। সে অপরিহার্য!

গোয়েঙ্কাজী জিজ্ঞেস করলেন—নমিনেশান কি বেরিয়ে গেছে পুণ্যশ্লোক-বাবু?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—নমিনেশানের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না গোয়েঙ্কাজী, ওটা আমাদের ব্যাপার। কিন্তু শুধু নমিনেশান পেলেই তো হবে না। আসল কথা হলো ওদের পার্টি কাকে নমিনেশান দেয়!

—কাকে দেবে কিছু খবর পেয়েছেন?

—সে-খবর তো প্রজেশকে আনতে বলেছি।

বলে হঠাৎ মনে হলো প্রজেশের তো এ-সময়ে এখানে থাকা দরকার। কিন্তু প্রজেশ কোথায় গেল?

হরিলোচন মুহুরী ঘরের এককোণে টাইপ-রাইটারে বসে কাজ করছিল। তাকে বললেন—প্রজেশ এখখুনি চলে গেল, তাকে একবার ডাকো তো হরি-লোচন—

হরিলোচন হুকুমের চাকর। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল।

প্রজেশ ঢুকেই বললে—আমাকে ডাকলেন পুণ্যদা?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়লো। ওরা আমার এরিয়াতে কাকে নমিনেশান দিচ্ছে বলতে পারো তুমি? আমার এগেনস্টে কে দাঁড়াবে?

প্রজেশ বললে—এখনও ওদের কিছু ঠিক হয়নি। তবে মনে হচ্ছে পূর্ণবাবু দাঁড়াবেন—

—পূর্ণবাবু?

গোয়েঙ্কাজী জিজ্ঞেস করলেন—পূর্ণবাবু কে? পয়সাওয়ালা কেউ?

—আরে না, আমাদের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারের একজন বাঙলার মাষ্টার। ঘোর কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে অভাবে পড়ে!

গোয়েঙ্কাজী বললেন—তাকে কিছু টাকা দিলেই তো হয়? আমিই না হয় দিয়ে দিতুম। নামটা তুলে নিত শেষের দিকে।

প্রজেশ বললে—তিনি অত সোজা নন গোয়েঙ্কাজী! টাকা দিতে গেলে আবার সে-খবর কাগজে ছাপিয়ে দেবে। পলিটিকস্ কি অত সোজা জিনিস!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আরে প্রজেশ, তুমি তো জানো, যখন খেতে পেত না, তখন আমার কাছেই ওই মানুষটা এসে ধরনা দিয়েছিল। আমি তখন স্কুলের সেক্রেটারি। আমি চাকরি না দিলে লোকটা উপোস করে মরতো। এখন তিনশো টাকা মাইনে পেয়ে আমারই এগেনস্টে দাঁড়াচ্ছে—

গোয়েঙ্কাজী বললেন—ওকে ইস্কুলে থেকে ছাড়িয়ে দিন আপনি, ও-রকম মাষ্টার রাখেন কেন ইস্কুলে?

—আরে স্কুল কি আমার? এখন তো আমিও আর সেক্রেটারি নই স্কুলের! আমি সেক্রেটারি থাকলে তো কমিউনিষ্ট মাষ্টারকে কবে একটা ছুতো করে ডিস্‌চার্জ করে দিতুম!

তারপর প্রজেশের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি খবরটা নাও একবার, আমি দেখি এদিকে কী করতে পারি—

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যেই একটা দমকা হাওয়া এসে ঢুকলো।

—বাবা!

পুণ্যশ্লোকবাবুও চমকে উঠেছেন।

পমিলি ঘরের ভেতরে ঢুকেই একেবারে সোজা বাবার দিকে চেয়ে বললে—বাবা, সুরেনকে তুমি চাকরি দিলে না কেন?

—চাকরি?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কোথায়? সুরেন কোথায়? দাঁড়িয়ে আছে নাকি?

পমিলি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তুমিই তো ওকে আসতে বলেছিলে। তুমি তো কথা দিয়েছিলে ওকে চাকরি করে দেবে। কিন্তু তুমি তো কিছুই করোনি ওর জন্যে!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কই, আমি তো চাকরি করে দেবো না, বলিনি—। আমি শুধু বলেছি চাকরিতে কোনও ভবিষ্যৎ নেই—

পমিলি বললে—তাহলে প্রজেশকে করে দিলে যে? প্রজেশেরও কি কোন ভবিষ্যৎ নেই বলতে চাও?

পুণ্যশ্লোকবাবু যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কোথায় যাচ্ছ তুমি এখন?

পমিলি বললে—কথা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু দেখলেন প্রসঙ্গটা বেশি দূর চালাতে দিলে আরো বেড়ে

যাবে। তিনি উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। তারপর মেয়েকে নিয়ে ঘরের বাইরে যাবার চেষ্টা করলেন। যা কিছু কথা হোক, যেন ঘরের বাইরে সকলের চোখ-কানের আড়ালে হয়।

পর্মিলি কিন্তু নড়লো না। বললে—ও বেচারি গরীব একটা কিছু করে দেবে তো ওর জন্যে! ও যে অনেক আশা করে এসেছিল তোমার কাছে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা আমি তো ওকে বলেছি কাজ দেবো একটা—

পর্মিলি বললে—কী কাজ দেবে? কত টাকা মাইনে?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা কাজ কি একদিনেই হয়? আগে কথাবার্তা বলতে হবে না? জানতে হবে না কী ধরনের চাকরি ওর পছন্দ? আমি তো ওকে বলেছি ইতিহাস লিখতে। তাতে টাকাও হবে, নামও হবে।

তারপর একটু থেমে বললেন—তা তুমি ও-নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছো কেন? তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও না! সে কোথায়? বাইরে দাঁড়িয়ে আছে!

পর্মিলি বললে—কেন, তা জেনে তোমার কী হবে? আমি যে-কথা জিজ্ঞেস করছি সেই কথার উত্তর তুমি দাও আগে।

পুণ্যশ্লোকবাবুর বড় লজ্জা লাগছিল এতগুলো লোকের সামনে এ-সব আলোচনা করতে।

বললেন—প্রজেশ, তুমি পর্মিলিকে নিয়ে একটু বাইরে যাও তো! এখন আমি গোয়েংকাজীর সঙ্গে একটু জরুরী কথা বলছি—

পর্মিলি বললে—তা এটাও কি জরুরী কথা নয়?

ইতিমধ্যে হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। পুণ্যশ্লোকবাবু টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে যেন অ[illegible]হিত [illegible]লেন। বললেন—হ্যালো—

প্রজেশ পর্মিলির কাছে এসে গলা নামিয়ে বললে—এখন কেন এ-সব কথা বলছো? দেখছো গো[illegible] এসেছেন, সামনে ইলেকশন।—

—তুমি থামো! তুমি নিজে চা[illegible] [illegible] করে নিয়েছ কি না তাই ওই কথা বলতে পারছো! তুমি যখন [illegible] [illegible] বাবার কাছে এসে ধরনা দাওনি?

প্রজেশ বললে—আঃ, চেঁচিও না অত, দেখছো পুণ্যদা টেলিফোনে ক[illegible] বলছেন—

পুণ্যশ্লোকবাবু তখন নিবিষ্টমনে টেলিফোনে কথা বলে চলেছেন—না না, সে-সব কথা লিখবেন না। লিখুন আমার শরীর খারাপ বলে আমি যেতে পারবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্লাড-প্রেসার, ওই কথাই লিখুন। নইলে আমি নিশ্চয়ই যেতুম। ও'র কাজ তো দেশেরই কাজ...

গোয়েংকাজী সব জিনিসটাই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তাঁর যেন কোনও বিকার নেই। তাঁর সঙ্গে যে-দুজন এসেছিল তারাও দৃশ্যটা একদৃষ্টে দেখছিল।

পর্মিলি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুর টেলিফোন শেষ হচ্ছে না তখনও।

পুণ্যশ্লোকবাবু তখনও বলে চলেছেন—সে কী কথা, আমি তো আপনাদেরই লোক, আমার নিজের বলতে তো আর কিছু নেই। দেশের জন্যেই আমি, দেশের স্বার্থেই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আপনারা আমাকে চান সে তো আপনাদের মহত্ত্ব, আমার কেবল সৌভাগ্য! দেশের জন্যে আমি যদি

আমার সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, তার চেয়ে তো বড় সুখ আমার আর কিছুই নেই—

পুণ্যশ্লোকবাবুর টেলিফোনের কথা যেন শেষ হবার নয়।

প্রজেশ পর্মিলির দিকে চেয়ে বললে—কেন তুমি রাগ করছো বাবার ওপর, চলো, বাইরে চলো—

পর্মিলি বললে—তুমি চুপ করো তো—নিজের কাজ হয়ে গিয়েছে বলে এখন তুমি আমাকে থামতে বলছো! একদিন তুমিই তো বাবার কাছে চাকরির চেষ্টায় ওই রকম ঘুরঘুর করেছ, সে-সব দিনের কথা তোমার মনে নেই?

—তা আমি কি বলছি আমার মনে নেই?

পর্মিলি বলে উঠলো—তাহলে সুরেন বাবার কাছে এলে তোমার রাগ হয় কেন?

প্রজেশ বললে—কে বললে আমার রাগ হয়? আমি কখনও তা বলেছি? তেমন কোনও প্রমাণ পেয়েছ আমার ব্যবহারে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে পর্মিলি আবার বাবাকে ডেকে উঠলো—বাবা—

প্রজেশ বলে উঠলো—ছিঃ, পর্মিলি, দেখছো উনি টেলিফোনে কথা বলছেন—

—আবার কথা বলছো?

বলে পর্মিলি হঠাৎ জোরে একটা চড় বসিয়ে দিলে প্রজেশের গালের ওপর। পর্মিলির নরম হাতের চড়টা প্রজেশের গালের ওপর পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বজ্রপাত হলো ঘরের ভেতরে। কিংবা বজ্রপাত হলেও বুঝি কেউ এতটা চমকে উঠতো না।

পুণ্যশ্লোকবাবু যেন এতক্ষণে বাস্তব-জগতে ফিরে এলেন। তাড়াতাড়ি টেলিফোন-রিসিভারটা রেখে তিনি দৌড়ে পর্মিলি আর প্রজেশের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—কী, হলোটা কী? কেন, মারলে কেন প্রজেশকে? কী করেছিল ও? তুমি কী করেছিলে প্রজেশ?

প্রজেশের তখন কথা বলবার অবস্থা নেই।

পর্মিলিই উত্তর দিলে। বললে—যে নিজের সম্মান রাখতে পারে না, তার শাস্তি হওয়াই উচিত। কেন তুমি প্রজেশকে চাকরি করে দিলে বাবা? ওর সুরেনের ওপর এত হিংসে কেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—ও কী করেছে তাই বলো না?

পর্মিলি বললে—সুরেন তোমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছিল, ও কেন তাকে তাড়িয়ে দিলে তা আমি জানি না মনে করেছো?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছো কেন পর্মিলি? তুমি যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে যাও না, কেন এখানে বিরক্ত করতে এলে? দেখছো গোয়েংকাজী এসেছে, জরুরী কাজের কথা হচ্ছে—

পর্মিলি ঝাঁজিয়ে উঠলো—তা সুরেনের একটা চাকরি দেওয়া বুঝি কাজ নয়? সেটা বুঝি অকাজ?

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আজকাল তুমি এমন খিটখিটে হয়ে গেছ কেন বলো তো?

পর্মিলি বললে—তুমি আমার খিটখিটে স্বভাবটাই দেখলে, আর একটা গরীবের দরকারটা বুঝলে না। জানো, ওর কেউ নেই, পরের বাড়িতে খায়-দায়, পরের গলগ্রহ—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—তা ও-রকম তো অনেক আছে বাংলাদেশে। অভাবের কী শেষ আছে এখানে?

পর্মিলি বললে—তাহলে প্রজেশকে কেন চাকরি করে দিলে? প্রজেশ তোমার ভোটের সময় খেটেছে বলে?

—আঃ পর্মিলি, তুমি বড় আবোলতাবোল বকো। কোথায়, সুরেন কোথায়? বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? চলো, আমি তার সঙ্গে কথা বলছি—

পর্মিলি বললে—না, আগে কথা দাও তার চাকরি করে দেবে তুমি?

—আচ্ছা আচ্ছা, কথা দিচ্ছি—চলো—

বাইরে যাবার আগে গোয়েঙ্কাজীর দিকে চেয়ে পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আমি এখুনি আসছি গোয়েঙ্কাজী, একটু বসুন—

বলে পর্মিলিকে নিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। বললেন—কোথায়? সুরেন কোথায়?

গোল-গোল টিউব-লাইট জ্বলছে বারান্দার সিলিং-এ। তার বাইরে বাগানে অল্প-অল্প অন্ধকার। ওদিকে আউট-হাউস। পোর্টিকোর তলায় গোয়েঙ্কাজীর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সুরেন কোথায়? কোথায় সুরেন?

পুণ্যশ্লোকবাবু চিৎকার করে ডাকলেন—রঘু—রঘু—

ভারি গলার আওয়াজে সারা বাড়িটা যেন গম গম করে উঠলো। রঘু অন্ধকারের অভ্যন্তরে কোথা থেকে দৌড়ে এসে হাজির হলো।

পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—ও-সাহেব কোথায় গেল রে? সুরেন সাহেব?

রঘু বললে—তিনি তো চলে গেলেন—

—কখন চলে গেলেন?

রঘু বললে—অনেকক্ষণ হলো চলে গেছেন। আমি জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলে গেলেন, দিদিমণিকে বলে দিও আমি চলে গেলুম—

নরেশ দত্ত বড় দেরিতে মা-মণির অসুখের খবরটা পেয়েছিল। যখন পেলে তখন আর বেশি দেরি করে আখের নষ্ট করতে চাইলে না। আর তা ছাড়া এমন একটা শুভ কাজে দেরি করা উচিতও নয়। এমনি দেরি করে আগে অনেক আখের নষ্ট করেছে সে। এবার আর তেমন না হয়।

একদিন আবার এসে হাজির হলো মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ভূপতি ভাদুড়ী একটু আগেই ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে এসে মা-মণিকে দেখিয়েছে। ডাক্তার চলে যাবার পর ওষুধও আনানো হয়েছে। ডাক্তারের কথাতেই বোঝা গেছে আর বেশি দিন নয়।

তারপর একটুখানি বিশ্রামের জন্যে নিজের ঘরখানায় ঢুকেছিল। হঠাৎ বাইরে নরেশ দত্তর গলা পেয়েই চমকে উঠলো—

—ম্যানেজার, ও ম্যানেজার!

বার বার ডাকাডাকিতে আর না উঠে পারলো না ভূপতি ভাদুড়ী। তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা খুলে চিৎকার করে উঠলো। বললে—ষাঁড়ের মতন চিৎকার করছো কেন? কী হয়েছে, কী? কী চাই? তোমার পাওনা তো সব মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে—আবার কী চাই?

হো হো করে একরকম পৈশাচিক হাসি হেসে উঠলো নরেশ দত্ত।

বললে—আরে, বুড়ীর অসুখ করেছে, তা তো আমাকে জানাওনি ম্যানেজার!

—তা অসুখ হলে তোমাকে জানাতে হবে কেন? তুমি কে?

নরেশ দত্ত আরো জোরে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে—আরে এত বড় একটা সুখবর, আর আমাকে তুমি একবার জানালেও না? তাহলে কালী-কান্তকে তো খবরটা দিতে হয়!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কেন, কালীকান্তকে খবর দেবে কেন? তেমন তো কথা ছিল না—

নরেশ দত্ত আর যাই হোক বোকা নয়। সে বুঝে গেছে যে, সংসারে যে আদায় করে নিতে পারে সেই-ই জেতে। এখানে ও-সব সততা সত্যবাদিতা সাধুতা ইত্যাদির কোনও দাম নেই। সেই সে-যুগে জন্মেও নরেশ দত্ত এ-যুগের স্বভাবটা আয়ত্ত করে ফেলেছে খুব তাড়াতাড়ি। মুখের কথাকে সে বিশ্বাস করতো না, বিশ্বাস করতো একমাত্র নগদ টাকাকে। নগদ টাকা হাতে পেলে সে মানুষ খুন করতেও পেছ-পা হতো না।

ভূপতি ভাদুড়ী গলাটা নামিয়ে বললে—এসো এসো ভেতরে এসো, যা বলবার ভেতরে এসো বলো—

নরেশ দত্ত হাসলো। বললে—কেন, জানাজানি হবার ভয়ে?

ভূপতি ভাদুড়ী তার হাতটা ধরে ভেতরে এনে তক্তপোষের ওপর বসালো।

বললে—যা বলবে ধীরে-সুস্থে বলো। অত হুড়োহুড়ি কোর না। কী চাও এবার বলো দিকিনি—

নরেশ দত্তর মুখে সেই এক কথা। বললে—আমার টাকার বড় দরকার ছিল ম্যানেজার, পকেটের অবস্থা বড় টাইট্ আজকাল। কিছুতেই কুলোতে পারছি না—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তোমাকে যে দু' হাজার টাকা দিলুম! তুমি যে কথা দিলে টাকা নিয়ে তুমি কালীকান্তকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবে—

—তা তো দিলুম। কালীকান্ত তো মাগীটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর কী চাই?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি চাই আর যেন তারা ফিরে না আসে!

নরেশ দত্ত বললে—ফিরে না এলে এ-সব সম্পত্তি কে ভোগ করবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কে আর ভোগ করবে, যে ভোগ করছে সেই-ই ভোগ করবে—সেই আমাদের মা-মণি!

—কিন্তু মা-মণির তো অসুখ করেছে। এবার তো নাকি বাড়াবাড়ি, আর বেশিদিন বাঁচবেও না, তখন কে ভোগ করবে? কে এ-সব সম্পত্তি পাবে?

ভূপতি ভাদুড়ী হঠাৎ যেন দার্শনিক হয়ে উঠলো। বললে—কে পাবে তা ভগবান জানেন! সে-কথা এখন ভাবাও পাপ—

—ওরে বাবা, তুমি আবার এত ধার্মিক-পণ্ডিত হলে কবে থেকে ম্যানেজার? তোমাকে তো বরাবর জোচ্চোর বলেই জানতুম! উঃ, তুমি তো দেখছি মানুষ খুন করতে পারো হে!

—থামো!

ভূপতি ভাদুড়ীর মুখখানা গালাগালি খেয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—থামো! আমি জোচ্চোর কি সাধু তা আমি নিজেই জানি, তোমাকে

আর বলতে হবে না। তুমি নিজে জোচ্চোর বলে আমাকেও জোচ্চোর বললে কে জোচ্চোর তা সবাই জানে!

—কী বললে? আমি জোচ্চোর?

ভূপতি ভাদুড়ীও রেগে গেল। বললে—জোচ্চোর না তো কী? তুমি আমার কাছে দু' হাজার টাকা নিলে, আবার এখন বলছো কালীকান্তকে খবর দেবে তুমি শুধু জোচ্চোর নও, নেমক-হারাম। নেমক-হারামের বেহদ্দ! তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও, তোমাকে আর একটা পয়সাও আমি দেবো না—যাও—

নরেশ দত্ত দেখলে মামলা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা পাকা ঘুঁটিকে কাঁচিয়ে লাভ নেই। বললে—তুমি চটছো কেন ম্যানেজার? আমি কি চটার মত কিছু বলেছি?

ভূপতি ভাদুড়ীর রাগ তখনও নামেনি। বললে—তুমি একটা হারামজাদা তোমার সঙ্গে আর কোনও কথা নয়, তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—

—ঠিক আছে, আমি তাহলে উঠি—

বলে সত্যিই উঠে দাঁড়ালো নরেশ দত্ত। মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি ভালো করে গুছিয়ে নিয়ে দরজার দিকেই চলতে লাগলো। তারপর ঠিক দরজার কাছে গিয়ে একবার পেছন ফিরলো।

বললে—তাহলে কালীকান্তকে খবরটা দিগে যাই—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তোমার যা-খুশী করো গে যাও, আমি ওতে ভয় পাইনে—

—তাহলে তখন কিন্তু আমাকে দুষো না ম্যানেজার। তখন কিন্তু আর আমার হাতে তাস থাকবে না। রঙের বিবি তখন আমি চিত করে ছেড়ে দেবো!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—চিত করো উপুড় করো, কায়দা করে আর টাকা আদায় করতে পারবে না আমার কাছে—

এবার আর দাঁড়ালো না নরেশ দত্ত। আর টাকা দেবে না ভূপতি ভাদুড়ী সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নরেশ দত্ত টলতে টলতে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো বহু দিন ধরে বহু টাকা নিয়েছে নরেশ দত্ত। সোজা-পথে বাঁকা-পথে, কোনও পথই বাদ দেয়নি সে। এ-রকম করে আগেও অনেক চাপ দিয়েছে, চাপ দিয়ে কাজও হয়েছে।

রাত্রে মাধব কুণ্ডু লেনের ভেতরে ভিড় একটু পাতলা হয়েছে। নরেশ দত্ত একাই যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো—

বললে—কে? কে যায়?

সুরেন সোজা আসছিল সুকীয়া স্ট্রীটের পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়ি থেকে নরেশ দত্তকে চিনতে পারলে। বললে—আমি—

—তুমি! তুমি ভূপতি ভাদুড়ীর ভাগ্নে না?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

নরেশ দত্ত বললে—তা ভালোই হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা কাজ তোমায় করতে হবে ভায়া। তোমাকে ভায়া বলছি বলে কিছু মনে কোর না, বড় বিপদে পড়ে তোমার মামার কাছে গিয়েছিলুম। জানো, আমার টাকার বড় দরকার ছিল, অথচ একটা টাকাও ঠেকালে না—

সুরেন বললে—তা আমি কী করতে পারি?

নরেশ দত্ত বললে—আরে তুমিই তো সব করতে পারো হে! তুমি আমার

তো কিছু টাকাও দিতে পারো—টাকা চাইতেই তো আমি এসেছিলাম—

সুরেন বললে—আমি কোথায় টাকা পাবো, আমার তো চাকরি-বাকরি নেই আপনি জানেন—

নরেশ দত্ত হেসে উঠলো। বললে—আরে তোমার আবার চাকরির কী দরকার, তুমিই তো সব সম্পত্তি পাবে—

—কে বললে?

নরেশ দত্ত বললে—কে আবার বলবে? আমিই বলছি। আমি কিছু জানি না ভাবছো? ছ'-সাত লাখ টাকার সম্পত্তি গাপ্ করবার জন্যে তোমার মামা হাঁ করে বসে আছে। বুড়ি মরলেই পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে জমিদারি করবে—

সুরেন এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

নরেশ দত্ত বললে—কিন্তু সেটি আমি হতে দেবো না। তুমি যে মা-মণির ছ'লাখ টাকার সম্পত্তি মেরে দেবে সেটি হবে না। আমি কালীকান্তকে গিয়ে সব খবর দিয়ে দেবো—

সুরেন এবার কথা বললে। বললে—কালীকান্তবাবু কোথায় থাকে আপনি জানেন!

—খুব জানি! আমিই তো তাদের বাসা জোগাড় করে দিয়েছি। আমিই তো তাদের গাঁটের পয়সা খরচ করে খাওয়াচ্ছি—

—আর সুখদা? সুখদা কোথায় আছে?

—সুখদা আর কোথায়? কালীকান্তর বউ কালীকান্তর কাছেই আছে—

সুরেন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আচ্ছা, ওরা খুব কষ্টে আছে নাকি?

নরেশ দত্ত বললে—কষ্টে থাকবে কেন? আমি টাকা দিচ্ছি আর ওরা আরাম করে মজা লুঠছে!

—কিন্তু আপনি টাকা দেন কেন? কালীকান্ত কিছু উপায় করে না?

নরেশ দত্ত বললে—টাকা উপায় করতে যাবে কোন দুঃখে! মা-মণির এত টাকার সম্পত্তি থাকতে কালীকান্ত টাকা উপায় করবে? তুমিও যেমন! সেই জন্যেই তো বসে আছে হাঁ করে। তোমার মামাও হাঁ করে বসে আছে, কালীকান্তও হাঁ করে বসে আছে। এখন যার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।

সুরেন হঠাৎ বললে—আচ্ছা নরেশবাবু, আপনি একবার আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন?

—কেন? তুমি আবার সেখানে যাবে কেন?

সুরেন বললে—ওরা কি কার্তিক বোস লেনে থাকে?

নরেশ দত্ত এবার পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। বললে—দূর, ওরা থাকে মাণিকতলায়—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—বাড়ির নম্বরটা বলতে পারেন?

—কেন? নম্বর নিয়ে তুমি কী করবে? যাবে সেখানে?

সুরেন বললে—হ্যাঁ, যাবো—

—কী করতে যাবে?

সুরেন বললে—সুখদা আমাকে হয়ত ভুল বুঝেছে। হয়ত সুখদা ভেবেছে সম্পত্তির লোভেই আমি মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে পড়ে আছি। আসলে বিশ্বাস করুন, আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করছি,

কোথাও কিছু পাচ্ছি না। অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টায় ঘুরছি। কেউ চাকরি দিচ্ছে না। আমার এক বন্ধুর পার্টির অফিসেও থাকবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সেখানে থাকলে জেলে যেতে হয় বলে দশ বার ভাবছি—

—জেলে যেতে হবে? কেন? জেল কেন?

সুরেন বললে—তারা দেশের কাজ করে। তারা মিটিং করে, মিছিল করে। তারা দেশের আইন ভাঙে—

—আইন ভাঙে মানে?

সুরেন বললে—তারা গভর্ণমেণ্টের কোনও আইনই মানে না। কিন্তু সে-সব কথা থাক আপনি আমাকে সুখদাদের সন্ধানটা দিন। আমি নিজে গিয়ে তাদের সব কথা খুলে বলবো। সুখদার সঙ্গে দেখা করা আমার বিশেষ দরকার—

নরেশ দত্ত এবার ভালো করে চেয়ে দেখলে সুরেনের মুখের দিকে।

বললে—বলতে পারি, কিন্তু তাহলে টাকা দিতে হবে—

—টাকা? কত টাকা?

নরেশ দত্ত বললে—দশ টাকা—

সুরেন বললে—দশটা টাকা আমার কাছে তো নেই। অত টাকা আমি কোথায় পাবো। দেখি আমার কাছে কত আছে—

বলে পকেট থেকে মানি-ব্যাগটা বার করে উপুড় করলে। তা থেকে চারটে এক টাকার নোট বেরিয়ে এল।

নরেশ দত্ত বললে—মোটে চার টাকা? আর কিছু নেই? খুচরো?

খুচরোগুলো বাঁ-পাশের পকেটে ছিল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তাও তিন আনার বেশি হলো না।

নরেশ সেটাও হাত বাড়িয়ে নিলে। বললে—দাও, ওতেই কাজ চালিয়ে নেব—

সুরেন বললে—আমাকে কখন সেখানে নিয়ে যাবেন?

—এখনই চলো।

বলে এগিয়ে চলতে লাগলো। সুরেনও চলতে লাগলো তার পেছন-পেছন।

নরেশ দত্তর পায়ে তখন গতি এসেছে। মাধব কুণ্ডু লেন পেরিয়ে বড় রাস্তাটায় পড়লো দু'জনে। তারপর খানিকটা দক্ষিণদিকে গিয়ে আবার পূর্ব-দিকে চলতে লাগলো। চলতে চলতে একটা বস্তির গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—এদিকে কোথায় যাচ্ছেন নরেশবাবু? আপনি যে বললেন মাণিকতলায়?

নরেশ দত্ত বললে—তুমি এখানে একটু দাঁড়াও ব্রাদার, আমি একটু গলা ভিজিয়ে আসছি—নইলে এখুনি আবার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে—

সুরেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। দেখলে সামনেই একটা অন্ধকার বস্তির মধ্যে নরেশ দত্ত ঢুকে পড়লো। সেখানটায় অনেক ভিড়। অনেক লোক সেখানে ঢুকছে, সেখান থেকে বেরোচ্ছে। সুরেন অবাক হয়ে সেই সব দেখতে লাগলো।

নরেশ দত্ত যে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। সংসারে কত রকম মানুষই থাকে! এভাবে তার সঙ্গে না এলে সকলের স্বরূপ দেখে নেওয়ার এমন সুযোগ হয়ত তার আর হতো না।

যখন দোকানের ভেতর থেকে বেরোল নরেশবাবু, তখন সে আরো টলছে। পাঞ্জাবির দু'পাশের পকেট তখন ভারি হয়ে দুদিকে ঝুলছে। তার ভেতরে কিছু খাবার ছিল। তা থেকে মাঝে মাঝে তুলছে আর ম[illegible] পুরছে।

সুরেনের কাছে এসে চলতে চলতে বললে—এবার [illegible]লো—

সুরেনও চলতে লাগলো।

নরেশ দত্ত বললে—খুব দেরি হয়ে গেল না তো? তা দেরি হলে ক্ষতি নেই। ওরা দেরি করে শোয়—

তারপর পকেট থেকে একটা কী বার করে বললে—নাও খাও, ক্ষিধে পেয়েছে?

সুরেন গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলে একটা আলুর চপ। বললে—এখন আমি কিছু খাবো না।

নরেশ দত্ত তখনও পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। বললে—খাও হে খাও, আমি বুড়ো মানুষ খাচ্ছি, আর তুমি এই বয়েসেই বুড়ো হয়ে গেছ? স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে ভাজিয়ে নিয়ে এসেছি, একেবারে খাঁটি কাঠের ঘানির সরষের তেলে ভাজা—

সুরেনের গা ঘিন-ঘিন করছিল নরেশ দত্তর পাশাপাশি যেতে। সারা গা দিয়ে একটা কড়া মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। বললে—আর কত দূর? অনেক দেরি আছে নাকি?

—আরে না, এই তো সামনেই।

বলে হন্ হন্ করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আর একটু হলেই টলে পড়ে যাচ্ছিল। সুরেন ধরে ফেললে। বললে—আপনি একটু আস্তে আস্তে চলুন, আপনার শরীর ঠিক নেই—

—কী? শরীর ঠিক নেই? বলছো কী হে ছোকরা? বলে নরেশ দত্ত সুরেনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। তারপর সোজা তার মুখোমুখি হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়ালো।

বললে—এসো, পাঞ্জা লড়ে যাও—লড়ে যাও পাঞ্জা—

সুরেন ভয়ে একটু পেছিয়ে এল, শেষকালে মাতালের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে মারামারি করবে নাকি!

বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি সে কথা বলিনি, আমি বলেছিলুম...

কিন্তু নরেশ দত্ত ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—না, সে কথা তুমি বলেছ, এখন কথা ঘোরালে চলবে না। তুমি পাঞ্জা লড়ে যাও আমার সঙ্গে—

বলে আরো এগিয়ে আসতে লাগলো নরেশ দত্ত। সুরেন মহা মুশকিলে পড়লো। সে যত পেছিয়ে আসে, নরেশ দত্তও তত এগিয়ে আসে। কেবল বলে—আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেই হবে।

ততক্ষণে কিছু লোকের ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। তারা বেশ মজা পাচ্ছে। বুঝতে পেরেছে একজন মদ খেয়েছে, আর একজন মদ খায়নি। সবাই মিলে নরেশ দত্তকে ঘিরে দাঁড়ালো।

বললে—করছেন কী মশাই, ওকে মারছেন কেন? ও কী করেছে?

নরেশ দত্ত বলে উঠলো—আপনারা কে? হু আর ইউ? আমি পাঞ্জা লড়ছি ওর সঙ্গে। আপনারা তার মধ্যে কেন ডিসটার্ব করছেন? গেট আউট—আপনারা গেট আউট—

বলে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো নরেশ দত্ত। কিন্তু একে নেশায় ঘোর, তার ওপর বয়েস হয়েছে। একটু এগিয়ে আসতে গিয়েই রাস্তার ওপর ধপাস করে একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

সবাই মাতালের কাণ্ড দেখে হো হো করে হেসে উঠেছে। কিন্তু সুরেনের

কেমন ভয় হলো। বুড়োমানুষ, মারা যাবে না তো! যে জোরে পড়েছে হয়ত বুকের পাঁজর ভেঙে গেছে। কাণ্ড দেখে রাস্তায় আরো ভিড় জমে গেল।

সুরেনের মনে হলো সে পালিয়ে যায়। এখানে এই অবস্থায় নরেশ দত্তকে রেখে সে বাড়ি পালিয়ে যায়। কেন সে এমন করে মাতালের কথায় বিশ্বাস করে এদিকে এসেছিল। সুখদা তার কে যে তাকে দেখবার জন্যে তার এত আগ্রহ। যেন সুখদা তাকে দেখতে পেলে খুশী হবে। যেন তাকে আদর করে অভ্যর্থনা করবে! তাহলে কেন কীসের জন্য তার এত আগ্রহ!

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা গলার আওয়াজে চমকে উঠলো সুরেন।

—ছোড়দা! ছোড়দা, এ কী হলো তোমার?

সুরেন চেয়ে দেখলে সেখানে কালীকান্ত বিশ্বাস এসে হাজির হয়েছে।

—কে মেরেছে তোমাকে?

নরেশ দত্ত ক্ষীণ সুরে বলে উঠলো—ওই সুরেন, ম্যানেজারের ভাগ্নেটা—

—কই, সে কই? কোথায় সুরেন?

সুরেন এগিয়ে গেল।—এই যে আমি—

—তুমি আমার ছোড়দাকে মেরেছ? কেন মারলে শুনি? ছোড়দা তোমার কী করেছিল? বলে একেবারে খেঁকিয়ে এল সুরেনের দিকে।

সুরেন বললে—আমি ও'কে মারতে যাবো কেন? উনি তো নিজেই টলে পড়ে গেলেন। আপনি এ'দের সকলকে জিজ্ঞেস করুন না, এ'রা সকলেই তো সাক্ষী আছেন—

যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে সব কাণ্ডটা দেখেছিল তারা সবাই-ই বললে—না মশাই, এ ভদ্রলোকের কোনও দোষ নেই। উনি মদের ঝোঁকে নিজেই টলে পড়েছেন। আমরা সবাই দেখেছি, ঘুষি পাকিয়ে এ'র সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আসছিলেন—

—পাঞ্জা?

সবাই বললে—হ্যাঁ মশাই, পাঞ্জা! আমরা বাধা দিতে গেলুম, আমাদের দিকেই আবার তেড়ে এলেন, বললেন—গেট আউট—

একজন বললেন—দিশি মাল খেয়েছে মশাই, দিশি মাতাল, বিলিতি মাতাল নয়—

কালীকান্ত বললে—আমার নিজের ছোড়দা মশাই, কুসঙ্গে পড়ে এই রকম হয়েছে। আহা, আপনারা একটা রিক্‌শা ডেকে দিন, আমি বাড়ি নিয়ে যাই—

রিক্‌শাওয়ালারাও কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল। সুরেন তাদেরই একজনকে ডাকলে। রিক্‌শাওয়ালাটা আসতেই কালীকান্ত বললে—একটু ধরবে বাবা, বুড়োমানুষ উঠতে পারবে না, একটু ধরে তুলতে হবে—

সবাই মিলে নরেশ দত্তকে পাঁজাকোলা করে ধরে তুললো রিক্‌শাতে। উঠতে কি চায় সহজে। গা দিয়ে এমন গন্ধ বেরোচ্ছে যে সকলের বমি আসবার জোগাড়।

কালীকান্ত চেঁচিয়ে উঠলো—খুব সাবধানে, পড়ে যায় না যেন—

তারপর চারিদিকে চেয়ে যেন কাকে খুঁজতে লাগলো। বললে—কই হে, সুরেন কোথায় গেল? ম্যানেজারের ভাগ্নে কোথায় গেল?

সুরেন বললে—এই যে আমি—

কালীকান্ত বললে—তোমার কি পালাবার মতলব নাকি? কোথায় ছিলে তুমি? তুমি রিক্‌শার ওপর উঠে বোস।

—রিক্‌শার ওপরে?

কালীকান্ত বললে—হ্যাঁ, রিক্‌শার ওপরে না তো কি রিক্‌শার নিচেয়? তোমার আক্কেল তো খুব হে! ভাল মানুষ পেয়ে আচ্ছা করে মদ খাইয়ে দিয়েছে—দেখতে পাচ্ছো না? ওপরে উঠে কোলের ওপরে শুইয়ে বেশ জম্পেশ করে ধরে থাকো, যেন পড়ে না যায়—

সুরেন আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—কোথায় নিয়ে যাবো?

কালীকান্ত বললে—কোথায় আবার নিয়ে যাবে, আমার বাড়িতে।

—আপনার বাড়িটা কোথায়, কতদূরে?

কালীকান্ত বললে—আরে সে ভাবনা তোমার নয়, আমি তো আছি, আমি তো যাচ্ছি তোমার পেছন পেছন—

ততক্ষণে সুরেন রিক্‌শার ওপর উঠে বসেছে।

তারপর রিক্‌শাওয়ালাটাকে বললে—চল্‌, রিক্‌শা ওঠা—চল্‌—

রিক্‌শাটা চলতে লাগলো, তার ওপরে নরেশ দত্তর দীর্ঘ দেহটা আঁকড়ে ধরে বসে রইল সুরেন। আর পেছন-পেছন চলতে লাগলো কালীকান্ত।

পেছন থেকে ক'টা ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো—বল হরি, হরি বোল্‌—

কালীকান্ত একটা কুৎসিত গালাগালি দিয়ে বলে উঠলো—দূশ্‌ শালা মড়া পেয়েছিস নাকি! যত সব মাতালের কাণ্ড। তারপর পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললে—খুব ভালো করে ধরে থাকো ভায়া, দেখো যেন রিক্‌শা থেকে পড়ে না যায়।

রিক্‌শাওয়ালা তখন ঠুন ঠুন বাজনা বাজাতে বাজাতে চলেছে—। নরেশ-বাবুর ভারি শরীরটা নিয়ে যেন হিমসিম খেয়ে গেল সুরেন। সত্যিই কেন সে লোকটার কথায় বিশ্বাস করেছিল!

রিক্‌শাতে বসেই সুরেন আর একবার জিজ্ঞেস করলে—আর কতদূর কালীকান্তবাবু?

কালীকান্ত বললে—আর বেশি দেরি নয় ভায়া, আর একটু...

রিক্‌শাটা তখনও ঠুন-ঠুন করে বোঝা টানতে টানতে চলেছে—

সুকীয়া স্ট্রীটে পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে তখন গোয়েঙ্কাজীর সঙ্গে আবার পরামর্শ চলেছে। সামনে ইলেকশান। এইসব সময়েই গোয়েঙ্কাজীদের প্রয়োজন বড় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

গোয়েঙ্কাজী বললেন—আর একটা নতুন মিল্‌ স্টার্ট করছি স্যার—

—কীসের মিল আবার?

—সুগারের, চিনির।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—হঠাৎ আবার সুগার-মিল কেন?

গোয়েঙ্কাজী বললেন—স্যার, আমার মনে হচ্ছে চিনির ফিউচার খুব ভালো। বেশিদিন গভর্ণমেণ্ট চিনির দর বেঁধে রাখতে পারবে না।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কী বলছেন আপনি, আমার চেয়ে বেশি খবর রাখেন দেখছি!

গোয়েঙ্কাজী বললেন—আমার খবর দিল্লীর। দিল্লী থেকে আমার কাছে খবর এসেছে। গভর্ণমেণ্ট ফরেন-এক্সপোর্ট করতে দেবে আবার কণ্ট্রোলও রাখবে, এটা

হতে পারে না স্যার। শেষে প্রোডাক্শান বন্ধ করে দেবে মিলওলারা! তখন গভর্ণমেণ্ট মুশকিলে পড়বে!

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—সে-সব পরের কথা, এখন...

গোয়েঙ্কাজী বললেন—কিন্তু আমাদের কাছে তো পরের কথা নয় স্যার, আমাদের অনেক আগে থেকেই সব ভাবতে হয়। দশ বছর পরের কথা এখন থেকে ভাবতে হবে।

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—আগে ইলেকশানটা উতরে যেতে দিন গোয়েঙ্কাজী।

হঠাৎ বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকলো প্রজেশ। বললে—তাহলে আমি এখন আসছি পুণ্যদা—

পুণ্যশ্লোকবাবু বললেন—কাল একবার এসো—

প্রজেশ বাইরে এল আবার, পর্মিলি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল কোরিডোরে।

প্রজেশ বললে—চলো, লেট্স্ গো সামহোয়্যার, কোথাও গিয়ে বসা যাক—বড় মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।

পর্মিলি বললে—তুমি যেখানে যাচ্ছো যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি—

প্রজেশ কাছে সরে এল। বললে—তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পর্মিলি বললে—সব কথা কি তোমাকে বলতে হবে? আমি যদি মাধব কুণ্ডু লেনে যাই?

—কোথায়?

প্রজেশ যেন বিশ্বাস করতে পারলে না পর্মিলির কথাটা। আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

পর্মিলি স্পষ্ট গলায় জবাব দিলে—মাধব কুণ্ডু লেনে!

—সেই মিস্টার সান্ন্যালের কাছে! কী জন্যে? সে তো এখনও বোধহয় বাড়ি পেঁছায়নি।

পর্মিলি বললে—না পেঁছোক, না হয় সেখানে ওয়েট করবো!

প্রজেশ বললে—কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার লাভটা কী? তার রাগ ভাঙাতে যাবে নাকি?

পর্মিলি বললে—কী যা তা বলছো! তোমার কথার উত্তর দিতেও আমার ঘেন্না হয়। আমি চলি—

বাগানের সামনে গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জগন্নাথ। পর্মিলি সেই দিকেই এগিয়ে গেল। প্রজেশ পেছন-পেছন গেল। আরো একবার বোঝাবার চেষ্টা করলে। বললে—সত্যিই তুমি মাধব কুণ্ডু লেনে যাচ্ছো?

পর্মিলি আর কিছু না বলে গাড়িতে উঠলো। শুধু বললে—হ্যাঁ—

প্রজেশ বললে—আমি বুঝতে পারছি না তার ওপর তোমার কিসের এত এ্যাট্রাকশান—

পর্মিলি বললে—কে বললে এ্যাট্রাকশান? আমি কি তাই বলেছি?

প্রজেশ বললে—মুখে তুমি না-ই বা বললে, কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি আমি! তার সঙ্গে কি এত মেলামেশা মানায়? তুমি কী আর সে কী!

পর্মিলি এ-কথার কোনও উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলে না। শুধু বললে—জগন্নাথ, চলো—স্টার্ট দাও—

কিন্তু জগন্নাথ স্টার্ট দেবার আগেই প্রজেশ বললে—কিন্তু জানো তুমি, তোমার সেই সুরেন কী রকম ছেলে?

পর্মিলি প্রজেশের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে চাইলে। বললে—তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। সে গরীব আন্-এমপ্লয়েড্ ছেলে—

প্রজেশ হাসলো। বললে—শুধু ওইটুকুই জানো, কিন্তু আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি জানি—

পর্মিলি বলে উঠলো—কী জানো তুমি, বলো।

প্রজেশ বললে—না, বলবো না। তার বিরুদ্ধে কিছু বললে তুমি আবার রাগ করবে—

পর্মিলি বললে—না, রাগ করবো না, তুমি বলো—

প্রজেশ বললে—সকলের সামনে সে-কথা বলা যায় না—

পর্মিলি এবার যেন সচেতন হয়ে উঠলো। বললে—তার মানে? হোয়াট ডু ইউ মীন্? বলে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে প্রজেশের মুখোমুখি দাঁড়ালো। বললে—এখানে তো কেউ নেই, বলো কী বলবে?

প্রজেশ বললে—এসো এদিকে সরে এসো; জগন্নাথ শুনতে পাবে।

পর্মিলি প্রজেশের সঙ্গে পায়ে-পায়ে আর একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—এবার বলো—

প্রজেশ বললে—তুমি যেন শেষকালে আবার আমাকে দোষ দিও না। তুমি জিজ্ঞেস করলে বলেই বলছি। তোমার সুরেন সান্ন্যাল ভদ্রলোকটি সুবিধের নয়।

—কেন, সুবিধের নয় কেন?

প্রজেশ বললে—আমাদের পাড়ার গলিতে বস্তি আছে জানো তো?

পর্মিলি বললে—হ্যাঁ দেখেছি, মেয়েমানুষের বস্তি—

প্রজেশ বললে—তোমাব সুরেন সান্ন্যাল ভদ্রলোকটিকে সেদিন সকালবেলা সেই বস্তির সামনেই দেখলাম।

—মেয়েমানুষের বস্তির সামনে!

প্রজেশ হাসলো। বললে—হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি?

—বস্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে কী করছিলো?

প্রজেশ বললে—মেয়েমানুষের বস্তির সামনে দাঁড়িয়ে লোকে যা করে তাই-ই করছিল। মেয়েমানুষের দর করছিল।

—তুমি ঠিক বলছো?

প্রজেশ বললে—আমি মিছিমিছি তার বিরুদ্ধে বলতে যাবোই বা কেন? সে তো আমার কেউ নয়। তোমার ভালোর জন্যই বললুম। ইট্স্ ফর ইওর গুড্—

পর্মিলি আর কিছু বললে না। শরীরটা ঘুরিয়ে আবার নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। তারপর বললে—চলো জগন্নাথ, তাড়াতাড়ি। দেরি হয়ে গেছে-

রিক্শাটা গলির ভেতর একটা একতলা বাড়ীর সামনে আসতেই কালীকান্ত চিৎকার করে উঠলো—এই রিক্শাওয়ালা. রোখকে রোখকে, হিঁয়া ঠায়রো—

রিক্শার উপরে বসে সুরেন চেয়ে দেখলে বাড়িটার দিকে। ঠিক একতলা বাড়ি নয়। তার সঙ্গে খানিকটা টিনের চালের বাড়িও লাগানো আছে।

কালীকান্ত দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো—কই, কোথায় গেলে, দরজা খোল,

দরজা খোল—

এতদিন পরে এমন করে যে সুখদার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবা যায়নি। আর সুখদাও হয়ত ভাবতে পারেনি যে এই অবস্থায় দেখা হয়ে যাবে সুরেনের সঙ্গে।

সে যে কী অদ্ভুত দৃশ্য! সুরেনেরই লজ্জা করছিল। সেই অত বড় একটা ভারি মানুষকে কি কোল থেকে নামানো যায়! মাতাল হলে মানুষ আরো ভারি হয়ে যায়। মরলে যেমন মানুষ ভারি হয়ে যায় ঠিক তেমনি।

কালীকান্ত বললে—নামাও, রিক্‌শাওয়ালা নামাও—

রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শার হ্যান্ডেলটা রাস্তায় নামাতেই কালীকান্ত নরেশ দত্তকে ধরে ফেললে।

নরেশ দত্ত চিৎকার করে উঠলো—কে? কে তুমি?

কালীকান্ত বললে—এই যে ছোড়দা, আমি! আমি কালীকান্ত—

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—তুমি চুপ করে বসে আছ কেন ঠুঁটো জগন্নাথের মত? ধরো না একটু, ধরতে পারছো না?

সুরেনও ধরলে নরেশ দত্তকে।

ওদিকে একতলা বাড়িটার সদর দরজা খুলে গেছে। সুরেন চেয়ে দেখলে কাঠের পুতুলের মত পাল্লা দুটো ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুখদা! সেই সুখদা! যেন আগের চেয়ে আরো অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। কিংবা হয়ত অন্ধকারে ভালো করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বলে অত রোগা দেখাচ্ছে!

নরেশ দত্তকে ধরে দু'জনে মিলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। বাড়ি মানে ঘর। বাড়িতে ঢোকবার মুখেই একটা ঘর। সেখানে একটা তক্তপোষ পাতা। তক্তপোষের ওপর ময়লা একটা বিছানা পাতা।

ধরে ধরে নরেশ দত্তকে সেখানেই শুইয়ে দিলে কালীকান্ত। বিছানার ওপর শোয়াতেই নরেশ দত্ত গড়াতে লাগলো। আর কাঁদতে লাগলো। সুরেন বুঝতে পারলে ওটা নেশার কান্না। নেশার ঝোঁকে সুরেন ও-রকম করে মাতালদের অনেক কাঁদতে দেখেছে।

কালীকান্ত সান্ত্বনা দিতে লাগলো ছোড়দাকে।

বললে—ছোড়দা, কেঁদো না, চুপ করে ঘুমোও—এ আমার বাড়ি—

নরেশ দত্ত বলতে লাগলো—আমি ঘুমোব না রে, আমার বড় কান্না পাচ্ছে—

কালীকান্ত বললে—কেন, কী হয়েছে তোমার? কান্না পাচ্ছে কেন?

সুরেন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কী করবে বুঝতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে তার কী করণীয় তা সে ঠিক করতে পারছিল না। রাতও অনেক হয়েছিল। এত রাত্রে আবার সেই মাধব কুণ্ডু লেনে ফিরে যেতে হবে। অনেকখানি রাস্তা। আর তাছাড়া এখানে তো তার কাজও কিছু নেই। এখানে এমনি করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে করবেই বা কী!

কিন্তু চলেই বা যাবে কী করে। একটা অনুমতিও তো নিতে হয়।

সমস্ত ঘরখানার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো সুরেন। বেশ পরিপাটি করে গুছোন ঘর। এখানে বোধহয় থাকে সুখদা! ঘরের এককোণে একটা দেয়াল আলনা। আলনার ওপর কোঁচানো শাড়ি রয়েছে। তার পাশে একটা আয়না ঝুলছে দেয়ালে। টিনের আয়না। দেয়ালের সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে।

সুরেন বললে—তাহলে আমি যাই কালীকান্তবাবু—

কালীকান্ত বিশ্বাস তখনও ছোড়দাকে পরিচর্যা করতে ব্যস্ত।

সুরেন সুখদার দিকে চেয়ে বললে—কেমন আছ?
সুখদা অন্যদিকে চোখ দিয়ে সব দেখছিল। সুরেনের কথায় মুখ ফেরাল। বললে—তোমার সঙ্গে এদের দেখা হলো কী করে?
সুরেন বললে—আমি অনেক দিন ধরেই তোমার খোঁজ করছিলাম। সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলুম নরেশবাবুকে।
সুখদা জিজ্ঞেস করলে—তুমি নরেশবাবুকে চিনলে কী করে?
সুরেন বললে—নরেশবাবু তো আমার মামার কাছে প্রায়ই যান—।
সুখদা আবার জিজ্ঞেস করলে—মা-মণি কেমন আছে?
সুরেন বললে—মা-মণির কথা তোমার এখনও মনে আছে?
সুখদা বললে—মনে থাকবে না?
সুরেন বললে—মা-মণির খুব অসুখ। সেই কথা জানাতেই আমি তোমার খোঁজ করছিলুম।
—কী অসুখ?
সুরেন বললে—খুব শক্ত অসুখ। বোধহয় আর বেশি দিন বাঁচবে না। এক-দিন তো মা-মণিকে দেখতেও যেতে পারো! তোমার নাম খুব করে মা-মণি!
সুখদা খানিক চুপ করে রইল।
ওদিকে কালীকান্ত বিশ্বাস তখন ছোড়দাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু নরেশ দত্ত কিছুতেই ঘুমোবে না।
বলছে—আমি কি শালা তোর এখানে ঘুমোতে এসেছি?
কালীকান্ত বলছে—তোমাকে ঘুমোতে বলছি না, কিন্তু এখন তোমার শরীর খারাপ, যাবে কী করে?
নরেশ দত্তর যেন হঠাৎ জ্ঞান হলো। জিজ্ঞেস করলে—সেই শালা কোথায়? সেই ম্যানেজারের ভাগ্নে শালা?
কালীকান্ত বললে—সুরেনের কথা বলছো? ওই তো দাঁড়িয়ে আছে—
নরেশ দত্ত বিছানার ওপর শুয়ে শুয়েই ঘুঁষি পাকাতে লাগলো। বললে—ওই শালাকে আমি আজ মেরে ফেলবো। নির্ঘাত মেরে ফেলবো।
কালীকান্ত বললে—কেন, ওকে মারবে কেন? ও কী করেছে?
নরেশ দত্ত বললে—ওকে তুই নিয়ে আয় আমার কাছে, নিয়ে আয়—
কালীকান্ত বললে—এসো হে ব্রাদার, এসো—কাছে এসো।
সুরেন আস্তে আস্তে নরেশ দত্তর কাছে এগিয়ে গেল। কালীকান্ত বললে—এসো, আরো কাছে এগিয়ে এসো—
সুরেন আরো কাছে এগিয়ে গেল।
নরেশ দত্ত বললে—এই ভাগ্নেশালাই যত নষ্টের গোড়া রে কালীকান্ত। একে ছাড়িসনি—
সুরেন বলে উঠলো—আমি কী করলুম নরেশবাবু?
নরেশ দত্ত বললে—তোর মামাবেটাই তো আসল পাণ্ডা!
সুরেন বললে—মামা কী করেছে তার জন্যে আমি কেন দায়ী হবো! আমার মামা যদি কিছু দোষ করে থাকে তো মামাকে গিয়ে বলুন না!
কালীকান্ত বললে—মামাকে আমরা বলবো কেন, তুমিই গিয়ে বলো না ব্রাদার—
সুরেন বললে—আমি কী বলবো?
কালীকান্ত বললে—বলবে মা-মণির সম্পত্তি সুখদা পাবে।

সুরেন বললে—তা পাক না সুখদা, আমার কী! আমি কি বলেছি সুখদা পাবে না? আমি মা-মণির সম্পত্তির এক কণাও চাই না—সবই সুখদা নিক! আমি তো আপনাদের সকলের সামনেই বলে যাচ্ছি—

নরেশ দত্ত বললে—সব মিথ্যে কথা রে কালীকান্ত, তুই ওর কথা কিছু বিশ্বাস করিসনি!

সুরেন বললে—বিশ্বাস করা-না-করা আপনাদের হাতে, কিন্তু যা সত্যি আমি তাই-ই বলে যাচ্ছি—

বলে সুরেন দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছিল। কালীকান্ত গিয়ে ধরলো। বললে—চলে যাচ্ছো যে বড়?

সুরেন বললে—চলে যাবো না তো কী করবো?

কালীকান্ত বললে—চলে যাবার আগে জবাব দিয়ে যেতে হবে।

সুরেন বললে—জবাব তো দিয়েছি। আবার কী জবাব দেবো?

নরেশ দত্ত এতক্ষণ শুয়ে-শুয়েই কথা বলছিল। এবার উঠে বসলো। বললে—বড় যে বড়-বড় কথা! এদিকে আয়!

সুরেন বললে—আপনারা কি আমাকে একলা পেয়ে ভয় দেখাচ্ছেন নাকি?

কালীকান্ত তখন সুরেনের একখানা হাত ধরে ফেলেছে। বললে—হ্যাঁ, ভয় দেখাচ্ছি—তুমি আমাদের সঙ্গে পারবে?

এবার সুরেন সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। ঘরের মধ্যে তিনজন, আর সে একলা! আশেপাশের বাড়ির ভেতরে কারা থাকে তাও জানা নেই। কেন সে এখানে এল? কী দরকার ছিল তার এখানে আসার? সুখদাই বা তার কে? সুখদার দিকে চেয়ে দেখলে একবার। সে একপাশে তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। তার মুখের ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না।

নরেশ দত্ত এবার টলতে টলতে উঠলো। উঠে এসে ধরলো সুরেনকে। তারপর কালীকান্তকে ডাকলে—কালীকান্ত, শোন্ এদিকে, শালাকে আজ নিকেশ করবো—

নরেশ দত্ত মদ খেলে কী হবে, গায়ের জোর আছে বেশ। কিন্তু সুরেনের মনে হলো এক্ষুনি যদি সে ধাক্কা দেয় তো নরেশ দত্ত আবার আগেকার মত মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

সুরেন বললে—আমাকে ছাড়ুন বলছি, আমি আপনাকে ঠেলে ফেলে দেবো—

নরেশ দত্ত ক্ষেপে গেল এবার। বললে—কী? এত বড় আস্পর্ধা, আমাকে ঠেলে ফেলে দিবি?

সুরেন বললে—ভুলে যাবেন না আপনি মদ খেয়েছেন, আপনার গায়ে এখন জোর নেই—

—কী? আমি মদ খেয়েছি? আমি মাতাল?

বলে চিৎকার করে ডাকলে—কালীকান্ত, কোথায় গেলি তুই? এ্যাই কালীকান্ত—

কালীকান্ত পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে সামনে এল। বললে—এই তো আমি—

নরেশ দত্ত বললে—এ শালাকে আজ খুন করে ফেলবো। দে, দরজা বন্ধ করে দে। শালা আমাদের মাতাল বলে!

কালীকান্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

নরেশ দত্ত বললে—তোর কাটারিটা নিয়ে আয় এবার—

কালীকান্ত ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে কোথায় চলে গেল। তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে একটা কাটারি নিয়ে এল।

—শালার হাত-পা বেঁধে ফেল দড়ি দিয়ে।

কোত্থেকে একটা দড়িও নিয়ে এল কালীকান্ত।

নরেশ দত্ত বললে—কোথাও কেউ দেখছে না তো?

সুরেনের মনে হলো সে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু এতটা যে হবে তা সে ভাবতে পারেনি। মাতলামিরও একটা সীমা আছে। কিন্তু তার মনে হলো তারা তো মাতাল নয়, গুণ্ডা। বস্তির মধ্যে এরা যেমন করে মদ খেয়ে খুন-খারাপি করে, এও তেমনি!

সুরেনকে কালীকান্ত ধরতে আসতেই সুরেন বলে উঠলো—আমি কিন্তু এবার চেঁচিয়ে উঠবো—

—তবে রে—

বলে কালীকান্ত টুঁটি টিপে ধরলো সুরেনের। আর নরেশ দত্তও দু' হাতে সুরেনের মুখ চাপা দিয়ে দিলে।

—থামো!

হঠাৎ যেন বাঘিনীর মতন সুখদা একেবারে তিনজনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললে—থামো—

সুখদার গলার আওয়াজে নরেশ দত্ত আর কালীকান্ত বিশ্বাস দু'জনেই থেমে গেল। তাদের দু'জনকেই হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে সুখদা। সুরেনকে আলাদা করে দিয়ে আড়াল করে দিলে।

বললে—খবরদার বলছি, এর গায়ে হাত দিতে পারবে না—

নরেশ দত্তরও তখন যেন হঠাৎ নেশা কেটে গেছে। হাত গুটিয়ে পেছনে সরে দাঁড়ালো। কালীকান্ত সুরেনকে ছেড়ে দিয়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল সুখদার দিকে।

তারপর দু'জনের দিকেই চেয়ে বললে—আর এক-পা যদি এদিকে এগোবে তো ওই কাটারি দিয়ে তোমাদের মুণ্ডু কেটে ফেলবো—

তারপর নিজের হাতেই দরজার খিলটা খুলে ফেলে সুরেনকে বললে—যাও, চলে যাও—

সুরেন সুখদার দিকে খানিক চোখ তুলে চেয়ে দেখলে। চোখের ভাষায় মনের কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না তার।

সুখদা আবার বললে—চেয়ে দেখছো কী অমন করে, যাও, বেরিয়ে যাও—

বলে সুরেনকে ঠেলে বাইরে বার করে দিলে। সুখদার ঠেলা খেয়ে সুরেন বাইরে এসে পৈঁঠের ওপর দাঁড়ালো। একবার পেছন ফিরে দেখলে সুখদার দিকে।

সুখদা দরজার পাল্লা দুটো দু'হাতে ধরে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বললে—যাও, দাঁড়ালে কেন?

সুরেন বলতে গেল—সুখদা...

সুখদা তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে—মাতালদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা করে না? এখানে এসেছিলে কী করতে? খবরদার, এখানে আর কখনো এসো না।

সুরেন বললে—তুমি একবার মা-মণিকে দেখতে যাবে না সুখদা?

সুখদা বললে—সে পরে দেখা যাবে, এখন তো তুমি যাও—

সুরেন তখনও দাঁড়িয়ে রইল। বললে—কিন্তু সেই কথা বলতেই তো আমি আজ এখানে এসেছিলাম—

সুখদা বললে—তুমি দেখছি এখনও সেই রকম ছেলেমানুষই রয়ে গেলে। দেখছো না এ মাতালের আড্ডা। শুধু মাতলামি নয়, এখানে খুন-খারাপিও হয়! এখন বুঝলে তো?

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি নিজে তো এখানে রয়েছ!

সুখদা বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি আর আমি?

সুরেন বললে—কেন, তুমি কি আলাদা?

সুখদা বললে—আলাদা নয়? আলাদা না হলে মাধব কুণ্ডু লেন ছেড়ে এই মাতালের আড্ডায় আসি?

সুরেন এবার একটু যেন সাহস পেলে। জিজ্ঞেস করলে—সত্যি, কেন তুমি মাধব কুণ্ডু লেন ছেড়ে এখানে এলে সুখদা? কেন আসতে গেলে এই মাতালের আড্ডায়? কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছিল?

সুখদা বললে—এখানে দাঁড়িয়ে বাজে কথা বলবার সময় নেই আমার। তুমি যাও এখন—

সুরেন বললে—বলো না কেন তুমি চলে এলে? আমার যে জানতে বড় ইচ্ছে করে।

সুখদা বললে—ওসব কথা এখন থাক—

সুরেন বললে—তাহলে কবে বলবে বলো, আমি কবে আসবো আবার?

সুখদা বললে—আর কখনও এ-বাড়িতে এসো না। কখনও যেন আর তোমার মুখ না দেখি, যাও—

বলে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলে সুখদা। আর সেই দরজার বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুরেনের মনে হলো, যেন শুধু, শুধু, সুখদা আবার তাকে চড় কষিয়ে দিলে। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তবু ইচ্ছে হয় দরজায় একবার ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলিয়ে আবার দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে সুখদাকে। আবার কিছুক্ষণ কাটায় তার সঙ্গে কথা বলে।

কিন্তু ভেতরে বোধহয় তখন নরেশ দত্ত আর কালীকান্ত আবার মদ খাওয়া শুরু করেছে। তাকে দেখলে হয়ত আবার তাড়া করে আসবে! কিন্তু সুখদাই বা ওখানে ওদের সঙ্গে কেমন করে কাটায়! কেমন করে ওখানে কালীকান্তর সঙ্গে সংসার করে! কীসের আকর্ষণে! কালীকান্তর ওপর তার কীসের আকর্ষণ!

সুরেন ভাবনার কোনও কূলকিনারা না পেয়ে আস্তে আস্তে বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

এই কলকাতার বাইরের চেহারার আড়ালে আর একটা চেহারা আছে, সেটা সবাই দেখতে পায় না। সুরেনই কি সেই ভেতরের চেহারাটা দেখতে পেত যদি না অমন করে সেদিন সুব্রতর সঙ্গে পরিচয় হতো! সুব্রতর সঙ্গে এক ক্লাশে

না পড়লে কি পর্মিলি আর প্রজেশকেই দেখতে পেত! একদিকে পর্মিলি আর একদিকে সুখদা! বিচিত্র জীবন সব। বিচিত্র জীবন-লীলা। সমস্ত কলকাতা সহরই এই বিচিত্র জীবন-লীলার ছন্দে মুখর হয়ে রয়েছে যেন।

সেদিন হঠাৎ রাস্তায় যেতে যেতে আর একটা মিছিলের মুখোমুখি হয়ে গেল সুরেন। মিছিলটা গরম-গরম স্লোগান দিতে দিতে চলেছে।

সুরেন কান পেতে শুনতে লাগলো—

গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না—

খুব গরম-গরম স্লোগান। হাতের মুঠো উঁচু করে সবাই বলছে—চলবে না, চলবে না—

হঠাৎ দেবেশ দেখতে পেলে। সুরেনকে দেখেই দেবেশ এগিয়ে এসেছে।

বললে—কী রে, এ কী চেহারা হয়েছে তোর? এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?

সুরেন বললে—তোর কিন্তু খুব ভালো চেহারা হয়েছে। তোকে খুঁজতে একদিন তোর পার্টির অফিসে গিয়েছিলুম, তুই কোথায় ছিলি এতদিন?

দেবেশের কথা বলবার তখন সময় নেই বেশি। বললে—জেলে গিয়েছিলুম যে, তাই হেলথ্‌টা বাগিয়ে এনেছি—

—জেলে? অবাক হয়ে গেল সুরেন। বললে—জেলে কেন?

দেবেশ বললে—সিকিউরিটি প্রিজনার। ফার্স্ট-ক্লাসে ছিলুম, খুব আরাম করে থেকেছি, খেয়েছি আর ঘুমিয়েছি।

তারপর বললে—আমি যাই ভাই, একদিন আসিস—

—কোথায় যাচ্ছিস এখন?

দেবেশ বললে—রাজভবনের দিকে। একশো চুয়াল্লিশ ভাঙবো—

কথাটা বলে চলে যেতে যেতে আবার ফিরলো। বললে—একটা খবর শুনেছিস?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কী?

দেবেশ বললে—সুব্রতর বাবা পুণ্যশ্লোকবাবুর এগেন্‌স্টে এবার পূর্ণবাবু ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে জানিস? এবার মজা টের পাবে। এবার সমস্ত লেফ্‌টিস্টরা ইউনাইটেড্‌ হচ্ছে—

বলে আবার দলের সামনে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলো—

গরীব মেরে মন্ত্রী পোষা চলবে না, চলবে না—

সুরেন হাঁ করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে খানিকক্ষণ। জনা পাঁচশো লোক হবে। সবাই দেবেশের দলের ছেলে। ওদেরই দলে সুরেনকে যেতে বলেছিল দেবেশ। দলে গেলে আজ ওদেরই সঙ্গে প্রোসেশান করে রাজভবনে যেতে হতো। রাজভবনের গেটের সামনে গিয়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে হতো।

সুরেন আবার নিজের বাড়ির রাস্তা ধরে চলতে লাগলো। মিছিলের জন্যে ট্রাম-বাস সব কিছু থেমে গেছে। অচল হয়ে গেছে কলকাতা সহর। কেন ওরা এ-রকম করে সকলকে অসুবিধেয় ফেলে! এতে ওদের কীসের লাভ!

যাক্‌ গে! সুরেন ভাবনাটা গা-ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে চাইলে। তার নিজেরই কত ভাববার রয়েছে। নিজেই বি-এ পাশ করে বসে আছে। একটা চাকরি-বাকরি কিছু নেই। সে কেন এত সব ভাবতে যাবে!

অথচ দেবেশ বলতো—তোদের জন্যেই তো এখনও এই সব জোচ্চুরি চলছে, নইলে সব কবে ঠিক-ঠাক হয়ে যেত!

সুরেন বলতো—কিন্তু বেশ তো চলছে সব—কোথায় জোচ্চুরি?

দেবেশ বলতো—জোচ্চুরি তো চারদিকেই চলছে। দেখতে পাচ্ছিস না? নইলে বাঙালীর এত কষ্ট কেন? এই যে তুই এতদিন বি-এ পাশ করে বসে আছিস, তা একটা চাকরি জোগাড় করতে পারছিস না কেন? তোর মত কত লাখ-লাখ ছেলে বেকার বসে আছে, তা জানিস? কাদের দোষে তারা চাকরি পায় না? তারা কী দোষ করেছে? তারা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? তাদের চাকরি দেওয়া কি স্টেটের ডিউটি নয়?

অত-শত কথা নিয়ে এখনও মাথা ঘামায়নি সুরেন। তার নিজের সমস্যা-গুলোই জীবনে পাহাড় হয়ে উঠে তাকে বার বার পাগল করে তুলেছে। শুধু কি নিজের সমস্যা? সুখদার সমস্যা, পর্মিলির সমস্যা, সব কিছুই তাকে বিব্রত করেছে বার বার। কেন এমন হবে? কেন সবাই ভালো হবে না? কেন সবাই সৎ হবে না? সবাই ভালো হলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

সেদিন রাত্রে সুখদাদের বাড়ি থেকে ফেরার পর যখন মাধব কুণ্ডু লেনের কাছে এসেছে, হঠাৎ দেখলে পর্মিলির গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে জগন্নাথ নেই, কিন্তু ভেতরে পর্মিলি বসে আছে।

তাড়াতাড়ি গাড়িটার পাশে গিয়ে সুরেন জিজ্ঞেস করলে—এ কি পর্মিলি, তুমি?

পর্মিলি বললে—জগন্নাথকে ভেতরে পাঠিয়েছি তোমাকে ডাকতে—

সুরেন তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরেই যাচ্ছিল, কিন্তু পর্মিলি বললে—না, সে এখুনি ফিরে আসবে, তুমি গাড়ির ভেতরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

সুরেন গাড়ির দরজাটা খুলে ভেতরে পর্মিলির পাশে উঠে বসলো।

পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—এত রাত্তিরে কোথা থেকে আসছো?

সুরেন বললে—এক জায়গায় গিয়েছিলুম—ফিরতে দেরি হয়ে গেল—

পর্মিলি বললে—ফিরতে বুঝি তোমার রোজই এমনি রাত হয়?

সুরেনের হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে—তুমি হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছো যে?

—কেন, জিজ্ঞেস করতে নেই?

সুরেন বললে—না, তা বলছি না। এই তো সন্ধ্যেবেলাই তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তবু যে আবার এলে আমাদের বাড়িতে!

পর্মিলি বললে—আমি নিজের চোখেই দেখতে এলুম তুমি কত দেরি করে বাড়ি ফেরো।

সুরেন হাসলো। বললে—তুমি যদি আমার গার্জেন হতে তাহলে কিন্তু সত্যিই আমার খুব মুশকিল হতো—!

পর্মিলি বললে—না, হাসির কথা নয়, তুমি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

সুরেন বললে—তার জবাবদিহি কি তোমার কাছে দিতে হবে?

পর্মিলি বললে—মনে করো না-হয় তাই-ই!

সুরেন বললে—কিন্তু যদি বলি কোনও মেয়ের কাছে গিয়েছিলুম, তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?

পর্মিলি বললে—তাহলে প্রজেশ যা বলেছিল তা সত্যি?

সুরেন বললে—প্রজেশবাবু তোমায় কী বলেছিলেন, তা আমি কী করে জানবো? তিনি মিথ্যে কথাও তো বলতে পারেন।

পমিলি বললে—আমি কিন্তু তোমায় সচ্চরিত্র বলে জানতুম!

সুরেন বললে—অসচ্চরিত্র হলে বুঝি আমাকে তোমার সঙ্গে আর মিশতে দেবে না?

পমিলি বললে—দেখ, নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে নেই। আমি মদ খাই, ড্রিংক করি, কিন্তু কখনও বলে বেড়াই না যে, আমি সন্ন্যাসী সাধু-মানুষ—

সুরেন বললে—তোমার নিজের সম্বন্ধে অত সাফাই গাইছো কেন? আমি কি কিছু জিজ্ঞেস করেছি? আর তাছাড়া তুমি ড্রিংক করলে আমারই বা কী, আর আমি চরিত্রহীন হলে তোমারই বা কী! তাতে আমাদের দু'জনের কারোরই তো কিছু এসে যায় না।

পমিলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—না, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

সুরেন পমিলির দিকে ঝুঁকে পড়ে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—তুমি বলছো কী পমিলি?

পমিলি বললে—হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি—

সুরেন বললে—কিন্তু আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না!

পমিলি বললে—তোমার বিশ্বাস না হলে আমি কী করতে পারি! কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি আজ এক ফোঁটা ড্রিংক না করেই বলছি। তুমি চলে আসার পর আমি আজ প্রজেশের সঙ্গে আবার ঝগড়া করেছি।

সুরেন বললে—তোমার সঙ্গে প্রজেশবাবুর বিয়ে হবে, সুতরাং ঝগড়া হলেই বা কী, আর না-হলেই বা কী!

পমিলি বললে—না, ঝগড়া করেছি তোমাকে নিয়ে!

—আমাকে নিয়ে? আমাকে নিয়ে মানে?

এতক্ষণে হঠাৎ জগন্নাথ এসে হাজির। তারপর সুরেনকে গাড়ির ভেতরে বসে থাকতে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলে।

পমিলি বললে—জগন্নাথ, গাড়ি ঘুরিয়ে নাও, ঘুরিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে চলো—

সুরেন বললে—এত রাত্রে মাঠে?

পমিলি কিছু উত্তর দিলে না। জগন্নাথ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রাম-রাস্তা ধরে সোজা ময়দানের দিকে চলতে লাগলো। সেই বিকেলবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সুরেন। তারপর পমিলিদের বাড়ি থেকে মাধব কুণ্ডু লেন পর্যন্ত এসে আবার নরেশ দত্তর সঙ্গে সুখদাদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। এখন আবার চলেছে ময়দানের দিকে।

সমস্ত রাস্তাটা পমিলি একটা কথাও বললে না। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সুরেন যে, এত জায়গা থাকতে বা এত লোক থাকতে পমিলি তার বাড়িতেই বা এত রাত্রে এল কেন? এমন তো হবার কথা নয়। সে তো এমন কেউকেটা নয় যে তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে পমিলির মত মেয়ে এত দূরে দৌড়ে আসবে?

—পমিলি!

সুরেন বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারছিল না। আবার ডাকলে—পমিলি—

পমিলি যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠলো। উত্তর দিলে—কী?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—এত রাত্রে ময়দানে চললে কেন?

পর্মিলি বললে—ওখানে বেশ খোলা-হাওয়া আর নিরিবিলি—

এও বড় বিচিত্র বলে মনে হলো সুরেনের কাছে। খোলা-হাওয়া আর নিরিবিলি বলে সুরেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে সেখানে! সঙ্গে যাবার লোকের কি অভাব ছিল পর্মিলির। কলকাতা সহরের কে না রাজী হবে পর্মিলির মত মেয়ের সঙ্গে রাত্রে গাড়িতে করে ঘুরতে! প্রজেশ সেনও তো ছিল। তাকে নিয়েও তো যেতে পারতো সে। তা না করে বেছে বেছে সুরেনকেই বা কেন তুলে নিলে গাড়িতে! পর্মিলির সঙ্গে সুরেন! সংসারে সুরেনের তুলনায় একটা পোকারও দাম বেশি। একটা পোকারও সুরেনের চেয়ে বেশি বাঁচবার অধিকার আছে! সুরেনের এমন কী গুণ আছে যার জন্যে সুরেনকেই বেছে নিয়েছে পর্মিলি!

গাড়িটা গিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের চওড়া রাস্তার নির্জন নিরিবিলিতে ব্রেক কষলো।

পর্মিলি বললে—জগন্নাথ, তুমি একটু ঘুরে এসো—

জগন্নাথ সবিনয়ে গাড়ি ছেড়ে কোথায় পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরেনের বুকটা কেমন যেন এক অজানিত ভয়ে দুর-দুর করে কেঁপে উঠলো। এত রাত্রে, এত অন্ধকারে, এত কাছাকাছি ঘেঁষে সুরেন আর কখনও বসেনি কোনও মেয়ের সঙ্গে।

পর্মিলি জিজ্ঞেস করলে—এবার বলো, কোথায় গিয়েছিলে সন্ধ্যেবেলা।

সুরেন বললে—এই আলোচনা করতেই কি তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে?

পর্মিলি বললে—যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও—

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি আগে বলো আমাকে নিয়ে প্রজেশবাবুর সঙ্গে তোমার কেন ঝগড়া হলো?

পর্মিলি বললে—আমি জানতুম তোমার সঙ্গে কমিউনিষ্টদের ভাব আছে, কিন্তু তুমি যে মেয়েমানুষের বাড়ি যাও তা আমার জানা ছিল না।

—কমিউনিষ্টদের সঙ্গে আমার ভাব আছে? আমি মেয়েমানুষের বাড়ি যাই? তুমি এ-সব বলছো কী?

পর্মিলি বললে—সত্যি কিনা শুধু তাই বলো, আর কিছু শুনতে চাই না—

সুরেন হেসে উঠলো শব্দ করে। বললে—ধরো আমি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিশি, আরো ধরো আমি মেয়েমানুষের বাড়ি যাই, কিন্তু তাতে তোমার কী? তাতে তোমার আমি কী ক্ষতি বৃদ্ধি করলুম? আমি তোমার কে?

পর্মিলি বললে—তাহলে যা শুনেছি সব সত্যি কথা?

সুরেন বললে—কার কাছে এ-সব শুনেছ বলো তো ঠিক করে?

পর্মিলি বললে—যে বলেছে সে তোমার নামে মিথ্যে বলতেই বা যাবে কেন? সে নিজের চোখে সব দেখেছে।

সুরেন বললে—মেয়েমানুষের বাড়ি যাওয়া না-হয় দোষের বুঝতে পারলুম, কিন্তু কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মেশাও কি দোষের? তারা কি মানুষ নয়?

—তাহলে স্বীকার করছো সব সত্যি?

সুরেন বললে—আমি বুঝতে পারছি না এ নিয়ে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? আমার ভালো-মন্দের দায়িত্বটাও কি তোমার?

পর্মিলি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কমিউনিষ্টদের সঙ্গে বাবার চিরকালের ঝগড়া তা তুমি জানো!

—কিন্তু আমার ক্লাশফ্রেন্ড যদি কমিউনিষ্ট হয়, তার সঙ্গে কথা বলাও

পাঁপ? সে তো সুব্রতরও ক্লাশফ্রেন্ড! আমরা তো সবাই এক স্কুলে এক সঙ্গে এক ক্লাশেই পড়েছি—

—তার নাম কী?

সুরেন বললে—দেবেশ!

—তুমি যদি তারই ক্লাশফ্রেন্ড তাহলে আমাদের বাড়িতে তুমি আসো কেন?

সুরেন অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের বাড়ি আসতে গেলে কি দেবেশের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়তে হবে?

পমিলি বললে—তুমি জানো বাবার লাস্ট ইলেকশানের সময় তারা বাবাকে গালাগালি দিয়েছিল, আমারও বদনাম রটিয়েছিল—

সুরেন বললে—আমি সে-সব কিছুই জানি না।

পমিলি বললে—তুমি না জানলেও সুব্রত সব জানতো—

সুরেন বললে—কিন্তু আমি তো কমিউনিষ্ট নই! আমি কী দোষ করলুম! ইলেকশানের সময় আমি খুব ব্যস্ত ছিলুম লেখাপড়া নিয়ে, তখন কোনওদিকে নজর দেবার সময়ই ছিল না আমার! আর সুব্রতও আমাকে কিছু বলেনি। আর তা ছাড়া আমি তো ওদের পার্টির মেম্বারও নই—

—কিন্তু প্রজেশ তোমাকে ওর সঙ্গে মিশতে দেখেছে।

সুরেন বললে—তার সঙ্গে মেশাই যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো আমি নিরুপায়। আমার নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর কারো এক্তিয়ার আমি সহ্য করবো না। তাতে যদি তুমি রাগ করো তো কী করতে পারি। তার চেয়ে বলো আমি তোমার গাড়ি থেকে নেমে যাই—

বলে সত্যিই গাড়ির দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল। পমিলি তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে।

বললে—এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছো?

সুরেন বললে—তুমি এই সব কথা বলবার জন্যেই বুঝি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে?

পমিলি বললে—পাগলামি কোর না, উঠে এসো—

পমিলি তখনও সুরেনের হাতটা ধরে আছে।

সুরেন বললে—আমার স্বাধীন ইচ্ছে বলে কি কোন জিনিস নেই?

পমিলির গায়ে কিন্তু জোর আছে খুব। খুব জোরে সুরেনের হাত ধরে টানতে লাগলো।

বললে—এসো বলছি—

সুরেন বললে—তোমার কথা শুনে বুঝি আমাকে চলতে হবে?

পমিলি বললে—কেলেঙ্কারি কোর না, আশেপাশে অনেক গাড়িতে লোক-জন রয়েছে, তারা দেখছে—

সুরেন বললে—দেখুক, আমি কাউকে কেয়ার করি না। আর যদি বেশি পীড়াপীড়ি করো তো আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করবো—

পমিলি সুরেনের হাতটা ধরে আরো জোরে টেনে আনলো। তারপর নিজের রুমালটা দিয়ে সুরেনের মুখটা জোরে চাপা দিয়ে বললে—এবার দেখি কত চেঁচাতে পারো, চেঁচাও—

সুরেনের মুখ বন্ধ। পমিলির হাত থেকে নিজের মুখটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পমিলি তাকে তখন গাড়ির ভেতরে সম্পূর্ণ টেনে নিয়েছে। অন্য হাত দিয়ে সুরেন তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করছে।

—কী হলো? পর্মিলি কী করছো?

কখন যে প্রজেশের গাড়িটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা কেউই দেখতে পায়নি।

সুরেন এতক্ষণে পর্মিলির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যেন বাঁচলো।

প্রজেশ বললে—তোমার গাড়িটা দেখেই দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম নিশ্চয়ই মিস্টার সান্যালকে নিয়ে বেড়াতে এসেছ!

পর্মিলি বললে—তুমি আবার এখানে এলে কেন?

প্রজেশ বললে—তোমরা মারামারি করছো দেখে—

পর্মিলি বললে—তুমি এখন যাও প্রজেশ। আমাদের দু'জনের কিছু কথা আছে—

প্রজেশ বললে—চলো না কোনও বারে যাই—

সুরেন তখনও হাঁফাচ্ছিল। বললে—দেখুন মিস্টার সেন, আপনারা দু'জনে বরং কথা বলুন, আমি যাই—রাত হয়ে গেছে—আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—

—সে কী! কলকাতা সহরে আবার রাত কী!

সুরেন বললে—না, বাড়িতে আমার মামা রাগ করবে। আমাদের বাড়ির মা-মণির খুবই অসুখ চলছে। কখন কী হয় বলা যায় না। হয়ত আমার খোঁজ করবে সবাই—

প্রজেশ বললে—পর্মিলি, তুমি ও'কে বাড়ি পাঠিয়ে দাও, মিছিমিছি কেন ট্রাবল্ দিচ্ছ ও'কে?

তারপরে সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—আপনি এ-যুগের মানুষ, না কী! জীবন কতটুকু? মানুষের লাইফের আয়ু কতটা? যত কম সময়ে পারেন সেটাকে ভোগ করে নেবেন তো! দেখছেন না কত গাড়ি জমা হয়েছে এখানে। এরা সবাই শিক্ষিত ভদ্রলোক, সবাই লাইফকে চুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলতে এসেছে এখানে। ভগবানের অনেক আশীর্বাদে একবার যখন মানুষ-জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, তখন সেটাকে ভালো করে সদ্ব্যবহার করুন। ঘুম তো সারা জীবন ধরেই রয়েছে, আপনি যত ইচ্ছে পারেন ঘুমোন না, কেউ বারণ করবে না। যখন বুড়ো হবেন, তখন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ঘুমোবেন। কিন্তু এই বয়েসের এই রাতগুলো তো আর ফিরবে না!

সুরেনের আজো মনে আছে প্রজেশ সেনের সেদিনকার সেই কথাগুলো। কথাগুলোর মধ্যে যে যুক্তি ছিল না তা নয়। কিন্তু শয়তানেরও তো একটা যুক্তি থাকে।

পর্মিলি বললে—কাকে ও-সব কথা বোঝাচ্ছো প্রজেশ, ও কি ভাবছো ও-সব কথা জানে না?

প্রজেশ হেসে উঠলো। বললে—সত্যিই তো, কাকেই বা আমি বোঝাচ্ছি—

পর্মিলি বললে—সেদিন তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ?

প্রজেশ বললে—হ্যাঁ, দেখেই তোমাকে তো এসে বললুম—তুমিই তো বলতে, সুরেন সাদাসিধে সৎ ছেলে।

সুরেন এ-সব কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না। দু'জনের মধ্যে পড়ে যেন কেমন হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল।

বললে—আপনারা কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না—

পর্মিলি বললে—বাইরেই তুমি এই রকম সাদাসিধে সেজে থাকো, এবার তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি। আসলে সুব্রতও তোমাকে চিনতে পারেনি।

সুরেন বললে—হঠাৎ আমাকে নিয়ে তোমরা দুজনে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বুঝতে পারছি না। আমি তো তোমাদের কাছে জোর করে মিশতে আসিনি। তুমিই তো আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এখানে এলে। কে আমাকে আনতে বলেছিল?

পমিলি হেসে উঠলো। প্রজেশকে বললে—দেখ দেখ, প্রজেশ দেখ, কত ভালোমানুষ সাজছে!

সুরেন অবাক হয়ে গেল এদের কাণ্ড দেখে। পমিলি কত বড়লোকের মেয়ে, প্রজেশও কত বড় চাকরি করে। দুজনেরই টাকা আছে। একজনের বাপের টাকা, আর একজনের নিজের চাকরির টাকা! কিন্তু জীবন কি শুধু এইভাবে সময় নষ্ট করবার জন্যে! অনেক দিন থেকেই তো সুরেন এদের দেখে আসছে। এ-ছাড়া কি এদের অন্য কোন ভাবনা নেই, অন্য কোনও কাজ নেই! এমনি করেই কি এরা দিন কাটায়! হয়ত তাই। হয়ত এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশে-পাশে এখন যত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সকলেই তাই। সকলেরই টাকা আছে, অথচ সবাই বেকার। এরা হয়ত কেউই সময় কাটাবার উপায় খুঁজে পায় না। গাড়ির ভেতরে সোডাওয়ালারা সোডার বোতল সাপ্লাই করে যাচ্ছে। গল্প চলছে, হাসি চলছে, হল্লা চলছে। ফুলের মালা বিক্রি করার জন্যে ঘুর-ঘুর করছে ফেরি-ওয়ালারা। এত ফুল কিনছে কেন সবাই। ফুলের মালা নিয়ে এরা কী করবে!

হঠাৎ এক সময় মনে হলো গাড়িটা চলতে আরম্ভ করেছে।

সুরেন বললে—আমাকে বাস রাস্তায় নমিয়ে দাও. আমি নেমে যাই—

চারদিকে লক্ষ্য করে দেখলে প্রজেশ নেই. জগন্নাথ গাড়ি চালাচ্ছে। আর তার পাশে বসে আছে পমিলি!

পমিলি বললে—তোমাকে বাড়িতেই পৌঁছিয়ে দিচ্ছি—

এতক্ষণে সুরেনের যেন খেয়াল হলো. সে তার বাড়ির সামনেই এসে গেছে। নিজের ভাবনাতেই বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে। এতক্ষণ কোনও খেয়ালই ছিল না তার। মনে হচ্ছিল সমস্ত কলকাতার মানুষগুলো কি এদের মতন! বাইরে থেকে তো বেশ চাকচিক্য। বাইরে সবাই ব্যস্ত। সবাই যেন ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

কিন্তু কোথায় কীসের সন্ধানে যে ছুটে চলেছে তা কেউ জানে না। কারোর সংগেই কারো যেন কোনও প্রভেদ নেই। সেই সুখদাও যেমন, এই পমিলিও তেমন। সেই কালীকান্তও যেমন, ওই প্রজেশও তেমন। তফাতটুকু শুধু যা বাইরেতেই. ভেতরে সেই একই আদিম প্রবৃত্তি।

সুরেন একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে—প্রজেশবাবু চলে গেছেন?

পমিলি বললে—এত সকাল-সকাল বাড়ি যাবে সে?

সুরেন অবাক হলো—সকাল-সকাল বলছো কেন?

পমিলি বললে—প্রজেশের তো সন্ধ্যেবেলাই সকাল শুরু হয়!

সুরেন বললে—তোমারও তো তাই—

পমিলি বললে—কিছু ভালো লাগে না আমার। আমারও ভালো লাগে না, প্রজেশেরও ভালো লাগে না।

—কোন কিছু ভালো লাগে না? তোমাদের তো আমার মতন টাকার অভাব নেই। আমার মত পরের গলগ্রহ হয়েও বেঁচে থাকতে হয় না—

পমিলি বললে—তা থাকলেই বোধহয় ভালো হতো। একটা কিছু নিয়ে ভাবতে পারতুম।

—তাহলে পড়াশোনাটা ছেড়ে দিলে কেন?

পর্মিলি বললে—পড়াশোনাটাও ভালো লাগলো না। আসলে কিছুই ভাল লাগে না আমার। কারোর কিছুই ভাল লাগে না।

সুরেন বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

পর্মিলি বললে—কী?

—প্রজেশবাবুকে তুমি বিয়ে করো না কেন? ওঁর সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা! তোমার সঙ্গে তো বিয়ের সব ঠিকই হয়ে গিয়েছিল!

ততক্ষণে বাড়ি এসে গিয়েছিল।

পর্মিলি বললে—তুমি এখন বাড়ি যাও, তোমার অনেক রাত করে দিলুম—

সুরেন বললে—কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। এতক্ষণ কেবল তাই-ই ভাবছিলুম। এই যে কলকাতায় এত বড়-বড় লোক, তারা সব কি তোমার মতন?

—আমার মতন মানে?

সুরেন বললে—এই যে আমাকে নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরলে, আজেবাজে কত কথা বললে, এক গ্যালন পেট্রল পোড়ালে, তারাও কি তাই করে? তাদেরও কি তোমার মতন সময় কাটতে চায় না? তারাও বুঝি তোমার মতন জীবনের মানে খুঁজে পায় না?

পর্মিলি হাসলো। বললে—অনেক রাত হয়ে গেছে, অন্য একদিন এর উত্তর দেবো, আজ থাক—

বলে থেমে গেল পর্মিলি। জগন্নাথ গাড়িটা স্টার্ট দিলে আবার। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

সুরেন খানিকক্ষণ সেখানে সেই দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে পর্মিলির এই ব্যবহারটার মানে বোঝবার চেষ্টা করলে। কেনই বা পর্মিলি তাদের বাড়িতে এল। আবার কেনই বা তাকে নিয়ে খানিকটা ঘুরলো। আবার একসময় ক্লান্ত হয়ে তাকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। একে সুরেন কী বলবে? খেয়াল? খেয়ালই যদি হয় তো এ খেয়াল কেন? কিংবা হয়ত পর্মিলির করবার কিছু নেই। পর্মিলিরও যেমন করবার কিছু নেই, প্রজেশেরও তেমনি চাকরিটা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। পর্মিলি হয়ত এমনি করে আরো কত বাড়িতে যায়। কত বন্ধুকে নিয়ে এমনি করে ঘুরে বেড়ায়। আর যখন কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না, তখন আসে সুরেনের কাছে। এ সমস্তই মিথ্যে। এই মিথ্যেটুকুকে আশ্রয় করে যদি সুরেন তার স্বর্গ রচনা করে তাহলেই তার সর্বনাশ। তাহলেই সুরেনের অধঃপতন হবে।

গাড়িটা অনেকক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও খেয়াল হয়নি তার। তারপর যখন খেয়াল হলো তখন একটা মাতাল গান গাইতে গাইতে মাধব কুণ্ডু লেন দিয়ে চলেছে।

সুরেন আস্তে আস্তে আবার গেট খুলে বাড়িতে ঢুকলো।

দেবেশদের প্রোসেশান যখন চলে গেল, তখন সুরেন বাড়ি ফিরতে-ফিরতে এই কথাগুলোই ভাবছিল। কেন এই অশান্তি, কেন এই চারদিকের ছন্দপতন।

কেন এত অনিয়ম। কেন এত অসাম্য। দেবেশ তো লেখাপড়া করে একটা চাকরি নিয়ে ঘর-সংসার করলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতো। তাহলে আর এই মিছিল করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে হতো না। এই জেল খাটতে হতো না।

ভূপতি ভাদুড়ী বলতো—আমার এ ভাগ্নেটা যেমন হয়েছে, সোজা কথা সোজা করে বুঝতে চায় না!

কথায়-কথায় লোককে বোঝাতো যে তার ভাগ্নেটা মূর্খ।

হরনাথবাবুকেও একদিন তাই বললে ভূপতি ভাদুড়ী।

হরনাথবাবু বললেন—তা তুমি না গিয়ে তোমার ভাগ্নেকেই তো আমার কাছে পাঠাতে পারো।

ভূপতী ভাদুড়ী বললে—আমার ভাগ্নের কথা আর বলবেন না উকীলবাবু, সে হলো তাজ্জব জীব!

হরনাথবাবুও অবাক হলেন। বললেন—কী রকম?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বড়-বড় লোকের সঙ্গে ভাব করেছে ও, কিন্তু কোনও কাজের মধ্যে নেই—

—বড়-বড় লোক মানে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মিনিষ্টার পুণ্যশ্লোকবাবুকে চেনেন তো? তার মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে সুরেনের!

—সে কী? তাঁর মেয়ের সঙ্গে? কী করে ভাব হলো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ওই বলে কে! আমিও তো তাই দেখে অবাক। দেখতে তো ওই গো-বেচারা মানুষ। একটা কাজ যদি ওকে দিয়ে হয়! কিন্তু শুনলে অবাক হয়ে যাবেন মশাই, সেই মেয়েটা রাত-নেই বিরেত-নেই এই বাড়িতে এসে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

হরনাথবাবু আরো অবাক। বললেন—কোথায় তুলে নিয়ে যায়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমিও তো তাই ওকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় তুলে নিয়ে যায় তোকে?

—তা, কী বলে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—বলে কোথাও না। কোনও দিন রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরে, কোনও দিন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গল্প করে—

—শুধু গল্প করে?

ভূপতি ভাদুড়ী বলে—তাই-ই তো বলে। ও তো কিছু লুকোয় না আমার কাছে। ওই একটা গুণ আছে আমার ভাগ্নের। ছেলেটা আসলে ভালো। তবে একটা দোষ, যে যা বলে তাই করে। নিজের বিচার-বিবেচনা বলে কিছু নেই—

—তা মিনিষ্টারের বাড়িতে যায়, কিছু পারমিট-টারমিট বাগিয়ে আনতে পারে না?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে-সব বুদ্ধি ওর নেই, সে-সব বুদ্ধি থাকলে আমার আর ভাবনা?

উইল রেজিস্ট্রী করা এমন কিছু সময়-সাপেক্ষ কাজ নয়। হরনাথবাবু বললেন—এখন তোমার ভাগ্নে বাড়িতে আছে নাকি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—এখন এই সময়ে কি সে বাড়ি থাকে?

—কোথায় গেছে?

—কোথাও ঘুরছে হয়ত টো-টো করে—

হরনাথবাবু বললেন—তাকে একবার পাঠিয়ে দিও তো আমার কাছে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আপনি একটু যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন তো ভাল হয় উকীলবাবু। আমার তো আর কেউ নেই, ওই একটা বাপ-মা মরা ভাগ্নে, ওকে যদি একটা কোন কাজে লাগিয়ে দিয়ে যেতে পারি তো আমারও মনটায় স্বস্তি থাকে—

—দিয়ো পাঠিয়ে।

বলে হরনাথবাবু সেদিনের মত কোর্টে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুরেন যখন বাড়িতে ফিরলো তখন অনেক রাত। ভূপতি ভাদুড়ী অত রাত্রেও জেগে বসেছিল। লোহার গেট খোলার শব্দ হতেই ভূপতি ভাদুড়ী ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

সুরেন তখন চুপি চুপি উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

ভূপতি ভাদুড়ী ডাকলে। বললে—এত রাত্তিরে কোত্থেকে ফিরলি রে?

সুরেন থমকে দাঁড়ালো। বললে—দেরি হয়ে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—দেরি হয়ে গেল মানে? কীসে দেরি হলো? কী রাজকার্য করছিলে এতক্ষণ?

সুরেন বললে—কোনও কাজ নয়, এমনি—

—এমনি মানে? তুমি বাড়িতে বসে-বসে খাবে আর আড্ডা দিয়ে-দিয়ে বেড়াবে কেবল, না? তোকে বলতেই হবে এতক্ষণ কোথায় ছিলি। আজ উকীল-বাবু এসে তোর খোঁজ করছিল। সবাই তোর কথা জিজ্ঞেস করে। আমার উত্তর দিতে লজ্জা করে—কোথায় গিয়েছিলি তুই আজ আমায় বলতেই হবে—বল্, কোথায় গিয়েছিলি?

সুরেন বললে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে—

—সেখানে কী আছে তোর? কার সঙ্গে গিয়েছিলি? কেন গিয়েছিলি? কী আছে সেখানে? বাড়িতে মা-মণির অসুখ চলছে, সেদিকে খেয়াল নেই? আমি বুড়োমানুষ, একবার ডাক্তার একবার ওষুধ করে বেড়াচ্ছি, বাড়ির চাকর-বাকর সবাই খেটে-খেটে হয়রাণ হয়ে যাচ্ছে, আর তোমাকে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবার জন্যে এখানে রেখেছি আমি? বল্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কী করছিলি এত রাত্তির পর্যন্ত! বলতেই হবে তোকে!

সুরেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—সুব্রতর দিদি আমাকে ছাড়ছিল না—

ভূপতি ভাদুড়ী যেন ব্যঙ্গ করে উঠলো—সুব্রতর দিদি আর লোক পেলে না, তোকে আটকে রাখলে, একেবারে মাতব্বর লোক তুই! কী করছিলি তাই সত্যি করে বল্—

সুরেন বললে—সত্যি কথাই তো বলেছি—

—সঙ্গে আর কে ছিল?

সুরেন বললে—সঙ্গে আর একজন ছিল—

—কী নাম তার?

—সে তুমি চিনবে না।

—আমি চিনবো না মানে? তুই কার সঙ্গে মিশিস আমার খবর রাখতে হবে না? আমার খাবে আর তাদের সঙ্গে মজা করে আড্ডা দিয়ে বেড়াবে, এ-সব নবাবি চলবে না আর, এই তোকে বলে রাখলাম, হ্যাঁ—এই শুনে রেখে দাও—

সুরেনের কী যে হলো। হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললে—আমিও আর এ-বাড়িতে থাকবো না—

—কী বললি? কী বললি তুই আর একবার বল্?

সুরেন বললে—আমিও এ-বাড়িতে আর থাকবো না।

ভূপতি ভাদুড়ী এবার এক-পা সামনে এগিয়ে এল। বললে—তাহলে আজ থেকেই থেকো না। এই মুহূর্ত থেকেই থেকো না। রাত্তিরটা আর কেন এ-বাড়িতে থাকবে, এখুনি চলে যাও, আমি আর তোমার মুখ দর্শন করতে চাইনে—যাও, চলে যাও—

সুরেন তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূপতি ভাদুড়ী রাগে গর-গর করছে তখন। বললে—কী হলো, কথা কানে যাচ্ছে না?

সুরেন আর কোনও কথা বললে না। আবার যেমন এসেছিল তেমনি সদর-গেটের দিকে হন্-হন্ করে এগিয়ে গেল। প্রায় নিশুতি রাত। কোথায় গিয়ে উঠবে তারও ঠিক নেই। কিছু খাওয়াও হয়নি তার। এতদিনকার আশ্রয়। যাবার আগে একবাব মা-মণির সঙ্গে দেখা করে যাওয়ারও ইচ্ছে হলো। কিন্তু তারও আত্মসম্মান বলে একটা জিনিস আছে। টাকা-পয়সা কিছু হাতে নেই। দ্বিতীয়, জামা-কাপড়ও নেই সঙ্গে। তবু সেদিন আত্মসম্মানটাই বড় হয়ে উঠলো সুরেনের কাছে। পৃথিবীর ওপর তার কীসের আকর্ষণ! কোথাও জায়গা না থাকে তো বাগবাজারের গঙ্গা তো আছে।

—ম্যানেজারবাবু!

হঠাৎ যেন অন্দর-মহলের গেটটা খোলার শব্দ হলো। ভূপতি ভাদুড়ী দেখলে ধনঞ্জয় গেট খুলে বাইরে আসছে।

বললে—কী রে মা-মণির শরীর কেমন? অসুখ বেড়েছে নাকি?

ধনঞ্জয় হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—মা-মণি পাঠালে আমাকে। আপনার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে। বললে ম্যানেজারবাবু বোধহয় আবার বকছে সুরেনকে। একটু থামতে বল্—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তুই মা-মণিকে গিয়ে বল্‌গে আমি আমার ভাগ্নেকে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। একি হোটেল পেয়েছে! রাত-নেই বিরেত-নেই, যখন ইচ্ছে আসবে যাবে—

ধনঞ্জয় বললে—ভাগ্নেবাবু চলে গেল?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হ্যা, তুই বল্‌গে যে আমি তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি।

ধনঞ্জয় সদর-গেটের দিকে একবার চাইলে। তারপর সেইদিকে এগিয়ে গেল। মাধব কুণ্ডু লেনটার যতদূর দেখা যায়, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে।

তারপর একবার চিৎকার করে ডাকলে—ভাগ্নেবাবু, ভাগ্নেবাবু—

কেউ কোনও সাড়া দিলে না।

বাহাদুর সিং দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে। ধনঞ্জয় বললে—বাহাদুর, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ তো ভাগ্নেবাবু কোথায় গেল যাও যাও, দৌড়ে যাও—

ভূপতি ভাদুড়ী সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো—না বাহাদুর, যেতে হবে না ও জাহান্নমে যাক্—

বাহাদুর এরপর আর এগোতে সাহস করলে না। একবার ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো, আর একবার ম্যানেজারবাবুর দিকে।

খুব সকালবেলাই সেদিন ভূপতি ভাদুড়ীর ঘুম ভেঙে গেছে। হঠাৎ বাহাদুর সিংকে ঘরের সামনে দেখেই কী যেন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলে—কী রে, ভাগ্নেবাবু ফিরে এসেছে?

বাহাদুর বললে—না হুজুর—

—তবে? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কী বলছিস বল্?

বাহাদুর সিং বললে—দিদিমণি এসেছে হুজুর।

—দিদিমণি?

ভূপতি ভাদুড়ী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে, সুখদা উঠোন দিয়ে অন্দর-মহলের দিকে চলে যাচ্ছে।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—শোনো দিদিমণি, শোনো—

সুখদা এবার পেছন ফিরলো।

ভূপতি ভাদুড়ী এগিয়ে গিয়ে মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলে বললে—মা-মণির অসুখ খুব, জানো?

সুখদা বললে—হ্যাঁ জানি—

—তুমি জানো? কোত্থেকে জানলে?

সুখদা বললে—সুরেন বলেছে!

—সুরেন বলেছে? সুরেনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে নাকি? কোথায় কী করে দেখা হলো?

সুখদার যেন আর এর বেশি কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল না। অন্দরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে—সুরেন আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল—

—কী বললে? সুরেন তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল?

ভূপতি ভাদুড়ীর মুখে যদি সুখদা একটা চড় মারতো তাও যেন ভালো হতো। ভূপতি ভাদুড়ীর মাথায় বজ্রাঘাত হলেও বুঝি এতটা যন্ত্রণা হতো না।

বললে—আর একটা কথা শোনো দিদিমণি। তোমরা আছ কোথায়? তোমরা সবাই ভালো আছ তো? কালীকান্ত ভালো আছে?

সুখদা ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ—

—যেও না, আর একটা কথা শোনো। মা-মণির কাছে যাচ্ছো যাও কিন্তু যেন বেশি বিরক্ত কোর না, ডাক্তার আমাকে বারণ করে দিয়েছে।

—তা মা-মণির হয়েছে কী? ডাক্তার কী বলছে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—হবে আবার কী, বয়েস তো হয়েছে। বয়েস হলে মানুষের যা হয় তাই-ই হয়েছে। কিন্তু ভয়ের তেমন কিছু নেই, ডাক্তার বলেছে।

শুনে সুখদা আর দাঁড়ালো না। ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ভূপতি ভাদুড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। সু...নি সুরেন নিজে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে! এতবড় শয়তান? শয়তানের গাছ একেবারে। একবারও বুঝলি না যে, যা কিছু আমি করছি সবই তোর ভালোর জন্যে। আমার আর কী রে! আমার আর ক'দিনই বা। আমি তো দু'দিন পরেই পটল তুলবো। তখন তো এ-সব তোরই হবে! তখন তো তুই-ই আয়েস করে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সব কিছু ভোগ-দখল করবি। আমার আর কি

আমি তো যেতেই বসেছি। আমার তো গঙ্গামুখো পা। সারাজীবন যে এই চৌধুরী-এস্টেট দেখলাম এর তো পেনশনও নেই, প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ডও নেই, শুধু ভূতের বেগার খেটেছি। এখন বুড়ো বয়সে যে দু'চার দিন বাঁচি, তখন যাবো কোথায়? যদি ধর অসুখেই পড়ে থাকি তো কে আমাকে দেখবে? তুই ছাড়া আমার আপন বলতে আর কে আছে! সংসারে তোকে আপন মনে করেই এখানে এনে রেখেছি। ভেবেছি শেষ-জীবনে তুই-ই আমাকে একটু দেখবি! তা সেটাও হলো না। একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলি। বলার মধ্যে বলেছি যে, এত রাত করে কোথা থেকে ফিরলি! আমি তোর গুরুজন। বলতে গেলে তোর বাপের বয়েসি। এটুকুও আমার বলবার অধিকার নেই?

যাক্ গে, মরুক গে! আমার কী! যা হবার তাই হবে। এখন সুখদা এসেছে, এখন যদি সমস্ত সম্পত্তি সে নিজের নামে লিখিয়ে নেয় তো কোথায় আর যাবো? রাস্তায়। শেষকালে এই বুড়ো বয়সে রাস্তাতেই গিয়ে দাঁড়াবো। রাস্তায় কি আর লোক বাস করে না? কত হাজার-হাজার লোক রাস্তায় বাস করছে তার কি ঠিক আছে?

—সেলাম হুজুর!

অর্জুন। অর্জুন ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল। ম্যানেজারবাবুকে ওই অবস্থায় একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা সেলাম করে বসলো!

—এ্যাই, এত দেরি করে ঝাঁট দিচ্ছিস যে? এই বেলা বারোটার সময় উঠোন ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে? আমি কিছু দেখি না বলে বড় জো পেয়ে গেছিস, না?

অর্জুন আম্‌তা-আম্‌তা করে বলতে গেল—আজ্ঞে, আমি তো হররোজ এই বখত্‌ই ঝাড়ু দিই—

—এই বেলা বারোটার সময় ঝাঁট দাও? এ কি অলক্ষ্মীর বাড়ি পেয়েছ সবাই যে, যার যেমন খুশী করবে। ওসব হবে না। এই আমি বলে রাখছি, ওসব হবে না। কাল থেকে ভোর বেলা ঝাড়ু লাগাতে হবে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে অর্জুন।

বললে—ঠিক আছে হুজুর—

—না, ঠিক আছে বললে চলবে না। আমি নিজে সব লক্ষ্য করবো তবে ছাড়বো। যদি দেখি একটু দেরি হয়েছে তো জবাব হয়ে যাবে। যাও, আচ্ছাসে ঝাড়ু দেও—

অর্জুন ঝাঁট দিতে লাগলো, যেমন দিচ্ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী নিজের কাছারিবাড়িতে ঢুকলো। আবার হিসেবের জাবদা খাতা নিয়ে বসলো। কীসের হিসেব কার হিসেব কে জানে। এও তো এক রকমের ভূতের বেগার বটে! এতদিন ধরে একটা-একটা করে পাই-পয়সা হিসেব করে কার উপকার হয়েছে? নিজের না ওই সুখদার? না ওই লম্পট জামাইটার? এই সব জমানো পয়সা দিয়ে তোরা মদ খাবি বলে আমি এতদিন হিসেব করে খরচ করেছি! আয় বাড়িয়েছি, খরচা কমিয়েছি! ভুল করেছি বাপু ভুল করেছি—

আর ভালো লাগলো না হিসেব করতে। হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে আবার বাইরে এসে দাঁড়ালো ভূপতি ভাদুড়ী। কিছুই ভালো লাগলো না তার। এই বাড়িটাকে এতদিন নিজের বলেই ভেবে এসেছে ভূপতি ভাদুড়ী। যেন তার নিজেরই সম্পত্তি। এ-বাড়ির চাকর-ঝি-ঝিউড়ি সকলকে তার নিজের কর্মচারী ভেবে নিয়েছিল। এখন মনে হলো সবাই যেন পর। সব যেন পরের সম্পত্তি। যখের মতন স[illegible] হাতে এ-সব তুলে দেবার জন্যে এতদিন শুধু পাহারা দিয়ে

এসেছিল।

—ম্যানেজার!

হঠাৎ ধনঞ্জয়ের গলার শব্দ শুনে যেন ধ্যান ভাঙলো।

বললে—কী রে? কী খবর? মা-মণি ডাকছে?

ধনঞ্জয় বললে—হ্যাঁ—

—তা সুখদা দিদিমণি তো এসেছে, কী বলছে?

ধনঞ্জয় বললে—হ্যাঁ, সুখদা দিদিমণি খুব কাঁদছে ম্যানেজারবাবু—

—সে কী রে, কাঁদছে? কেন, কাঁদছে কেন? কী হয়েছে রে?

ধনঞ্জয় বললে—তা জানিনে ম্যানেজারবাবু দেখলুম মা-মণির বিছানায় বসে খুব কাঁদছে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আহা, তা তো কাঁদবেই, মা-মণি তো নিজের মায়েরই মতন—

তারপর একটু থেমে বললে—তা চল্, আমি যাচ্ছি!

কিন্তু সুখদা যখন এসেছে এতদিন পরে, সম্পত্তির লোভেই এসেছে। এর মধ্যে কান্নাকাটির কী আছে! হয়ত ন্যাকামি! মা-মণির সামনে ন্যাকামি করছে।

দরকার নেই ভেবে। যখন হুজুরের হুকুম হয়েছে তখন গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কী!

ভূপতি ভাদুড়ী তাড়াতাড়ি গায়ে ফতুয়াটা চড়িয়ে নিয়ে অন্দর মহলের দিকে চলতে লাগলো। নিক, সুখদাই সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নিক। আমার আর কোনও দায় নেই। ভাগ্নেটাই যখন বাড়িতে রইল না তখন আর কার জন্যে কী!

দোতলার সিঁড়ি পেরিয়ে তেতলা।

তেতলায় মা-মণির শোবার ঘরে গিয়ে দেখলে মা-মণি বিছানায় উঠে বসেছেন। আর সুখদা তার কোলে মুখ গুঁজে রয়েছে।

ভূপতি ভাদুড়ীর গলা পেয়ে সুখদা মা-মণির কোল থেকে মাথা তুললো।

—আমাকে ডেকেছেন মা-মণি?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ, এই দেখ কে এসেছে। পোড়ামুখী এখন এসে হাপুস-চোখে কাঁদছে—

ভূপতি ভাদুড়ী একথার উত্তরে কিছু বললে না।

মা-মণি বললে—বড় দুর্দশা এর, জানো ভূপতি?

—কেন, দুর্দশা কীসের মা-মণি?

মা-মণি বললে—খেতে পায় না, পরতে পায় না, আবার কীসের দুর্দশা!

—তা তখনই তো আপনি এখানে থাকতে বলেছিলেন মা-মণি। এ-বাড়িতে থাকলে আর এমন দুর্দশা হতো না।

মা-মণি বললে—পোড়ামুখীর দুর্মতি হয়েছিল—এখন ভুগছে তাই—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে দিন না মা-মণি!

মা-মণি বললে—তা কি পোড়ারমুখী নেবে? পোড়ারমুখীর যে গুমোর খুব মনে মনে—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—না না, গুমোর থাকা ভালো নয়, কোনও অবস্থাতেই মানুষের গুমোর-অহঙ্কার থাকা উচিত নয়। কখন কোন্ মানুষের কী হয় কে বলতে পারে?

মা-মণি বললে—ভাগ্যের ফের—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা এখন এখানে এসে উঠলেই হয়। ঘর তো

এখানে আমাদের পড়েই আছে—

মা-মণি বললে—তা তো আমিও বলছি, কিন্তু এখান থেকে চলে গেল কেন পোড়ামুখী!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—গ্রহ। একেই বলে গ্রহ—

সুখদা তখন শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। সে কিছু উত্তর দিলে না।

ভূপতি ভাদুড়ী আবার বললে—আমি তখনই বলেছিলুম মা-মণি, যে এখান থেকে চলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে—

মা-মণি বললে—পোড়ারমুখীর যদি অতই বুদ্ধি থাকবে তো এত কষ্ট পায়? সুখে থাকতে ওকে ভূতে কিলোল—

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ক্যাশ থেকে কিছু টাকা দেবো মা-মণি?

সুখদা এবার ফোঁস করে উঠলো—তুমি থামো তো ম্যানেজার, তুমি কি মনে করেছ আমি এখানে ভিক্ষে করতে এসেছি?

মা-মণি বললে—তুই আর আমাকে জ্বালাসনি মা, আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া তোর কাছে ভিক্ষে চাওয়া হলো?

সুখদা বললে—টাকা দিয়ে কি তুমি আমার দুঃখ ঘোচাতে পারবে মা-মণি?

মা-মণি বললে—সংসারে কে কার দুঃখু ঘোচাতে পারে তাই বল্? তবু সংসারে টাকারও তো দরকার রে। টাকা না হলে যে কিছুই হয় না—

সুখদা বললে—খবরদার বলছি, আমাকে টাকা দিও না—

মা-মণি বললে—কিন্তু তুই কী চাস তা আমাকে বলবি তো!

সুখদা বলে উঠলো—তোমার পায়ে পড়ি মা-মণি, তুমি আর কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। তোমার অসুখ শুনে শুধু তোমাকে দেখতে এসেছি—

—তা আমার যে অসুখ তা তুই শুনলি কোত্থেকে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—ও আমার ভাগ্নের কাছ থেকে শুনেছে, সুরেনের কাছ থেকে—

মা-মণি অবাক হয়ে গেল। বললে—সুরেনের কাছ থেকে? তার সঙ্গে তোর দেখা হলো কী করে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সুরেন নাকি সুখদার বাড়ি গিয়েছিল—

—সে কী রে? সুরেন তোর বাড়ি গিয়েছিল? কবে? কই, সে তো আমায় বলেনি কিছু? কোথায়, সুরেন কোথায় ভূপতি?

ভূপতি হঠাৎ এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না।

—কোথায় সে? এখন বাড়িতে আছে?

ভূপতি তবু কোনও উত্তর দিতে পারলে না।

মা-মণি আবার জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? কথা বলছো না কেন? সুরেন কোথায়?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে নেই—

মা-মণি বললে—এখন তো নেই, কিন্তু কখন আসবে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—সে চলে গেছে—

—চলে গেছে মানে? চলে গেছে মানে কী?

ভূপতি ভাদুড়ী জবাবে কী বলবে বুঝতে পারলে না।

খানিক চুপ করে থেকে বললে—সে এ-বাড়িতে আর থাকে না—

মা-মণি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—এ-বাড়িতে আর থাকে না সে?

তাহলে কোথায় থাকে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কোথায় থাকে তা জানি না।

—তা হঠাৎ সে চলে গেল কেন? কী হয়েছিল তার?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিছুই হয়নি। রাত্তিরে দেরি করে বাড়িতে আসতো বলে আমি তাকে বকেছিলুম।

—বকেছিলে? তুমি বকেছিলে বলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল? কই, যাবার আগে সে তো আমাকে কিছু বলে যায়নি। তুমিও তো আমাকে কিছু বলোনি? কবে গেছে সে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—পরশু দিন রাত্তিরে—

—তা সে আছে কোথায়? খোঁজ নিয়েছ তুমি?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কোথায় আর খুঁজবো!

—যেখানে যেখানে সে যেত সেখানে খুঁজলে না কেন?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কোথায় সে যেত তাও আমি জানি না।

—তাহলে তুমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ? তুমি তাকে এ-বাড়ি থেকে তাড়াবার কে? এ কি তোমার বাড়ি না আমার বাড়ি? আমাকে না বলে তুমি কেন তাকে তাড়িয়ে দিলে? তুমি বুড়ো হয়ে মরতে চললে এখনও তোমার একটু জ্ঞানগম্যি কিছু হলো না ভূপতি! বলি, পুলিশে খবর দিয়েছ?

ভূপতি ভাদুড়ী চুপ করে রইল।

মা-মণি আবার বললে—কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? বলি পুলিশে খবর দিয়েছ?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—পুলিশে খবর দিতে যাবো কেন মিছিমিছি?

মা-মণি বললে—ওমা, পুলিশে খবর দিতে হবে না? জলজ্যান্ত ছেলেটা বাড়ি থেকে চলে গেল, কোথায় আছে, কী খাচ্ছে, কিংবা রাস্তায় গাড়ি-চাপা পড়লো কিনা তাও তো জানতে হবে? ছেলেটা চলে গেল বাড়ি থেকে আর তুমি বুড়ো মানুষ হয়ে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে রইলে! আমাকে একবার খবরটা পর্যন্ত তো দিলে না!

ভূপতি ভাদুড়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার আর উত্তর দেবার মত কিছু ছিল না।

মা-মণি বললে—যাও, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কী! থানায় গিয়ে একটা খবর দাও—

ভূপতি ভাদুড়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচের উঠোনে নেমে নিজের কাছারিঘরে ঢুকলো। যত সব ঝঞ্ঝাট তারই মাথার ওপর এসে জোটে। কেন রে বাবা, এত লোক তো রয়েছে পৃথিবীতে, কারোর তো কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। সবাই বেশ আরামে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে আয়েস করে দিন কাটাচ্ছে। কেন মরতে এনেছিল ভাগ্নেটাকে। তার ভাবনা ঘাড়ে নিতে গিয়েই তো যত ঝামেলা হলো!

দূর ছাই, হিসেবের খাতা খুলে আবার সেটা বন্ধ করে দিলে ভূপতি ভাদুড়ী। কার হিসেব কে রাখে তার ঠিক নেই। হিসেব রাখবার মালিক তো সেই তিনি। তিনি আকাশের মাথায় বসে বসে সব মানুষের কড়া-ক্রান্তির হিসেব রেখে চলেছেন। তাহলে ভূপতি ভাদুড়ী আর কেন মরতে হিসেবের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে হাঁপাচ্ছে!

বিরক্ত হয়ে ভূপতি ভাদুড়ী হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে দিয়ে চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়লো।

—ম্যানেজারবাবু!

আবার ধনঞ্জয়ের গলা!

—কী রে? আবার কী হলো?

ধনঞ্জয় বললে—মা-মণি ডাকছে একবার আপনাকে—

মনে মনে বড় বিরক্ত হলো ভূপতি ভাদুড়ী। একটু যদি আরাম করবে কেউ!

—কী, হয়েছে কী?

ধনঞ্জয় বললে—তা জানি না। মা-মণি বললে এক্ষুনি ম্যানেজারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়—

হুকুম যখন হয়েছে, তখন পালন করতেই হবে। তাড়াতাড়ি ছাড়া ফতুয়াটা আবার গায়ে চড়িয়ে এগিয়ে গেল অন্দর-মহলের দিকে। একেবারে সেই তেতলায়।

—ভূপতি, সুখদা এবার যাবে, একটা গাড়ি ডেকে দাও তো!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি ডেকে দিচ্ছি—ট্যাক্সি ডেকে আনছি। কোথায় যেতে হবে?

মা-মণি বললে—সে সুখদা বুঝবে, তুমি আগে ট্যাক্সি ডাকো তো।

—আমি কি সঙ্গে করে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো?

মা-মণি বললে—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও, যা বলছি তাই করো—

ভূপতি ভাদুড়ী হুকুম-মত একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলে। সুখদা ওপর থেকে নিচেয় নেমে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো। সাদা শাড়িটায় শরীর-মাথা সব ঢেকে-ঢুকে এসেছে আগেকার মত। মা-মণির সঙ্গে এতক্ষণ কী মতলব আঁটলে সে তাও বোঝা গেল না। আসবার সময় সে কেমন করে এসেছিল তা দেখতে পায়নি ভূপতি ভাদুড়ী। হাত পেতে টাকা নিলে কিনা তাও জানতে পারলে না। সমস্ত জিনিসটাই যে একটা রহস্য হয়ে রইল ভূপতি ভাদুড়ীর কাছে!

দেবেশদের পার্টি অফিসে চুপ করে বসে ছিল সুরেন। অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছিল।

—কী রে, সুরেন তুই! কতক্ষণ?

সুরেন বললে—দু'ঘণ্টা হলো এসেছি।

—এ কী চেহারা হয়েছে তোর? অসুখ করেছিল নাকি?

সুরেন বললে—না, বাড়ি থেকে চলে এসেছি ভাই—

—চলে এসেছিস মানে? ঝগড়া করে চলে এসেছিস?

সুরেন বললে—এক রকম তাই। দু'দিন আগে মামার সঙ্গে খুব ঝগড়া হলো।

—দু'দিন আগে? তা এ দু'দিন কোথায় ছিলি?

সুরেন বললে—এই এখানে-সেখানে। শেয়ালদার প্লাটফরমে, রাস্তার ফুট-পাথে। শেষকালে কোথাও সুবিধে না পেয়ে তোর কাছে চলে এলাম—তোদের এখানে আমাকে থাকতে দিবি?

সে এক অদ্ভুত জীবন দেবেশদের। একটা ভাঙা পুরোন বাড়ি। সমস্ত বাড়িটাই ওদের পার্টির ভাড়া নেওয়া। রান্নার লোক আছে একজন। বাসন মাজার জন্যেও দু'জন লোক। বাকি কাজ সব নিজেরা। সমস্ত দিন কে কখন খাচ্ছে, কিংবা খাচ্ছে না তার কোনও ঠিক নেই। সকাল থেকে যে-যার কাজে বেরিয়ে যায়। কাজ, পার্টির কাজ। চাঁদা আদায়ের কাজ। কারো নিজস্ব কোনও আয় নেই। কাউকে কোনও চাকরি করতে হয় না। কোনও ব্যবসাও করতে হয় না।

দেবেশই বললে—আয়, খাবি আয়—

সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় খাওয়ার জায়গা। একটা খবরের কাগজ পেতে দিলে বসবার জন্যে। আর খাওয়ার জন্যে দু' গ্লাস জলও গড়িয়ে নিলে। ঠাকুর দুটো থালায় দু'জনকে ভাত দিয়ে গেল।

দেবেশ বললে—ও বামুন নয়। আমাদের এখানে আমরা যার-তার হাতে খাই—। আমরা জাত-ফাত মানি না।

সুরেন বললে—কিন্তু তোদের ঘাড়ে বসে খাবো, আমার লজ্জা করছে ভাই—

দেবেশ বললে—কাজ করবি আমাদের সঙ্গে। চাঁদা তুলবি। যা চাঁদা তুলতে পারবি সব এনে এখন জমা দিবি আমাদের পার্টির ফাণ্ডে—। তারপর যখন যা বলবো তাই করতে হবে। আর দরকার হলে মিছিলে যাবি আমাদের সঙ্গে—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—জেলেও যেতে হবে তো?

দেবেশ বললে—জেলে গেলে তো ল্যাঠাই চুকে গেল। বেশ তোফা আরামে থাকবি আর ঘুমোবি। দেখিসনি, সেবার জেলে গিয়ে আমি কী-রকম হেল্‌থ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম! এ তো চোর-ডাকাতের জেলে যাওয়া নয় রে—

খাওয়া সামান্য। ভালো করে পেটও ভরলো না সুরেনের। আর দুটো ভাত চাইতেও লজ্জা করলো। শুধু ডাল, ভাত আর আলুর তরকারি। খেয়ে নিয়ে থালাটা উঠোনের এক কোণে রেখে আসতে হলো। বাসন-মাজার লোক যখন আসবে, তখন সব পরিষ্কার করবে।

তারপর রাস্তায় বেরোলো দেবেশের সঙ্গে। দেবেশ বললে—তুই তো আর কোনও জামা-কাপড় আনিসনি সঙ্গে করে!

সুরেন বললে—সব মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়িতে রয়েছে—

দেবেশ বললে—ঠিক আছে, এখন সাবান কেচে এই পরেই চালা, পরে সব কিনে দেবো–

তারপর বাসে উঠিয়ে সকাল থেকে কত জায়গাতেই যে নিয়ে গেল দেবেশ। দেবেশের অনেক বন্ধু, অনেক বান্ধব। বরানগর থেকে শুরু করে টালিগঞ্জ পর্যন্ত। অনেক ফ্যাক্টরি, অনেক ইউনিয়নের অফিস। কোথায় কাদের ছাঁটাই হচ্ছে, কোথায় কাদের মাইনে বাড়ছে না. সব তদারকি করলে। তারপর পার্টির জন্যে চাঁদা চাইলে। টাকাও দিলে অনেকে।

আসবার সময় সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ওরা তোকে চাঁদা দিলে কেন রে?

দেবেশ বললে—পূর্ণবাবু যে ওদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। টাকা না দিলে চলবে কেন? পূর্ণবাবুই তো চেষ্টা করে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে—

তারপর একটু থেমে বললে—জানিস, দেশের গরীব লোকরা এত গরীব কেন?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন?

দেবেশ বললে—দেশের গরীবরা গরীব তার কারণ তাদের ইউনিটি নেই। তাদের হয়ে কথা বলবার কেউ নেই, তাদের কোনও মাউথ্‌পিস্‌ নেই। তারা

যদি এক হয়ে যায় তো কারো সাধ্যি নেই তাদের নিচেয় নামিয়ে রাখে—। আমাদের প্রথম ডিউটি তাদের সচেতন করে তোলা। তাদের যে বড়লোকরা কেমন করে এক্‌স্‌প্লয়েট করছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া—

সুরেন বললে—কিন্তু কংগ্রেসও তো ওই একই কথা বলছে। পুণ্যশ্লোকবাবুও তো সেদিন আমাকে এই কথাই বললেন—

দেবেশ সুরেনের মুখের দিকে তাকালো।

বললে—তুই এখনও পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছে যাস নাকি? সুব্রত তো আমেরিকাতে। এখন সেখানে কী করতে যাস?

সুরেন বললে—একটা চাকরির কথা বলতে গিয়েছিলুম—

—চাকরি দেবে বললে?

সুরেন বললে—আমাকে বললেন ইতিহাস লিখতে।

—ইতিহাস? কীসের ইতিহাস?

সুরেন বললে—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। সেই সিপাহীযুদ্ধ থেকে শুরু করে একেবারে এই আজ পর্যন্ত। কী করে দেশ স্বাধীন হলো, ব্রিটিশরা চলে গেল, আর শেষকালে কী করে কংগ্রেস মানুষের সেবার ব্রত গ্রহণ করলো।

—সব বোগাস!

দেবেশ টিটকিরির সুরে বললে—সব বোগাস। তোকে দিয়ে নিজের পাবলিসিটি করিয়ে নিতে চায়। খবরদার রাজী হোসনে। আর তুই যে আমাদের এখানে আসিস তাও যেন বলিসনি ওকে। চাকরি যদি একটা দিয়ে দেয়, নিয়ে নিবি।

সুরেন বললে—নেব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিবি। একবার চাকরিতে ঢুকলে আর তো কোনও শালা তোকে চাকরি থেকে ছাড়াতে পারবে না। আজকাল আমরা সব জায়গায় ইউনিয়ন করে করে ওই কাজটা করিয়ে দিয়েছি। এখন স্ট্রাইকের ভয়ে সব মালিক-গুষ্ঠি থরহরি কম্পমান—

তারপর একটু থেমে বললে—পুণ্যশ্লোকবাবুর তো ওই-ই পলিসি। চাকরি দিয়ে সকলকে হাতে রেখে দেয়। তোমাদের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টেরই ওই পলিসি—

সুরেন বললে—কিন্তু আমার একটা চাকরির দরকার, জানিস—

—কেন, আমাদের অফিসে থাকতে তোর কী অসুবিধে?

সুরেন বললে—না ভাই, আজকে তোদের এখানে খেলুম, আমার কী রকম লজ্জা করছিল খেতে—

—কেন, লজ্জা কীসের? তুই তো আমাদের পার্টির হোল-টাইম্‌ কাজ করবি। হোল-টাইম্‌ পার্টি ওয়ার্কার। সামনে ইলেকশান আসছে, এখন তো আমাদের অনেক ওয়ার্কার দরকার।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—যদি তোদের পার্টির কাজ ভালো মত না করতে পারি?

—পার্টি-ওয়ার্ক করা আর শক্ত কীসের? ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারবি না?

সুরেন বললে—কখনও তো বক্তৃতা দিইনি—

—দিসনি তো শিখে নিবি! বক্তৃতা দেওয়া কী হাতী-ঘোড়া কাজ! ও তো সবাই পারে। আমিও তো প্রথমে বক্তৃতা দিতে পারতুম না। এখন আমি বক্তৃতা

দিলে হাজার-হাজার লোক চার্মড্ হয়ে যায়। বক্তৃতা এমনভাবে দিতে হবে যেন মানুষের রক্ত গরম হয়ে যায়।

সুরেন বললে—আমার ভাই খুব লজ্জা করে!

—দূর! এই যে গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ, সুভাষ বোস এত নাম করেছে, সে কীসের জন্যে? স্রেফ বক্তৃতা করতে পারতো বলে! ওটা কিছু না। দিন কতক প্র্যাক্টিস করলেই হয়ে যাবে! ঘরের মধ্যে দু'একদিন না-হয় রিহার্শাল দিয়ে নিবি!

তবু সুরেনের সন্দেহ গেল না।

বললে—প্রথম প্রথম তুই একটু পাশে থাকিস ভাই!

দেবেশ বললে—সে তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি কেন, আমাদের পুরো পার্টি তোর পাশে থাকবে!

সুরেন বললে—আচ্ছা, একটা কথা দেবেশ, তোরা তো দেশের কথা ভাবছিস কিন্তু পুণ্যশ্লোকবাবুও তো দেশের ভালোর জন্যে ভাবছে! অথচ দেশ তো সেই একই!

দেবেশ বললে—না রে তোর ধারণা ভুল। আমরা ভাবছি দেশের কথা, আর ওরা ভাবছে পার্টির কথা। ওর গভর্ণমেন্ট হাতে পেয়ে পার্টির সব লোককে বড় বড় চাকরি দিয়ে দিয়েছে—। পুণ্যশ্লোকবাবুর একটা সাগরেদ ছিল প্রজেশ। প্রজেশ সেনেব জন্যেই পুণ্যশ্লোকবাবু ইলেকশানে জিতেছে। সেই প্রজেশ সেনকে কত বড় চাকরি করে দিয়েছে জানিস? সে আগে রাস্তার ভিখিরি ছিল, এখন কলকাতা সহরে একটা পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। এখন সুব্রতর বোনের সংগে এক টেবিলে বসে মদ খায়।

সুরেন চমকে উঠলো কথাটা শুনে।

জিজ্ঞেস করলে—তুই কি করে জানলি রে?

দেবেশ বললে—তুই জানিস না? এ তো সবাই জানে! কিন্তু এখন তো আর প্রজেশকে তাড়িয়ে দেবার উপায় নেই। এখন ওই প্রজেশের জন্যেই পুণ্যশ্লোক-বাবু মিনিষ্টার হয়েছে। প্রজেশ সেন পুণ্যশ্লোকবাবুর নাড়ি-নক্ষত্র জানে। এখন যদি তাড়িয়ে দেয় তো প্রজেশ সব কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেবে। এখন প্রজেশ সেনেরই পোয়া বারো। তুই প্রজেশ সেনকে দেখিসনি ওখানে?

সুরেন বললে—আমি চিনি। আমি সব জানি।

দেবেশ বললে—তুই একলা কেন, আমরাও জানি। সবাই-ই জানে—

তারপর বললে—এবার চল্, পার্টি অফিসে যাই। সব জায়গা তো দেখালুম। ওইগুলো হলো আমাদের ঘাঁটি। এবার একদিন কলকাতার বাইরে নিয়ে যাবো। শালিমার কাঁকিনাড়া, বীরভূম, ধানবাদ জয়নগর, টিটাগড, সোদপুর। যেখানে যত ফ্যাক্টরি আছে, যত মিল আছে, যত খনি আছে, সে-গুলোও আমাদের ঘাঁটি। সব জায়গায় আমাদের ইউনিয়নই স্ট্রং। এই রকম করে আমরা সমস্ত ইণ্ডিয়াতে আমাদের পার্টির ব্র্যাঞ্চ খুলবো। তখন দেখবি কংগ্রেস কোথায় থাকে। এই নেক্স্ট্ ইলেকশানেই কংগ্রেস ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

রাস্তার একটা দোকানে চা খেয়ে সুরেনকে নিয়ে অফিসে ঢুকলো দেবেশ।

সন্ধ্যেবেলা তখন অফিসের মধ্যে অন্য চেহারা। বিরাট একটা হলঘর। সেখানে এলোপাথাড়ি এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প-গুজব করছে সবাই। দেবেশ ঢুকেই কার সংগে গিয়ে কী সব কথা বলতে লাগলো।

সুরেন দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। কাউকেই চেনে না সে। কেউ তার দিকে

দেখছেও না। সবাই যেন খুব গভীর কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। হঠাৎ একটা কোণের দিকে চেয়ে দেখলে, গোটাকতক মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। হাসির শব্দ শুনেই সেদিকে নজর পড়লো সুরেনের। কালো রং, মাঝারি বয়সের মেয়ে সব। এদের পার্টিতে মেয়েও আছে নাকি?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় আড়ষ্ট লাগছিল তার। এরা সবাই কাজে ব্যস্ত। তারই শুধু কোনও কাজ নেই এখানে। সে যেচে এখানে এসেছে। তার থাকবার খাবার আশ্রয় নেই বলেই এখানে মাথা গুঁজতে এসেছে। মামা চায় তার কথা অনুযায়ী সুরেন চলুক। পর্মিলি চায় সুরেন তার কথামত চলুক। পুণ্যশ্লোকবাবু চান সে তাঁর উপদেশ মত কাজ করুক। সুখদাও চায় সে তার মর্জি অনুযায়ী কাজ করুক। দেবেশও চায় সুরেন তাদের পার্টির হুকুম মেনে চলুক। অথচ আসলে কেউই তাকে চায় না। আশ্রয়ের বদলে তার স্বাধীনতাটুকু খর্ব করতে চায়।

মনে আছে, সেদিন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে তার সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করে ফেলেছিল। কেন সে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। মামার কথাতে সায় দিলে কী অন্যায়টা হতো। অন্যায় দূরের কথা, কত লাখ টাকার সম্পত্তি তার হাতে আসতো। মামা তো অন্যায় কিছু বলেনি। মামা তো তার ভালোই চেয়েছিল।

আর পুণ্যশ্লোকবাবু?

পুণ্যশ্লোকবাবুর সান্নিধ্যই বা ক'জন ভাগ্যবান পায়? তাঁর করুণার এক কণা পেলেও তো সে ধন্য হয়ে যেতে পারতো! কিংবা পর্মিলির কথাই ধরা যাক না কেন! পর্মিলি তার সঙ্গে কথা বলে, এও তো একটা সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করা উচিত।

কিন্তু না, জীবনে সৌভাগ্য যাদের সয় না, তাদের কপালে বোধহয় অনেক দুঃখ থাকে। আর সৌভাগ্যকেই যারা দুর্ভাগ্য বলে ভুল করে, তাদের দুর্ভাগ্য কে দূর করতে পারে?

—এ কে দেবেশদা?

পার্টির একজন মহিলার গলার স্বরে এতক্ষণে চমকে উঠলো সুরেন। যেন স্বপ্ন ভেঙে গেল।

কখন যে আবার দেবেশ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তার খেয়াল ছিল না।

দেবেশ বললে—আমাদের পার্টির নতুন মেম্বার—

সুরেন চেয়ে দেখলে মেয়েটার দিকে। মোটামুটি গড়ন, মিলের একটা সাধারণ শাড়ি পরনে।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ও কে ভাই?

হঠাৎ যেন খেয়াল হলো দেবেশের। ডাকলে—টুলু, শোনো শোনো—

মেয়েটা ফিরে আসতেই দেবেশ বললে—আমার রুমাল কী হলো? রুমাল দেবে বলেছিলে যে?

টুলু লজ্জায় জিভ কাটলো। বললে—একেবারে ভুলে গেছি দেবেশদা, বাবার জ্বর হয়েছে ক'দিন সময় পাচ্ছি নে মোটে, আমি আজই নিয়ে বসবো—

বলে মেয়েটা চলে গেল।

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—ও কে ভাই?

দেবেশ বললে—আমাদের পার্টির মেয়ে।

সুরেন আবার জিজ্ঞেস করলে—রুমাল কী করবে?

দেবেশ বললে—আরে কথা ছিল একটা রুমাল তৈরী করে দেবে। একটাও

রুমাল নেই, বড় অসুবিধেয় পড়েছি, কিন্তু ওর খেয়ালই থাকে না—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—ও-ও এখানে থাকে নাকি?

দেবেশ বললে—না, টুলু থাকে ওদের নিজেদের বাড়িতে—সবাই তো এখানে থাকতে পারে না, অত জায়গা কোথায়? একটা বড় বাড়ি পেলে সবাই একসঙ্গে থাকবার প্ল্যান আছে আমাদের—

সুরেন বললে—ছেলে-মেয়েরা সবাই এক-বাড়িতে থাকবে?

—হ্যাঁ, তাতে পার্টির কাজের সুবিধে হয় অনেক।

সুরেন বললে—পূর্ণবাবুকে তো দেখছি না?

দেবেশ বললে—পূর্ণবাবু ধানবাদ গেছে, পরশু আসবে—

বলে দেবেশ আবার কার সঙ্গে কথা বলতে পাশের ঘরে চলে গেল। আবার সুরেন একলা। লোকজন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাতায়াত করছে। সবাই যেন খুব ব্যস্ত। কয়েকজন একমনে খবরের কাগজ পড়ছে। সুরেন পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখলে। দেবেশ সেখানে গিয়ে বেশ জোরে-জোরে কার সঙ্গে তর্কে মেতেছে। কেবল রাজনীতির কথা।

তারপর হঠাৎ বোধহয় একসময়ে মনে পড়লো সুরেনের কথা।

পেছন ফিরে ডাকলে—এই সুরেন, এদিকে আয়—

রাত্রে দেবেশের পাশেই শুয়ে ছিল সুরেন। সকলের জন্যে এক-একটা করে মাদুর। কে কোথায় শুয়েছে তার ঠিক নেই। মাথায় একটা তেলচিটে বালিশ। অন্ধকার চারদিক। শুধু জানালা দিয়ে রাস্তার ইলেকট্রিক বাতির আলো এসে পড়েছে ভেতরে।

দেবেশ শুয়েই নাক ডাকাচ্ছে। দূরে কাছে আরো অনেকেরই নাক-ডাকার শব্দ কানে আসছে—

শুধু সুরেনেরই ঘুম নেই। সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। এ আবার কোথায় এসে পড়লো সে। এখানে যে সে এল, সে কীসের আশায়? আশ্রয়? কিন্তু তার বিনিময়ে তার কাছ থেকে এরা কী চায়?

কোথায় ছিল সুরেন, আর এ কোথায় চলে এল সে! একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের স্নেহনীড় থেকে একেবারে নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রান্তরে। এখানে আবার অন্য সমস্যা। এ যেন হট্টগোলের রাজত্ব। মানুষ নিজেকে নিয়েই বাঁচতে চায়। কিংবা বড় জোর নিজের আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে। মাধব কুণ্ডু লেনের ভেতরে তাই-ই সে দেখে এসেছে। সেখানে মা-মণির সমস্যা তার ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত। তার বাইরে কারোরই দৃষ্টি চলে না। ভূপতি ভাদুড়ী নিজেদের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখতো। বুড়োবাবু তার নিজের খাওয়া-পরার সমস্যাটা নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতো। তাদের নিজের নিজের চাহিদাগুলো মিটলেই সব পাওয়া ফুরিয়ে যেত।

পুণ্যশ্লোকবাবুর বাড়িতে গিয়েও তাই-ই দেখে এসেছে সুরেন।

সেখানে পুণ্যশ্লোকবাবুই সব। তাঁর একার প্রয়োজনেই যেন তাঁর সংসার, তাঁর নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যেই যেন তাঁর অস্তিত্ব। কোথাও কারো কোনও প্রয়োজনেই তাঁর যেন কোন কৌতূহল নেই।

কিন্তু এখানে অন্য রকম।

দেবেশ বলতো—লক্ষ লক্ষ লোককে উপোসী রেখে মুষ্টিমেয়র সমাজ কখনও শান্তিতে থাকতে পারে না। আমাদের এই সংগ্রাম সেই সকলের সংগ্রাম।

এই সংগ্রামে তাই সকলকে নামতে হবে। নিজের নিজের সুখের কথা ভাবলে কারোর সুখ হবে না—

আরো অনেক কথা বলতো দেবেশ।

এক একদিন মিছিল বার করতো দেবেশরা। কথা নেই বার্তা নেই, মিছিল। সুরেন অবাক হয়ে যেত।

জিজ্ঞেস করতো—আবার?

তা দেবেশদের পার্টির অফিসেই থাকছে খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে, সুতরাং তাদের নির্দেশ মেনেই চলতে হবে। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে সার বেঁধে বেরোত সবাই। সামনে থাকতো লাল ফেস্টুন। তারপর স্লোগান দিতে দিতে যাওয়া। লম্বা প্রোসেশান।

কতদিন এই সব রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়েছে সুরেন, তখন তার দিকে কেউ নজর দেয়নি। কিন্তু মিছিল দেখলেই সবাই হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। টিটকিরি দেয়।

কেউ বলে—এদের জ্বালায় অস্থির মশাই, রোজ একটা না একটা বায়না লেগেই আছে এদের—

বাস-ট্রাম-গাড়ি সব জমাট হয়ে যায়। অফিসের যাত্রীরা গালাগালি দেয়। সুরেনের কেমন লজ্জা করে। লজ্জায় মাথা নিচু করে পিছু পিছু হেঁটে চলে।

টুলু একদিন জিজ্ঞেস করলে—আপনার খুব লজ্জা করে নাকি?

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে এমনিতেই সুরেনের লজ্জা করে। তার ওপর ভালো করে জানা নেই শোনা নেই, কী কথা বলবে?

—লজ্জা করলে আপনি পলিটিকস করবেন কী করে? শেষকালে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন লেকচার দিতে হবে?

সুরেন বললে—আমি লেকচার দিতে পারবো না—

টুলু হাসলো। বললে—পারবো না বলছেন কেন? চেষ্টা করলে কী না পারা যায়? আমিও প্রথম প্রথম পারতুম না। অথচ লেকচার না দিতে পারলে এ-লাইনে কিছুই উন্নতি নেই—

সুরেন মনে মনে হাসলো। যেন উন্নতি করার জন্যেই সে এ-লাইনে এসেছে। কিন্তু সে কথাটা মুখ ফুটে বলতেও লজ্জা করতে লাগলো। সে কেমন করে বলবে যে সে এখানে, এ-লাইনে এসেছে বাধ্য হয়ে। কেমন করে বলবে কোনও উপায় নেই বলেই সে এখানে এসেছে।

শুধু টুলু নয়, পার্টির সবাই সুরেনকে আনাড়ি বলে ধরে নিয়েছে।

টুলু একদিন বললে—এ রকম করে পেছনে পড়ে থাকলে আপনার চলবে না। দিনকতক আমাদের সঙ্গে ঘুরুন!

—কোথায় ঘুরবো?

টুলু বললে—আমাদের কত কাজ। কিন্তু ওয়ার্কের কি শেষ আছে। সমস্ত কলকাতা আমরা চষে বেড়াই। সকলকে দলে টানতে হবে তো।

—কী করে দলে টানেন?

টুলু বললে—লোকের সঙ্গে মিশি। নানারকম লোক সব। তাদের মধ্যে স্টুডেন্টই বেশি। স্টুডেন্টদের দলে টানতে পারলেই বেশি সুবিধে। তাদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে যাই, চা খাই, সিনেমায় যাই। তারপরে কফি-হাউসে বসে বসে আড্ডা দিই। তাদের সঙ্গে আমরা একটু হেসে কথা বললে তারা কৃতার্থ হয়ে যায়।

সুরেন বললে—সে আপনি মেয়ে বলে। আমার সঙ্গে তারা আড্ডা দেবে কেন?

টুলু বললে—আমার সঙ্গে চলুন, কোনও পয়সা খরচ হবে না, দেখবেন কেমন আড্ডা জমে যাবে। আর তা না করলে পার্টি মেম্বার বাড়বে কেন? আজকে যাবেন আমার সঙ্গে?

সুরেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। বললে—না, আজ থাক—

টুলু চলে গেল। দেখতে টুলুকে ভাল নয় তেমন। কিন্তু কথায়-চলায় খুব সপ্রতিভ। খুব স্মার্ট। সহজে আলাপ জমিয়ে নিতে পারে সকলের সঙ্গে। এই যাচ্ছে, আবার কয়েক ঘণ্টা পরে কোথা থেকে অনেক কাজ সেরে ফিরে এল। তারপর যখন রাত হয় তখন বাড়ি চলে যায়।

বলে—চলি—

আর দাঁড়ায় না তখন। রাস্তায় গিয়ে একটা বাসে বা ট্রামে উঠে পড়ে। সে যে মেয়েমানুষ এ-কথাটা সে বাসে ওঠবার সময় ভুলে যায়। এক গাদা পুরুষের ভিড়ের মধ্যে চেপ্টে গেলেও ভ্রূক্ষেপ নেই। লেডিজ্-সীটে পুরুষ বসে থাকলেও পাশে গিয়ে বসে পড়ে—

বলে—আপনি উঠছেন কেন, বসুন না—

তারপর বাসে চড়ে চলে যায় কলকাতার কোন্ এক সহরতলীতে। বউ-বাজারের বনেদী পাড়ার আওতা পেরিয়ে, চৌরঙ্গীর শৌখীন আবহাওয়া অতিক্রম করে বাসটা যত দূরে যায় ততদূরে যায় টুলু। তারপর টার্মিনাসে নেমে হাঁটিতে শুরু করে।

শুধু টুলুই বা কেন, পার্টির যত মেয়ে মেম্বার আছে সবাই-ই বোধহয় তাই। কোথা থেকে সব আসে, সারাদিন কোথায়-কোথায় ঘোরে। তারপর আবার যার-যার বাড়ি চলে যায়।

কয়েকদিন পরেই দেবেশ পাঁচটা টাকা সুরেনের দিকে এগিয়ে দিলে।

বললে—এই টাকাটা রাখ্—

সুরেন অবাক হয়ে গেল টাকা দেখে। জিজ্ঞেস করলে—এ টাকা কীসের?

দেবেশ বললে—তোর হাত-খরচা-টরচা লাগে তো, তার জন্যে—

সুরেন বললে—তোরা কি সবাই হাত-খরচা পাস?

দেবেশ বললে—যার যার হাত-খরচা দরকার তারা তারা পায়। যারা চাকরি করে তারা পায় না।

—কত করে পায়?

দেবেশ বললে—কেউ পঁচিশ তিরিশ! কেউ পঞ্চাশ। যার যেমন দরকার।

—এ-সব টাকা কোত্থেকে আসে?

দেবেশ বললে—আমরা কালেক্ট করি। যত সব অফিসের ইউনিয়ন আমাদের আন্ডারে তারা দেয়। সেই টাকাতেই তো পার্টি চলছে আমাদের। এই খাওয়া-খরচ, বাড়ি ভাড়া সবই সেই টাকা থেকে চলছে।

—টুলু! ওই টুলু মেয়েটা কত পায়?

দেবেশ বললে—কোনও মাসে পঞ্চাশ কোনও মাসে সত্তর, কখনও আরো বেশি নেয়। ওর খুব অভাব যে। বাবা অন্ধ, ছোট বোন আছে, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় কুড়ি টাকা...

—মেয়েটা খুব কাজের বুঝি?

দেবেশ বললে—খুব কাজের। সকালে রান্নাবান্না শেষ করে বোনকে স্কুলে,

পাঠিয়ে, বাপকে খাইয়ে চলে আসে। তারপর সেই রাত্রিতে ফিরে গিয়ে আবার যা পারে দুটো রান্না করে সকলকে খাওয়ায়—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—তা ওই ক'টা টাকাতেই চলে? চালাতে পারে?

দেবেশ বললে—ও-রকম কত মেয়ে কলকাতায় আছে, কে তাদের খোঁজ রাখে। ওরা আছে বলেই তো আমাদের পার্টির কাজ চলছে। যেখানে আমরা কিছু করতে না পেরে ফিরে আসি সেখানে টুলুকে পাঠিয়ে দিই, টুলু কাজ হাসিল করে চলে আসে—। মেয়েদের অনেক সুবিধে!

সুরেন আর কিছু কথা জিজ্ঞেস করলে না। টাকাটা পকেটে রেখে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে টুলুর চেহারাটা কল্পনা করতে লাগলো। এত অভাব নিয়েও তো বেশ হাসিমুখে থাকতে পারে মেয়েটা! এতদিন সুরেন ভাবতো তার দুঃখটাই বুঝি সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই সহরে এ-রকম মানুষও তো আছে!

—আরে, সুরেনদা, এখনও ঘুমোচ্ছ?

সত্যিই সেদিন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুরেন। ঠেলাঠেলিতে ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। চারিদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সারাদিন মেঘলা ছিল। যে-যার কাজে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কোনও কাজ ছিল না, কি করবে? ঘুম ছাড়া আর কি কাজ আছে!

—একেবারে কুম্ভকর্ণের মত ঘুম দেখছি তোমার। সারা পৃথিবীর লোক খেটে-খেটে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি ঘরের কোণে পড়ে পড়ে কিনা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ। ওঠো, ওঠো—

টুলুর কথায় বড় লজ্জা পেয়ে গেল সুরেন।

বললে—খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

টুলু বললে—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এমনি করে ঘুমোলে পার্টির কাজ চলবে?

সুরেন বললে—কেউ ডেকে দেয়নি আমাকে, আমিও ঘুমোচ্ছি।

টুলু বললে—আর আমি দেখ তো কত রাস্তা চষে এলুম। গিয়েছিলুম [illegible], সেখানে কাজ সেরে আসছি, এখন আবার যাবো হাসপাতালে—

– হাসপাতালে? হাসপাতালে কী করতে?

টুলু বললে—তোমার মত নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে আমার চলবে?

সুরেন বললে—আমি তোমার মত খাটতে পারবো না সত্যি। আমি এতদিন ধরে তো দেখছি, তোমার সঙ্গে কারো তুলনা নেই। আমি তো পারবোই না—

—খুব পারবে! আমার সঙ্গে চলো দেখিনি। একটু গতর নাড়াও—

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

টুলু বললে—হাসপাতালে। এখনি আবার গেট বন্ধ হয়ে যাবে। ছ'টা পর্যন্ত খোলা—

—সেখানে কী করতে যাবে?

টুলু বললে—চলো না, রাস্তায় যেতে যেতে বলবো। খুব তাড়াতাড়ি করো, দেরি হয়ে যাবে।

সুরেন তাড়াতাড়িই তৈরি হয়ে নিলে। খালি গায়েই ঘুমোচ্ছিল। টুলুর সামনে খালি গায়ে কেমন লজ্জা করছিল। জামাটা গায়ে দিয়ে চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে দিয়ে বললে—চলো, যেখানে যাবে চলো—

পার্টি-অফিস থেকে হাসপাতাল বেশি দূরে নয়। হাঁটতে হাঁটতেই যাওয়া যায়। টুলু সর্টকাট রাস্তা জানে। বলতে গেলে টুলুই সুরেনকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগলো।

সুরেন বললে—তুমি খুব জোরে হাঁটো—

টুলু বললে—নামেই মেয়েমানুষ আমি, অনেক পুরুষ-মানুষকে আমি হারিয়ে দিতে পারি।

সুরেন বললে—তুমি যে ইষ্টবেঙ্গলের মেয়ে—

টুলু সুরেনের দিকে মুখ ফেরালে। বললে—কে বললে আমি ইষ্টবেঙ্গলের মেয়ে?

সুরেন বললে—দেবেশ বলেছে—

—দেবেশদা?

সুরেন বললে—দেবেশ আমাকে তোমার কথা সব বলেছে। তুমি পার্টির খুব ইম্‌পর্ট্যান্ট্‌ মেম্বার।

টুলু বললে—ইম্‌পর্ট্যান্ট্‌ না ছাই, না খাটলে চলে না তাই খাটি। আমার মত কত মেয়ে কলকাতা সহরে খেটে পেট চালায়!

সুরেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তুমি পার্টিতে এলে কী করে? কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল?

টুলু বললে—ওই দেবেশদা। চাকরি করলে আর কীই বা হতো আমার। কিন্তু পার্টির কাজে কত রকম জিনিস দেখতে পাচ্ছি। কত লোকের কত কাজ করতে পারছি। তাদের এত কষ্ট যে তুমি যদি দেখতে তোমারও চোখে জল আসতো।

তারপর আবার তাড়া দিলে। বললে—চলো চলো, তাড়াতাড়ি করো, একটু পা চালিয়ে চলো—

সুরেন পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—হাসপাতালে তোমার কে আছে?

টুলু বললে—আমার কেউ নয়। হাওড়ার চট কলে একজন কাজ করে, তার বউ—

—কী হয়েছে তার?

টুলু বললে—কী আবার হবে, মেয়েদের যা হয়। এ্যানিমিয়া। বছর বছর ছেলে হয়ে হয়ে একেবারে হাড়-মাস কালি হয়ে গেছে। এত করে বলি যে আর ছেলে করিসনি, তা শুনবে না। আমি জোর করে ওর স্বামীটাকে ধরে ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তা আমার কথা শুনে পালিয়ে গেল। আমাকে দেখলেই এখন গা ঢাকা দেয়—। এখন বুঝছে ঠেলাটা—

সুরেন চুপ করে রইল।

খানিক পরে বললে—তা বউটাকেই অপারেশন করিয়ে দিলে পারো। শুনেছি মেয়েদেরও নাকি অপারেশন হয়—

টুলু বললে—এবার তাই করবো। এই এ্যানিমিয়া থেকে সেরে উঠলেই বউটাকে নিয়ে যাবো ক্লিনিকে। কিন্তু মুশকিল, অপারেশনের নাম শুনলেই এরা ভয় পায়—

তারপর একটু থেমে বললে—তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি কেন জানো?

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—কেন?

টুলু বললে—তুমি তো বড়লোকের বাড়িতে মানুষ, কাকে বলে পৃথিবী তা দেখনি। পার্টির কাজ করতে গেলে এসব দেখা উচিত—

—কিন্তু আমি বড়লোকের বাড়িতে মানুষ, কে তোমায় বললে?

টুলু বললে—আমি সব শুনেছি।

—দেবেশটা বলেছে বুঝি?

টুলু বললে—হ্যাঁ।

সুরেন বললে—তুমি ভুল শুনেছ। আমি যে বাড়িতে থাকি সেটা বড়লোকের বাড়ি বটে, সেখানে খাওয়া-পরার কোন অভাব নেই তাও সত্যি. কিন্তু সুখ-দুঃখ তো মনের ব্যাপার। আমার নিজের কি মনে হয় জানো? আমার মত হতভাগা দুনিয়ায় আর কেউ নেই। তা না হলে তোমাদের পার্টিতে আসি?

টুলু হাসলো। বললে—ও তো সুখের দুঃখ। দুঃখের বিলাস ওটা—

সুরেন বললে—তা হতে পারে, কিন্তু কষ্টবোধটা তো সত্যি। যন্ত্রণাটা তো মিথ্যে নয়—

অফিসের তখন ছুটি হয়ে গেছে। অফিস ফেরতা লোক দলে দলে বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছে।

সুরেন বলতে লাগলো—আমি অনেক বড়লোকের সঙ্গে মিশেছি, আবার অনেক গরীব লোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, তাছাড়া শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে অনেক মাতাল, লম্পটদের সঙ্গেও জানাশোনা আছে, আমার মনে হয়েছে সকলেই এক। ও মিনিষ্টারও যা, ও রাস্তায় ভিখিরিও তাই—

টুলু বললে—হঠাৎ তোমার এই অদ্ভুত ধারণা হলো কী করে? কী দেখে?

রাস্তাটা মোড় ঘুরে বড় রাস্তায় পড়বার মুখেই হঠাৎ কে যেন সুরেনের হাতটা চেপে ধরলে জোরে।

সুরেন আচমকা মুখ ঘুরিয়ে দেখেই অবাক হয়ে গেছে।

ভূপতি ভাদুড়ী। মামা।

ভূপতি ভাদুড়ীর চোখের দিকে চেয়েই সুরেন চুপ করে গেল।

ভূপতি ভাদুড়ী পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টুলুর দিকে একবার তাকিয়েই আবার সুরেনের দিকে চেয়ে ধমকে উঠলো—এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি রে? কোথায় ছিলি এ্যাদ্দিন?

সুরেন হঠাৎ কোনও জবাব দিতে পারলে না।

—বল্, কোথায় ছিলি?

তবু সুরেনের মুখে কথা নেই।

তারপর টুলুর দিকে চেয়ে বললে—তুমি কে?

টুলু তো অবাক। সুরেনের সঙ্গে ভদ্রলোকের যে কী সম্পর্ক তাও সে বুঝতে পারছিল না।

—চল্, বাড়ি চল্!

যেন ধমকের সুর ভূপতি ভাদুড়ীর গলায়।

—আমি তোকে চারদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, আর তুমি ইদিকে মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছো? এ্যাদ্দিন তোমায় খাইয়ে-পরিয়ে বড় করে এখন এই তার পরিণাম! চল্, বাড়ি চল্—

দেবেশ নিজের কাজ-কর্ম সেরে অফিসে ফিরেই জিজ্ঞেস করলে—কোথায়, সুরেন কোথায়?

এলাহি পার্টি-অফিস। সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত। কে কোথা থেকে টাকা এনে ঢালছে, কে খরচ করছে তা বাইরের কেউ হিসেব রাখে না।

পূর্ণবাবুকে এই সব ছোটখাটো ব্যাপার দেখতে গেলে মজুরি পোষায় না। আরো বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয়। স্কুলের মাষ্টারি করে যেটুকু সময় পায়, তার মধ্যেই কখনও যেতে হয় ধানবাদের কয়লা-খনির অঞ্চলে। আবার শেষ রাত্রের ট্রেণেই কলকাতায় এসে স্কুল করতে হয়। লেবার-ইউনিয়নের কাজে পূর্ণবাবুকে নিজে গিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়াতে হয়।

মজুররা বলে—পূর্ণবাবু মানুষ নয়, দেবতা—

পূর্ণবাবু ধমক দেয়। বলে—চুপ কর, সবাই আমরা কম্‌রেড, আমরা কেউ বড়ও নই, কেউ ছোটও নই, সবাই মানুষ। মানুষ হয়ে জন্মে যাতে সবাই আমরা মানুষের মত মর্যাদা পাই, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি, দেবতা-টেবতা বললে আমাদের কাজের ক্ষতি হয়—

কিন্তু আসল কাজ করে সন্দীপবাবু।

ভদ্রলোক পার্টির সেক্রেটারি। বিয়ে-থা করেনি, হাওড়ার কলেজে প্রফেসারি করেন। হাজার টাকার মতন মাইনে যেটা পান সেটা এনে পার্টির ফাণ্ডে দিয়ে দেন। হিসেবপত্র থেকে আরম্ভ করে কার কী দরকার সব দেখেন।

টুলু এসে হয়ত বলে—সন্দীপদা, দুটো টাকা দবকার—

—কেন?

—সেই হাওড়ার জুট মিলের সেই মিস্ত্রিটার বউ-এর জন্যে একটা ওষুধ কিনতে হবে—

আর বলতে হয় না। টাকাটা স্যাংশন করে দেন সন্দীপদা। এছাড়া আরো অনেক আছে। পোষ্টার লেখবার কাগজ-কালির টাকাও যেমন দিতে হয়, তেমনি দিতে হয় কারো সার্ট, কি কারো চটি। এ-সব বিলাসিতা নয়। মোটামুটি ভদ্র-ভাবে চলতে গেলে মেম্বারদের যা-যা খরচ দরকার সব জোগাতে হয় সন্দীপ-বাবুকে। নিজের চাকরিটাও যেন এই পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। কবে একদিন মাথায় আইডিয়াটা ঢুকেছিল যে দেশের জন্যে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু যেভাবে সি. আর. দাস বা পি সি. রায় প্রাণ দিয়েছেন ওভাবে নয়। দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে গেলে আগে প্রথম একদল আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে হবে। তাদের স্বার্থ বলতে কিছু থাকবে না, সংসার বলতে কিছু থাকবে না। শুধু থাকবে পার্টি। পার্টির আদর্শকে তারা মনপ্রাণ দিয়ে মেনে চলবে।

সেই সময়েই পূর্ণবাবু জুটে গিয়েছিল। স্কুলের বাঙলার টিচার। পূর্ণ-বাবু তখন ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত।

সন্দীপবাবুই তাঁকে বোঝালেন--পলিটিক্যাল আদর্শে স্বামী বিবেকানন্দের আইডিয়াটাকে আপনি রূপ দিন না। ওই ওদের মিশনের মত করেই। কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন দেশকে গড়তে হলে নতুন আইডিয়া নিয়ে এগোতে হবে। এমন একদল ছেলেমেয়ে গড়ে তুলুন যারা স্বার্থ ভুলে পার্টির সেবা

করবে—

তখন এল দেবেশ। তখন এল টুলু। তখন এল আর সবাই।

কাজ আরম্ভ হলো ফ্যাক্টরি আর কল-কারখানার মধ্যে। দেবেশ তাদের মধ্যেই ঢুকে পড়লো। তাদের বোঝাতে লাগলো—তোমাদের এই যে অবস্থা এর জন্যে দায়ী তোমরা। তোমরা যদি এক হও তাহলে পৃথিবীতে তোমাদের নিচু করে রাখে এমন শক্তি কোথাও নেই—

এমনি করেই ফ্যাক্টরিতে-ফ্যাক্টরিতে ইউনিয়ন হলো। ইউনিয়ন আগেও ছিল, আলাদা আর একটা ইউনিয়ন হলো। দেবেশ বোঝালে—নিজেদের মধ্যে তোমরা ঝগড়া কোর না। তোমাদের ঝগড়া সরকারের সঙ্গে। তোমাদের ঝগড়া মালিকের সঙ্গে। মালিক মানেই সরকার। আর সরকার মানেই কংগ্রেস সরকার। কংগ্রেস সরকারকে আগে হঠাতে হবে!—

খুব আস্তে আস্তে কাজ শুরু হয়েছিল। তখন দেবেশদের পার্টিতে মেম্বারও ছিল দু'একজন। ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল সন্দীপবাবু। ভাড়া তিরিশ টাকা। দু'খানা ঘরের মধ্যে সবাই গাদাগাদি করে শুতো। সন্দীপবাবু যেমন বিছানায় শুতো, তেমনি বিছানাতেই শুতো দেবেশ। আর তেমনি করে এক কোণে শুয়ে থাকতো পূর্ণবাবু আর পার্টির দু-চারজন।

তারপর পার্টির মেম্বার বেড়েছে, দায়িত্ব বেড়েছে, খরচও বেড়েছে। টাকার জন্যে রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করেছে ঝুলি পেতে। লোকে হেসেছে, টিটকিরি দিয়েছে। কিন্তু তাতে কেউ দমেনি। পূর্ণবাবু ইলেকশানে নেমেছে, কিন্তু হেরে গেছে। ওই পুণ্যশ্লোকবাবুর কাছেই ভোটে হেরে গেছে। ওই প্রজেশ সেনই সেদিন প্রাণ দিয়ে খেটে বাঁচিয়ে দিয়েছে পুণ্যশ্লোকবাবুকে। তার বদলে তিনি লাখ-লাখ টাকা নিজের পকেট থেকে খরচ করেছেন। কিন্তু পূর্ণবাবু পার্টি থেকে পাঁচশো টাকাও খরচ করতে পারেনি।

তবু সন্দীপবাবু দমেনি।

সন্দীপবাবু শুধু নয়, দেবেশও দমেনি, টুলুরাও দমেনি—

ফ্যাক্টরির কুলি-মজুরদের বলেছে—এবার হেরেছি। কিন্তু এর পরের বারে আমরা জিতবো—

এবার সামনে আবার ইলেকশান আসছে, আবার উঠে পড়ে লাগতে হচ্ছে সকলকে। এবার আরো খাটতে হবে, আরো টাকা তুলতে হবে। সেই টাকা তুলতেই দেবেশ বেরিয়েছিল। সবাই ভরসা দিয়েছে টাকা দেবে। ছোট ছোট সব ফ্যাক্টরির মালিক একটু বাম-ভাবাপন্ন। কংগ্রেসের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা। তারাই বেশি উৎসাহী।

টুলু বলে—দেবেশদা, আর পারা যাচ্ছে না—

দেবেশ জিজ্ঞেস করে—কেন?

—বাবা কান্নাকাটি করছে খুব আজকাল। বলে আর বেশি দিন বাঁচবে না।

দেবেশ বলে—একজন হোল্-টাইম ঝি-টি রাখতে পারো না দেখাশোনা করবার জন্যে?

—তা তো রাখতে পারি, কিন্তু টাকা গুনবে কে?

দেবেশ বলে—সন্দীপদাকে বলবো?

টুলু বলে—না না, তোমায় বলতে হবে না। যা হবার তা হবে।

—তাহলে একটা বিয়ে করে ফেলো।

টুলু হাসে। বলে—হাসালে তুমি দেবেশদা, বিয়ে করলে তো আগেই করতে

পারতুম। ওই একটা ক্যাপিট্যালই তো আছে এখনও হাতে! কিন্তু তাহলে বাবাকেই বা দেখবে কে, আর দুটো বোনকেই বা কে দেখবে?

—কেন, যাকে বিয়ে করবে তার মাইনের টাকা দিয়ে একটা হোল-টাইম ঝি রাখবে?

টুলু আরো হাসে। বলে—তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু বেছে বেছে ও-রকম পাত্রই বা পাচ্ছি কোথায়? আর আমার এমন কী রূপ আছে যে আমার জন্যে অতগুলো পুষ্যি ঘাড়ে নেবে!

দেবেশ বলে—খুঁজলে এমন পাত্র পাওয়া যায় না যে তা নয়, কিন্তু সে আবার চাকরি-বাকরি কিছু করে না। তবে তার চাকরি-বাকরি না করলেও চলে যায়।

—কে সে?

দেবেশ বলে—সে আমার এক বন্ধু। মামার ঘাড়ে বসে-বসে খায়। বড়লোকের বাড়িতে ম্যানেজারি করে তার মামা। বিরাট বড়লোক তারা। একদিন তার সঙ্গে তোমায় ভিড়িয়ে দেবো। তারপরে তোমার ভাগ্য আর তার হাত-যশ!

এ-সব কথা গোড়ার দিকের। তখন সুরেন আসেনি পার্টি-অফিসে। কিন্তু যেদিন সুরেন এল সেদিন টুলু দূর থেকে দেখেছিল। বুঝেছিল এরই কথা বলেছিল দেবেশদা।

কিন্তু নানান কাজের ভিড়ে দেবেশ সে-সব ভুলেই গিয়েছিল। ইলেকশানের কাজ আসছে সামনে। তাই নিয়েই তাকে ভাবতে হচ্ছে তখন। সুরেন এলে তাদের পার্টি আরো স্ট্রং হবে এইটেই সে তখন ভেবেছিল।

কিন্তু যখন পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো তখন কেমন অবাক হয়ে গেল সে।

একদিন আড়ালে দেবেশকে ডেকে টুলু জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা দেবেশদা, তুমি এরই কথা আমাকে বলেছিলে, না?

দেবেশের যেন তখনই মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

বললে—আরে, সত্যিই তো, আমি তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম সে-কথা, চলো চলো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই সুরেনের—

—না দেবেশদা, থাক।

—আরে লজ্জা কী! তুমিও অসূর্যম্পশ্যা মেয়ে নও, আর সুরেনও এমন কিছু তালেবর কেউকেটা নয়। ও-ও ঠিক তোমার ও-পিঠ। বিয়েটা হয়ে গেলে একটা ভালো করে ফিস্ট্ হয়ে যায়।

টুলু বললে—না না দেবেশদা, আমার বড় লজ্জা করছে, সে পরে হবে'খন—

দেবেশ বললে—পরে হবে কেন? বয়েস বেড়ে গেলে কে আর তোমায় বিয়ে করবে? এখন বয়েস থাকতে থাকতে গিঁথে নেওয়া ভালো—

—কিন্তু তোমার বন্ধু তো পালিয়ে যাচ্ছে না!

দেবেশ বললে—তা ঠিক আছে, ও তো সবে আমাদের এখানে এল। এখন থেকে মেলামেশা করতে করতে প্রেম গজানো ভালো।

কিন্তু সেই সুরেনের আসা যে এমনভাবে দু'দিনের আসা হবে তা ভাবতে পারেনি টুলু।

দেবেশ তখন অফিসের মধ্যেই খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছে। সন্দীপদা তখন নিজের চেয়ারে বসে কাজ করছিল।

দেবেশকে দেখেই বললে—তোকে একবার সিউড়িতে যেতে হবে দেবেশ—

সন্দীপদার কথা মানেই হুকুম। দেবেশ বললে—যাবো—

সন্দীপদা বললে—হ্যাঁ, অনেকদিন ও-দিকটায় কেউ যায়নি. সব পার্টি গিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে—

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—সন্দীপদা, তুমি আমার বন্ধুকে দেখেছ, সেই সুরেন সান্ন্যাল, যে নতুন এসেছিল?

সন্দীপদা বললে—কই, দেখিনি তো—

তারপরেই নিজের কাজেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

দেবেশ একে-ওকে-তাকে অনেককেই জিজ্ঞেস করলে। ঠাকুরের কাছে গেল। চাকরদের কাছেও খোঁজ নিলে।

কেমন যেন সন্দেহ হলো তার। তবে কি সে চলে গেল নাকি!

একজনকে জিজ্ঞেস করলে—টুলু কোথায়?

—টুলু তো সুরেনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে!

যাক্। নিশ্চিন্ত হলো দেবেশ। টুলু যখন তাকে নিয়ে গেছে, তখন আর কোনও ভাবনা নেই। কালকে আবার সিউড়ি যেতে হবে। তার জন্যে তৈরি হতে হবে। একটা গেঞ্জি কিনতে হবে। ট্রেণ ভাড়া চেয়ে নিতে হবে সন্দীপদার কাছ থেকে। অনেক কাজ তার!

হঠাৎ টুলু এসে ঢুকলো গম্ভীর মুখে।

দেবেশ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? সুরেন কোথায়?

টুলু বললে—তোমার বন্ধুকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলুম, তার মামা এসে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

—মামা টেনে নিয়ে গেল মানে?

—জোর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল.

দেবেশ তো অবাক! বললে—টেনে নিয়ে গেল আর সেও চলে গেল! ছেলে-মানুষ নাকি? তা তুমিও তার হাত ধরে টানলে না কেন?

টুলু বললে—তা আমি কী করে পারি! তার নিজের মামা, আর আমি কে? আমি তো কেউ-ই না।

দেবেশ বললে—ওটার কিছু হবে না। একটা পার্সোন্যালিটি বলে কিছু নেই, যে যা বলে তাই শোনে।

তারপর একটু ভেবে বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি সিউড়ি যাচ্ছি, কাল ফিরে এসে এর একটা ফয়সলা করছি—

এক-একজন মানুষের জীবন থাকে যা সকলকে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। বা সকলের জীবনের মাঝে জড়িয়ে বেড়ে উঠতে চায়। আর এক ধরনের জীবন থাকে যা সকলকে অস্বীকার করে নিজের অস্তিত্বটাকেই প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাদের কাছে তুমি কেউ নও, আমি কেউ নই। তারা নিজেরাই সব। তারা নিজের প্রয়োজনে সকলকে কাছে ডাকে, আবার নিজের প্রয়োজনেই সকলকে দূরে ঠেলে। সংসারে এদের সংখ্যাই বেশি।

সুখদা একটু বড় হয়েই বুঝেছিল যে-সংসারে সে মানুষ, সেখানে তার অধিকার বলে কোনও কিছু নেই। মা-মণির সঙ্গে যে-সম্পর্কটা বাইরে সত্য, ভেতরে সেটা অন্তঃসারশূন্য। সেখানে সে অনুগ্রহের পাত্রী। আইনের দোহাই

দিয়ে তার কিছু করণীয় নেই। এককথায় বলতে গেলে সে নিরাশ্রয়।

এই অসহায়-বোধ থেকেই তার প্রকৃতিতে একটা বিদ্রোহীর জন্ম হয়েছিল।

কিন্তু বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? তার অসহায়তার জন্যে যারা দায়ী তাদের তো হাতের কাছে পায় না সে। বাবা কেউ আছে কি নেই, তারা কেউ ছিল কি ছিল না, তাও তো জানা নেই। একদিন রাগ করেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিল পৃথিবীর সব মানুষের ওপর সে প্রতিশোধ নেবে। সকলের ক্ষতি করে সে প্রতিশোধ নেবে না, প্রতিশোধ নেবে নিজের ক্ষতি করে।

কিন্তু নিজের ক্ষতিরও তো একটা সীমা আছে।

মাধব কুণ্ডু লেনের বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তাই তার নিজের কথাটাই সে ভাবছিল।

মা-মণি সেই অসুস্থ অবস্থাতেই টাকা বার করে দিয়েছিল।

বলেছিল—এগুলো তুই রাখ না তোর কাছে

সুখদা প্রথমে ভেবেছিল নেবে না। বলেছিল—টাকা তুমি দিচ্ছ মা-মণি, কিন্তু তোমার কাছ থেকে কিছু নিতে আমার বড় কষ্ট হয়—

—কেন রে, আমি তো তোকে নিজে থেকেই দিচ্ছি, তুই তো চাসনি আমার কাছে। তোর নিতে হয়ত ভালো লাগে না, কিন্তু আমার যে তোকে দিতে ভালো লাগে!

টাকাগুলো মা-মণি জোর করে সুখদার আঁচলে বেঁধে দিয়েছিল।

বলেছিল—এতে শ'তিনেকের মত আছে, দরকার হলে আমার কাছে এসে আরো নিয়ে যাস্—

—দরকারের কথা আর বোল না মা-মণি। আমার দরকার তুমি জীবনে কোনও দিন মেটাতে পারবে না, আমার দরকার কেউ কখনও মেটাতে পারবে না।

—কেন রে, তোর এত খরচ কীসের মা?

সুখদা বলেছিল—খরচ তো আমার সংসারের নয় মা, খরচ পাঁচ ভূতের!

—পাঁচ ভূতের মানে?

—সে তুমি বুঝবে না।

—তুই আমাকে সব খুলে বললেই বুঝতে পারবো! তোর তো সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় মা। এখানে ছিলি আমি তোকে চোখের সামনে দেখতে পেতুম। তারপরে তোর যে কী মতিচ্ছন্ন হলো, কার সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গেলি। তারপর হুট্ করে আবার একদিন এলি। তা এলিই যদি তো আবার চলে গেলি কেন মা?

সুখদা বলেছিল—সে তুমি বললেও বুঝতে পারবে না।

মা-মণি বলেছিল-কেন, আমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই? বললেই বুঝতে পারবো।

সুখদা বলেছিল—আচ্ছা তুমি তো বলছো বুঝতে পারবে, কিন্তু আমি নিজেই কি নিজেকে বুঝি? আমার যে সকলকে পর মনে হয়। বলতে পারো, কেন তোমাকেও আমার পর মনে হয়?

—ওমা, আমি নাকি তোর পর?

—তা পর নও?

মা-মণি বললে—আবার তোর সেই যত পুরোন কথা। তুই বাপু আমাকে আর জ্বালাসনে। একে আমার মাথার রোগ তার ওপরে তোর কথা—আমার ভাল্লাগে না—

—তা ভাল লাগবে কেন? আমার সবই তোমার খারাপ, আর সুরেনের সবই ভালো—

এ কথা বলে উঠে পড়লো সুখদা। ততক্ষণে নিচেয় ট্যাক্সি এসে গিয়েছিল। চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু পেছন থেকে মা-মণি ডেকে বলেছিল—ওরে রাক্ষুসী, তুই এত বড় মিথ্যে কথাটা বলতে পারলি?

কিন্তু সে-কথায় কান না দিয়ে সুখদা হন্-হন্ করে নিচেয় নেমে গিয়েছিল। আর তারপর ট্যাক্সিতে উঠে সোজা নিজের বাড়ির গলির সামনে এসে নামলো।

কালীকান্ত আর নরেশ দত্ত দু'জনেই বাড়ির ভেতরে অপেক্ষা করছিল।

ট্যাক্সির শব্দটা কানে যেতেই নরেশ দত্ত সোজা হয়ে বসলো। বললে—ওই বোধহয় তোর বউ এল—

সত্যিই তাই। ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে সুখদা তখন ঘরে ঢুকেছে। সুখদার মুখের চেহারা দেখে দু'জনেই একটা কিছু আন্দাজ করতে চেষ্টা করলে।

কালীকান্ত জিজ্ঞেস করলে—কী গো, কিছু হলো?

সুখদা সে-কথার জবাব দিলে না। সোজা ঘরে ঢুকে পাশের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

নরেশ দত্ত ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে—কী রে কালীকান্ত, তোর বউ রেগে গেছে নাকি? রাগলো কেন হঠাৎ—

কালীকান্ত বললে—আরে ও তো রেগেই আছে দিনরাত। অত যে কীসের রাগ বুঝি না বাবা।

নরেশ দত্তর যেন সন্দেহ হলো। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে—টাকা পায়নি নাকি?

কালীকান্ত বললে—কে জানে, বিবির মর্জি বোঝা ভার!

নরেশ দত্তরই টাকার বেশি দরকার। বললে—তুই একটু তোয়াজ কর না গিয়ে বাবা। মেয়েমানুষ তোয়াজেই জব্দ! যা না, টাকা এনেছে কিনা জিজ্ঞেস কর না গিয়ে।

গরজ বড় বালাই। কালীকান্ত পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বললে—কী গো, কথা বলছো না যে? বলি টাকা-কড়ি কিছু হাতাতে পারলে?

সুখদা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। চোখ-মুখ যেন জ্বলছে সুখদার। তারপর আঁচল থেকে কয়েকটা নোট নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কালীকান্তর দিকে।

বললে—যাও, টাকা নিয়ে মদ গেলো গে—

কালীকান্তর মান-অপমান জ্ঞান নেই। ও-জ্ঞান থাকলে চলেও না। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে নোটগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগলো।

সুখদা বললে—যা পেলে ওই শেষ, আর কখনও আমি টাকা আনতে পারবো না, এই বলে রাখছি—

পরের কথা পরে হবে। এখন তো ক'টা টাকা পাওয়া গেল। টাকাগুলো গুণতে গুণতে আবার বাইরের ঘরে এল।

নরেশ দত্ত মুখিয়েই ছিল। কালীকান্তর হাতে টাকা দেখে আনন্দে উঠে দাঁড়ালো।

বললে—কত রে কালীকান্ত, কত?

ভূপতি ভাদুড়ী সুরেনকে টানতে টানতে একেবারে উঠোনের ওপর এনে দাঁড় করালো।

বললে—চল্, মা-মণির কাছে চল্—মা-মণি তোর জন্যে ভেবে-ভেবে মরছে আর তুই এদিকে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছিস—

কী আর করবে সুরেন, যেতেই হবে! সুরেন সিঁড়ি দিয়ে অন্দরের দিকেই যাচ্ছিল।

পেছনে যেতে যেতে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—তা তুই অত মেয়েছেলে কোত্থেকে জোটাস বল তো, আর তোর পেছনে অত মেয়েছেলে জোটেই বা কী করতে? তোর ট্যাঁক তো ঢু-ঢু—। এখন আজ যাকে দেখলাম ও কে? ওর বাড়ি কোথায়? করে কী মাগীটা?

ভূপতি ভাদুড়ী যে কেন এমন করে সুরেনকে ভালো ছেলে করবার চেষ্টা করতো তা সুরেন নিজেই জানতো না। কাউকে কি জোর করে ভালো বা খারাপ করা যায়? যেন মেয়েদেব সঙ্গে মিশলেই সুরেন খারাপ হয়ে যাবে আর ছেলেদের সঙ্গে মিশলে খারাপ হবে না। খারাপ যে হবে তাকে ঘরের দরজার ভেতরে শেকল দিয়ে বন্ধ করে রাখলেও সে খারাপ হবে। সংসারে ভালো-খারাপের কি কোনও মানদণ্ড আছে? কে বিচার করবে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ? গরীবের ভালোটাও মন্দ, আর বড়লোকদের মন্দটাও ভালো।

কিন্তু সুরেন এ-সব কথা মুখ দিয়ে কিছুই বললে না। গুরুজনের সামনে এ-সব কথা বলতেও নেই। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। তেতলায় মা-মণির ঘরের কাছে গিয়ে ভূপতি ভাদুড়ী বললে—মা-মণি, এই সুরেনকে ধরে এনেছি—

মা-মণি ঘরের ভেতরে শুয়ে ছিল। খবরটা শুনেই সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল।

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আপনাকে উঠতে হবে না মা-মণি। আপনি শুয়ে থাকুন—

কিন্তু মা-মণি সে-কথায় কান না দিয়ে উঠে বসলো।

বললে—কই সে?

সুরেন তখন অপরাধীর মতন ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

মা-মণি সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ রে, তোরা কী মনে করেছিস? তোদের কি দয়া-মায়া বলে প্রাণে কিছু নেই? আমি কী করেছি যে আমায় ছেড়ে তোরা সবাই চলে গেলি?

সুরেন কিছু কথা বললে না। শুধু চুপ করে শুনে গেল।

কথা বলতে বলতে মা-মণি যেন হাঁফাতে লাগলো। বললে—আমি কী দোষ করেছি বল তো? তুইও থাকলি না, সুখদাও চলে গেল? কে তোদের কী হেনস্থা করেছে? সত্যি করে বল্ তো কে তোদের কী বলেছিল? বল্, খুলে বল্—

সুরেন বললে—কেউ কিছু বলেনি—

—তাহলে? তাহলে কেন চলে গেলি

সুরেন বললে—আমার এখানে থাকতে আর ভালো লাগলো না।

এতক্ষণে ভূপতি ভাদুড়ী কথা বলে উঠলো। বললে—না মা-মণি, তা নয়, আমি ওকে বকেছিলুম। রাত করে বাড়ি আসে বলে আমি বকেছিলুম ওকে—

—কেন বকতে গেলে তুমি? তোমারই তো দোষ ভূপতি! ছোট ছেলে, সমস্ত দিন একলা-একলা ওর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে! একটু ঘুরে বেড়াবে না? তুমি কেন ওকে বকো? কে তোমাকে বকতে বলেছে? ও তোমার যেমন ভাগ্নে, তেমনি আমার ছেলেও। বকতে হলে আমি ওকে বকবো!

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু মা-মণি, একদিন তো ওকেই এই সব দেখা-শোনা করতে হবে! এখন থেকে আমার কাজ-কর্ম বুঝে না নিলে কবে বুঝবে? কবে সব শিখবে?

মা-মণি বললে—সে শেখবার এখন অনেক সময় পড়ে আছে। তা বলে তুমি ওকে বকবে? আর এমন করে বকবে যে একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ও?

তারপর একটু থেমে বললে—ও যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তো আমি কী নিয়ে, কাকে নিয়ে থাকবো বলো তো?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—কিন্তু ও যে বড় বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছিল মা-মণি, এই তো দেখলুম এখুনি একটা মেয়েছেলের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিল—

—সে কী? মা-মণি যেন চমকে উঠলো।

সুরেনের দিকে চেয়ে বললে—কে? কোন্ মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তুই?

সুরেনের উত্তর দেবার আগেই ভূপতি ভাদুড়ী বললে—আমি কি সাধ করে ওকে বকি মা-মণি। যখন-তখন যার-তার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। বাড়ি আসবার নাম করে না মোটে। এখন থেকে তো আমার কাজ-কর্মগুলো ওর বুঝে নেওয়া উচিত। তা নয়, কেবল মেয়েদের পেছন-পেছন ঘুরবে। আগে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিত। তখন তবু বাড়ি আসতো। এখন আবার আর একটা মেয়ের পাল্লায় পড়েছে, এর পাল্লায় পড়ে একেবারে বাড়ির কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে—

মা-মণি সুরেনের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—কে রে? মেয়েগুলো কে? কী করে? কাদের মেয়ে?

সুরেন বললে—তুমি বিশ্বাস করো মা-মণি, আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশি না। মেয়েরাই আমার সঙ্গে মেশে—

—কিন্তু মেয়েরা কারা?

সুরেন বললে—একজন ছিল আমার বন্ধু সুব্রতর বোন। আর আজকে যাচ্ছিলাম টুলুর সঙ্গে। ও হাসপাতালে যাচ্ছিল একটা রোগী দেখতে, তাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল—

মা-মণি অবাক হয়ে গেল। বললে—টুলু কে?

ভূপতি ভাদুড়ী বললে—দেখুন দিকিনি কাণ্ড, কোত্থেকে টুলুকে জোগাড় করেছে আবার।

মা-মণি বললে—তুমি থামো ভূপতি, তুমি কেন কথার মাঝখানে কথা বলছো?

তারপর সুরেনের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, আমাকে বল্ তো তুই টুলু কে?

সুরেন বললে—আমি কী করে জানবো মা-মণি! আমার তো ভালো করে তার সঙ্গে আলাপও হয়নি। দেবেশদের পার্টির মেম্বার, ওদের সঙ্গে পার্টির

কাজ করে—

ভূপতি ভাদুড়ী আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে—তাদের পার্টির ব্যাপার তো তোর কী? তুই কি ওদের পার্টিতে নাম লিখিয়েছিস?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

—নাম লিখিয়েছিস মানে? তুই কি ওদের সঙ্গে জেলে যাবি নাকি?

সুরেন বললে—হ্যাঁ—

মা-মণি এতক্ষণ কিছু বুঝতে পারছিল না। বললে—জেলে যেতে হবে? কেন?

সুরেন বললে—সে তুমি বুঝবে না মা-মণি। জেলে যাওয়া খুব কষ্টের নয়। জেলে গেলে ওদের শরীর ভালো হয়ে যায়। খুব ভালো-ভালো খাওয়া-দাওয়া দেয় জেলে। দেবেশ যতবার জেলে গেছে ততবার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে—

—তুই থাম্। বাজে কথা বকিসনি। যত সব ইল্লুতদের সঙ্গে মিশে ওই সব হচ্ছে। আর ইদিকে আমরা ভেবে ভেবে মরছি। তোর কি খাওয়া-পরার অভাব যে ওদের পার্টিতে যাবি? তোর কি বাড়ি-ঘর দোর নেই যে বখাটে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশে গোল্লায় যেতে হবে? তোর কীসের দায় যে বাড়ি ছেড়ে ওখানে গিয়ে বসবাস করবি? মা-মণি, আপনি একবার বুঝিয়ে বলুন তো ওকে, বুঝিয়ে বলুন—

—আঃ ভূপতি, তুমি থামো না। আমার কথার মাঝখানে তুমি কথা বলছো কেন! যা বলবার আমি বলবো. তুমি কে? তুমি এখান থেকে যাও দিকিনি, তুমি যাও—

ভূপতি ভাদুড়ীর যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

বললে—তাহলে আপনি একটু ওকে বকে দিন মা-মণি, দিন-দিন বড় বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে—

মা-মণি বললে—আচ্ছা, সে-যা বলবার আমি বলবো, তুমি এখন যাও—

ভূপতি এবার আর দাঁড়ালো না। আস্তে আস্তে নিচেয় নেমে গেল।

মা-মণি বললে—কী বলছিলি বল্ এখন। তোর এ-রকম মতিগতি হলো কেন? কে তোকে এ-সব মতলব দিলে? বল্ কে দিলে?

সুরেন তবু চুপ করে রইল।

মা-মণি আবার বললে—বল্! উত্তর দে!

সুরেন মুখ তুললো এবার। বললে—কী বলবো?

মা-মণি বললে—তোকে এ-সব বদ-মতলব কে দিলে?

সুরেন বললে—কে আবার মতলব দেবে? কেউ-ই দেয়নি। আমি নিজেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি।

—কেন? এখানে তোর কষ্টটা কীসের?

সুরেন বললে—আমার একদিন বাড়ি আসতে রাত হয়েছিল বলে মামা আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি।

—কিন্তু বাড়ি ফিরতে তোর রাতই বা হলো কেন? কেন অত রাত হয়? কোথায় কী করিস তুই?

সুরেন বললে—কিছু করি না।

—কিছুই যদি করিস না তো রাত হয় কেন তোর? কোথায় যাস তুই? কার সঙ্গে মিশিস?

সুরেন এবার চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমার কিছু ভালো লাগে

না মা-মণি।

—কেন রে? কিছু ভালো লাগে না কেন তোর?

সুরেনের চোখ দুটো কান্নায় ভিজে এল। বললে—তা জানি না। আমার কিছু ভালো লাগে না। কেবল মনে হয় আমি পৃথিবীতে এসে কী করলুম। কোনও কাজই তো আমার নেই। আমার নিজের বলতে কে আছে সংসারে? কার জন্যে আমি বেঁচে থাকবো?

—ওমা! মা-মণি অবাক হয়ে গেল। বললে—এ-সব কী উদ্ভুট্টি ভাবনা তোর? এ-সব ভাবনা তোর মাথায় কে ঢোকালো?

সুরেন বললে—কেউ ঢোকায়নি। আমি নিজেই কেবল এই সব কথা ভাবি। ভাবি আমার কেউ নেই—

মা-মণি বললে—কেউ যদি নেই তোর তো আমি কে? আমি তোর কেউ নই?

সুরেন এ-কথার কোন জবাব দিল না।

মা-মণি বললে—কী রে, জবাব দিচ্ছিসনে যে? আমি তোর কেউ নই? আমি তোর পর?

সুরেন এবারও কোনও উত্তর দিলে না।

মা-মণি এবার সুরেনের চিবুক ধরে নিজের দিকে ফেরালো। বললে—কী রে, কথা বল্, আমি তোর পর?

সুরেন মাথা নাড়লে, বললে—না—

—তাহলে?

সুরেন বললে—কিন্তু আমার যে কিছু ভালো লাগে না!

মা-মণি সুরেনের হাত ধরে সামনে টেনে আনলে। বললে—আমার কাছে সরে আয়। ও-সব পাগলামি ছাড় তুই! তুই চলে গেলে আমি কী নিয়ে থাকবো সেটা একবার ভাবলিনে? সুখদা পোড়ামুখীটা ছিল, সেও একদিন চলে গেল। তোরা কি কেউই আমাকে ভালবাসিসনে? তোরা কি কেবল নিজের কথাই ভাববি? আমার দিকটা একবার কেউ দেখবিনে? আমি তোদের কাছে কী অপরাধ করেছি বল্ তো! আমারই কি কেউ আছে? আমারই কি কিছু ভালো লাগে? আমারও তো মনে হয় পৃথিবীতে এসে আমি কী করলুম? তা তার জন্যে কি আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছি?

সুরেন এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

মা-মণি বললে—ও-সব কথা ভাবিসনি। ও-সব কথা ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যায় আমার। তার চেয়ে এই তো ভালো। সব মুখ বুজে সহ্য করি। সহ্য না করতে পারলে যে মানুষ আত্মঘাতী হয়। আত্মঘাতী হওয়া কি ভালো? ওতো পাপ—

সুরেন তবু চুপ করে রইল—

মা-মণি হঠাৎ বললে—আমার কথা দে, তুই আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবিনে? কথা দে তুই—

সুরেন কিছু বললে না।

—চুপ করে আছিস কেন? কথা দে—

সুরেন তবুও কিছু কথা বললে না।

মা-মণি আবার বললে—দে আমায় কথা। তুই না কথা দিলে কিন্তু আমি আত্মঘাতী হবো। দে, কথা দে আমায়!

সুরেন বললে—কিন্তু তুমি আমার জন্যে আত্মঘাতী হতে যাবে কেন মিছি-মিছি? আমি তোমার কে?

মা-মণি বললে—ও-সব কথা শুনতে চাইনে আমি, আগে আমাকে কথা দে—

সুরেন কী করবে বুঝতে পারলে না।

মা-মণি ধমকে উঠলো এবার। বললে—কথা দিবিনে?

সুরেন এবার সোজাসুজি চাইল মা-মণির দিকে। বললে—কেন তুমি আমাকে এমন করে আটকে রাখছো? আমাকে কি তুমি চিরকাল এখানে ধরে রাখবে? আমাকে কি তুমি কখনও ছেড়ে দেবে না?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ, ধরে রাখবো, কখনও ছেড়ে দেবো না!

—কিন্তু সুখদাকে তো তুমি ছেড়ে দিলে। তার বেলায় তো তুমি আটকে রাখতে পারলে না।

মা-মণি বললে—ওরে, সেই জন্যেই তো তোকে এমন করে বলছি। ওরে, আমার যে আর কেউ নেই সংসারে।

মা-মণির দিকে চেয়ে দেখলে সুরেন। মা-মণির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। কেমন যেন মনটা ভিজে এল সুরেনের। বললে—আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি আমি যাবো না—

—এ-বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবি না তো?

সুরেন বললে—না।

মা-মণি বললে—তাহলে আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর,—ছোঁ পা—

সুরেন এক মুহূর্তের জন্যে বুঝি একটু দ্বিধা কবতে লাগলো।

মা-মণি আবার তাগাদা দিলে। বললে—কই, পা ছুঁলিনে?

এবার সুরেন সরে বসে মা-মণির পায়ে হাত দিলে।

মা-মণি বললে—বল্, আর কখনও এ-বাড়ি ছেড়ে যাবিনে? মুখে উচ্চারণ কর্—

হঠাৎ পেছনে কার পায়ের আওয়াজ হতেই সুরেন মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সুখদা।

সুখদা হয়ত আশা করেনি সুরেন এ-সময়ে এ-ঘরে থাকবে। সুরেনের দিকে একবার চেয়ে দেখে নিয়েই মা-মণির দিকে এগিয়ে এল।

—কী রে, তুই? আবার?

সুখদা বললে—কেন মা-মণি, আসতে নেই?

মা-মণি বললে—আয় আয়, বোস, তোরা এলে যে কত ভালো লাগে আমার কী বলবো। এই দেখ্ না, এই সুরেনও ক'দিন থেকে কোথায় চলে গিয়েছিল, আবার কত কষ্ট করে একে আজ ধরে এনেছে ভূপতি। হ্যাঁ রে এ তোর কী চেহারা হয়েছে?

সুখদা বললে—তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম মা-মণি!

—বল্ না!

সুখদা বললে—একটু আড়ালে বলবো।

—ও মা, সুরেনের সামনে আবার লজ্জা কী! ও তো তোর ভাই-এর মতন। কী বলবি ওর সামনেই বল্ না।

সুরেন বললে—তাহলে আমি এখন যাই মা-মণি, পরে আবার একসময় আসবো'খন।

মা-মণি বললে- না, তুই কোথায় যাবি, বোস্। বল না মা কী বলবি তুই

বল্ না। আর কিছু টাকার দরক

সুখদা প্রথমে একটু সঙ্কোচ করলে। তারপর বললে—আমি বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি মা-মণি। আমি বুঝতে পারছি না আমি কী করবো। তোমার কাছ থেকে গিয়ে পর্যন্ত আমার দু'চোখে ঘুম নেই। ও বোধহয় আব বাঁচবে না।

মা-মণি শুনে চমকে উঠলো। বললে—কী, বলছিস কী তুই? জামাই? কালীকান্ত? কালীকান্তর অসুখ? কী হয়েছে? কাকে দেখাচ্ছিস? কোন্ ডাক্তার দেখছে?

কিন্তু এত কথার উত্তর তখন কে আর দেবে? সুখদা তখন অঝোর ধারায় কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

মা-মণি যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে—তাহলে জামাইকে এখানে নিয়ে আয় না? কোথায় কোন্ বস্তির মধ্যে পড়ে আছিস, সেখানে কে তোদের দেখা-শোনা করবে?

সুখদা কাঁদতে কাঁদতে বললে—সে এখানে আসবে না মা, আমি অনেক কবে বলেছি—

—তা ডাক্তার কী বলছে? সেদিনও তো তুই এসেছিলি, কিছু তো বললি না। হঠাৎ কী হলো?

সুখদা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমি আর একলা থাকতে পার-ছিলুম না মা-মণি, তাই চলে এলাম, এবার যাই, বাড়িতে দেখবার কেউ নেই—

—এখ্খুনি যাবি! বসবি না?

সুখদা বললে—মানুষটাকে একলা ফেলে রেখে এসেছি মা-মণি। এই কথাটা বলতেই শুধু তোমার কাছে এসেছিলুম। কী যে করি, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো।

বলে সুখদা সত্যি-সত্যিই উঠলো।

মা-মণি বললে—উঠলি?

সুখদা বললে—হ্যাঁ, আর ভালো লাগছে না কিছু, আমি যাই—

মা-মণি তবু ছাড়লে না। বললে—ওবে, আমার কাছে কিছু চাইতে লজ্জা করিস নে মা, টাকার দরকার থাকে তো টাকা নিয়ে যা। এখন তোর অনেক টাকার দরকার হবে। টাকা নিয়ে যা—

সুখদা একটু থমকে দাঁড়ালো।

মা-মণি সুরেনকে বললে—বাবা, এই চাবি নিয়ে ওই সিন্দুকটা খোল তো। খুলে শ'দুয়েক টাকা বের করে দে তো।

সুরেন চাবি নিয়ে সিন্দুকটা খুললো। ভেতরে থাক-থাক টাকা। সুরেন তা থেকে কুড়িটা দশ টাকার নোট গুণে নিয়ে সুখদার হাতে দিলে।

মা-মণি বললে—যাবি কী করে? একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবো?

সুখদা বললে—না, তার দরকার নেই, আমি একলাই যেতে পারবো—

বলে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

মা-মণি বললে—দেখলি তো বাবা মেয়ের রাগ। হাত পেতে টাকা চাইতেও লজ্জা। জামাই-এর অসুখ, আর মেয়ের খালি লজ্জা। আমি ওর মুখ দেখেই বুঝেছি একটা কিছু বিপদ হয়েছে। অথচ আমি যে ওর কাছে কী অপরাধ করেছি তাও মুখ ফুটে কখনও বলবে না। সবই আমার কপাল—

সুরেন বললে—আমি একবার গিয়ে দেখে আসবো মা-মণি?

—তুই ওদের বাড়ি চিনিস?

সুরেন বললে—হ্যাঁ।

—তুই কী করে চিনলি?

সুরেন বললে—একদিন ওই কালীকান্তবাবু আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

—তাহলে তোর সঙ্গে আমিও যাবো বাবা। আমারও একবার যেতে ইচ্ছে করছে।

সুরেন বললে—তোমার এখন শরীর খারাপ, তুমি যেতে পারবে না। আমি আগে একদিন গিয়ে দেখে আসি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাবো—

—তা তাই যাস বাবা। ও হয়ত আমাকে আর খবরই দেবে না। টাকার দরকার না থাকলে ও তো আমার কাছে আসে না। তুই একদিন গিয়ে দেখে আসিস—

টুলু সেদিন ভোর বেলাই পার্টির অফিসে এসেছে। দেবেশ দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—এ কি, এত সকালে যে?

টুলু বললে—আজ তো তুমি সিউড়ি যাচ্ছ—

দেবেশ বললে—তা তো যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কী করতে?

টুলু বললে—তোমার তো আসতে দেরি হবে—

দেবেশ বললে—তা তিন-চার দিন দেরি বৈ কি।

টুলু বললে—যাবার আগে তোমার সেই বন্ধুর বাড়িটা একবার দেখিয়ে দেবে? সেই সুরেন, সুরেন সান্ন্যাল? দেখাতে কত আর সময় লাগবে? তোমার গাড়ি তো আটটায়—

দেবেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেল টুলুর ব্যাপার দেখে।

বললে—তুমি কি এই জন্যেই এত সকালে এলে নাকি?

টুলু যেন একটু লজ্জায় পড়লো। বললে—নিজেকে যেন আমার দোষী মনে হচ্ছে দেবেশদা। আমি যদি তোমার বন্ধুকে হাসপাতালে নিয়ে না যেতুম, তাহলে হয়ত কেউ দেখতেও পেত না। মনে হচ্ছে আমিই তাঁর ক্ষতি করলুম।

দেবেশ বললে—ঠিক আছে, চলো দেখি কী করতে পারি।

বৌবাজার থেকে শেয়ালদা না গিয়ে আবার উল্টোদিকে যাওয়া।

দেবেশ বললে—আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না, আমার ট্রেণ লেট হয়ে যাবে।

টুলু বললে—আমিই কি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো? আমি শুধু ক্ষমা চেয়েই চলে আসবো। কাল রাত্তিরে সেই কথা ভেবে-ভেবে ঘুমই হয়নি।

দেবেশ বললে—সুরেনটা চিরকালই ওই রকম। কারোর মুখের ওপর কিছু বলতে পারে না। যে যা বলে শুধু শুনে যায়। ওকে দিয়ে আমাদের পার্টির কী কাজ হবে কে জানে!

বাসে যেতে যেতে সুরেনের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলতে লাগলো দেবেশ। পার্টির কথাই বেশি। সন্দীপদার কথা, পূর্ণবাবুর কথা। কংগ্রেসের অত্যাচারের কথা। কিন্তু টুলুর সে-সব কথা শুনতে বেশি ভালো লাগলো না।

বললে—আমি যাচ্ছি বলে তোমার বন্ধু কিছু মনে করবে না তো?

দেবেশ বললে—মনে করলো তো আমাদের বয়েই গেল! আমরা কি ওর তোয়াক্কা করি?

—কিন্তু সুরেনবাবুর মামা যদি আমাদের দেখতে পায়?

দেবেশ বললে—দেখতে তো পাবেই! ওর মামাটাই তো একটা হারামজাদা! ওদের বাড়ির বুড়িটার সমস্ত সম্পত্তি হাত করতে চায়।

টুলু বললে—ওর আর কে আছে?

দেবেশ বললে—কেউ নেই। ছোটবেলা থেকেই ওই ওর মামার কাছেই মানুষ।

টুলু বললে—মনে হয় ওই জন্যে ওর মনে একটা দুঃখ আছে। বড় একলা-একলা থাকতে ভালবাসে। কারোর সঙ্গে বিশেষ কথা বলতে চায় না। মনে হয় সব সময় কী যেন ভাবছে!

ততক্ষণে বাসটা যথাস্থানে এসে গিয়েছিল। দেবেশ নামলো। টুলুও আগেই নেমে পড়েছিল। সকালবেলার মাধব কুণ্ডু লেন। বেশি লোকজন নেই রাস্তায়। তখনও দোকানের ঝাঁপগুলো ভালো করে খোলেনি।

বাড়িটার কাছে এসে দেবেশ বললে—এই বাড়ি—

তারপর টুলুকে বললে—তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আসি—

বাহাদুর সিং দেবেশকে আগেও একবার-দু'বার দেখেছে। দেবেশকে ঢুকতে দেখে কিছু বললে না। দেবেশ সোজা গিয়ে উঠোনে দাঁড়ালো। তারপর সুরেনের ঘরের দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

—সুরেন, সুরেন—

—কে?

ওদিক থেকে ভূপতি ভাদুড়ী দেখতে পেয়েছে। বললে—কে? কে তুমি?

দেবেশ পার্টির কাজ করা লোক। অত সহজে ঘাবড়ায় না। এ-রকম অবস্থার মুখোমুখি অনেকবার হতে হয়েছে তাকে আগে।

বললে—আমি দেবেশ, সুরেনের বন্ধু—

ভূপতি ভাদুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে সামনে এল।

বললে—বন্ধু তো এত সকালে কী করতে?

দেবেশ বললে—সে আপনাকে আমি বলতে যাবো কেন? আমি সুরেনকে যা-বলবার বলবো—

ভূপতি ভাদুড়ী রেগে গেল। বললে—তুমি তো বেশ ছোকরা হে! জানো সে আমার কে? সে আমার ভাগ্নে, আমি তার মামা। আমাকেই তোমায় বলতে হবে—

ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে সুরেন দরজা খুলে দিয়েছে। খুলে দিয়ে সামনে দেবেশকে দেখে অবাক। আরো অবাক মামাকে দেখে।

বললে—দেবেশ? তুই?

দেবেশ বললে—তোর সঙ্গেই দেখা করতে এলুম—একটা কাজ আছে তোর সঙ্গে—

ভূপতি ভাদুড়ী পাশে দাঁড়িয়ে সব কথাগুলো শুনছিল। সুরেন সেদিকে না তাকিয়ে বললে—তুই আয়, ভেতরে আয়—

দেবেশ বললে—আমার এখন ভেতরে বসবার সময় নেই ভাই, আমি সিউড়ি যাচ্ছি, তোকে একটা কথা বলেই আমি চলে যাবো। তুই একবার বাইরে আসতে

পারবি? গেটের বাইরে?

সুরেন বললে—চল—

যেমন উঠোন পেরিয়ে ঢুকেছিল, তেমনি সুরেনকে নিয়ে আবার বাইরের দিকে এল। বললে—তোর মামা তোকে খুব বকেছে নাকি কাল?

সুরেন বললে—মামা তো চিরকালই বকে, ও আর নতুন কথা কি?

—এখনও আমার দিকে কেমন অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখছিল। জিজ্ঞেস করছিল যে, তোর সঙ্গে আমার কি কথা আছে! আমি কিছু বলিনি—

সুরেন বললে—আমার সারা জীবনই বকুনি খাওয়ার কপাল, ও আর জীবনে ঘুচবে না রে—

তারপর বাইরের রাস্তায় আসতেই টুলুকে দেখে সুরেন অবাক হয়ে গেল।

বললে—এ কি, তোদের সেই টুলু না?

টুলুও সামনে এগিয়ে এল হাসতে হাসতে।

বললে—আমি ক্ষমা চাইতে এলুম আপনার কাছে—

সুরেন লজ্জায় পড়ে গেল। সবে ঘুম থেকে উঠেছে। তখনও মুখ-হাত-পা ধোওয়া হয়নি। খালি গা। টুলু যে হঠাৎ তাদের বাড়ি আসবে, তা সে কী করে কল্পনা করবে?

টুলু বললে—কালকে আপনাকে নিয়ে হাসপাতালে বেরোনই আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছিল।

সুরেন বললে—না না, তার জন্যে এত সকালে আসার কী দরকার ছিল? আমি তো কিছু মনে করিনি।

টুলু বললে—কাল সারারাত তাই আমি ঘুমোতেই পারিনি।

সুরেন দেবেশের দিকে চাইলে। বললে—টুলু তো আমার মতই সেণ্টি-মেণ্টাল দেখছি—

দেবেশ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই ভাই, আমি এখুনি সিউড়ি যাচ্ছি তিনদিনের জন্যে। আমার ট্রেণ ছাড়বে আটটার সময়—আমি যাই—

টুলু বললে—আমিও চলে যাবো, আমিও আর কষ্ট দেবো না আপনাকে—

দেবেশ বললে—তোমার তাড়াতাড়ি চলে যাবার দরকার কী? তুমি গল্প করো না সুরেনের সঙ্গে—

টুলু বললে—না না, সুরেনবাবু এখুনি ঘুম থেকে উঠলেন, এখন আর বিরক্ত করবো না—

সুরেন বললে—আমি থাকি পরের বাড়িতে, আমি এ-বাড়ির অন্নদাস, আমি নিজেও এখানে থাকতে ভালবাসি না, কেউ এলে তাকে ভদ্রতা করে বসতে বলতেও পারি না—

দেবেশ হঠাৎ বলে উঠলো—আমি যাই ভাই—

বলে চলতে লাগলো ট্রাম-রাস্তার দিকে।

টুলু বললে—আমিও চলি, কেমন?

সুরেন বললে—তুমি তো সেই যাদবপুরেই যাবে এখন?

টুলু বললে—এখন বৌবাজারে পার্টি অফিসে যাবো, একবার যখন এসে পড়েছি, তখন আর বাড়ি ফিরে যাবো না—

সুরেন বললে—যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে তো আমার ঘরে এসে বসবে?

টুলু বললে—আমার তো বসতে আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার বাড়িতে যদি কেউ আপত্তি করে?

সুরেন বললে—আমার মামা একটু সেকেলে লোক—

টুলু বললে—সে আমি সব শুনেছি, সেই জন্যেই তো ভেতরে ঢুকিনি—

সুরেন বললে—এই কষ্ট করে তুমি নিজে না এসে যদি কাউকে দিয়ে খবরটাও পাঠাতে তো আমি নিজেই গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতুম।

টুলু বললে—অতটা সাহস আমার কী করে হবে বলুন?

সুরেন বললে—আসলে দেবেশেরই দোষ। দেবেশ যদি আমাকে একবার খবর দিত তাহলেই আমি চলে যেতুম—

টুলু বললে—কিন্তু তাহলে তো আপনার মামার কাছে তার জন্যে বকুনি খেতে হতো?

সুরেন হাসলো। বললে—বকুনি তো এমনিতেই খেতে হবে। পেছনে চেয়ে দেখ মামা উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকেই চেয়ে দেখছে—

টুলু ভয় পেয়ে গেল। বললে—সর্বনাশ, তাহলে আর দেরি নয়, আমি যাই—

সুরেন বললে—চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই--

টুলু বললে—আমরা পার্টির মেয়ে, আমাদের এগিয়ে দিতে হয় না।

সুরেন বললে—তা হোক, তুমি এত কষ্ট করে আমাদের বাড়ি এলে, আর আমি তোমাকে ট্রাম-রাস্তা পর্যন্ত এগিয়েও দিতে পারবো না?

চলতে চলতে টুলু বললে—আপনাব মামা বোধহয় এখনও আমাদের লক্ষ্য করছেন—

—তা করুক। আমি আর কাউকে ভয় করি না।

টুলু সুরেনেব মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—হঠাৎ এ-কথা বলছেন যে?

সুরেন বললে—এক-এক সময় রাগ হয়ে যায় খুব। এই রকম রাগ করেই তো সেদিন হঠাৎ তোমাদের অফিসে গিয়ে উঠেছিলুম।

টুলু বললে—শুনেছি আপনি নাকি কারোর মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না।

সুরেন বললে—ওটা আমার স্বভাব—

টুলু হঠাৎ বললে—আর কতদূর আপনি আসবেন আমার সঙ্গে?

সুরেন বললে—এবার এলে নিজে এসো না কখনও, আমাকে খবর পাঠিয়ে দিও, তোমার কাছে গিয়ে আমি নিজে দেখা করবো।

টুলু বললে—দেখছি সত্যিই আপনি ভীতু—। এ-যুগে এই ভীতু মন নিয়ে কী করে বাঁচবেন? এটা যে ঝগড়া-মারামারি-ঠেলাঠেলির যুগ।

সুরেন বললে—তাই তো দেখছি। যেখানেই যাই সেখানেই সবাই ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কেউ ভালবাসতে চায় না, সবাই টিকে থাকতে চায়।

টুলু বললে—টিকে থাকা যে কত কষ্টের তা আপনি আর কতটা জানেন?

সুরেন বললে—দেবেশ আমাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছে—

টুলু বললে—দেবেশদা আর আমার কতটুকু জানে?

সুরেন বললে—মানুষ তো শুনেছি অনেক সময় নিজেকেই জানতে পারে না। আমারই তো মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নিজেকেই ভালো করে চিনতে

পারিনি।

টুলু বললে—ও-সব বড় বড় দার্শনিক কথা আমি ঠিক বুঝিনে—

সুরেন বললে—দার্শনিক কথা নয়। এই দেখ না এই বাড়িতে আমার কিছুই অভাব নেই বলতে গেলে। আমার থাকবার ঘর, মাথার ওপর গার্জেন, টাকার দরকার হলেই পাই, তার ওপর এ-বাড়ির যিনি মালিক তিনি সমস্ত সম্পত্তি আমার নামেই উইল করে দিতে চাইছেন। তার দামই প্রায় সাত-আট লাখ টাকা। তবু আমার মনে হয় আমি নিরাশ্রয়, মনে হয় আমার মত হতভাগা বোধহয় পৃথিবীতে একটিও নেই—

টুলু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তবু আপনি কী চান?

সুরেন বললে—আমি কী চাই তাই যদি আমি বলতে পারবো, তাহলে তো আমার আর কোনও দুঃখই থাকতো না। তাহলে এই সব ছেড়ে কেন আমি তোমাদের পার্টির অফিসে থাকতে গিয়েছিলুম?

টুলু এবার চাইলে সুরেনের মুখের দিকে। বললে—আপনি কি কখনও কাউকে ভালবেসেছিলেন?

সুরেন কথাটা শুনে চমকে উঠলো। বললে—কী জানি, কই, মনে তো পড়ে না।

—নিজেকে?

সুরেন বললে—এক-এক সময় মনে হয় আমি বোধহয় বড় স্বার্থপর। আমি বোধহয় নিজেকেই সব চেয়ে বেশী ভালোবাসি—

টুলু হঠাৎ বলে উঠলো—নিজেকে ভালো না বেসে একটু পরকে ভালো-বাসুন, দেখবেন সব অশান্তি দূর হয়ে গেছে।

সুরেন কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই একটা বাস এসে গেছে।

টুলু বললে—আমি আসি—

সুরেন বললে—তোমাকে বসতে বলতে পারলাম না, এ দুঃখ আমার জীবনে যাবে না—

টুলু বললে—আমি সামান্য মানুষ, আমার জন্যে কেউ দুঃখ পাক এটা ভাবলে আমার কষ্ট হয়। আর তা ছাড়া আমি তো নিজেই যেচে এসেছি। আপনি তো আর আমাকে ডেকে পাঠাননি। সুতরাং এর সুখ-দুঃখের দায় তো আপনার নয়, আমার—

টুলু বাসের দিকে এগোচ্ছিল।

সুরেন জিজ্ঞেস করলে—আবার কবে দেখা হবে?

টুলু বাসে ওঠবার আগে বললে—দেখা করবার ইচ্ছেটা যদি খাঁটি হয় তো দেখা হতে আটকাবে না, দেখা যেমন করেই হোক একদিন-না-একদিন হবেই—

বলে টুলু বাসে উঠে পড়লো। একটুখানি থেমেই বাসটা আবার চলতে লাগলো। সুরেন বাসটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। দূর থেকে দেখা গেল টুলু গিয়ে বাসের ভেতরে ঢুকলো। তারপর একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো। কিন্তু তারপর আর তাকে দেখা গেল না।